প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৭, প্রকাশক হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলিকাতা-৭৩, মুদ্রণে মহামায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬৬বি, মাণিকতলা স্ট্রিট, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল।

সূচিপত্র

হো চি মিন

জেলখানার ডায়েরি

সন্ধ্যার ছবি

গোলাপ ফুটে ওঠে গোলাপ ঝরে যায়
উদাস ঝরে বটে শুকনো গোলাপ
গন্ধে তবুও সে কুঠুরি ভরে যায়
জাগিয়ে কয়দির মর্মপ্রলাপ।

সকালের ছবি

ভোরবেলা রোজ সূর্যের উঁকি পাহাড়-আড়াল থেকে
গোলাপি আভায় ভরে যায় সব গ্রাম ও গ্রামান্তর।
অন্ধ কারার সামনে কেবল অন্ধকারের ছায়া
রৌদ্রের রেখা ছোঁয় না কখনো কয়েদির অন্দর।

অসুখ

ক্ষীণ হয়ে আছে শরীর চীনের এলোমেলো আবহাওয়ায়
ভিয়েৎনামের চিরযন্ত্রণাঃঅশান্ত রাখে প্রাণ।
জেলে পড়ে থাকা – হায় কী কঠিন তীব্র প্রতীক্ষা এ
চিরকান্নার উৎস যেন-বা, আমি তবু গাই গান।

শারদীয় রাত

রাইফেল হাতে দরোজার কাছে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে।
ছেঁড়া মেঘগুলি ঘুরছে ওপরে চাঁদের সঙ্গে মিলে।
ট্যাঙ্কবাহিনীর মতো সারে সারে খাটিয়ার ছারপোকা।
মশাগুলি যেন বিমানবহর উড়ে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে।
হাজার লী দূরে স্বদেশের দিকে হৃদয় আমার ধায়।

বিষাদের ভারে স্বপ্নগুলিও যেন-বা জড়ানো জট।
কোনো দোষ নেই, একটা বছর বাঁধা তবু শৃঙ্খলে।
বন্দীদশার কবিতা বানাই কালিতে চোখের জলে।

ঝকঝকে দিন

সবই একদিন ঘুরে যায়, জানি প্রকৃতিবই বিধি এই।
বৃষ্টির কাল কেটে গেল, এল ঝকঝকে দিন আজ।
মুহূর্তে মাটি সরিয়ে নিয়েছে সিক্ত আচ্ছাদন,
দশহাজার লী-র ওপরে এখন ছড়ানো জরির কাজ।
রৌদ্রের তাপে স্নিগ্ধ বাতাসে ফুলেরা হাসিতে মাতে,
উজ্জ্বলশাখা বড়ো-বড়ো গাছে পাখির মহড়া-গান।
সবার হৃদয়-বিশ্বহৃদয আনন্দে যায় ভরে
বিষাদের পরে আসে যে মধুর—প্রকৃতিরই এ বিধান।

জেলপ্রাঙ্গণে হাঁটা

এতদিন ধরে অকর্মা থেকে দুটো পা-ই তুলতুলে—
দু-চার কদম হাঁটতে গেলেই টলমল করে ভারি।
তবে তক্ষুনি জেল-ওযার্ডার গাঁক-গাঁক করে ওঠে
'এই-যে, ফেরো হে, জেলের ভিতরে চলবে না পাযচারি।'

বন্দীদশার পর পাহাড়চড়া

পাহাড় জড়ায় মেঘেদের আর মেঘেরা জড়ায পাহাড়
নিষ্কলঙ্ক আয়নার মতো ঝকঝকে নদী নিচে।
পশ্চিম গিরিতট বেয়ে হাঁটি, ধুকধুক শুনি বুকে
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে ভাবছি গত যত বন্ধুকে।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

লু শুন

গাঁয়ের অপেরা

গত বিশ বছরের হিশেব কষলে, আমি সকুল্যে মাত্র দু-বার চীনে অপেরা দেখেছি। তার মধ্যে প্রথম দশ বছরে তো একবারও নয়। কারণ, অপেরা দেখার ইচ্ছে বা সুযোগ, কোনোটাই সে-সময়ে হ'য়ে ওঠেনি। যে দু-বার দেখেছি, তা পরের দশ বছরে। তাও সেই দু-দু-বারই বিশেষ-কিছু না-দেখেই বেরিয়ে এসেছি।

গণতন্ত্রের সেটা প্রথম বছর[১]। সবে আমি পিকিঙে এসেছি। সেই সময়েই একবার দেখতে গিয়েছিলাম পিকিং অপেরা। এক বন্ধুপ্রবর এসে জানিয়েছিলেন - পিকিং অপেরা অতীব চমৎকার উপাদেয়, চোখ ভ'রে দেখবার মতো জব্বর এক জগৎ।

ভাবলাম, পালা দেখাটাই তো বেশ আনন্দের। তার ওপর যদি হয় পিকিং অপেরা।

মহা-উৎসাহে এক রঙ্গশালায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম দুজনে। ততক্ষণে পালা শুরু হ'য়ে গেছে, বাইরে থেকেই ঝুমঝাম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ভেতরে ঢুকতেই চোখ ধাঁধিয়ে দিলে সবুজ-লাল আলোর ঝলকানি। তারপর একটু ধাতস্থ হ'লে নজরে পড়লো মঞ্চের নিচে দর্শকদের অজস্র মুণ্ডু। ভালো ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে তখনও গোটাকয়েক ফাঁকা আসন রয়েছে। চাপাচাপি ক'রে এগিয়ে বসতে যাবো, কে-একজন আমাদের উদ্দেশ ক'রে কিছু ব'লে উঠলো। আমার তখন কান ভোঁ-ভোঁ করছে। অতি কষ্টে তার কথা হৃদয়ঙ্গম করলাম—'লোক আছে, বসবেন না।' আমরা পিছিয়ে এলাম। এবার খুব চকচকে-বেণীওয়ালা একটা লোক আমাদের অন্য একধারে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখালে। ঐ তথাকথিত জায়গাটা একটা বেঞ্চি ছিলো, কিন্তু তার তক্তাটা আমার উরুর তিন-চতুর্থাংশ চওড়া, আর পায়াগুলো আমার পায়ের চেয়েও দুই তৃতীয়াংশ উঁচু। প্রথমে তো ওটা বেয়ে ওঠবার সাহসই হ'লো না আমার। উলটে তৎক্ষণাৎ মনে এলো

বে-আইনি অত্যাচারের জন্য ব্যবহৃত সব ভয়াবহ যন্ত্রের কথা। গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠলো আমার, পালিয়ে এলাম ভয়ে।

বেশ খানিকটা রাস্তা এসেছি, হঠাৎ আমার বন্ধুর গলা শুনতে পেলাম— 'হ'লো কী তোমার?' ফিরে তাকিয়ে এতক্ষণে বোধগম্য হ'লো যে ওকেও আমার পেছনে বের ক'রে নিয়ে এসেছি। খুব অবাক হ'য়ে জিগেশ করলে সে—'কী হ'লো? বোবা মেরে খালি হেঁটেই চলেছো দেখছি, জবাব দিচ্ছো না যে?' বললাম—'বন্ধু হে, মাপ করো। কান আমার এতই ভোঁ-ভোঁ করছে যে তোমার কথা একেবারে শুনতে পাইনি।'

পরে ব্যাপারটা যখনই মনে পড়তো, খুব আশ্চর্য লাগতো আমার। হয় অভিনয়টা খুব বাজে ছিলো, নয়তো দর্শক-আসনে বসা আজকাল আমার আর ধাতে সইছে না।

কোন বছরে দ্বিতীয়বার অপেরা দেখতে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে সে-বছর 'হু-পেই'-তে বন্যা হয়েছিলো এবং তান-শিন-পেই[2] তখনো জীবিত। বন্যাত্রাণের জন্য চাঁদা দেবার পদ্ধতি হচ্ছে দু-ইয়ুয়ান দিয়ে একটা টিকিট কাটা আর তা দিয়ে একনম্বর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার সুযোগ পাওয়া। অনেক নামীদামি অভিনেতা আসরে নামবেন, তান-শিন পেইও তাঁদের মধ্যে আছেন অবশ্যই। চাঁদা-আদায়কারীর প্রতি ভদ্রতা দেখানোর জন্য একটা টিকিট আমরা কেটেছিলাম ঠিকই, তবে একজন 'সর্বঘটে কাঁঠালি কলা' জাতীয় লোক এই সুযোগে আমায় জানিয়ে দিলো যে তান-শিন-পেই-কে না দেখলেই নয়, অনবদ্য তাঁর অভিনয়, ইত্যাদি-ইত্যাদি। সুতরাং কয়েক বছর আগের কান ভোঁ-ভোঁ-করা বিপর্যয়ের কথা ভুলে গিয়ে একনম্বর রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়েছিলাম। তবে একটা বড়ো কারণ বোধহয় এটাও যে এত দামি টিকিটটা কাজে না-লাগিয়ে পারছিলাম না। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো তান-শিন-পেই মঞ্চে বেশ দেরি ক'রে আসবেন। একনম্বর রঙ্গমঞ্চ নাকি আধুনিক ধাঁচে তৈরি, বসার জায়গার জন্য গুঁতোগুঁতি করতে হবে না। তাই নিশ্চিন্ত মনে ধীরে-সুস্থে ন-টা নাগাদ বেরিয়েছিলাম। হায়! কে জানতো এবারকার অবস্থাও আগের মতোই হবে। লোকজনের এমন ভিড় যে পা-ফেলা দায়। দূর থেকেই লোকের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে-করতে দেখতে পেলাম মঞ্চে একজন বুড়ি দান[3] গান গাইছে। তার ঠোঁটের কোণায় পাকানো দুটো জ্বলন্ত কাগজ, পাশে একজন যমদূতের মতো লোক। আর ভেবেচিন্তে অনুমান করলাম এ নিশ্চয়ই মৌদ্গল্যায়নের[4] মা হবে, কেননা

পরে একজন সন্ন্যাসীও মঞ্চে এলো। কিন্তু উনি কোনো বিখ্যাত অভিনেতা কিনা ঠাহর করতে না-পেরে আমার বাঁ-পাশে চাপাচাপি করা একজন মোটা লোককে সে-কথা জিগেশ করলাম। লোকটা খুব অবজ্ঞা ভরে টেরচা চোখে দেখলো আমাকে, তারপর জবাব দিলো 'গং-ইয়ুন-ফু'[৫] ('কুঙ ইয়ুন ফু')।

আমি তো আমার অজ্ঞতা আর অন্যমনস্কতায় ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলাম। মুখ-টুখ গরম হ'য়ে গেলো আমার। সেই সঙ্গে মাথায় এই দৃঢ় সংকল্প খেলে গেলো যে আর প্রশ্নটশ্ন করা নয়। সুতরাং একজন তরুণী 'দান'কে গাইতে দেখলাম, এক বুড়োকে গাইতে দেখলাম, একদঙ্গল লোকের ঝাড়পিট দেখলাম, দু-তিনজন লোকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখলাম। ন-টা থেকে দশটা বাজলো, দশটা থেকে এগারো, এগারোটা থেকে সাড়ে-এগারো, সাড়ে-এগারো থেকে বারোটা — কিন্তু তান-শিন-পেই আর মঞ্চে এলেন না।

আমি কোনোদিনও কোনো-কিছুর জন্য ধৈর্য ধ'রে এতক্ষণ অপেক্ষা করিনি। তার ওপর পাশের মোটা লোকটা ফোঁস-ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলছে। ও দিকে মঞ্চের ওপর ধুমধাড়াক্কা মারদাঙ্গা, কাঁপা-কাঁপা লাল-সবুজ আলোর ঝলকানি, আর সেই সঙ্গে বারোটাও বেজে গেছে। এ-সবকিছু মিলে হঠাৎ ঠাহর করলাম আর এখানে টেঁকা যাচ্ছে না। তক্ষুনি ঠিক যন্ত্রের মতো উলটো দিকে ঘুরে গেলো শরীরটা। বেশ জোরে একটা ঠেলা দিতেই অনুভব করলাম পেছন-দিকটা তৎক্ষণাৎ ভর্তি হ'য়ে গেলো। বোধহয় সেই স্থিতিস্থাপক মোটা লোকটা ওর ডানদিকের চেপটে-থাকা শরীরের অংশ ফুলিয়ে ভ'রে দিলো আমার ফাঁকা জায়গাটা। আর ফেরার উপায় না-থাকায় আমি কোনোরকমে ঠেলেঠুলে এগিয়ে চললাম যতক্ষণ-না বেরুনোর দরজায় এসে পৌঁছুনো যায়। কেবল দর্শকদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাড়া খাটার জন্য দাঁড়িয়ে-থাকা রিক্সাটি ছাড়া রাস্তার ওপর পথচারী বিশেষ ছিলো না। বাইরের দরজায় কিন্তু তখনো জনা তিরিশ-চল্লিশ লোক ঘাড় উঁচিয়ে পালার পোস্টার দেখছে, আর আরেকদল লোক কিছুই দেখছে না। মনে হ'লো এরা সম্ভবত অভিনয় শেষে বেরিয়ে-আসা মহিলাদের দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তান-শিন-পেই-এর আসার নামগন্ধও নেই……।

অবশ্য রাতের হাওয়াটা খুবই ঠাণ্ডা আর তাজা। সত্যিই যেন হৃদয় জুড়োনো। পিকিং শহরে এমন চমৎকার হাওয়া, মনে হয়, এবারই প্রথম পেয়েছিলাম।

সেই রাতেই চীনে অপেরাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলাম। আর কখনো কোনো পালা দেখতে যাবার ইচ্ছে আমার হয়নি। এমনকি কখনো যদি কোনো থিয়েটারের সামনেও গিয়ে পড়েছি, তার কোনো প্রভাবই আমার ওপর পড়েনি। যেন মনের দিক থেকে আমার আর চীনে অপেরার মধ্যে উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান।

সে যাই হোক, কয়েকদিন আগে হঠাৎ জাপানি একট বই চোখে পড়লো। দুর্ভাগ্যবশত বইটি আর তার লেখকের নাম বেমালুম ভুলে গেছি। বিষয়: চীনে পালা। সংকলিত একটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হচ্ছে—চীনে অপেরায় ভীষণ গুঁতোগুঁতি, চ্যাঁচামেচি, লাফালাফি, সব মিলে দর্শকদের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়, বস্তুটা রঙ্গালয়ে মোটেই খাপ খায়না। কিন্তু যদি বিস্তৃত খোলা জায়গায় হয, দূর থেকে দেখা যায়, তাহ'লে বোঝা যায় তারও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। তখনি বুঝলাম, ঠিক এই কথাটাই আমার পেটে এসেও মুখে আসছিলো না। কারণ ভালোই মনে আছে ফাঁকা খোলা জায়গায় খুব চমৎকাব পালা দেখেছি আমি। পিকিং (বেজিং) আসবার পর যে দু-বার থিয়েটাবে গিযেছি সেও বোধহয সেই আগেকাব পালার প্রভাবেই হবে। কিন্তু কেন জানি না, পালাটার নাম আমার কিছুতেই আর মনে পড়ছে না।

সেই চমৎকার অপেরা-পালাটি অবশ্য সত্যিই অনেক, অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। বয়স আমার তখন মাত্র এগারো কি বারো। আমরা যে-শহরের বাসিন্দা, সেই লু-সেনে সে-সময়ে এক সামাজিক রীতি প্রচলিত ছিলো। বাইরে থেকে যে-সব মেয়েরা বিয়ে হ'য়ে আসতো, সংসারের দায়িত্ব না-থাকলে তারা গরমকালটা বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসতো। সে-সময়ে আমার ঠাকুমার স্বাস্থ্য যদিও ভালোই ছিলো, মা তবু সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই ভাগ ক'রে নিতেন। তাই গরমকালে বেশি দিনের জন্য দেশে ফিরতে পারতেন না। 'কবর সাফাই'[৬] শেষ হ'লে, অবসর পেয়ে, কয়েকদিনের জন্য দেশে যেতেন। আমিও সে-সময় প্রতি বছরই মা-র সঙ্গ ধ'রে মামাবাড়িতে যেতাম। জায়গাটার নাম পিং-ছিয়াও ছন (শান্তি সেতুর গ্রাম)। সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়। একদম পাণ্ডববর্জিত জায়গা, নদীর পাশেই গ'ড়ে-ওঠা একটা গণ্ডগ্রাম। সব মিলিয়ে তিরিশঘর বাসিন্দাও হবে কিনা সন্দেহ, তাও সকলেই চাষী কিংবা জেলে। মুদির দোকান মাত্র একটি। তবু আমার কাছে সেই গ্রাম ছিলো যেন স্বর্গ। এখানে শুধু যে খুব যত্ন-আত্তি পেতাম, তা-ই নয়,

'সংগীতাঞ্জলি' থেকে পদ মুখস্থ করার হোম-টাস্ক্ থেকেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।

আমি অনেক দূর থেকে আসায় গ্রামের ছোটোরা সকলেই বাবা-মা-র কাছে কম-কাজ করার সুযোগ পেয়ে খেলতে আসতো আমার সঙ্গে। ছোট্ট গাঁয়ে কোনো-এক বাড়ির অতিথি প্রায় সার্বজনীন অতিথি ব'লে গণ্য হ'তো। আমরা সবাই সমবয়সী, কিন্তু বংশধারার হিশেব কষলে সকলেই কমসে-কম আমার কাকা-জ্যাঠা, খুঁজলে এমনকি ঠাকুদ্দা বা বড়োঠাকুদ্দা পাওয়া যেতে পারে। এর কারণ গোটা গাঁয়ের সবারই এক পদবি, সবাই এক গোত্রের লোক। কিন্তু আমরা পরস্পরের বন্ধু, এই ঠাকুদ্দাদের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করায় আমার স্বাভাবিক অধিকার। যদি-বা কারুর গায়ে হাত দিয়েও বসি গ্রামের ছোটো-বড়ো কেউই আমায় 'বেয়াদপ' বিশেষণে অক্ষর সাজাবে না, আর তাছাড়া ওদের শতকরা নিরেনব্বুই জনেরই কোনো বর্ণপরিচয় হয়নি।

প্রায় রোজই আমাদের কাজ ছিলো, মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করা। তারপর তার বাঁকিয়ে তৈরি-করা ছোটো বঁড়শিতে সেই কেঁচো গেঁথে নদীর কিনারায় রেখে চিংড়ি ধরা। চিংড়ি হচ্ছে জলজগতের মহামূর্খ। গোঁয়ারের মতো বঁড়শির মাথাটা দুই দাঁড়ায় ধ'রে মুখে পুরে দেয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই বড়ো গামলা ভর্তি চিংড়ি ধরা হ'তো। রীতি ছিলো, এই চিংড়ি সবই আমাকে দেয়া হবে। এরপর সবাই একসঙ্গে গোরু-মোষ চরাতে যেতাম। কিন্তু বোধহয় উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণী ব'লেই গোরু-মোষগুলো আমার খবরদারি মানতো না। বলা যায়, রীতিমতো অবজ্ঞাই করতো আমাকে। আর আমিও তাই ওদের কাছে ঘেঁষতে খুব একটা সাহস করতাম না। বন্ধুরা কিন্তু কেউই—আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারি ব'লে—আমায় মাফ ক'রে দিতো না। সবাই মিলে খুব হাসিঠাট্টা জুড়ে দিতো।

ওখানে আমার সবচেয়ে লোভনীয় আকর্ষণ ছিলো চাও চুয়াং, (ঝাও ঝুয়াং,) গিয়ে অপেরা পালা দেখা। চাও-চুয়াং 'শান্তি সেতুর গ্রাম' থেকে পাঁচ-লি তফাতে, তুলনায় একটু বড়ো একটা গ্রাম। 'শান্তি সেতুর গ্রাম' খুবই ছোটো। একটি অপেরা-পালা বন্দোবস্ত করার ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। তাই প্রতি বছর কিছু পরিমাণ টাকা চাও চুয়াংকে ধ'রে দিয়ে পালা আয়োজনের শরিক ব'লে মনে করতে নিজেদের। সে-সময় আমি বুঝে উঠতে পারতাম না যে, ওরা কেন প্রতি বছরই অপেরার আয়োজন করে। এখন মনে

হয়, বোধহয় বসন্তকালীন প্রতিযোগিতা বা ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ হিশেবেই ঐ পালাগানের আয়োজন করা হ'তো।

আমার এগারো-বারো বছর বয়সের সেই বছরটাতেও প্রতীক্ষিত দিনটি দেখতে-দেখতে এসে গেলো। কিন্তু কে জানতো এ-বছরের পরিণতি হ'য়ে দাঁড়াবে দুঃখজনক। সকালবেলায় নৌকো পাওয়া গেলো না। শান্তি সেতুর গাঁয়ে একটাই বড়ো খেয়া নৌকো ছিলো, সকালে সেটা বেরুতো আর সন্ধেবেলায় ফিরে আসতো। আর সব নৌকোই ছিলো ছোটো। সেগুলোতে কাজ হবে না। পাশের গাঁয়ে খোঁজ নেয়া হ'লো, কিন্তু সেখানেও আগে থেকেই লোকেরা বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে। খবর শুনে দিদিমা খুব রেগে গেলেন। আগে থেকে ব্যবস্থা করা হয়নি ব'লে বাড়ির লোকদের দোষারোপ ক'রে সুদীর্ঘ বকুনি শুরু হ'লো। মা তখন দিদিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালেন, আমাদের লু-সেন (পু-মেন) শহরের পালা ছোট্ট গ্রামের চেয়ে অনেক ভালো, প্রতি বছরই কয়েকটা ক'রে দেখা হয়, আজ না-হয় নাই-বা হ'লো। আমার তো বুক ফেটে কান্না আসছিলো, কিন্তু মা কড়া ধমক দিলেন। হুকুম হ'লো, যেন ন্যাকামি না-করি, তাহ'লে দিদিমা আবার রেগে যাবেন। ওদিকে অন্য অচেনা লোকের সঙ্গে যাবার অনুমতিও দিলেন না, তাতে নাকি দিদিমার দুশ্চিন্তা হবে। তাহ'লে এখানেই সব শেষ! বিকেলবেলা বন্ধুরা সবাই চ'লে গেলো, পালা শুরু হ'য়ে যাবে। মনে হ'তে লাগলো যেন ঝাঁঝর আর ঢোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এও বুঝলাম ওরা নিশ্চয়ই মঞ্চের নিচে সয়াবীনের দুধ কিনে খাচ্ছে।

সেদিনটা আমার আর চিংড়ি ধরা হ'লো না। বিশেষ-কিছু খেলামও না। মা খুবই অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু কোনো উপায়ও ছিলো না। রাতে খাবার সময় দিদিমাও শেষ অব্দি ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন। আবারও বললেন যে, আমার অখুশি হওয়াই উচিত। এরা অমন কুঁড়ের বাদশা যে অতিথির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় সে-সহবৎটুকুও শেখেনি। খাওয়া হ'য়ে গেলে পালা-দেখে-ফেরা বাচ্চারা সব একত্র হ'য়ে মশগুল হ'য়ে মনের খুশিতে অপেরা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। চুপ ক'রে রইলাম একা আমিই। ওরা সকলেই আমার জন্য আফশোশ করলো, সহানুভূতিও দেখালো। হঠাৎ শুয়াং-শি ব'লে খুব চালাকচতুর একজন, মস্ত কিছু মাথায় এসেছে এমনভাবে,

ব'লে উঠলো—'বড়ো নৌকো? হুম্, সোনা দাতুর' ফেরি নৌকোটা ফিরে এসেছে না?' আরো জনা বারো বাচ্চা ছিলো, তাদেরও মাথায় খেলে গেলো ভাবনাটা। তক্ষুনি তাড়াহুড়ো লাগালো সবাই: ঐ নৌকোতে ক'রে আমাকে নিয়ে যাবেই। আমার তো খুব আনন্দ, কিন্তু দিদিমার সে কী ভয়, সবাই ছোটো-ছোটো, এদের ওপর ভরসা করা চলে না। মা আবার বললেন, যেহেতু বড়োদের সবারই সকালে কাজ আছে, তাদের রাত জাগতে বলাটা উচিত হবে না। এই দোটানার মধ্যে গুয়াং-যি কিন্তু সমস্ত সুবিধে-অসুবিধেগুলো খুঁটিয়ে ভেবে নিয়েছে; এবার ও চেঁচিয়ে উঠলো—'আমি লিখিত গ্যারান্টি দিচ্ছি! নৌকোটাও বড়ো, সুন ভাইও মোটেই দুরন্ত নয়; তাছাড়া আমরা সকলেই খুব ভালো সাঁতার জানি।'

কথা তো ঠিকই। বারো-চোদ্দজন বাচ্চার মধ্যে সাঁতার জানে না এমন একজনও নেই, কয়েকজন তো আবার জোয়ালো স্রোতকেও গ্রাহ্য করে না।

দিদিমা আর মা-র এবার বিশ্বাস জন্মালো। ওরাও আর কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। মিটিমিটি হাসলেন কেবল। আমরা তৎক্ষণাৎ তো হৈ-হৈ করতে-করতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার পাথর-চাপা মনটা হঠাৎই হালকা হ'য়ে গেলো, শরীরটাও যেন ছড়িয়ে গেলো বিশাল। বাইরে বেরুতেই চাঁদের আলোয় চোখে পড়লো শান্তি সেতুর নিচে নোঙর করা একটা শাদা ছইয়ের নৌকো। সবাই লাফিয়ে উঠলো নৌকোয়, গুয়াং-যি সামনের হাল ধরলো, পেছনের হাল ধরলো আ-ফা। ছোটো বাচ্চারা সব আমার সঙ্গে ছইয়ের ভেতরে ব'সে গেলো।

নৌকোর পেছন দিকে জড়ো হ'লো একটু বড়োরা। আমাদের ছেড়ে দিতে এসে মা যতক্ষণে বলছেন—'সাবধানে যাস', ততক্ষণে আমরা নৌকো খুলে দিয়েছি। পাথরের সেতুতে ঠোক্কর খেয়ে কয়েক ফুট পিছিয়ে গেলো নৌকো, তারপর বেরিয়ে এলো সেতুর তলা থেকে। এবারে প্রতি লি-তে, একবার ক'রে হাত বদলে এক-এক দাঁড়ে দু-জন ক'রে, দুটো দাঁড় জোর চললো। কেউ-বা চ্যাঁচাচ্ছে, আর তার সঙ্গে মিশছে নৌকোর মাথায় স্রোতের ছলকানির শব্দ। দু-ধারে ঘন সবুজ ধান আর গমের খেতের মাঝখানে নদীর স্রোতে আমাদের নৌকো যেন সোজা উড়ে চললো চাও-চুয়াং-এর দিকে।

জলের ওপর কুয়াশার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে আছে তাজা বীন, গম আর জল-ঝাঁঝির গন্ধ। এই কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাঁদটাকে দেখাচ্ছে আবছা, মায়াময়।

বৈচিত্র্যহীন কালো একটানা। পাহাড়ের উঁচু-নিচু সারি, দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন নৌকোর পেছনদিক পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে লৌহ-পশুদের দীর্ঘ মেরুদণ্ড। কিন্তু নৌকোটা বড়োই যেন আস্তে চলছে। অন্তত আমার তা-ই বোধ হচ্ছে। চারবার হাত বদল হ'লো দাঁড় টানার। ধীরে-ধীরে অবশেষে অস্পষ্টভাবে চোখে এলো চাও চুয়াং। সেই সঙ্গে মনে হ'তে লাগলো যেন গানবাজনাও কানে আসছে। কয়েকটা আলোর ফুটকি দেখা গেলো, সম্ভবত মঞ্চের আলো, কিংবা জেলেদের আগুনও হ'তে পারে।

বাজনার সেই আওয়াজটা সম্ভবত বাঁশির। উঁচুনিচু, দীর্ঘায়িত সেই সুর, আমার মনটাকে স্তব্ধ, আত্মহারা ক'রে দিলো। মনে হ'লো যেন সেই সুরের সঙ্গে মিশে এই বীন, গম আর জলঝাঁঝির গন্ধে-ভরা রাত্রির আকাশে ছড়িয়ে পড়ছি।

আলোর ফুটকি ক্রমশ বড়ো হ'তে-হ'তে এগিয়ে এলো; জেলেদের আগুনই বটে। তখনই কেবল বোঝা গেলো যেটাকে চাও চুয়াং ব'লে ভেবেছি সেটা আসলে নৌকোর মুখোমুখি পাইন আর সাইপ্রেসের বন। গত বছরও এখানে এসেছিলাম, চোখে পড়েছিলো পাথরের ভাঙা ঘোড়ার মূর্তি মাটিতে প'ড়ে আছে, ঘাসের মধ্যে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে একটা পাথরের ভেড়া। সেই বনটা পেরিয়ে নৌকো একটা দু-ভাগ-হ'য়ে-যাওয়া খালের ভেতরে ঢুকলো। আর তখনই সত্যি-সত্যি নজরে এলো চাও চুয়াং।

প্রথমেই চোখে পড়লো, খেতের বাইরে নদীর ঠিক পাড়েই ফাঁকা জায়গায় একটা মস্ত খাড়া মঞ্চ। চাঁদনি রাতে দূর থেকে ঝাপসা দেখা যায়, কিন্তু কোথায় যে তার শেষ, বোঝা যায় না। মনে হ'লো, ছবিতে যে-মায়াপুরী দেখেছি, তা যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এখানে। নৌকো এখন ছুটছে আরো জোরে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো মঞ্চের ওপর মানুষ, লাল-সবুজের আনাগোনা। মঞ্চের কাছাকাছি নদীতে, যতদূর দেখা যায়, পালা দেখতে-আসা লোকেদের নৌকোর কালো-কালো ছই।

'মঞ্চের কাছে জায়গা নেই, আমরা বরং দূর থেকেই দেখি,' — আ-ফা বললে।

ততক্ষণে নৌকোর গতি ধীর হ'য়ে এসেছে। পৌঁছে গেলাম আমরা। যেমনটি ভাবা গিয়েছিলো, মঞ্চের কাছে যাওয়া যাবে না। মঞ্চের ঠিক উল্টো দিকে যে-মন্দিরটা ছিলো তার চেয়েও দূরে নৌকো দাঁড় করাতে হ'লো। আসলে আমাদের শাদা ছইওয়ালা নৌকোটা কালো-ছইওয়ালা নৌকোদের সঙ্গে একত্রে থাকতে চাইছিলো না। তাছাড়া ফাঁকা জায়গাও তেমন নেই…

নৌকো থামানোর ব্যস্ততার মধ্যে দেখলাম একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক, পিঠে তার চারটে ছোটো পতাকা গোঁজা, বিশাল এক বর্শা হাতে একদঙ্গল খালিহাত লোকের সঙ্গে লড়াই করছে। শুয়াং-ষি জানালো ইনিই হচ্ছেন সেই বিখ্যাত লৌহমস্তক বীর। ষি নিজেই দিনের বেলা শুনেছে, একাদিক্রমে চৌরাশিটা ডিগবাজি দিতে কোনোই অসুবিধে হয়নি তাঁর।

নৌকোর মাথায় ভিড় ক'রে আমরা লড়াই দেখতে লেগে গেলাম। সেই 'লৌহমস্তক বীর' কিন্তু ডিগবাজি দিলেন না। খালিহাতে কয়েকজন লোক কয়েকবার ডিগবাজি খেলো, তারপর সবাই ভেতরে চ'লে গেলো। তখন বেরিয়ে এলো একজন তরুণী 'দান'। সে এসেই প্যানপ্যানানি সুরে গান জুড়ে দিলো। শুয়াং-ষি বললো—'সন্ধের পর দর্শক কম, তাই লৌহমস্তক বীরও টিলে দিয়েছেন, ফাঁকা ময়দানে কে আর কেরামতি দেখায়?' কথাটা ঠিক ব'লেই মনে হ'লো আমার, কেননা মঞ্চের নিচে বেশি লোক ছিলো না সে-সময়। গাঁয়ের লোকের সকালে কাজ আছে। রাতে অপেরা দেখতে না-এসে, তাই, বেশির ভাগই ঘুমুতে গেছে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওই গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের জনা-ত্রিশ-চল্লিশ নিষ্কর্মা। কালো-ছই নৌকোর ভেতরে গ্রামের ধনী পরিবারের লোকজনও অবশ্য আছে। কিন্তু ওরাও পালা দেখছিলো না, বেশির ভাগই মঞ্চের নিচে পিঠে, ফল, কোঁড়া এইসব খাচ্ছে। কাজেই, সব মিলিয়ে, ফাঁকা ময়দানই বলা চলে।

আমার প্রধান উৎসাহ কিন্তু ডিগবাজি দেখায় ছিলো না। শাদা কাপড়ে শরীর ঢেকে দু-হাতে মাথার ওপর গদার মতো সাপের মাথা ধ'রে সর্পরাক্ষস সাজা লোকটার কেরামতি দেখা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। আর ভালো লাগতো হলদে কাপড়-জড়ানো লাফঝাঁপ দেওয়া ব্যাঘ্রপ্রবরকে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও এ-সব কিছুই দেখতে পেলাম না। তরুণী দান যদিও ভেতরে ঢুকে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো তরুণ 'শেং'[৯] সাজা একজন খুব বুড়ো মতন লোক। আমার ক্লান্তি এসে গিয়েছিলো। কুই (গুই) শেংকে পাঠালাম সয়াবীনের দুধ কিনে আনতে। ও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বললো—'নেই, দুধ-বেচা কালা লোকটাও চ'লে গেছে। সারাদিন ধ'রে ছিলো। - আমি দু-বাটি দুধ খেয়েছিলাম। এখন আর কী করবি! কাঠের ভাঁড়ে ক'রে জল এনে দিচ্ছি তোকে।'

আমি জল খেলাম না। প্রায় জোর ক'রেই পালা দেখতে লাগলাম।

তাও কী দেখছিলাম নিজেই বলতে পারবো না। কেবল মনে হ'তে লাগলো অভিনেতাদের মুখগুলি ধীরে-ধীরে কেমন যেন অদ্ভুত হ'য়ে যাচ্ছে। আমার সারা শরীর কেমন অবশ হ'য়ে আসছে, গ'লে-গ'লে সমতল হ'য়ে যাচ্ছে, সবকিছু উঁচু-নিচু সব একাকার। ছোটো কয়েকজন খুব হাই তুলতে লাগলো, অপেক্ষাকৃত বড়োরাও গল্প জুড়ে দিলো নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ একটা লাল জামা পরা বামন ভাঁড়কে একটা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা লোক থামে বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করলো। আর তখনই কেবল সবার মনোযোগ ফিরলো ওদিকে, হাসতে লাগলো সবাই। আমার মনে হয় সে-রাত্রিবে এটাই ছিলো সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য।

কিন্তু শেষ অব্দি এক বুড়ি 'দান' মঞ্চে উঠে এলো। বুড়ি 'দান'কেই সবচেয়ে ভয় পাই আমি, বিশেষ ক'রে সে যখন পা ছড়িয়ে ব'সে গান জুড়ে দেয়। তখন সবাইকেই ঝিমিয়ে পড়তে দেখে বুঝলাম, সবারই অবস্থা তথৈবচ। বুড়ি 'দান' প্রথমে ধীর পায়ে এদিক-ওদিক চলতে-চলতে গান করছিলো, শেষে মঞ্চের মাঝখানে রাখা একটা 'জিযাও'[১০] চেয়ারেব ওপর ব'সে পডলো। আমাব ভয়ানক মেজাজ খারাপ হ'লো, শুয়াং-ষির তো বিড়বিড়িয়ে গাল পাড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলো। ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছি, অনেকক্ষণ পর সেই 'দান' একবার হাত তুললো। ভাবলাম, বুঝি-বা উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু হায়' আবার হাতটাকে আগের জায়গায় রেখে আস্তে-আস্তে গেয়েই চললো। নৌকোয় বেশ কয়েকজন দীর্ঘশ্বাস আর চেপে রাখতে পারলো না। হাই তুলতে লাগলো বাকিরাও। শুয়াং-ষি আর সহ্য করতে পারলে না। শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেললো – 'ওর গান বোধহয় ভোর অব্দি চলবে। আমাদের এবার ফেরাই ভালো।' – আসবার সময়ের মতোই উৎসাহ দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেলো সবাই। তিন-চারজন নৌকোর পেছন দিকে দৌড়ে গেলো, লগি ঠেলে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পিছিয়ে মুখ ঘোরানো হ'লো নৌকোর। দাঁড় ঠিকঠাক বসিয়ে, বুড়ি 'দান'কে গাল দিতে-দিতে সেই পাইন সাইপ্রেস বনের দিকে এগোলাম আমরা।

চাঁদ তখনো ডোবেনি, বোঝা যায় আমরা খুব বেশিক্ষণ পালা দেখিনি, আর চাও-চুয়াং ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে উঠলো। ফিরে তাকালাম মঞ্চের দিকে। আসবার সময়ের মতোই আবছা মায়াময় সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন গোলাপি আলোয় ঢাকা কোনো মায়াপুরীর প্রাসাদ। কানে

এলো সেই বাঁশির আওয়াজ, টানা-টানা সুর। তখন মনে হ'লো, বুড়ি 'দান' হয়তো এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কাউকে ফিরে যেতে বলবার ইচ্ছে হ'লো না আর। খুব কম সময়ের মধ্যেই পাইন-সাইপ্রেসের বন পেছনে প'ড়ে গেলো। চারদিকে অন্ধকার তখন আরো মিশমিশে। বোঝা যায়, রাত গভীর হয়েছে। পালা নিয়ে আলোচনা, গালপাড়া, হাসাহাসি, ইয়ার্কি-ফাজলামির মধ্যে--প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চলেছে সবাই। নৌকোর মাথায় ঘা-খাওয়া জলের আওয়াজ এখন শোনা যাচ্ছে আরো সুস্পষ্ট। যেন একটা বিরাট শাদা মাছ আমাদের এই নৌকো! একদল বাচ্চাকে পিঠে ক'রে ফেনপুঞ্জের উপরে লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে। রাতে যারা মাছ ধরে সেই সব জেলেদের কয়েকজন, বেশ বুড়োই হবে, নিজেদের নৌকো থামিয়ে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে তারিফ ক'রে উঠলো।

'শান্তি সেতুর গ্রাম' তখনো এক লি পথ বাকি, নৌকোর গতি মন্থর হ'য়ে এলো। দাঁড়িরা সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, কেননা নৌকো বাওয়া হয়েছে খুব দ্রুত। বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ পেটে কিছু দানাপানিও পড়েনি। বুদ্ধি বাতলালো কুই (গুই) শেং—"লু হান" বীন খুব ভালো ফলেছে, চ্যালাকাঠও মজুত আছে কিছু। চুরি ক'রে সেঁকে খাওয়া যাক।' সব্বাই রাজি হ'য়ে গেলো তক্ষুনি; আর সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো নৌকোটা। পাড়ের লাগোয়া খেতেই চক্‌চকে কালো ফলন্ত 'লু হান' বীন।

'ওরে আ-ফা, এদিকটা যে তোদের ক্ষেত, ওদিকটা তো লিউ-ই বুড়োর। কোন দিক থেকে চুরি করবো, বল?'—জিগেশ করলে শুয়াং-ষি। সবার আগে পাড়ে লাফ দিয়েছে সে। ততক্ষণে সবাই লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে পড়েছি পাড়ে। আ-ফা পাড়ে নামতে-নামতে জবাব দিলে—'একটু দাঁড়া, দেখে নিই।' দু-পাশটাই হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখে নিলে সে। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে বললে—'আমাদেরটাই চুরি কর, এগুলো বেশ বড়ো-বড়ো।' একডাকে সাড়া দিয়ে সবাই আ-ফাদের বীন খেতে ঢুকে পড়লো, দু-হাত ভর্তি ক'রে বীন তুলে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতে লাগলো নৌকোয়। শুয়াং-ষির কিন্তু ভয়, আরো বেশি বীন তুললে আ-ফার মা টের পেয়ে হৈ-হল্লা জুড়ে দেবেন। তাই তার পরামর্শ অনুযায়ী, লিউ-ই দাদুর খেত থেকেও প্রত্যেকেই দু-হাত ভ'রে বেশ কিছু বীন তুলে নিলো।

আমাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো ছিলো, তাদের কয়েকজন ধীরে-ধীরে নৌকো বাইতে লাগলো। কেউ-কেউ নৌকোর পেছন দিকে ব'সে আগুন

জ্বাললো। ছোটোরা আর আমি বানের খোশা ছাড়ানোর কাজে লেগে গেলাম। একটু বাদেই বান সেঁকাও হ'য়ে গেলো। নৌকোটাকে স্রোতে ইচ্ছেমতো ভাসতে দিয়ে গোল হ'য়ে ঘিরে ব'সে মনের সুখে সেই সেঁকাবান খেতে লাগলাম সবাই। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আবার নৌকো চালানো আরম্ভ হ'লো। আর অন্যদিকে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলা হ'লো। বানের খোসা-ও ফেলে দেওয়া হ'লো জলে। ফলে চৌর্যবৃত্তির আর-কোনো চিহ্নই রইলো না।

শুয়াং-ঘির ভয় ছিলো, সোনাদাদুর তুন আর চ্যালাকাঠ ব্যবহার করা হ'লে বুড়োর যা কড়া নজর, নির্ঘাৎ টের পেয়ে যাবেন। কিন্তু সবাই মিলে আলোচনা করার পর ঠিক হ'লো—ভয়টয় করা চলবে না। যদি বুড়ো গালমন্দ করে, তবে গত বছর নদার পাড় থেকে নেয়া অর্জুন গাছের শুকনো ডালটা বুড়োর কাছ থেকে ফেরৎ চাইবো। সেই সঙ্গে মুখের ওপর ওকে 'ঘেয়ো বুড়ো' ডেকে-ডেকে খচানো হবে।

'সবাই ফিরে এসেছ, আর কোনো গোলমালও হয়নি। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, লিখিত গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।'—শুয়াং-ঘি হঠাৎ নৌকোর মাথা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি, শান্তি সেতুর সামনা-সামনি এসে গেছি। সেতুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সে আর কেউ নয়, আমারই মা। আর তারই সঙ্গে কথা বলছে শুয়াং-ঘি। আমি সামনের ছই থেকে বেরিয়ে পড়লাম, নৌকোটাও সেতুর নিচে ঢুকে থামলো। আর ঝপাঝপ পাড়ে উঠে এলাম আমরা। লক্ষ করলাম, মা-র বেশ একটু রাগ হয়েছে। বললেন, 'দু-ঘণ্টা কেটে গেছে, এত দেরি কেন তোদের?' আবার তার পাশাপাশি বেশ খুশিও হয়েছেন বোঝা গেলো। সবাইকে চালভাজা খেতে ডাকলেন।

সকলেই বললো, পেট-পুরে জলখাবার খাওয়া হ'য়ে গেছে, তাছাড়া চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচা যায়। এই-রকম ব'লে-ট'লে যে-যার বাড়ি ফিরে গেলো।

পরদিন খুব বেলা ক'রে উঠলাম আমি। কিন্তু সোনাদাদুর চ্যালাকাঠ নিয়ে কোনো ঝগড়া-টগড়া শুনতে পেলাম না। বিকেলে আবার চ'লে গেলাম সেই চিংড়ি ধরতে।

'শুয়াং-ঘি, বুঝলি, তোরা সব এক-একটা হাড়-বজ্জাত। আর তুলবি তো

তোল, দেখেশুনে না-তুলে, মাড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিয়েছিস বেশ কিছু!' মাথা তুলে দেখি লিউ-ই দাদু, বীন বেচে নৌকো নিয়ে ফিরছেন। পাটাতনের ওপর তখনো একবোঝা বীন।

'হ্যাঁ, করেছি তো। আমরা অতিথিকে খাওয়াচ্ছিলাম। তাও তো প্রথমে ভেবেছিলাম তোমারটা নেবো না। একটু দেখে চলো, নইলে তোমার ভয়ে চিংড়িগুলো পালিয়ে যাবে।'—শুয়াং-ষির সাফ জবাব।

লিউ-ই দাদু আমায় দেখে দাঁড় থামালেন, হেসে বললেন—'অতিথিকে খাইয়েছিস?—তবে তো ঠিকই করেছিস।' তারপর আমায় বললেন—'স্ুন-ভাই, কাল রাতের অপেরা পালাটা ভালো ছিলো তো?'

আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলাম—'খাশা।'

—'বীনের স্বাদ ভালো ছিলো তো?'

আবার মাথা নাড়লাম আমি—'তোফা, চমৎকার।'

অভাবিতভাবে লিউ-ই দাদু ভীষণ বিচলিত হ'য়ে পড়লেন, আঙুল উঁচিয়ে যেন পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে এমনভাবে ব'লে উঠলেন—'আসলে বইপড়া শহুরে লোকেরাই জিনিসের আসল কদর বোঝে। বীন বুনবার সময় প্রতিটি দানা আমার বেছে-বেছে নেয়া। গাঁয়ের লোক তো আর ভালো-মন্দর তফাৎ বোঝে না। এরা বলে আমার বীন নাকি অন্যদের চেয়ে মোটেই ভালো নয়। আজই তোর মাকে এগুলো দিয়ে আসবো।'...দাঁড় বেয়ে চ'লে গেলেন সোনাদাদু।

রাতের খাওয়া খেতে মা যখন ডাকলেন, গিয়ে দেখি টেবিলে এক বড়ো বাটি ভাত সেদ্ধ 'লু হান' বীন। লিউ-ই দাদু আমাকে খাওয়াবার জন্য মাকে দিয়ে গেছেন। শুনলাম, শতমুখে আমার প্রশংসা করেছেন মার কাছে—'এত অল্প বয়সেই ঠিক জিনিশ চিনতে শিখেছে, বড়ো হ'য়ে নিশ্চয়ই চুয়াং (ঝুয়াং) ইউয়ান[১১] হবে।'

তবে বীন খেয়ে কিন্তু আমার গত রাতের মতো অত ভালো লাগলো না।

সত্যি-বলতে, আজ এতদিন পরেও বলতে পারি যে, সে-রাতের মতো ভালো বীন তারপর আজ অব্দি খাইনি আর সে-রাতের মতো ভালো অপেরা পালাও আর কোনোদিন দেখিনি।

টীকা:

১। চীনে বছরকাল গোনার এক প্রাচীন পদ্ধতি হ'লো যে-কোনো নতুন রাজত্বকাল থেকে বছরের হিশেব করা। ১৯১১ সালের বিপ্লবে 'গণতন্ত্র'

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাই গণতন্ত্রের প্রথম বছর হ'লো ১৯১২ সাল।

২। তান শিন-পেই (তাম জিয়াও তিয়ান) ছিলেন তৎকালীন চীনে অপেরার একজন নামকরা অভিনেতা।

৩। চীনে অপেরার একটি বৈশিষ্ট্যময় মহিলা চরিত্র হ'লো 'দান'। তখনকার চীনে পালায় সাধারণত পুরুষরাই মহিলা সেজে 'দান' চরিত্রের রূপ দিতো। আমাদের গ্রাম্য যাত্রাপালার 'বিবেক' জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে চীনে অপেরার এই 'দান' চরিত্রের বেশ খানিকটা মিল লক্ষ করা যায়।

৪। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন গৌতম বুদ্ধের এক পরম ভক্ত। প্রচলিত গাথা এই যে, তাঁর মা নিজের পাপকাজের জন্যে নরকে গিয়েছিলেন, আর পরবর্তীকালে মৌদ্‌গল্যায়ন মাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন।

৫। চীনে অপেরার আরেকজন খ্যাতনামা অভিনেতা।

৬। 'কবরসাফাই' : মৃতের সমাধিতে শ্রদ্ধানিবেদনের প্রথা।

৭। 'সংগীতাঞ্জলি' : প্রাচীনতম চীনা কাব্য। মূল চীনে পাণ্ডুলিপিতে ঐ কাব্যগ্রন্থ থেকে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৮। সোনাদাদু : মায়ের অষ্টম কাকা।

৯। শেং : প্রচলিত চীনে অপেরার একটি বিশেষ ধরনের পুরুষচরিত্র।

১০। সম্ভ্রান্ত বংশের চীনে লোকজনদের ব্যবহারযোগ্য এক বিশেষ ধরনের আরামকেদারা।

১১। চুয়াং (ঝুয়াং) ইউয়ান ; চীনের উচ্চতর সরকারি পদে নিয়োগ করার জন্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-পরীক্ষা নেয়া হ'তো, তাতে যে প্রথম হ'তো, তাকে 'চুয়াং ইউয়ান' সম্বোধন ক'রে সম্মান জানানোর চল ছিলো। এই প্রথা বহু বছর ধ'রে চীন দেশে প্রচলিত ছিলো।

অনুবাদ : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

[অক্টোবর ১৯২২]

ওয়াং আন-ইউ

তারা তিনজন

চিউ-শান্ বাড়িতে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ কে যেন তার গায়ে চাপড় মারলে। চোখ খুলেই সে দেখতে পেলে তার পেয়ারের বন্ধু তা-মিঙ্ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তা-মিঙ্ একফালি হেসে বললে: "আরে বিকেল হ'য়ে গেছে। এত যে ঘুমোচ্ছিস হেদিয়ে পড়ার ভয় নেই তোর?" চিউ-শান্ চট্‌পট্ উঠে ব'সে জিগেস করলে, "কী ব্যাপার?" তা-মিঙ্ আর থাকতে না পেরে বললে, "দারুণ খবর আছে।"

"কী দারুণ খবর?"

"মাও-সাই এইমাত্র আমাকে বললে যে কাল গণমুক্তি বাহিনী আমাদের গ্রামে আসছে যাতে জনগণ তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারে। গোটা উদ্যোগ বাহিনী তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তা'হলে আমি বাঁদরের মামা।" তাই শুনে চিউ-শান্ হেসে ফেললে। "ঠিক আছে! ঠিক আছে! বড়োরা তৈরি হচ্ছে, আমরা কী করতে যাচ্ছি?"

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে," তা-মিঙ্ উত্তর দিলে। "চল, দেখি তো শিহ্-তৌ কোথায়, ওর সঙ্গে কথা বলি গিয়ে।" চিউ-শান্ সায় দিলে আর এই দুই দস্যিতে মিলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

তা-মিঙ্ আর চিউ-শান্ দুজনেই ছিলো গরিব জেলের ছেলে আর দুজনেরই বয়েস চোদ্দ বছর! গত বছর থেকে তারা কী ক'রে দাঁড় বাইতে হয় আর নৌকা চালাতে হয় শিখছিলো। আর তা-মিঙের নেতৃত্বে তারা অবসর সময়ে একটা যুব অনুশীলন সমিতিও গ'ড়ে তুলেছিলো আর স্কুলের ছুটির পর তাদের সময়টা তারা জলজ প্রজনন কেন্দ্রের জন্যে কুচো চিংড়ি ধরতে সাহায্যে লাগাতো। বড়োরা ছোটদের ওপর খুব খুশি হ'য়ে বলেছিলো ওরা কত প্রতিশ্রুতিবান।

সেই শেষ গ্রীষ্মের বিকেলে আকাশ ইতিমধ্যে মেঘে ঢেকে গেছিলো।

বাচ্চাদের মুখে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিলো। তারা দক্ষিণের রাস্তা ধ'রে কিছুটা গিয়ে অবশেষে একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা ক'ষে বন্ধ। চিউ-শান্ নিজের মুখের ওপর হাত চেপে রেখে, দরজার দিকে মুখ ক'রে দু-বার জোরে প্যাঁচার ডাক ডাক.স। দরজাটা একটুখানি ফাঁক হ'লো। তারপর একটা বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এলো। সে হ'লো শিহ্-তৌ। শিহ্-তৌ-র বাবা, লি-স্থু-চিঙ্ একটা ট্রলারে কারিগরের কাজ করতো। সে তার কাজে খুব পটু ও উৎসাহী ছিলো, কিন্তু তার বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা বাজে ছিলো। কখনো সে খুবই উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ, এই তাদের গায়ে সস্নেহে চাপড় মারছে বা জড়িয়ে ধরছে, আবার পরক্ষণেই তাদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে হম্বিতম্বি ও গালাগালি করছে। তাই শিহ্-তৌ তাকে রাগাতে ভীষণ ভয় পেতো আর সেইজন্যেই ছেলেটা তার বন্ধুদের তাকে বাড়িতে এসে ডাকতে মানা করেছিলো। তারা ডাকার জন্যে একটা গোপন সংকেত ঠিক করেছিলো। তাকে বাইরে বের করে আনতে চাইলে, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে প্যাঁচার ডাক ডাকতো আর শিহ্-তৌ চুপিচুপি বেরিয়ে আসতো। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান্কে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে সশঙ্ক মুখে ফিসফিস করে জিগেস করলে: "কী হয়েছে?"

তা-মিঙ্ তাকে সুখবরটা দিয়ে বললে, "গণমুক্তি বাহিনীকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমার মা ইতিমধ্যেই কিছু খাবার-দাবার তৈরি ক'রে ফেলেছে। চেয়ারম্যান মাও আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছেন, 'সৈন্য-বাহিনীকে মদত দাও আর জনগণকে মনে রেখো।' আমি তখন ভাবলাম, এই ফাঁকে আমরা আজকের বিকেলটা কাঁকড়া ধরার কাজে লাগাতে পারি। কাল যখন গণমুক্তি বাহিনী এসে পৌছোবে, আমরা তাই দিয়ে তাদের স্বাগত জানাবো। তুই কী বলিস?"

শিহ্-তৌ তা-মিঙের আসল মতলবে পুরোপুরি সায় দিলে। কিন্তু ব্যাকুল মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বুক দুরদুর ক'রে উঠলো। সে বললে, "আবহাওয়ার অবস্থা দ্যাখ। তোদের কি মনে হয় সব ঠিক হ'য়ে যাবে?"

"আমরা তীরের কাছাকাছিই থাকবো," তা-মিঙ্ জবাব দিলে। "যে মুহূর্তে আবহাওয়া বদলাবে আমরা বাড়িমুখো রওনা দেবো।"

"চল, মাও-সাই ভাইকে জিগেস করি গিয়ে", চিউ-শান্ পরামর্শ দিলে।

"যাই হোক আমরা তো সবকিছু খোলাখুলি করছি। সে নিশ্চয় আমাদের মদত দেবে।"

"হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে," তা-মিঙ্ অনুযোগ করলে। "যদি যেতে হয় তাহ'লে এখুনি চল্।" তারা শিহ্-তৌ-এর কোনো জবাবের অপেক্ষা না-ক'রেই তাকে টেনে নিয়ে চললো।

তিনটে বাচ্চা বন্দরে গিয়ে পৌছোলো। তা-মিঙ্ বন্দরের দলীয় শাখায় সম্পাদক চ্যাং মাও-সাইকে দেখতে পেলো, আর তাকে তাদের মনের কথা জানালে। মাও-সাই-এর মনে হ'লো বাচ্চাদের মতলব ভালোই। শুধু আবহাওয়া অত খারাপ ছিলো ব'লে সে তাদের যেতে দিতে একটু ইতস্তত করছিলো। তা-মিঙ্ বললে, "চিন্তা কোরো না, আমরা বেশিদূর যাবো না।" সে জানতো বাচ্চাদের দলটার নৌকা বাইবার কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো আর সৈন্যদের ওপরও তাদের ছিলো গভীর ভালোবাসা।

"ঠিক আছে, তাহ'লে। যদি তোরা কাঁকড়া ধরতে যাস।" সে ব'লে দিলে, "গভীর জলে যাস না। আবহাওয়া বদলাতে দেখলেই নৌকা বন্দরে এনে লাগাস।" তা-মিঙ বললে, "আচ্ছা।" আর তিনটে বাচ্চা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়োলো বন্দরের পূর্বদিকের জেটি লক্ষ্য ক'রে। জলজ প্রজনন বাহিনীর একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো সেখানে নোঙর করা ছিলো। বসন্তকালে কুচোচিংড়ি ধরার কাজে সেটা ব্যবহার করা হ'তো। কিন্তু এখন মরশুম শেষ হ'য়ে গেছিলো। সুতরাং, ছেলেরা সারাদিন ধরে নৌকোটা নিয়ে উপসাগরে দাঁড় বাওয়া আর চালানো অভ্যেস করতে পারতো।

একনজরে সবকিছু ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্যে তা-মিঙ্ নৌকোর ওপরে গিয়ে উঠলো। সে চিউ-শান্-এর দিকে ফিরে বললে, "ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সবকিছু জোগাড়যন্তর করে ন্যাল।" আধ ঘণ্টা পরে, তা-মিঙ আর শিহ্-তৌ তাদের কাঁকড়া ধরার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বন্দরে ফিরে এলো, কিন্তু চিউ-শান্-এর টিকিটিও দেখা গেলো না। ঠিক যখন শিহ্-তৌ অধৈর্য হয়ে উঠেছে, সে দেখতে পেলে চিউ-শান্ বঁড়শি, চিমটে, পাত্র আর ঝড়-লণ্ঠন নিয়ে আসছে। শিহ্-তৌ চিউ-শান-এর মতো সমুদ্র সম্বন্ধে অতো অভিজ্ঞ ছিলো না, তাই চিউ-শানকে দেখে সে অন্যায় অভিযোগ করলে, "তুই সত্যি কীভাবে সময় নষ্ট করিস ছাখ তো, এদিকে সন্ধে হয়ে গেলো।" "আমার তোর থেকেও ভাবনা

বেশি," বললে চিউ শান্। "কিন্তু আমি যতই উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছিলাম ততোই ঝড়-লণ্ঠনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"কিন্তু আমরা তো আর বাইরে রাত কাটাতে যাচ্ছিনা", শিহ-তৌ প্রত্যুত্তর করলে। "তবে আর এই লণ্ঠন নিয়ে কী হবে?"

চিউ-শান্ নৌকোয় উঠে খুব গম্ভীব গলায় বললে, "বড়োরা কী বলেছে ভুলে গেছিস? সমুদ্রে এক-পা বা এক কিলোমিটার মতো দূরেই যাস না কেন, একটা লণ্ঠন, জল আর আগুন সবসময়ে নৌকোয় সঙ্গে নেওয়া উচিত।"

"ও ঠিকই বলেছে," তা-মিঙ্ বললো। "হাজারে একটা বিপদের আশঙ্কা থাকলেও, হাজারটা বন্দোবস্তের একটাও আমাদের ছাড়া উচিত নয়। যদি সত্যিই ঝড় ওঠে তখন আমাদের কী হবে?" সে দেখলো চিউ-শান ততক্ষণে নোঙর তুলে ফেলেছে। সে হাল ধরে দাঁড় বাইতে শুরু করলো।

চ্যাংচিয়া উপসাগরে একটা ছোট্ট বন্দর ছিলো। বন্দর থেকে একশো মিটারেরও কম দক্ষিণে গেলেই উন্মুক্ত সমুদ্র। পুবদিকের সমুদ্র চোরা চড়া, বালিয়াড়ি আর পোড়ো পতিত দ্বীপে ভরা ছিলো। যেহেতু লোকজন ঐসব দ্বীপে যেতে পারতো না, তাই তাদের পাড়ের ফাটলগুলো শুক্তি আর বড়ো লাল দাঁড়াওয়ালা শাঁসালো কাঁকড়ায় ভরা ছিলো।

ছোটো ডিঙিটা যখন উপকূল ছাড়লো, তখন প্রথমে সেটা পশ্চিম থেকে পুবের দিকে প্রধান তীর ঘেঁষে এগিয়ে চললো। দক্ষিণ-পূবমুখো বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত নৌকোটা খুব আস্তে-আস্তে গেলো। তারপর নৌকোটা দক্ষিণ সমুদ্রতীর ধ'রে চললো। পাহাড়গুলোর পশ্চিম দিকে একের পর এক চোরা বালিয়াড়ি থাকায় নাবিকদের পক্ষে জাল ফেলা কষ্টকর ছিলো আর নৌ-চালনাও দ্বিগুণ সাবধানে করতে হ'তো। দক্ষিণদিকে পাহাড়গুলোর চূড়ায় নৌকোগুলোকে পথ দেখাবার জন্যে একটা বাড়িঘর ছিলো যাতে তারা পথ ভুলে বালিয়াড়িতে গিয়ে ধাক্কা না-খায়। যে-কোনো অবস্থাতেই চ্যাংচিয়া উপসাগরে ঢুকতে হ'লে সমস্ত নৌকাকেই মূল ভূখণ্ডের চারপাশে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হ'তো। তা-মিঙ্ ও অন্যান্যরা বাতিঘরের নিচু পর্যন্ত দাঁড় বেয়ে এসে তারপর উলটোদিকে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ছোট্ট দ্বীপের অভিমুখে যেতে শুরু করলে। যেই তারা খাঁড়ির জল বেয়ে দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়লো, তা-মিঙ নৌকো যাতে দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা না-খায় তাই শক্ত হাতে হাল সামলালো আর /চিউ-শান্ তীরের উঁচু জমিতে নিরাপদে নোঙর ফেললো। তারপর

তারা কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে যে-দ্বীপটায় গিয়ে উঠলো সেটা ছিলো একটা বড়ো পাথর—গাছপালাহীন, ঘাস ছিলো না, এমনকি একটু মাটিও না। দ্বীপটার থেকে পুবদিকে তাকালে এক কিলোমিটারেরও কম দূরে ছিলো পাহাড়গুলো। কিন্তু চ্যাংচিয়া উপসাগরের দূরত্ব ছিলো সেখান থেকে তার দ্বিগুণ।

বাচ্চা তিনটে সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে লোহার হুক দিয়ে জল আর পাথরের ফাঁকফোকর থেকে কাঁকড়া ধরতে শুরু করলো। কাঁকড়াগুলো সত্যি খুব বড়ো-বড়ো আর তাদের লাল চকচকে সাঁড়াশির মতো দাঁড়াগুলো ছিলো বুড়ো আঙুলের মতো মোটা। চিউ-শান্ তার জামা খুলে ফেলে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছিলো। সে লোহার হুক দিয়ে পাথরের ফোকরগুলো খোঁচাচ্ছিলো আর দু-বার টান আর ঝাঁকি মেরে হঠাৎ হুকটা টেনে তুলতেই তার ডগায় একটা বড়ো বাটির মতো কাঁকড়া ঝুলতে দেখা যাচ্ছিলো। দু-ঘণ্টায় তারা আধ পাত্রেরও বেশি কাঁকড়া শিকার ক'রে ফেলেছিলো। সে নিজেদের সাফল্যে খুশি হ'য়ে পরামর্শ দিয়ে বললে, "চল, আজ রাতেই রওনা হই। প্রথমেই এগুলো লাল টকটকে ক'রে রান্না করবো যাতে কাল যখুনি গণ-মুক্তি বাহিনী এসে পৌছবে, আমরা তাদের সামনে কাঁকড়াগুলো রেখে যেন বলতে পারি, আগে খাও, এই কাঁকড়াগুলোই হ'লো এই এলাকার বিশেষত্ব।"

তা-মিঙ্ আরো বললে, "আমরা নিজেরা এগুলো ধরেছি আর কিনে খাওয়া জিনিশ আর এ জিনিশ এক নয়।"

তা-মিঙ্ ও তার সঙ্গীরা সৈন্যদের জন্যে পাথরের খাঁজে কাঁকড়া শিকারে এমন তন্ময় হয়েছিলো যে. আকাশের দিকে তারা একবারও মাথা তুলে তাকায়নি। তাই হঠাৎ যখন তাদের মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো প্রবল গর্জনে মেঘ ঢেকে উঠলো, তখন তারা সবাই দারুণ চমকে উঠলো। শিহ্-তৌ সচকিত হ'য়ে ওপরে তাকালে। যে আকাশ একটু আগে অত ঝকঝকে পরিষ্কার ছিলো, এখন তা ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে। একনাগাড়ে মেঘ ডাকছিলো আর মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। শি-তৌ বললে, "এই সেরেছে! সর্বনাশ হয়েছে, দারুণ ঝড় আসছে।" এই ব'লে খাঁড়িতে নোঙর ক'রে রাখা নৌকোর দিকে রওনা হলো। চিউ-শান্ তা-মিঙের দিকে তাকালো। তার হাবভাবে মনে হচ্ছিলো যেন কিছুই হয়নি। সে তার হাতের পাত্রটা নামিয়ে রেখে পাথরের চূড়াটার দিকে এগোলো।

তা-মিঙের এই শান্তভাবের মূলে একটা ঘটনা জড়িত ছিলো। তার

বাবা তিরিশ বছর সমুদ্রে কাটিয়েছে আর যতরকমের ঝড় কল্পনা করা যায় সবরকম সম্বন্ধেই তার অভিজ্ঞতা ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের আগে সে এবং আরো দুজন মিলে পাঁচজন জলদস্যুকে খতম করেছিলো। আর একবার ১৯৫৬ সালে যখন সে খোলা সমুদ্রে জাল ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো, তখন ১১-অশ্ব শক্তি সামুদ্রিক তুফানের মুখোমুখি পড়েছিলো। তিনদিন তিনরাত ধ'রে সমানে ঝড় চলেছিলো আর তাদের সেখান থেকে পাঁচশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছিলো। তারা সেবার শুধু সেই তুফান থেকেই বেঁচে ফিরে আসেনি, পরে পাঁচ হাজার কিলোরও বেশি মাছও ধ'রে এনেছিলো। ছোটোবেলা থেকেই তা-মিঙ্ তার পূর্বপুরুষদের সমুদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের নানান গল্পে মুগ্ধ হয়েছিলো। তাদের কাছ থেকে সে অনেককিছু শিখেছিলো। গত বছর যখন সে বসন্তকালীন কুচোচিংড়ি জোগাড় করছিলো ৬-অশ্বশক্তির ঝড়ের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিলো তার। সে যে ছোট্ট নৌকোটাতে ছিলো সেটা চার কিলোমিটার বিপথে ভেসে গেছিলো, তবু সে সেটাকে নিরাপদে কূলে এনে ভিড়িয়েছিলো। সুতরাং তাকে সবাই বাচ্চাদের নেতা ব'লে ধ'রে নিয়েছিলো।

শিহ্-তৌ খুব ভয় পেয়ে গেছিলো আর নৌকায় গিয়ে উঠতে চাইছিলো। কিন্তু যেহেতু তা-মিঙ্ তখনো তার মত জানায়নি, শিহ্-তৌ শুধুই নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

উত্তরদিকের পাহাড়গুলো ততক্ষণে বৃষ্টি আর কুয়াশায় ঝাপসা হ'য়ে গেছিলো। চূড়ার ওপর হাওয়ার বেগ সম্ভবত কম ক'রেও ৭-অশ্বশক্তির ছিলো, আর হাওয়ার চাবুক খাওয়া সমুদ্র শাদা ফেনায় ভরে গেছিলো। তা-মিঙ্ তবুও ধীর স্থির হ'য়ে রইলো। যখন চিউ-শান্ তাকে সমুদ্রের পাড়ে নেমে আসতে দেখলো, সে দৌড়ে গিয়ে তাকে জিগেস করলে, "আমরা কী করবো? চ'লে যাবো?"

তা-মিঙ্ দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলে, "না! কোনো উপায় নেই। খুব জোরে হাওয়া বইলে গুরুজনেরা নৌকা বাইতে নিষেধ করেছেন, আবার খুব বড়ো-বড়ো ঢেউ থাকলেও নৌকা তীরে ভিড়োতে মানা করেছেন। আমরা এখন যেতে পারি না।"

ঠিক তখনি জোরে হাওয়া বইতে আর বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। মুষল-ধারে বৃষ্টি নামলো। তিনজনেই দ্বীপের ওপর উবু হ'য়ে বসলো, ভিজে

একেবারে জবজবে হ'য়ে। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান একে অন্যের দিকে তাকালে। চিউ-শানের চুলগুলো তার মাথার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গিয়েছে, তার মুখে একনাগাড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তা-মিঙের জামাটা তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। হঠাৎ জামার মধ্যে হাওয়া ঢুকে জামাটা এমন ফুলে উঠছে যে মনে হচ্ছে যেন জামার ভেতর একটা ইঁদুর ঢুকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো যেন তারাই গন-মুক্তিবাহিনী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৃঢ়ভাবে সবকিছু সহ্য ক'রে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি ক'মে এলো আর আটটা নাগাদ থামলো। কিন্তু ঝোড়ো বৃষ্টির পর সবেগে হাওয়া বইছিলো। যতদূর তাদের দৃষ্টি যায় তারা দেখলো সমুদ্র ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তারা চ্যাংচিয়া উপসাগরের আলোও দেখতে পাচ্ছিলো না, শুধু উত্তর আকাশে দেখছিলো বিদ্যুতের চমক।—"অবস্থা খুব সঙ্গিন," নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললে চিউ-শান্। "মনে হচ্ছে এ-বৃষ্টি চলতেই থাকবে।"

তা-মিঙ ঝট করে হাওয়ার গতিবিধি দেখে নিয়ে বললে: "ঠিক আছে, চ'লে যাওয়াই যাক। বাড়ির দিকে দাঁড় বাই, চল!"

বাচ্চা তিনটে সমুদ্রে নেমে এসে আকাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করা এক বিদ্যুৎ চমকানির আলোয় নৌকোয় এসে উঠলো। শিহ্-তৌ লণ্ঠনের আলোটা উশকে বাড়িয়ে দিলে। চাউ-শান্ পাত্র তিনটে সামলে রেখে নোঙর তুললো। ছোট্ট নৌকোটা দ্বীপ ছেড়ে ভাসলো। তারা পুবদিকে রওনা হ'লো, তারপর নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে দাঁড় বাইতে লাগলো। নৌকোটা ঢেউয়ের চূড়ায় চ'ড়ে একবার ওপরে একবার নিচে ওঠানামা করতে লাগলো। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান তাদের সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় বেয়ে চললো আর শিহ-তৌ বিশ্বস্তভাবে লণ্ঠনটা ধ'রে রইলো। কিন্তু তবু তো তারা ছোটো বাচ্চা, তাদের শক্তিও সীমিত, আর আজ তারা রাতের খাবারও খায়নি। তার ওপরে তারা দাঁড় বাইছিলো হাওয়ার প্রতিকূলে। কিক্ষুণের মধ্যেই চিউ-শান্ এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে তার মুখ ঘামে ভিজে চুপশে গেলো আর হাঁপাতে লাগলো। তা-মিঙ্ তা লক্ষ ক'রে শিহ্-তৌ কে চিউ-শান্ এর জায়গা নিতে বললো। শিহ্-তো তাকে লণ্ঠনটা দিয়ে দাঁড় হাতে নিলে। আরো কিছুক্ষন দাঁড় বাইবার পর তা-মিঙ্ও ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লো। চিউ-শান্ হাতের লণ্ঠনটা তা-মিঙ্কে দিয়ে তার সঙ্গে জায়গা-

বদল করলে। একঘণ্টারও বেশি তারা এইভাবে দাঁড় বাইলো। কিন্তু ছোট্ট নৌকোটা তবু এক কিলোমিটারেরও কম এগিয়েছিলো।

তিনজনে মিলে ঝড় আর ঢেউয়ের সঙ্গে দুঃসাহসের সঙ্গে লড়তে-লড়তে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আবৃত্তি করছিলো : "সাহস রাখো, ধৈর্য ধরো, কোনোরকম ত্যাগ স্বীকারে ভয় পেয়োনা এবং জয়ী হবার জন্যে প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করো।" তারা উত্তরতীরের দিকে যাবার জন্যে জোর হাত লাগালো। হঠাৎ উপকূল থেকে দূরে, বাইরের সমুদ্র থেকে তারা কুয়াশার বুক চিরে আসা কোনো সাবধানী ভোঁ শুনতে পেলো। প্রথমে তারা অতোটা খেয়াল করেনি। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসতেই তা-মিঙ্-এর নজরে পড়লো যে আপাতত ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাতিঘরের মোটেই আলোটা কাজ করছে না। তা-মিঙ্ পুবদিকে লণ্ঠনের আলো ফেললো। সে শুধু দেখলো, ঘন কালো অন্ধকার সমুদ্রে তাদের সামনে জলে একটা বিশাল মোষের মতো কী যেন উঠে আসছে। সে তার মুখ থেকে ঘাম মুছলো। "ত্যাখ্," সে বললে, "আমরা 'লম্বা গলা'য় পৌছে গেছি। আমাদের যতটা যেতে হবে তার তিনভাগের দু-ভাগ পেরিয়ে এসেছি।"

লোকেরা সমুদ্রের তলায় সারিবদ্ধ পাহাড়গুলোর ঘরোয়া নাম দিয়েছিলো "লম্বা গলা।" এখান থেকে বেলাভূমির দূরত্ব এখন এক কিলোমিটারেরও কম। তারা যদি প্রাণপণ দাঁড় বাইতো তাহলে আধঘণ্টার কম সময়ে তীরে পৌছে যেতো। বাচ্চারা যখন সেই পাথুরে চরটা দেখতে পেলো, তখনি তাদের মনশ্চক্ষে নিজেদের বাড়ির দরজার ছবি ভেসে উঠলো। কী স্বস্তিই যে পেলে তারা! কিন্তু ঠিক সেই সময় তারা আবার কুয়াশা ভেদ ক'রে আসা জাহাজের ভোঁ শুনতে পেলো। ইঞ্জিনের শব্দটা ক্রমাগত কাছে এগিয়ে আসছিলো। ভোঁ-এর আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পারলো যে জাহাজটা শিগগির পাহাড়ের কাছে এসে পৌছোবে। "একটা বিপদ হ'তে চলেছে," তা-মিঙ্ বললে।" আচ্ছা, চিউ-শান্ তোর কি মনে হয় জাহাজটা তীরের পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খাবে?"

চিউ-শানেরও খুব ভাবনা হচ্ছিলো। "সত্যি এ এক বিচ্ছিরি ব্যাপার," সে উত্তর করলে, "তবে আমরা কী করতে পারি?"

তা-মিঙ্ খুব মন দিয়ে ইঞ্জিনের শব্দটা শুনলো। সে খুব দ্রুত মনস্থির ক'রে ফেললো। "চল, তাড়াতাড়ি পুবদিকে ফিরে যাই। নৌকোটাকে পাহাড়ের

নিচ পর্যন্ত নিয়ে চল, যাতে পাহাড়ে উঠে আমরা ওদের বিপদ সংকেত জানাতে পারি।" চিউ-শান তৎক্ষণাৎ রাজি হ'লো আর পেছনদিকে দাঁড় বাইতে শুরু করলে। নৌকোটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললো, কিন্তু সেখানে পৌঁছে হাওয়া এমন বেগে সমুদ্রে ঝাপটা মারতে লাগলো যে, বাচ্চারা তিন-তিনবার চেষ্টা ক'রেও তীরে নৌকা ভেড়াতে পারলো না, প্রতিবারই ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসতে হ'লো।

"আমার ভয় হচ্ছে যে যতক্ষণে আমরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে পৌঁছোতে পারবো ততক্ষণে স্টীমারটাও এসে যাবে," শিহ্-তৌ বললে। তা-মিঙ্ আবার ইঞ্জিনের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। শব্দটা সারাক্ষণই কাছে এগিয়ে আসছে। আর ওরা যখন পাহাড়ে উঠতে পারছিলো না জাহাজটা তখনো নিশ্চিন্ত ভাবে এগিয়ে আসছিলো। তা-মিঙ্ লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সেটাকে দোলাতে লাগলো। কিন্তু ওদিক থেকে তার কোনো প্রতিক্রিয়াই বোঝা গেল না।

"লণ্ঠনের আলো দেখেও ওরা থামছে না কেন?" চিউ-শান্ জিগেস করলে।

"ওরা দেখতে পাচ্ছে না," তা-মিঙ্ জবাব দিলে। "পাহাড়গুলো ওদের দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দিচ্ছে। সংকেত দেওয়ার পক্ষে এই জায়গাটা ঠিক নয়।"

"তাহ'লে?" চিউ-শান্ জিগেস করলে। "এখন তবে আমরা কী করবো?"

"আমাদের কী করা উচিত?" তখনি তা-মিঙ্ কোনো উত্তর দিলে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো—যদি তারা চাইতো যে ওরা লণ্ঠনটা দেখতে পাক তাহ'লে আবার তাদের সেই পাহাড়গুলোর কাছে দাঁড় বেয়ে ফিরে যেতেই হ'তো, ঠিক যেখানে তারা কাঁকড়া শিকার করেছিলো। একজন কম্যুনিস্টের কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে চেয়ারম্যান মাওয়ের বাণী তার মনে পড়লো: "বিপ্লবের স্বার্থকে নিজেরই জীবনের মতো ক'রে দেখা।" আর সেই অসংখ্য বিপ্লবীদের কথাও মনে পড়লো তার যারা জনগণের স্বার্থে দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকটি বিপদের মোকাবিলা করেছিলো। সে নৌকোটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প হ'লো আর তার সামনে তখন অগণিত ছুরির ফলার উদ্যত বাধা থাকলেও সে তাই করতো। যখন তা-মিঙ্ কোনো উত্তর দিলে না, চিউ-শান্ বললে: "কিছু একটা বল। আমাদের গণ-মুক্তিবাহিনীর মতো যত রকম অসুবিধার কথা ভাবা যায়, সব অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখতে হবে।"

তা-মিঙ্ দক্ষিণদিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, "যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে ফিরে চল!"

তার আদেশে চিউ-শান্ আর শিহ্-তৌ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে দাঁড় বাইতে লাগলো। তারা নৌকোটা দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণদিকে রওনা দিলো।

ব্যগ্রতার সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে দাঁড় বেয়ে আর সেই সঙ্গে অনুকূল হাওয়ার সাহায্যে তারা অচিরেই দ্বীপটায় ফিরে এলো। শিহ্-তৌ লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিলে আর তা-মিঙ্ পাড়ের পাথরটার গায়ে ধীরে সুস্থে নৌকাটা লাগালে। চিউ-শান্ হাঁফ ছেড়ে লোহার নোঙরটা পাড়ের দিকে ছুঁড়লো। তারা হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোরকমে নৌকো থেকে নেমেই পাহাড়ে উঠতে লাগলে। পুবদিকের সমুদ্রে তারা একটা লাল্ আলো জ্বলজ্বল করতে দেখলো। সেটা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়গুলোর উদ্দেশে ছুটে চলেছিলো। তা-মিঙ্ তৎক্ষণাৎ শিহ্-তৌ-এর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে সেটা দুলিয়ে সংকেত দিতে আরম্ভ করলে। এদিকে চিউ-শান্ সমানে, "ওহে শোনো, ওদিকে আর এগিয়ো না! সামনে পাহাড় আছে! সামনে এগিয়ো না!" ব'লে চ্যাচাতে লাগলো। জাহাজের কেউ নিশ্চয় দ্বীপের আলোটা দেখতে পেয়েছিলো, তাই হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হ'য়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর আবার ইঞ্জিন চলতে শুরু করলো। তিনজন ছেলেই লক্ষ করলো যে জাহাজটা দিক বদলে লণ্ঠনের সংকেত অনুযায়ী দক্ষিণদিকে চলতে শুরু করেছে। প্রায় এক কিলোমিটার পথ যাবার পর জাহাজটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চ্যাংচিয়া অভিমুখে রওনা হ'লো। যখন তারা জাহাজটাকে নিরাপদে বন্দরে ঢুকতে দেখলো, তারা মৃদু হেসে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। তাদের মুখে কথা সরছিলো না। তারা তাদের ক্লান্তি ভুলে গেছিলো আর শীতও অনুভব করছিলো না। উপকূলে জাহাজটার লাল আলোটা মিলিয়ে যেতেই তারা তাদের ছোট্ট নৌকোর উদ্দেশে রওনা দিলে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা অবাক হ'য়ে গেলো।

"এবার আমরা সত্যিই বিপাকে পড়েছি," শিহ্-তৌ হঠাৎ ব'লে উঠলো। "আমাদের নৌকো হাওয়া।"

তারা জাহাজটাকে সংকেত দেবার জন্যে এমন তাড়াহুড়ো ক'রে দ্বীপে উঠেছিলো যে নৌকোটাকে যথেষ্ট সাবধানে নোঙর করে রেখে যায়নি।

প্রবল হাওয়া নোঙর উৎখাত ক'রে নৌকোটাকে দ্বীপ থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে গেছিলো। নৌকোটা তখন তীর থেকে একশো মিটার দূরে।

মূল ভূখণ্ডের আবহাওয়া থেকে দ্বীপের আবহাওয়া ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি গরমকালেও রাত্রিবেলা গায়ে মোটা জ্যাকেট দিতে হয়। আর ছেলেগুলোর গায়ে ছিলো পাৎলা টি-শার্ট। সেগুলোও আবার জলে ভিজে ন্যাতা আর বাচ্চাগুলোর পেটে তখনো কিছু পড়েনি। একবারে হাঁটাচলা বন্ধ ক'রে তাদের মনে হ'লো যেন তারা বরফে জ'মে যাচ্ছে।

চিউ-শান্ ছিলো সত্যিকারের আশাবাদী। যে-কোনো বাধাই সামনে আসুক না কেন সে কখনো নিরাশ হ'য়ে পড়তো না। যাই হোক, এখন তার এত ঠাণ্ডা লাগছিলো যে সে শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলো। কিন্তু সে তার সর্ব-শক্তি দিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, মুখ দিয়ে একটা টুঁ-শব্দও বের করলে না। শিহ্-তৌ জীবনে প্রথম এখন বিপদে পড়েছে আর সে হতাশায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। তা-মিঙ্ ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। "আমাদের হওয়া উচিত লাল ফৌজের মতো," সে চেঁচিয়ে উঠলো। "এই সমস্ত অসুবিধের মধ্যে দিয়েই আমাদের অদম্যভাবে রাতটা কাটাতে হবে।"

চিউ-শান সবার আগে সায় দিলে: "ঠিক বলেছিস্! আমাদের গণ-মুক্তিবাহিনীর মতোই হওয়া উচিত! বাধা-বিঘ্ন যত বড়ো হবে আমাদের জয় করার ইচ্ছেও তত বেড়ে চলবে।" তারা দুজনেই শিহ্-তৌ-এর দিকে তাকালো। কিন্তু সে তখনো চুপচাপ। চিউ-শান্ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের বুক ঠুকলো। "আয়, গান গাই," ব'লে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

"ঠিক বলেছিস", ব'লে তা-মিঙ্ও তার সঙ্গে যোগ দিলে আর ঝটপট তিনজনেই উঠে দাঁড়ালো। তারা সবেমাত্র একটা স্তবক গাওয়া শেষ করেছে এমন সময় একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনলো। তা-মিঙ্ ভাবলো আবার কোনো জাহাজ বুঝি বিপদে পড়তে চলেছে আর খুব চিন্তিত হ'য়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা উজ্জ্বল আলো চ্যাংচিয়া উপসাগর থেকে তাদের ছোট দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। শিহ্-তৌ-এর চোখ ছিলো খুব ধারালো। সে একটু পরেই চিৎকার ক'রে বললে, "চিউ-শান্! শিগ্গির আয়! ত্যাখ! ওরা আমাদের উদ্ধার করতে আসছে!" তারা নৌকোটাকে চিৎকার ক'রে স্বাগত জানাতে লাগলো আর চেঁচিয়ে তাকে পথ বাৎলে দিতে থাকলো।

"এই যে, এইখানে!"

"আমরা এই দ্বীপে!"

"এইদিকে!"

আসলে যখন তারা তাদের ছোট্ট নৌকো নিয়ে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করছিলো, তখনই তাদের বাড়ির লোকজন সমুদ্রতীর বরাবর তাদের খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছিলো। তারা ভাবেইনি যে বাচ্চাগুলো এত গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। আর এটাও তাদের মাথায় আসেনি যে, বাড়ি ফেরার পথে বাচ্চাগুলো আবার স্টিমারকে পথ দেখাবার জন্যে ফিরে যেতে পারে। প্রথমে, লম্বা গলা থেকে আলোর ঝলকানি নজরে পড়েছিলো, কিন্তু খোঁজ করার জন্যে নৌকোটা সেখানে গিয়ে পৌছোতেই দেখা গেলো সেখানে কেউ কোথাও নেই। যখন তারা অবস্থা জানাতে ফিরে গিয়েছিলো, তখন সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিলো।

ঠিক সেইসময়, স্টিমারের ক্যাপ্টেন লি তীরে এসে ভিড়েছিলেন। জাহাজটি কৃষিজাত পণ্যে ঠাশা ছিলো, আর তারা চ্যাংচিয়া উপসাগরেই মালখালাশ করার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। যখন তিনি সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া সেই তিনজন বাচ্চাছেলের কথা শুনেছিলেন, তখনি তাঁর সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখা আলোর কথাটি মনে হয়েছিলো। তিনি দলীয় শাখার সম্পাদক চ্যাং মাও সাই-এর কাছে গিয়ে উপকূলে ঢোকার সময় কী ঘটনা ঘটেছিলো খুলে বলেছিলেন। "কী সাংঘাতিক বিপদই না হয়েছিলো", মাও-সাই বলেছিলে। তারা অন্দোজ করেছিলো যে আলোটা দ্বীপ থেকেই আসছিলো আর সৌভাগ্যবশত গণমুক্তিবাহিনীর উপকূলরক্ষীরাও পাহারা দেবার সময় আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছিলো। সেই বাচ্চাগুলোই যে আলোর ঝিলিক দিচ্ছিলো সে সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিলো। তাই চ্যাং মাও-সাই, ক্যাপ্টেন লি ও উপকূলরক্ষীরা আবার তাদের মোটর-চালিত চীনা নৌকাতে ক'রে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিলো।

চীনা নৌকোটির আলোগুলো ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো। চিউ-শান্ তৎক্ষণাৎ লণ্ঠনের সাহায্যে সংকেত জানাতে শুরু করলো। যখন চ্যাং মাও-সাই সেই আলো দেখতে পেলো সে খুব খুশি হলো ও স্বস্তিবোধ করলো। "ঠিকই তো" সে হাসলো, "বটে তারাই।"

"এদিকে আমরা এই প্রথম এলাম," ক্যাপ্টেন লি বললো, "আর আমাদের

এখানকার নাব্যতার গলিঘুঁজির সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিলো না। আর তার ওপর বেদম কুয়াশা! যদি এই বাচ্চাগুলো না-থাকতো তাহ'লে একটা মারাত্মক বিপদ হ'তে পারতো।

"সবই আমাদের দোষ," মাও-সাই জবাব দিলে। "আমরা ভাবতেই পারিনি যে সংকেত দেখানোর আলোটা ঝড়ো হাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে অচল হ'য়ে পড়বে।"

মোটর-চালিত চীনা নৌকোটি যেই তীরে ভিড়লো অমনি বাচ্চাগুলো হাসতে-হাসতে হৈ হৈ ক'রে পাহাড়ি রাস্তা ধ'রে নেমে এলো। চ্যাংমাও-সাই সর্বপ্রথম তীরে নামলো। "আমার বীর বাছারা," সে বললে, "আজ রাতে তোরা একটা দারুণ কাজের মতো কাজ করেছিস। খুব ভালোই করেছিস। তোরা খুবই প্রশংসা পাবার যোগ্য।"

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন লি আর গণমুক্তি বাহিনীর লোকেরাও পৌঁছে গেছিলো। ক্যাপ্টেন লি তাদের দেখে শুধু বললেন, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" তারপর সে চিউ-শান্‌কে জড়িয়ে ধরলো। তা-মিঙ্‌ আর শিহ্‌-তৌ গণমুক্তি বাহিনীর সবাই এসেছে দেখে এতো খুশি হলো যে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিলো না। তারা ডাকলো "মামা" আর গণমুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাদের কোলে ক'রে নৌকোয় তুলে নিলে। সবাই যখন নৌকোয় উঠে পড়লো তখন তারা ছোট্ট জেলে ডিঙিটাকে সেই চীনা নৌকোর পেছনে জুড়ে দিলে।

তা-মিঙ আর চিউ-শান্‌ ছোট্ট ডিঙিটা একবার দেখতে গেলো—লাল দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়ায় আদ্ধেক ভরা সেই তিনটি পাত্র ঠিকঠাক ছিলো। কাঁকড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিলো আর এদিক ওদিক চলে বেড়ানোর সময় তাদের দাঁড়াগুলো থেকে স্পষ্ট কড়মড় কড়মড় আওয়াজ হচ্ছিলো। "কাল আমাদের প্রথম কাজই হবে ওগুলোকে রেঁধে ফেলা," চিউ-শান্‌ বললে।

"ঠিক বলেছিস," তা-মিঙ্‌ বললে। "গণমুক্তিবাহিনীর লোকেরা এসে পড়লেই আমরা সবটাই তাদের হাতে তুলে দিতে পারবো!"

চিউ-শান্‌ সে-কথায় সায় দিলে, তখন মাও-সাই তাদের চীনা নৌকোতে গিয়ে উঠতে বললো। মোটর-চালিত নৌকোটা জলপথের সব গলিঘুঁজি দেখানোর আলোগুলো চ্যাংচিয়া উপসাগরের অভিমুখে।

অনুবাদ: প্রদোষ দত্ত

ইয়ুয়ে চ্যাং কুয়েই

ভারার দাঁড়

আমাকে পাহাড়ের গভীরে 'সবুজ গিরি' দোকানে একটা চাকরি দেওয়া হয়েছিলো। বাণিজ্যের গ্রামীণ দপ্তর থেকে আমার পরিচিতি পত্র নিয়ে আমি আমার নতুন কাজে যোগ দিতে গেলাম। দোকানের সদর দরজার কাছে হাজির হ'য়ে আমি শুনতে পেলাম এক সুন্দর কণ্ঠ ঘণ্টাধবনির মতো স্বচ্ছস্বরে উঠোনে গাইছে :

'আমার মালগুলো বিকোই আমি পাহাড় ভেঙে উঠে আর নেমে, আমার কাঁধের বাঁক জুড়ে দেয় শহরের সাথে কত গ্রামে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে আমি খড়ের টুপি পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম যে উঠোনের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে দক্ষতার সঙ্গে একটা কাঁধের বাঁক সারাচ্ছিলো। আমি এগিয়ে যেতেই সে গান গাওয়া থামিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর খড়ের টুপিটা পেছনে ঠেলে দিতে তার দুটো খাটো মোটা বিনুনি দেখা গেলো। মনে হ'লো তার বয়স কুড়ির মতো হবে। লম্বা নয়, কিন্তু সুগঠিত শরীর, চোখদুটো বড়ো-বড়ো, ঈষৎ টেবৃচা। সে তার যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এলো।

"যদি আমার ভুল না-হ'য়ে থাকে, তুমি নিশ্চয়ই কমরেড চ্যাং ইয়েন-চুন, আমাদের নতুন সহকর্মী," ঝকঝকে চোখে সে বললে।

"আর তুমি ?"

"আমি সান-লিং।"

সান লিং ? সে কী! তাহ'লে তো আমি ওর অধীনেই কাজ করবো। গ্রামে ওরা আমাকে বলেছিলো যে সবুজ গিরি দোকানের নিয়ন্ত্রণভার যার ওপরে সেই সান লি ইং খুবই চমৎকার এক কমরেড। তার কাছে আমার অনেক কিছু শেখা উচিত। আমি তো তাকে একজন অভিজ্ঞা, মধ্যবয়স্কা মহিলা ব'লে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু এ তো একটা কিশোরী মেয়ের থেকে বেশি কিছু নয়।

"আমাকে তুমি কী কাজ দেবে ?" আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি কি এক্ষুনি কাজ শুরু করতে চাও ? একটু জিরিয়ে নাও না কেন ?"

সে তার চোখগুলো সরু করলে, যেন আমাকে মেপে নিচ্ছে। তারপরে আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে দোকানের পেছনের উঠোনে আমাকে নিয়ে গেলো। সেখানে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখা চারটে চুবড়ি আর দুটো কাঁধের বাঁক। দুটো চুবড়ি ভর্তি চাষবাসের যন্ত্রপাতি আর দুটোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্র। আমি হতভম্ব হ'য়ে তার দিকে তাকাতে দেখি সে হাসিভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার মুখের ভাব থেকে আমি তার মনের ভাব আন্দাজ করতে পারলাম।

"এটাই কি আমার কাজ ?" জিজ্ঞাসা করলাম। সে ঘাড় নাড়লো। আমি চমকে গেলাম। আমার পরিচিতিপত্রে, যেটা তখনো আমার পকেটে, খুব পরিষ্কারভাবে লেখা ছিলো যে আমি একজন "বিক্রির কেরানি।" তার মানে কাউন্টারের পেছনে থেকে কাজ করা। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে এই ভারি চুবড়িগুলো বইতে হবে। আমি আমার সমবয়সী তরুণ অধ্যক্ষের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম। আমি কথা বলবার আগেই সে একটা বাঁক তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে সেটা আমার হাতে তুলে দিলে।

"এই যে। এটা তোমার।"

আমি সেটার দিকে একঝলক তাকালাম। হায় ! একটা পুরোনো বাঁক যার কিছু অংশ এত ক্ষ'য়ে গিয়েছে যে চক্‌চক্ করছে। দুই প্রান্ত ফেটে যাওয়াতে তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এগিয়ে দিয়েও আমি আমার হাত সরিয়ে নিলাম।

আমার দ্বিধা দেখে সে তার ভুরু কোঁচকালো। "কী হ'লো ? ব্যাপারটা ভালো লাগছে না ?" আমি শুধু নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম। সে বাঁকটার দিকে তাকালে, তারপরে আমার দিকে। "ইয়েন-চুন, সে গুরুত্ব দিয়ে বললে, "এই বাঁকে যা চোখে পড়ে তার বাইরেও অনেক কিছু আছে। এটা আমাদের সবুজগিরি দোকানের মহান ঐতিহ্যের প্রতীক।"

সে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কেন আমি বুঝতে পারলাম না। বাঁকটা নিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে সেটার পেছনে "জনগণের সেবা করো" অক্ষরগুলো খোদাই করা আছে। চেহারা থেকে মনে হ'লো যে এটা সম্প্রতি

করা হয়েছে। এই তিনটি কথা আমার হৃদয়ে উষ্ণতার ছোঁয়া লাগালো। বাঁকটা চেপে ধরে আমি ভারি বোঝাটা ওঠালাম। ছোট্ট সানের মুখ খুশিতে ভ'রে উঠলো। আমাকে চেরা চোখে দেখে সে হাসিতে ভেঙে পড়লো, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরণার মতোই ফটিকস্বচ্ছ সেই হাসি।

ঘুরে ঘুরে ওঠা পথটা ছিলো খাড়া আর পাথুরে। আমার বোঝা নিয়ে একটা পাহাড় বেয়ে উঠতেই আমার পিঠ বেয়ে ঘামের স্রোত নামলো। দম ফুরিয়ে খাবি খেতে-খেতে আর বেজায় গরম লাগাতে, আমার জিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করছিলো। কয়েকবার তো আমি চুবড়িগুলো প্রায় নামিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার চেয়েও ভারি বোঝা ব'য়ে ছোট্ট সান একভাবে হেঁটে চলেছিলো। তার মাথা তুলে ধরা; তার বিনুনিগুলো প্রতি পদক্ষেপে দুলছে। আর হাঁটতে-হাঁটতে সে গানও গাইছে।

শীগ্‌গীরই আমাদের পথটা নেমে এসে একটা উপত্যকার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চললো। আমরা দেখতে পেলাম একজন যুবক আমাদের দিকেই আসছে। সে খুবই ব্যস্ত, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি দরকারে।

"এই যে, ইয়াং মা! এত তাড়া কিসের?" ছোট্ট সান ডেকে বললে।

"আমি শহরে যাচ্ছি," সে মাথা না-তুলেই জবাব দিলে।

"তাই নাকি! এখন তো সকলেই ব্যস্ত, প্রত্যেকেই দুজনের কাজ করছে। কিন্তু তোমার সময় আছে শহরে গিয়ে খুট্‌খুট্‌ করবার।"

"কাজ না-থাকলে আমি কখনোই শহরে যাই না, আমাকে তুমি কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে গেলেও না।"

"আজকে তোমার কী কাজ?" ছোট্ট সান শুধালে।

"তোমাকে ব'লে আমার কোনো লাভ নেই!" ইয়াং মা হাত নেড়ে বললে। সে যেতে শুরু করলে কিন্তু তার দুটো চুব্‌ড়ি নিয়ে মেয়েটি তার পথ আটকে দাঁড়ালো। "এভাবে কথা বলার মানে কী?" সে জানতে চাইলো। "তুমি যদি আমাকে না-বলো, আমি তোমাকে পথ ছাড়বো না। তুমি কি কৃষিসরঞ্জামের কারখানায় যাচ্ছো?"

"তুমি কী ক'রে জানলে?" তরুণটি তো অবাক।

"আমি অনুমান করেছিলাম।" সে তার মাথা তুলে হাসলো।" তুমি কি

তোমার আগাছা নিড়ানির জন্য যন্ত্রাংশ কিনতে যাচ্ছে।"

"কে বললো তোমাকে ?" ইয়াং মা ধাঁধায় পড়লো।

"সে জেনে তোমার কাজ নেই।" সে প্রশ্নটায় গুরুত্বই দিলো না। "কটা মেশিন বিকল হয়ে গিয়েছে ? আর তোমার কি কি যন্ত্রাংশ দরকার ?"

"কটা ? তুমি জানো না ?" তরুণটি চোখ টিপলো।

"আমি ঠিকই জানি।" সে তার আঙুল গুনলো। "তোমার বিগ্রেডে সবসুদ্ধ আঠারোটা আগাছা নিড়ানি আছে। তাদের চারটে বিকল হয়ে আছে। তিনটের দাঁড় ভাঙা, আর একটার অক্ষদণ্ড ভাঙা। আমি ঠিক কিনা ?"

তরুণটি হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। "একদম ঠিক ! তুমি জানলে কি করে ?"

"আমরা যদি পরিস্থিতিটা না জানি, তাহলে অর্থনীতির সম্প্রসারণই বা ঘটাবো কি করে আর সরবরাহই বা ঠিক রাখবো কি করে ?" ছোট্ট সান তার চুলগুলো মসৃণ করে পেছনে ঠেলে দিলো, তারপরে তার একটা চুবড়ি থেকে একটা ভারী কার্ডবোর্ডের বাক্স বার করে তরুণটিকে দিলো। "তুমি যা কিনতে চাও তা এতে আছে।"

এগিয়ে এসে আমি লক্ষ্য করলাম যে বাক্সটার ওপরে লেখা আছে : 'নতুন পথ' ব্রিগেড, তিন সেট আগাছার দাঁত আর একটা অক্ষদণ্ড।

বাক্সটা নিয়ে তরুণটি এত খুশী হলো যে কি বলবে ভেবে পেলো না। কিন্তু হঠাৎ সে সেটাকে নামিয়ে রেখে বাঁকটা ছোট্ট সানের কাছ থেকে টেনে নিলো।

"এটা আমাকে তোমার হয়ে বইতে দাও।"

"না। আমরা এক পথে যাচ্ছি না," সে আপত্তি করলো।

"তুমি কি সোনালী উপসাগরে যাচ্ছো না ? আমি এখন ব্রিগেডে ফিরে যাবো। একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

তার বোঝা তুলে নিয়ে ছোট্ট সান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া একটা আলপথ দেখালো। "আমরা এই পথে যাবো", সে জানালো।

"মতলবটা কি ?" তরুণটি শুধালো, "পথ দিয়ে যাবে না কেন ?"

ছোট্ট সান তাকে একটা ঠেলা মারলো। "ঠিক আছে, তোমার কাজ করো গিয়ে। আমাদের তোমাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাবার দরকার নেই।"

আমি বুঝতে পারলাম যে এই পথ বদলের জন্য মেয়েটার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেটা কী তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবার আগেই সে বললো :

"এই পথ দিয়ে গেলে আমরা শস্যগুলোকে দেখে নিতে পারবো। কিছু অনুসন্ধান চালাবো। আমরা বলি না: 'অনুসন্ধান বিনা উপদেশ দেবার অধিকার নেই'?"

"এখানে অনুসন্ধান চালানোর মত কিছুই নেই," আমি না ভেবেই বললাম। "আমাদের কাজ হলো শুধু মজুত মালগুলো বিক্রী করা।"

"কি বলছো?" ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গুরুত্ব দিয়ে বললো: "তুমি জানো কি ওই বাঁকটা তোমাকে আমি কেন দিয়েছি?" আমি মাথা নাড়লাম। "সারা দেশের লোক তাচাইয়ের কাছ থেকে শিখছে," সে বলে চললো। "আমরা কি আমাদের মাল বয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়ে গরীব আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের সাহায্য করবার চেষ্টা করবো? না, বসে থেকে আমাদের দোকানে তাদের আসবার অপেক্ষায় থাকবো? বাণিজ্যিক কাজে এটা একটা মূল প্রশ্ন। আমরা কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে জনগণের সেবা করতে পারি?" তারপরে সে আমাকে একটা গল্প বললো।

গত বসন্তে উৎপাদন সঙ্ঘগুলো বেশী সার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো নতুন করে বানাবে ঠিক করেছিলো। এটা শুনে তার মনে হয়েছিলো যে তাদের সিমেন্ট লাগবে। তখন তার অফিসে বসে সে কিছু সিমেন্ট মজুত রাখবার পরিকল্পনা করে ও শহর থেকে কুড়ি টন কিনে আনে। কিন্তু একটা পুরো সপ্তাহ চলে গেলো। সিমেন্ট কিনতে কেউ এলো না। সে ধাঁধায় পড়লো। কাজেই সে বিভিন্ন সঙ্ঘগুলোতে গেলো আর জানতে পারলো যে তাচাইয়ের স্বনির্ভর বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত থেকে শেখবার ফলে তারা শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো পাথর দিয়ে নতুন করে বানিয়েছে, কোন সিমেন্ট ব্যবহার না করেই।

"আত্মমুখিনতাই আমাকে বিপদে ফেলেছিলো!" ছোট্ট সান আন্তরিক উপলব্ধির সঙ্গে বললো। "জনগণকে সেবা করবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। তোমাকে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানও চালাতে হবে। নাহলে তুমি তোমার কাজ ভালোভাবে সারতে পারবে না।"

আমরা চলতে চলতেই কথা বলছিলাম আর শীগগিরই কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করলাম। হঠাৎ ছোট্ট সান দাঁড়িয়ে পড়লো। "দেখো! ওই কচি ধানের চারাগুলো হলদে হয়ে উঠেছে কেন?" সে ধানক্ষেতের দিকে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম যে সব কচি চারাগুলোই ভরা সবুজ,

শুধু একটা অংশ বাদে। সেটা এতো ছোট যে সতর্কভাবে দেখলে তবেই চোখে পড়ে। "হয়তো ওটাতে সারের অভাব ঘটেছে," আমি বিবেচনা না করেই বললাম।

"হয়তো' কথাটা ব'লো না। লাগলো-তো-লাগলো, না-লাগলো তো-ফস্‌কালো—এই পদ্ধতি কাজ দেবে না।" আমার দিকে সে তাকালো। জুতো খুলে সে ওই কাদায় ভরা ক্ষেতে নেমে গেলো। নীচু হয়ে একটা কচি চারা তুলে আমায় দেখালো। "কমরেড ইয়েন-চুন, তুমি কি বলতে পারো এটায় কি দোষ ঘটেছে?" আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম যে শিকড় আর কাণ্ডটা সুস্থই আছে। শুধু চারার ডগাটা একটু হলদে, যেন পুড়ে গিয়েছে।

"এই প্রথমবারই আমরা এখানে ধান ফলাচ্ছি," সে চিন্তিতভাবে তার ভুরু কুঁচকে বললো। "আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আমরা যদি এটা এক্ষুনি না সাফ্ করে ফেলতে পারি, তবে এটা দ্রুত ছড়াবে। এ বছরের উৎপাদনকেই যে শুধু ব্যাহত করবে তাই নয়, আমাদের পাহাড়ে এলাকায় ধানচাষকে জনপ্রিয় করে তোলবার কাজকেও বিঘ্নিত করবে।"

"আমরা কি করবো?" আমি প্রশ্ন করলাম। ছোট্ট সান নীরব রইলো, কিন্তু যখন সে আবার ধানজমিতে নেমে গিয়ে কিছু কাদা তুলে নিলো, তখন তার কালো চোখদুটো জ্বলে উঠলো। "তুমি আগে তোমার মাল নিয়ে সোনালী উপসাগরে যাও," সে আমাকে নির্দেশ দিলো। "আমি কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্রে যাচ্ছি।"

আমি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। চারদিক থেকে কালো জলভরা মেঘ এসে জমা হচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ো এর মধ্যেই কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঝড় আসবে। "ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না কেন, ছোট্ট সান," আমি বললাম।

"একটা ঝড় কিছুই না। অসুস্থতা নিবারণ হলো আগুন নেবানোর মতই ব্যাপার। আমরা এক মিনিটও দেরী করতে পারি না।" এই বলে সে কাঁধে তার বাঁকটা তুলে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলো। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সে থামলো আর ফিরে এসে আমাকে তার সবুজ বর্ষাতিটা দিতে চাইলো।

"তোমার পেছনের চুবড়ির ঢাকনাটায় ফুটো আছে। ওটার ওপরে আমার বর্ষাতিটা চাপিয়ে দাও," সে চেঁচিয়ে বললো।

"তোমার কি হবে?"

"মালগুলো বাঁচানোই দরকার…।" কথার বাকিটুকু মেঘের গর্জনে ডুবে গেলো।

সোনালী উপসাগর গ্রামের নিকটবর্তী হয়ে আমি দেখতে পেলাম যে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। যখন তারা শুনলো যে আমি নতুন বিক্রেতা, তারা ছোট্ট সান কোথায় জানতে চাইলো। আমি মুখ খুলতে পারবার আগেই এক ছোকরা চেঁচালো, "তুমি কি আমাদের ধানের জন্য কীটনাশক এনেছো?"

আমি লক্ষ্য করলাম যে তাদের হাতেও কিছু কচি চারা। "ধানে কি দোষ ঘটেছে তাই আমি জানি না। কীটনাশক আনবো কি করে?" আমি উত্তর দিলাম।

"ছোট্ট সান তোমার মত নয়," ছোকরা ফিরে জবাব দিলো। বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতি তার দিকে একবার তাকালো। "তোমাকে চটতে হবে না। তোমাকে এক্ষুনি এই চারাগুলো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।"

"ছোট্ট সান ইতিমধ্যেই সেখানে কয়েকটা নিয়ে গিয়েছে," আমি ছোকরা চলে যাবার আগেই জানিয়ে দিলাম।

"সে নিয়েছে, নিয়েছে তো?" বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতির মুখ হাসিতে ভরে উঠলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তার বর্ষাতি খুলে ছেলেটির হাতে দিলো। "চট্‌পট্‌! গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো।" ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই দৌড় দিলো।

ঠিক একই মুহূর্তে আমার বাঁকটা বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতির চোখে পড়লো।

"ওই বাঁকটা!" সে বলে উঠলো। আমার কাছে হেঁটে এসে সে শক্ত করে বাঁকটা ধরলো। তারপরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

"এই বাঁকটায় কি দেখছো, ব্রিগেড দলপতি?" আমি হাসলাম। "এটাতে তো কোন ফুল গোঁজা নেই—। এটার বৈশিষ্ট্য কি?"

"এটাতে কোন ফুল গোঁজা নেই, ঠিকই। কিন্তু এটা আমাদের পুরোনো দোকানদারের রক্তে ভেজানো।"

"তোমাদের পুরোনো দোকানদারের রক্ত!"

কুয়াশায় ঢাকা দূর পাথরের দিকে চেয়ে সে আমাকে বাঁকটার গল্প শোনালো।

"স্বাধীনতার আগে, এই এলাকার গরীব আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের কিছু কিনতে হলে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হতো। মুনাফাখোরেরা এই সুযোগে মাল নিয়ে ফাটকাবাজি করতো। আমাদের তাদেরকে এক বাক্স দেশলাইয়ের বদলে আধ কেজি ভেষজ দ্রব্য দিতে হতো। একটা চামড়ায় মাত্র এক লিটার কেরোসিন পাওয়া যেতো। কি নিষ্ঠুরই না ছিলো ওই রক্ত চোষাগুলো!"

"মুক্তির অল্প পরেই, জনগণের আঞ্চলিক সরকার এখানে এই সবুজ গিরি দোকানটা খুললো। প্রথমে দোকানটা ছিলো ছোট, একজন কমরেডই চালাতো। সে ছিলো সেই পুরোনো দোকানদার। সেই-ই, ওই বাঁকটাই কাঁধে নিয়ে, আমাদের কাছে গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের জন্য চেয়ারম্যান মাওয়ের উৎকণ্ঠা পৌঁছে দিয়েছিলো। একই সময়ে, ওই বাঁকের সাহায্যে, সে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি আমাদের ভালোবাসাও সমতলের বাসিন্দাদের কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো। সবাই দোকানটাকে বলতো "কাঁধের বাঁকের দোকান।" কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু শ্রেণীশত্রু তাকে ঘৃণা করতো। একদিন খুব ভোরে, বুড়ো দোকানদার যখন একটা পাহাড়ী পথে গ্রামবাসীদের কাছে মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, দুটো বদমাশ বন থেকে হাতে লাঠি আর ছোরা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। হিংস্র নেকড়ের মত তারা বুড়ো দোকানদারের পথ আটকে দাঁড়ালো। ক্রুদ্ধ হয়ে বুড়ো দোকানদার চিৎকার করে বললো, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো। কিন্তু এই পথ আটকাতে পারবে না।' বাঁকটা তুলে সে শত্রুদের দিকে তেড়ে গেলো। আমাদের পুরোনো দোকানদার তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জনগণের স্বার্থে লড়ে গিয়েছিলো।"

"তার নাম কি ছিলো?" আমি আবেগে প্রশ্ন করলাম।

"সান জু-সুং। সে ছিলো সান লি-ইং-এর বাবা।"

"কি! ছোট্ট সানের বাবা!" আমি চমকে উঠলাম। বাঁকটা নিয়ে আমি সেটা আমার বুকে চেপে ধরলাম। আমার যা কিছু বলবার ছিলো তার জন্য আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাকে এই বাঁক দিয়ে, যাতে জড়িত এমন এক মহান ইতিহাস, ছোট্ট সান আমার উপরে বিরাট আস্থা দেখিয়েছে। কিন্তু আমি...আমার চোখ জলে ভরে গেলো। সবুজ দেওদার গাছের ছায়ায় ঢাকা

খাড়াই পথটার দিকে আমি তাকালাম। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চূড়োয় ওঠা পথটাকে মনে হলো একটা দড়ি যা কিছুতেই ছিঁড়তে পারবে না।

"বুড়ো দোকানদারই পায়ে চলে এই পথ তৈরী করেছিলো।" আমাকে বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতি অর্থপূর্ণভাবে বললো।

হ্যাঁ! 'অর্থনীতিকে গড়ে তোলো আর সরবরাহ ঠিক রাখো।' চেয়ারম্যান মাওয়ের এই নির্দেশ মেনে আমাদের সেই বিপ্লবী পূর্বসূরী তার দৃঢ় পদক্ষেপে এই বন্ধুর পথ তৈরী করেছিলো। ছোট্ট সান তার বাবার বাঁক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। একটা ভারী বৈপ্লবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এখন বাঁকটা আমার কাঁধে। আমি পথ বেয়ে পুরোনো দোকানদারের পদক্ষেপ অনুসরণ করবার সঙ্কল্প নিলাম। আমি এটা শেষপর্যন্ত অনুসরণ করে চলবো...।

বৃষ্টি থামলো। পুরো আকাশটাকে দেখাচ্ছিলো একটা চওড়া পুষ্করিণীর মত—বিচ্ছিন্ন মেঘগুলো যাতে ছোট ছোট নৌকার মত ভেসে আছে। সদ্য বর্ষণসিক্ত সবুজ পাহাড় আর গাছ আর লাল ফুলগুলো দ্বিগুণ টাটকা ও সুন্দর হয়ে উঠেছিলো। পাহাড়ের ওপরে মৃদু বাতাস বইছিলো। আমরা ঘণ্টাধ্বনির মত স্বচ্ছ এক গায়ন্ত গলা শুনতে পেলাম যে কণ্ঠস্বর আমাদের সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়।

"ছোট্ট সান ফিরে এসেছে!" বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতি দৌড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলো।

সূর্য আবার দেখা দিলো। আকাশে একটা রামধনু ছড়িয়ে পড়লো ধনুকের মত, যেন উঁচু পর্বতচূড়াগুলোর উপরে এক অত্যাশ্চর্য বহুবর্ণ সেতু। রামধনুর তলায়, ঘুরাল পথে দেখা দিলো ছোট্ট সানের খাটো, সমর্থ দেহ। তার কাঁধের বাঁক থেকে খামারের যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকে ভরা দুটো চুবড়ি ঝুলছিলো। তার প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ় ও শক্তিপূর্ণ। সোনালী সূর্যালোক তার শরীরটাকে পোশাকের মত জড়িয়ে ছিলো, আর তার পায়ের তলায় পড়ে ছিলো দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন পথ।

অনুবাদ ঃ অনিন্দ্য সেন

আবদুল্লা কাহ্‌হার

দৃষ্টিদান

আর তাই আহমেদ পালোয়ান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। হয়ত বলা উচিত যে মৃত্যু তার প্রতীক্ষায় আছে···পরলোকে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই, কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের ভার যে সর্দারের হাতে তার পাশে বলির পাঁঠার মতন বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার ক্ষমতা তো তার নেই।

জল্লাদ বেঁটেখাটো ষণ্ডাগোছের ছোকরা। সে ঠেলা দিতে লতার মতো দুলে চিৎ হয়ে পড়ে গেল পালোয়ান, পিছনে আড়মোড়াভাবে বাঁধা হাতদুটোয় শরীরের চাপ দিয়ে।

জল্লাদের জবর একটা লাথিতে উঠে দাঁড়াতে হল পালোয়ানকে।

ওঠবার সময় পালোয়ান কাঁধ বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কোনো জায়গা মচকে বা ভেঙে গিয়েছে কিনা, কিন্তু হঠাৎ একটা তিক্ত দৈন্যতার সঙ্গে মনে পড়ল যে এখন ভাঙা বা মচকানোর কোনো মানে নেই তার কাছে।

জল্লাদের আর একটা ধাক্কা, এবার অত জোরে নয়। পালোয়ান ছুটে, বরঞ্চ কয়েক পা লেংচে পৌছল মাটির মঞ্চটার একেবারে সামনে। মঞ্চের ওপরে গদীতে শুয়ে আছে দলের পাণ্ডা, কানা কুরবাশি, পরনের ডোরাকাটা পোশাকটা একেবারে তেল চিটচিটে। কুরবাশির ডানদিকে আসীন কুঁজো উলেম তাদের ধর্মগুরু, বাঁ দিকে হলদে মুখ তাবিব—ভারতীয় ডাক্তারটি। পিছনে গৃহকর্তা নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে। বুড়ো লোকটি ছটফটে প্রকৃতির, দেখতে বাদুড়ের মতো।

এইমাত্র গোটা একপ্লেট পোলাও উদরস্থ করেছে কুরবাশি। গুটিভরা গালে তেলের চকচকে ছিটে, চিরুনি-না-পড়া চাপদাড়িতে চালের শাদা দানা। অন্য যে কোনো সময়ে তার বর্বর দৃষ্টিপাতে অত্যন্ত নির্ভীক লোকেও ভয়ে সিঁটিয়ে যেত, কিন্তু এই মুহূর্তে চর্বচোষ্য ভুরিভোজের ফলে তার পেটটা

বেজায় ভারি, কেমন যেন অসাড় আর ইচ্ছশক্তি বিহীন হয়ে পড়েছে সে। জগদ্দল শরীরের প্রতিটি পেশী অদম্য ঘুমের ঘোরে শিথিল হয়ে আসছে, চাপা ক্রোধের আগুন জ্বালাবার বৃথা চেষ্টা তার।

অতিকষ্টে যে চোখটা ভালো সেটা খুলল সে, সেই মুহূর্তে চোখে বলতে গেলে কিছু দেখল না। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে যত জোরে পারে হাঁকল কুরবাশি :

'বেটা জাহান্নমের কীট! দোস্তদের নাম শোনার জন্য আর কতক্ষণ সবুর করতে হবে আমাদের?'

আগেকার মতো চুপ করে রইল আহমেদ পালোয়ান। যা বলেছে তার বেশী আর কি বলতে পারে? ইসমাইল এফেন্দিকে সে হত্যা করেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কুঠার ছাড়া তার তো আর কোনো দোস্ত ছিল না।

ইসমাইলকে নিজের প্রধান সর্দার ভাবত কুরবাশি। সত্যি, শকুনটার ডান পাখার সামিল ছিল এফেন্দি। একবার যখন লাল তারা মার্কা একটি ঘোড়-সওয়ারের গুলি লাগে ইসমাইল এফেন্দির বুকে 'আলকার মাজার' এর কাছে, তখন ঘোর যুদ্ধের মধ্য থেকে তাকে ছিনিয়ে কুরবাশি নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ঝড়ের মতো নিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে। এত জোরে ওরা পিছু তাড়া না করলে বিশ্বস্ত সর্দারের ক্ষতস্থান বেঁধে দিত কুরবাশি। কিন্তু উঁচু তীক্ষ্ণ হেলমেটে লাল তারা আঁকা ঘোড়সওয়াররা পলাতকদের এত নাছোড়বান্দাভাবে অনুসরণ করে যে, কোনোখানে মুহূর্তেকের জন্য পর্যন্ত থামার প্রশ্ন ওঠেনি।

নিজের দলের ঘোড়সওয়ারদের অর্ধেককে হারিয়ে কুরবাশি যখন আহমেদ পালোয়ানের পাহাড়ি গ্রামে পৌছয় তখন রাত্রি। এফেন্দির প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল, সে বলল তাকে আর নিয়ে যাবার দরকার নেই, কোনো বিশ্বস্ত লোকের বাড়িতে তাকে রেখে যাওয়া হোক।

সে গ্রামে কুরবাশির অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু তিনজন সাঙ্গোপাঙ্গো ছিল। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে এফেন্দিকে রাখা যায় না। ওরা সবাই বে। আর কুরবাশির খুব ভালো করে জানা ছিল যে সে সময় সতর্কতার খাতিরে লাল তারা সৈনিকেরা ধনী ও গণ্যমান্য বে'দের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন। কুরবাশির সুবিবেচনায় এফেন্দির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হল কোনো গরিবের কুঠি, তাই পালোয়ানের দীন কুঁড়েঘরে মুমূর্ষু লোকটিকে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত সে করে।

কুরবাশির হাত থেকে এফেন্দিকে নিয়ে আহমেদ পালোয়ান কথা দিল যে আহতের দেখাশোনা সে শুধু করবে না, শান্তিতে নির্ঝামেলায় তার থাকার ব্যবস্থাও করবে। কুরবাশি ও তার ঘোড়সওয়াররা চলে গেল আরো নিরাপদ স্থানে। রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের কথা রাখে পালোয়ান।

এফেন্দির আরোগ্য লাভ বা মৃত্যুর জন্য সবুর করেনি আহমেদ পালোয়ান। পাছে কুরবাশি ফিরে এসে বন্ধুকে নিয়ে যায় সেই ভয়ে সে আহতকে ভারি কুঠারের এক ঘায়ে শান্তি জোগায়, চিরশান্তি জোগায়।

গভীর একটা গর্তে এফেন্দিকে চাপা দেবার সাঁইত্রিশ দিন পরে কুরবাশি আহমেদকে ধরে বেঁধে বস্তার মতো তুলে নিল ঘোড়ায়। গাঁয়ের এক বে তাকে পালোয়ানের কর্মের কথা জানিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে দু দিন এভাবে যেতে যেতে তার শরীর নড়বড়ে। এফেন্দির মৃত্যুর ঠিক চল্লিশ দিন পরে তাকে যেতে হল ডাকাত দলের সর্দার, কুরবাশির বিশ্বস্ত অনুচরের রক্তের দাম দিতে।

এখন সে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু কথা বলল না কুরবাশি। প্রতিশোধের ক্রোধ পুরোপুরি জাগাবার যে চেষ্টা তাকে করতে হয় তাতে তার সর্বশক্তি নিঃশেষ। ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করল, মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকে, তার নাসিকা গর্জন কানে গেলো কুঁজো উলেমের, হলদে মুখ তাবিবের আর বাদুড় মার্কা ক্ষুদে বুড়োটার।

মঞ্চে বসে বসে উলেম, তাবিব এবং ছটফটে বুড়োটা শঙ্কায় এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নামা, প্রতীক্ষায় তিতিবিরক্ত লোকগুলির আর জল্লাদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা তাদের।

অবশেষে সাহস করে কুরবাশিকে ধাক্কা দিল উলেম। থরথর করে কেঁপে উঠে, মাথা পিছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুরবাশির মনে পড়ে গেল যে, সূর্যাস্তের সময় পাশের একটা গাঁয়ে হামলায় নিয়ে যেতে হবে ঘোড়-সওয়ারদের। সেখানে বিরোধী চাষীদের সঙ্গে একটা হিসেবনিকেশ অনেক দিন করা হয় নি। সূর্য তখন নিম্নগামী, অস্ত যাবে ঘণ্টা দুতিন পর, অতএব কুরবাশি ঠিক করল যে বদমাইশটাকে সাবাড় করার সময় হয়েছে। তার ভালো চোখটা নেকড়ের চোখের মতো জ্বলে উঠে নিবদ্ধ হল পালোয়ানের উপর।

ভয়াল সে চোখের দিকে অবিচলিতভাবে তাকাল পালোয়ান, নিজের ক্লান্ত অথচ দৃঢ় চোখ নামাল না।

খুব জোরে শরীরটাকে সামনে টেনে কুরবাশি গলা ফাটিয়ে চেঁচাল :

'নোংরা কাফের কোথাকার ! তোর কি মনে হচ্ছে—পেছনে জল্লাদ দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে একটা বা দুটো জিন্দিগী ?'

পেছনে বাঁধা হাতের ফোলা আঙুলগুলো একটু নড়ে উঠল পালোয়ানের, সরাসরি কুরবাশির মুখে তাকিয়ে সে বলল :

'হুজুর ! যা বলার সব বলেছি, আর কিছু বলার নেই। এফেন্দি গরিবদের জান নিত, আমি তার জান নিয়েছি, আর এখন আপনি আমার জান নেবেন··· কিন্তু মারা যাবার আগে আমি এমন একটা জিনিস করতে চাই, যেটাতে আল্লা খুসি হবেন, সেটা করলে আল্লা······

'বুরবক !' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'আল্লার নাম মুখে আনিস না বলছি !'

হেসে পালোয়ান বলল, 'আল্লাকে অমর্যাদা করার কথা স্বপ্নেও ভাবি কি করে ? না হুজুর, আমার শেষ মুহূর্তে অন্য সব জিনিসের কথা ভাবছি। আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাই, হুজুর। আমাকে একটা কাজ করতে দিন, সেটাতে আল্লা খুসি হবেন, আপনারো উপকার হবে, হুজুর, বিজ্ঞ লোক আপনি !'

কুরবাশি হিংস্রভাবে গর্জে উঠল : 'তুই আমার কী উপকার করতে পারিস ?'

'হুজুর,' পালোয়ান বলল, 'আপনি সিংহের মতন জোরদার, আমি মৌমাছির মতন দুর্বল। কিন্তু জানেন তো, মৌমাছির কথায় কান না দেওয়াতে সিংহের প্রায় সর্বনাশ হতে চলেছিল ? আমাকে অবজ্ঞা করবেন না হুজুর, আপনাকে একটা রহস্য আমি জানাব।'

'তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, কুত্তা কোথাকার।'

'এখন আমাকে দেখছেন এক চোখে, কিন্তু দু চোখে দেখতে হয়ত পারবেন,' আপত্তি জানিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল পালোয়ান আর কুরবাশির মুখে রাগ আর হতবুদ্ধির একটা ভাব দেখে আস্তে আস্তে আরো বললো, 'হুজুর, বাঁ চোখে আপনি দেখতে পারেন না, কালো জল পড়েছিল বলে। কিন্তু আপনার কানা চোখের দৃষ্টি আমি ফিরিয়ে আনতে পারি—অন্ধ লোককে আরোগ্য করার গোপন বিদ্যা আমার জানা।'

'আরোগ্য' কথাটা কানে যাওয়াতে ভারতীয় তাবিব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে

উলেমকে জিজ্ঞেস করল দণ্ডিত লোকটা কী বলছে। তাবিব উজবেক ভাষা ভালো বুঝত না।

উজবেক ভাষায় আরবী শব্দ এখানে সেখানে ব্যবহার করে, যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ উলেম ব্যাখ্যা করাতে ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে তাবিব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

"মিথ্যে কথা বলছে নির্ঘাৎ," সে ভাবল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্দেহকে সন্দেহ করে কঠোরভাবে নিজেকে প্রশ্ন করল : "লোকটার এই বড়ো মিথ্যেয় যদি সত্যের দানা থাকে একটা, তাহলে ?"

কুরবাশি হঠাৎ ফিরল তাবিবের দিকে। বলল :

'তাবিব, এ লোকটার গোপন বিদ্যা তোমাকে উপহার দিচ্ছি। রোগ সারাবার গুণ তোমার তো বিশেষ জানা নেই, হপ্তায় তিনবার তুমি এমনভাবে কাঁপো যেন শয়তান পাপীকে ঝটকা দিচ্ছে, নিজের শরীরের রোগ তুমি সারাতে পারো না। অন্ধ লোককে সারাবার গোপন বিদ্যাটা এর কাছ থেকে জেনে নাও, তাহলে তোমার গুণ বাড়বে।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে কুরবাশি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুলো। বাড়ির ক্ষুদে ছটফটে কর্তা তাকিয়াগুলো তখুনি সেখানে বসিয়েছিল। ভাগ্যিস তাকিয়া ছিল, নইলে হয়ত হেসে ফেটে পড়ত কুরবাশি এত জোরে ওঠাপড়া করছিল তার বাজর্খাই ভুঁড়ি। কুরবাশির হঠাৎ ফুর্তির ছোঁয়াচ লাগল অন্যদের, এমন কি কঠোর মুখ উলেম পর্যন্ত একটি স্মিত হাসি চাপতে পারল না, আর বাদুড় মার্কা ক্ষুদে বুড়োটা একবার জোরে হেসে উঠল। এই অশোভন ফুর্তিতে যোগ দিল না শুধু তাবিব।

অবশেষে ধাতস্থ হল কুরবাশি।

'বোকাটার নানা গল্প শুনতে আর পারি না।' দম ফিরে আসার পর বলল সে, 'তাবিব তুমি কথা বলো ওর সঙ্গে।'

তাকিয়ায় আরাম করে বসে, রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে কুরবাশি বিদ্বেষের একটা হাসি হেসে আরো বলল :

'এও তো হয় যে ইঁদুর ধরে বেড়াল তখুনি সেটাকে সাবাড় না করে একটু খেলা করে প্রথমে। আমরাও কিছুটা খেলতে পারি...তাই না, তাবিব ?'

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে তাবিব ফিরল পালোয়ানের দিকে। কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল তাকে :

'কখনো অন্ধ লোকের দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছ তুমি ?'

'না,' সহজভাবে জবাব দিল পালোয়ান। 'নিজে কখনো কাউকে সারাইনি, কিন্তু একবার আমার বুড়ো গুরু একজন অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্ধ লোকটি দৃষ্টি ফিরে পেল আর বুড়ো লোকটি নিজে অন্ধ হয়ে গিয়ে মারা গেলেন।'

'মারা গেলেন কীসে ?'

'নিজের দৃষ্টিশক্তি অন্ধলোকটিকে দিয়েছিলেন বলে।'

অসাড় আঙুলগুলোকে আবার বেঁকিয়ে শান্তকণ্ঠে যোগ করল আহ্মেদ পালোয়ান :

'হুজুরের কানা চোখে নিজের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আমিও অন্ধ হয়ে যাব।'

এ উত্তরে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি এমন ভান করে তাবিব আরো কঠোর সুরে প্রশ্ন করল :

'তোমার গুরুর কী নাম ছিল ?'

পালোয়ান বলল, যখন সবাই দেখবে যে সে সত্যি সত্যি একজনকে আরোগ্য করতে পেরেছে, শুধু তখনি গুরুর নাম বলবে।

তাবিব আর একবার মাথা নাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হল। তার মাথায় জ্ঞানের চেয়ে কুসংস্কারের বোঝা বেশি, যদিও চিকিৎসা বিদ্যা কিছুটা তার জানা ছিল।

তার মনে হল পালোয়ানের কথাটা অসম্ভব, এমন কি অস্বাভাবিক, কিন্তু অনেকদিন আগে শোনা গুরুদের উপদেশও মনে পড়ল। গুরুরা সর্বদা বলতেন যে, প্রকৃতিতে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা চলে না। তাবিব নিজের ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না বটে, কিন্তু তা নিয়ে ইয়ার্কি করতে পারে শুধু কুরবাশির মতো মস্তিষ্কবিহীন লোক। বড় বড় হাকিমেরা পর্যন্ত রোগব্যাধির কাছে মাথা নত করে। কিন্তু যে জিনিস সিদ্ধ লোকের কাছেও অজানা সেটা যেমন-তেমন লোক জানতে পারে কি ?

চকিত দৃষ্টিতে পালোয়ানের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল তাবিব : যা হবার হোক, এ সুযোগ সে ছাড়বে না।

তার অপরিচিত ভাষায় থেমে থেমে সে পালোয়ানকে জিজ্ঞেস করল কুরবাশিকে সারাবার জন্য কী কী ওষুধ বা গাছগাছড়া তার দরকার।

পালোয়ান জানাল তার দরকার ছটা জিনিস। 'ভুলো-না-কখনো' ফুল, দুটো খুর্মা, একটা ডিম, এক চামচ মধু আর এক চিমটে যোয়ানের বীজ। নিজের বাড়ির

বিনয়ে জাঁকী সেই ছটফটে বুড়ো বে'র কাছে সব ছিল, ফুল বাদে। ফুল আনতে গেল একজন ঘোড়সওয়ার।

'তোমার আরো কিছু চাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল তাবিব।

'হ্যা', বলল পালোয়ান। 'একটা তামার কেটলি আর একটা মোমবাতি।'

বুড়ো জিনিসগুলো আনল। পালোয়ান বলল মোমবাতিটা কুরবাশির কানা চোখের ঠিক সামনে রাখা দরকার। কেটলিটা বসাতে হবে আগুনে, দুটো চায়ের পাত্রে জল ভরে ঢালতে হবে কেটলিতে।

সব কিছু করা হল।

কেটলিতে জল ফুটছে, তখন পালোয়ান তাবিবকে বলল মধুটা জলে গুলে দিতে, ডিমটা ফাটিয়ে তাতে ফেলতে, খুর্মা ও যোয়ানের বীজগুলো জলে ছেড়ে দিতে।

আরো বলল, কেটলির পাশে বসে যে ঘোড়সওয়ারটা মিশেলটা ঘাঁটছে তাকে যেন ফুলগুলো দেয় সেই ঘোড়সওয়ারটি যে ফুল এনেছে। প্রথম ঘোড়সওয়ার ফুলগুলি পাওয়ামাত্র পালোয়ান তাকে হুকুম দিল সে যেন ছটা ফুল গুনে মিশেলে ফেলে দেয়।

তাবিব একবারও সতর্ক দৃষ্টি ফেরায়নি পালোয়ানের উপর থেকে। প্রক্রিয়াগুলির পূর্বাপর মনে রাখার চেষ্টা সে করে চলেছে, কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহে সে জর্জরিত।

"সত্যি যদি লোকটার গোপন বিদ্যেটা জানা থাকে!" এটা ভেবে সে হিসেব করতে বসল গোপন বিদ্যা তার নিজের রপ্ত হয়ে গেলে কত লাভ হবে। প্রথমত, কুরবাশির পৃষ্ঠপোষকতা তার আর দরকার হবে না, অন্য কারোর ছুরি বা গুলির সাহায্য না নিয়েই বিষের দ্রুত মাধ্যমে তাকে সরাতে পারবে। সত্যি, এমন একটা জবর রহস্যের চাবিকাঠি যার হাতে তাকে সম্বর্ধনা করতে পারলে ভারতের যে কোনো সহর কৃতার্থবোধ করবে। তাহলে ডাকাত দলের এই নিষ্ঠুর সর্দারের কৃপা ভিক্ষা সে করবে কেন? এমনকি সে ফিরে যেতে পারবে নিজের সহরে যেখান থেকে অন্যান্য তাবিবের হীন ষড়যন্ত্রের ফলে জোচ্চোর আর গণ্ডমূর্খ বলে সে নির্বাসিত হয়। বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত হয়ে সে যখন ফিরে যাবে, ফিরে যাবে এমন তাবির হয়ে যার তুলনা পৃথিবীতে কখনো হয়নি, তখন এই সব হীন, আর হিংসুটে তাবিব কী বলবে, কী বলবে উচ্চশিক্ষিত হাকিমরা, কোথায় ঢাকবে নিজেদের লজ্জা?

কেটলি থেকে ওঠা নীলচে বাষ্পরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এ ধরনের সব চিন্তা ভিড় করেছিল ভারতীয় তাবিবের মাথায়।

কেটলির দিকে নজর রেখেছিল পালোয়ানও।

নীলচে বাষ্প যখন কুঁকড়ে সাদা হতে শুরু করল তখন পালোয়ান বলল কেটলিটা সরাতে আর এমন সব পাথর আনতে যাদের জল স্পর্শ করেনি কখনো।

'লেয়াও পাথর,' হুকুম দিল কুরবাশি। হঠাৎ তার মালুম হয়েছে যে পাশের গাঁয়ে হামলা চালাবার আগে ঘোড়সওয়ারদের একটা তামাশা দেখিয়ে উত্তেজনা যোগাতে হবে আর তামাশার শেষ করবে সে, স্বয়ং কুরবাশি, শেষ করবে মজার ও রক্তাক্ত একটা কসরতে।

নিজেদের পোশাকের খুঁটে করে তিনজন ঘোড়সওয়ার পাথর এনে আহমেদ পালোয়ানের পায়ের কাছে জড় করল।

পালোয়ান বলল প্রত্যেকটা পাথর তাকে আলাদা করে দেখাতে। শেষ পর্যন্ত তিন সাড়ে তিন সের ওজনের একটা পাথর সে বেছে নিল।

'ঠিক জানি না পাথরটায় কখনো জল লেগেছে কি না', বলে সে ওদের হুকুম করল সেটাকে ঘষে মেজে লাঙলের লোহার ফলকের মতো করে দিতে।

'যা বলছে কর।' আদেশ দিল কুরবাশি। ষণ্ডামার্কা ছোকরা একটি ঘোড়সওয়ার একটা হাতুড়ী নিয়ে কাজ শুরু করল। এরকম হাতুড়ী জাঁতার পাথর তৈরির কাজে লাগে।

পালোয়ান তাবিবের দিকে ফিরে বলল :

'হাকিম! আমার এখন মানুষের রক্ত চাই!

'কোথায় পাবো?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলে তাবিব, তাকাল কুরবাশির দিকে।

পালোয়ানের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুরবাশি।

'আমি দেব রক্ত!' কুরবাশির দিকে ফিরে বলল পালোয়ান। 'হুজুর জল্লাদকে বলুন আমার একটা আঙুল কেটে নিতে!'

নানা কণ্ঠের চাপা আওয়াজ বিরাট উঠোনটায় গড়িয়ে মিলিয়ে গেল।

কোঁকড়ানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে কুরবাশি এমনভাবে বলল যেন স্বগতোক্তি করছে :

'তাহলে তো তোর হাতের বাঁধন খুলতে হয়।'

'হুজুর, আপনি তাহলে আমাকে ডরান?' বলে কুরবাশির মুখের দিকে উদ্ধতভাবে তাকাল পালোয়ান।

দাড়ি শক্ত করে চেপে টান দিল কুরবাশি, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠল, তাতে গুটিগুলো আরো ফুটে উঠল।

'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে,' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে! দুজনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়া ওর দুপাশে। আর জল্লাদ, তুই তলোয়ার খুলে ওর ওপর কড়া নজর রাখ!'

খোলা তলোয়ার হাতে তিনজন ঘিরে দাঁড়াল পালোয়ানকে, ছুরি দিয়ে কাটতে বাঁধনের দড়িটা মাটিতে পড়ে গেল। মাথার উপরে হাত তুলে নাড়াল পালোয়ান।

'একখণ্ড কাঠ আর একটা বাটি নিয়ে এসো!' হাতের কব্জার কড়া ঘষতে ঘষতে হুকুম দিল পালোয়ান।

কাঠ আর বাটি এল। কোথায় সেগুলো রাখতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান।

'তুমি তৈয়ার হও, জল্লাদ!' শান্ত কণ্ঠে সে বলল। 'যখন চেঁচিয়ে বলব "কাটো" ঠিক তখনি কাটতে হবে কিন্তু!'

বিড়বিড় করে জল্লাদ কী বলল শোনা গেল না।

তাবিবকে ডেকে পালোয়ান বলল, 'হাকিম! এখানে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরুন!'

মঞ্চ থেকে নেমে এল তাবিব, বাটিটা নিয়ে যেখানে তাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে সেখানে দাঁড়াল।

হাঁটু গেড়ে বসল পালোয়ান। বাঁ হাতের চারটে আঙুল চেটোয় মুড়ে কড়ে আঙুলটা রাখল কাঠের উপরে।

ছটফটে বুড়োর বাড়ি আর উঠোনে এত গভীর স্তব্ধতা তখন যে একটি উড়ন্ত প্রজাপতির ডানার ফৎফৎ শব্দ কানে এল স্পষ্টভাবে।

কুঁজো উলেমের হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল, শাদা হয়ে গেল মুখ, দু হাতে মুখ ঢাকল সে। খুব সম্ভবত 'কাটো' এ চীৎকারটা, বা হাওয়ায় তলোয়ারের শিস তার কানে যায়নি।

যখন সে চোখ খুলল, তখন পালোয়ান একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাবিব রক্তপাত রোখার জন্য ক্ষতস্থানে কী একটা গুঁড়ো ছড়াচ্ছে। পালোয়ানের মুখে ঘামের চকচকে বড়ো বড়ো বিন্দু, সে নিশ্বাস ফেলছে হাঁপিয়ে, সশব্দে।

উলেম আড়চোখে দেখে নিল যে বাটিটা আর শূন্য নয়, কীসে যেন ভরা, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে পালোয়ানের আধবোজা

চোখের পাতা কেঁপে উঠল। হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল রক্তপাত কমে এসেছে।

'পাথর তৈয়ার ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাথর তৈয়ার ?' প্রতিধ্বনির মতো পুনরুক্তি করল কুরবাশি, তারপর হাত নাড়িয়ে অধীরভাবে বলল, 'নিয়ে আয় এখানে।'

সে মুহূর্ত পর্যন্ত কুরবাশির কোনো সন্দেহ ছিল না যে মৃত্যু এড়াবার জন্য পালোয়ান তাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। কিন্তু এখন তার প্রায় নিশ্চিত ধারণা যে এই অবোধ্য লোকটা তার কানা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে। করুণা বা করুণাজাতীয় কিছুর অস্পষ্ট একটা অনুভূতি তার নিষ্ঠুর বুকে সাড়া জাগিয়েছে। পালোয়ানের দিকে যেভাবে এবার সে তাকাল তাতে ক্রোধের ভাবটা কম।

নানা নির্দেশ দিয়ে চলল পালোয়ান। এমনভাবে সেগুলো পালন করা হল যেন স্বয়ং কুরবাশির নির্দেশ।

লাঙলের ফলার মতো বানানো পাথরটা নিয়ে এল বিরাটদেহী ঘোড়সওয়ার। পালোয়ানের নির্দেশ মতো তাবিব সেটাতে লাগাল কেটলিতে তৈরি মিশেলটা। যে মন্থরগতির জন্য তাবিবের একটা হোমরা-চোমরা ভাব সেটা সে ঝেড়ে ফেলে খুব চটপট ভাবে কাজ করছে, তার আর কোনো সন্দেহ নেই পালোয়ানের সম্বন্ধে, তার বিশ্বাস মহান রহস্যের চাবিকাঠি চলে আসবে তার হাতে, সেই তাবিবের হাতে যে কুরবাশির ডাকাতদলে বিপজ্জনক আর কঠিন কাজে হয়রান হয়ে গিয়েছে।

পাথরটা নিয়ে তাবিব এমন একটা জায়গায় গেল যেখানে হাওয়া খেলে, কেননা পালোয়ান বলেছে যে পাথরটা শুকিয়ে যাওয়া চাই। ঠিক সে সময়ে তার মনে পড়ল পালোয়ান বলেছে যে, অন্ধকে দৃষ্টিদানের শক্তি যার সে নিজে অন্ধ হয়ে যাবে অন্যকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে। এটা মনে পড়াতে তাবিব এত ভয় পেয়ে গেল যে হোঁচট খেয়ে আর একটু হলে পাথরটা ফেলে দিত। কিন্তু আর একটা কথা তার মনে হল।

"আমি শুধু বড়ো লোকেদের সারাব আর এত টাকা হবে যে, যে কোনো ভিখিরি আমার জায়গায় অন্ধ হয়ে যেতে রাজি হবে..."

এটা ভেবে সে তাজা হয়ে উঠল। হাওয়া খেলে এমন একটা জায়গায় পাথরটা রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

'এরপর সব কিছু আমিই করব', বলল আহমেদ পালোয়ান। গুরুতর একটা

হাজির করেছে এমনভাবে মঞ্চে উঠল তাবিব। তার দিকে তাকিয়ে রইল পালোয়ান, কাটা হাতের রক্তপাত তখন বন্ধ হয়েছে। হাতটা কাঁধ বরাবর নামিয়ে, কুরবাশির দিকে ফিরে সসম্ভ্রমে বলল, 'যদি হুজুর অনুমতি দেন তাহলে পাথরটা না শুকোনো পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিই।'

'বোস, বোস!' তাড়াতাড়ি বলল কুরবাশি। আশপাশের লোকে তার কণ্ঠস্বরে হয়তো সদয়তার একটা ছাপ পেত, কিন্তু সে ভাঙা খেঁকী গলায় নরম সুর আনার উপায় ছিল না।

তিনজন রক্ষীর মাঝখানে উবু হয়ে বসে পালোয়ান শ্রান্তভাবে মাথা নোয়াল। হাঁটুর উপরে আঙুল কাটা হাতটা না-থাকলে মনে হত একটা চাষা অল্প জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছে, আবার খেতে বা বাগানে কাজ শুরু করবে বলে। মৃত্যু যার অনিবার্য সেই লোকটির অদ্ভুত শান্তভাব দেখে কুরবাশি অবাক, এমনকী শঙ্কিত বোধ করল।

এতদিন পর্যন্ত কুরবাশির ধারণা ছিল মানুষের মনের সমস্ত অলিগলি তার নখদর্পণে। যুদ্ধের সৈনিক, খেতের চাষী সে খুন করেছে, রক্তপাত করেছে ক্যারাভান পথের বালিতে, গ্রামের পদদলিত রাস্তায়, স্ত্রী-পুরুষের জীবন নিয়েছে, অনেক সময়ে ভেবে দ্যাখেনি পর্যন্ত তারা দোষী কী না—এভাবে হাজার-হাজার লোকের জান নিয়েছে কুরবাশি। আজকের এই প্রৌঢ় চাষীটির মতো শত-শত বন্দী দাঁড়িয়েছে তার সামনে, কিন্তু তাদের কয়েকজনকে মাত্র তার মনে আছে, কারণ মৃত্যুর আগে তাকে শাপ ও গালিগালাজ দেবার সাহস দেখিয়েছে কয়েকজন মাত্র।

আর-কোনো কারণে না-হোক, আহমেদ পালোয়ান দুর্বোধ্য এইজন্য যে সে শাপান্ত করেনি, করুণা ভিক্ষা করেনি, বুদ্ধিসংগত ভাবে, খাতির দেখিয়ে যুক্তি করেছে।

কী ধীরস্থিরভাবে বিশ্রামটা উপভোগ করছে দুর্বোধ্য মানুষটা! তা দেখে মন্ত্রণা দেবার যত উপায় কুরবাশির জানা, সব ক-টা সে ভেবে দেখল একবার, কিন্তু এমন একটার কথা মনে এল না যেটা পালোয়ানের অস্বাভাবিক প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

'শয়তানটার অনুভূতি বলে কিছু নেই। লোকটা আমার ঘোড়সওয়ার দলে যোগ দিলে একাই একশ হত।' ভাবল কুরবাশি আর রাগ ও তারিফের একটা

ভাবে তার বুকটা ভয়ে উঠল। কেননা সে জানত যে পাথরকে ভাঙা চলে — কিন্তু বাঁকানো যায় না।

দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে চিন্তার ভারি জাঁতা এভাবে চালাল কুরবাশি যতক্ষণ-না উলেম তার কাঁধের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল :

'সময় কেটে যাচ্ছে হুজুর !'

ঝিমুনো জাঁতিওয়ালার মতো গা নাড়া দিয়ে কুরবাশি হুমকির হাঁক ছাড়ল :

'হেই ! কাজ শুরু করলে হয় না ?'

'আজ্ঞে, হুজুর !' মাথা তুলে শান্তভাবে বলল পালোয়ান। 'পাথরটা, বোধ হয় শুকিয়েছে···এখানে আনুক ওটা।'

বিরাটদেহী ঘোড়সওয়ারটি তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করল। তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে পালোয়ান তেকোনা ধারালো মুখটা আস্তে-আস্তে দেখে নিল আঙুল দিয়ে।

'হুজুর !' পায়ের কাছে পাথরটা রাখতে-রাখতে সে শুরু করল। 'চিকিৎসা আরম্ভ করার আগে জিজ্ঞেস করতে চাই···'

'যে তোকে মারা হবে না, এই তো ?' বাধা দিয়ে কুরবাশি বলে উঠল। ভালো চোখটা জ্বলে উঠল অশুভ জয়ের একটা ঝিলিকে। 'সেটা সম্ভব নয়, শুনছিস ভাঁড় কোথাকার ! সেটা অসম্ভব, কেননা তোর হাতে এফেন্দির খুন লেগে আছে···'

'ঠিক বলেছেন হুজুর !' বিনীতভাবে বলল পালোয়ান, যেন কুরবাশির কথার যাথার্থ্য সে স্বীকার করছে। 'কিন্তু আপনার ডান হাত হবার আগে এফেন্দি কী ছিল বলুন।

'সে ছিল খাঁটি মুসলমান আর মুসলমান শাসকের সৈনিক !' গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বেশ ঠাটের সঙ্গে জবাব দিল কুরবাশি।

'তা, শুনেছি,' সহজভাবে মেনে নিল পালোয়ান। 'কিন্তু এও শুনেছি যে বিদেশের সেই শাসককে যখন সমুদ্রতীরের শাদা প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন, এফেন্দি স্বদেশে ফিরে যেতে চায়নি।

সতর্কভাবে মাথা নাড়াল কুরবাশি।

ঠিক আগেকার মতো সহজভাবে বলে চলল পালোয়ান. 'এ-রকমটা ঘটে তাহলে। তাহলে নিজের দেশ ছেড়ে এফেন্দি বিদেশে, আমাদের দেশে রয়ে গেল, তাই-না ? আমাদের দেশে কী করল সে ? আপনি আর জবাব দেবেন

না, আপনাকে আমিই বলছি···আপনার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চেপে এফেন্দি গ্রামে আগুন লাগাত, খুন করত, লুঠতরাজ চালাত···'

নিজের নিচু জায়গা থেকে কুরবাশির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠল পালোয়ান।

'সেজন্য আমি তার জান নিয়েছি!'

'কুত্তা! শুয়োর কোথাকার!' ভাঙা গলায় চীৎকার করে কুরবাশি ছোরার বাঁট ধরার জন্য আলথাল্লা হাতড়াতে লাগল।

'চিকিৎসার কথাটা···আপনি চিকিৎসার কথাটা ভুলে গিয়েছেন!' বাঁ দিক থেকে আর্তনাদ করে উঠল তাবিব, তার ডান দিক থেকে উলেম হলদে হাতে পালোয়ানকে দেখিয়ে ঘ্যানঘ্যানে গলায় স্বর মেলাল:

'হুজুর, আপনাকে ঠকাতে দেবেন না ওকে! দেখছেন না, বদমায়েসটা কি সহজে মরতে চায়!'

'সাচ বাত্, উলেম···তুমিও ঠিক বলেছ তাবিব'···জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে গরগর করে বলল কুরবাশি। 'কিন্তু ছুরি নিয়ে খেলার বিষয়ে কুত্তাটা যেন হুঁশিয়ার থাকে! কথাটা কানে যাচ্ছে, বেটা শয়তান?'

'যাচ্ছে, হুজুর।' আগেকার মতো, হয়তো বা আগেকার চেয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিল পালোয়ান। 'মাফ করবেন হুজুর, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার রাগ এখনো জেগে আছে কি না?'

'সেটা জানায় তোর কী দরকার?' জিজ্ঞেস না-করে পারল না কুরবাশি।

'কারণ আপনার রাগকে আমি যত-না ভয় পাই, তত ভয় পাই আপনার দয়ালুভাবকে···'

আবার কুরবাশি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস না-করে পারল না:

'বুঝলাম না···'

'শীগগিরই বুঝবেন!' বলল পালোয়ান। 'আমি আপনাকে সারাতে চাই, তাই না? তাই আমার ভয়ের কারণ আছে যে যখন আপনার কানা চোখে আলোর ফুলকি জ্বলে উঠবে, তখন কৃতজ্ঞ হয়ে আপনি আমার জান নেবেন না।'

'হুঁ, দেখছি তুই একটা বিদঘুটে ভাঁড়!' রাগত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল কুরবাশি।

'একটু সবুর করুন, হুজুর আমি এখনো শেষ করিনি···'

'বল কী বলবি, কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করিস না!'

'বেশ, হুজুর! এই দেখুন আমার আঙুল-কাটা হাত, আর এই হল এক জোড়া চোখ। চোখের আলো যখন আপনাকে দেব…'

'বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল কুরবাশি। 'তারপর?'

'আপনি আমাকে বাঁচতে দেবেন সেটা আমি চাই না…বাজারে-বাজারে যাকে ভিক্ষের অন্ন চেয়ে বেড়াতে হয় তার জীবনের কী মানে?'

'বিজ্ঞ লোকের মতো কথা বলছিস বটে,' কুরবাশি হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল:

'কিন্তু তোকে বাঁচতে দেব এ-কথাটা মনে হল কেন?'

এতক্ষণ পালোয়ান উবু হয়ে বসেছিল, এবার দাঁড়িয়ে উঠে কুরবাশির দিকে হাসি মুখে তাকাল।

'আমার সন্দ আছে, হুজুর!' বলল সে।

'না-না, তোর সন্দের কোনো কারণ নেই,' বিদ্বেষপূর্ণ ভরসার সুরে বলল কুরবাশি, 'তুই জানিস যে চিকিৎসা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে তোর জান নেব… সেজন্যই তো চিকিৎসাটা তাড়াতাড়ি সারছিস না, তাই না, ভাঁড়?'

'তা নয়, হুজুর। চিকিৎসা শুরু করতে আমি তৈয়ার, কিন্তু তার আগে আমার নিশ্চিত জানা দরকার…'

'কী জানা দরকার?'

'যে আপনি আমাকে খুন করবেন।'

'তোকে তো বলেছি…'

'শুনেছি, হুজুর…'

'তাহলে তুই কী চাস?'

'আপনার লোকদের দু-একটা কথা বলতে চাই…'

'কেন?'

'আপনাকে রাগাবার জন্য…'

'আমি তো রেগেই আছি…'

'আপনাকে আরো রাগাতে চাই…'

'আর আমার লোকদের যদি বোকা-বোকা কথা তোকে বলতে না-দিই?'

হেসে অন্য-একটা প্রশ্ন করে জবাব দিল পালোয়ান:

'আমার বোকা-বোকা কথাকে আপনি ভয় পান?'

লাল হয়ে উঠে, রক্ষীদের দিকে মাথা নাড়িয়ে চাপা গলায় এমনভাবে কুরবাশি বলল যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করছে :

'আর যদি ওদের বলি একটা বোকার মাথায় তলোয়ারগুলো শানিয়ে নে, তাহলে ?'

'আর যদি একটা কানা চোখ চিরকাল কানা থাকে তাহলে ?' জিজ্ঞেস করল পালোয়ান।

তাকিয়ায় লাফিয়ে বসে কুরবাশি তার গর্জনে ভরিয়ে দিল সমস্ত উঠোন :

'শয়তান ! যত তাড়াতাড়ি পারিস তোর নোংরা কথা সেরে নে !'

'বেশ, হুজুর !' তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বরের বেয়াড়া ভাবটা বিনীত করে কুরবাশির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ নামাল পালোয়ান।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, আমার সঙ্গে না।' গর্জে উঠে কুরবাশি হাত নাড়িয়ে অন্য লোকদের দেখাল। তারা সাগ্রহে ব্যাপারটা দেখছিল।

মাটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা লোকগুলির দিকে ফিরল পালোয়ান। অস্ত সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখ ওরা দেখল।

পরিষ্কার জোরালো গলায় পালোয়ান বলে উঠল :

'ভাই সব ! তোমরা আমাকে দেখে দেখে ভাবছ, "বোকা লোকটা নিজের সবচেয়ে বড়ো শত্রুর জন্য, হুজুরের জন্য, হাতের একটা আঙুল দিয়েছে আর এখন নিজের দৃষ্টিশক্তি দেবে।" তাতে অবাক হয়ো না। আমি তো শুধু একটা আঙুল আর দৃষ্টিশক্তি দিচ্ছি আর তোমরা নিজেদের দিয়ে দিচ্ছো যাতে দুশমনটা তোমাদের টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নিজের বাপভাইকে যখন তোমরা মারো, নিজেদের গ্রামে যখন আগুন জ্বালাও তখন নিজেদেরই তোমরা মারো। ভেবো না আমি ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছি। ওরা আমার হাড় মাংস আলাদা করুক, জাঁতাকলে গুঁড়ো করে দিক আমার হাড়, যা ইচ্ছে করুক, আমি তৈয়ার যদি আমার কথার সত্যটা তোমরা বোঝো ! আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি মরব···কিন্তু মরার আগে জানতে চাই কার খাতিরে তোমরা পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে চারদিক ঘোরো, নিজেদের ভাইদের, তোমাদেরই মতো গরিবদের ক্ষতবিক্ষত করো ? বলো আমাকে, সৎ চাষীর হাল ছেড়ে দিয়ে অসৎ রাইফেল ঘাড়ে নিয়েছ কার খাতিরে ?'

'চোপ রও, আর কথা নয়, বদমায়েস !' ক্রুদ্ধ কুরবাশি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার

করল। কিন্তু পালোয়ান তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত, আরো জোরে, আরো উচ্চকণ্ঠে বলে চলল :

'আমাদের লোকে যখন প্রতিবিপ্লবী ডাকাতদলগুলোকে একেবারে শেষ করে দেবে তখন বড়োলোকরা, ভুঁড়িপেট বে'গুলো ভয় পাবে···কিন্তু তোমাদের তো কিছু নেই, তোমাদের কীসের ভয় ?'

রাগে কুরবাশির মুখ কালো হয়ে গেল, ইশারায় সে জল্লাদকে জানাল তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে পালোয়ানকে মারতে। কিছু না-ভেবেই হুকুম পালন করল জল্লাদ। টলমল করে উঠল পালোয়ান, কিন্তু পড়ে গেল না।

তারপর কুরবাশি কাঁধের এক ঝটকায় তাবিবের হাত আর উলেমের থলথলে থাবা ছাড়িয়ে মঞ্চের কিনারায় গিয়ে একেবারে পালোয়ানের মুখে হিসিয়ে উঠল :

'তোর বকবকানি শুনেছি অনেকক্ষণ। এবার আমার কথা শোন্। আগে ভেবেছিলাম তলোয়ারের এক ঘায়ে মরবি, সেভাবে আর মরবি না, বেটা ভাঁড়, মরবি বুনো শুয়োরের দাঁতের মতো ধারালো ছুরির খোঁচায়। কিন্তু মরবার আগে তাবিব তোর গায়ের ছাল আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে নেবে, চামড়াটা লাগানো হবে ঢাকের গায়ে, আমার হাতে ঢাকের বাদ্যি তুই শুনবি, তারপর যে-ছুরিটা দিয়ে জল্লাদ তোর গলা কাটবে সেটা দেখবি। যা বলবার বলেছি। ব্যস, আর কিছু বলার নেই। বকবকানি থামিয়ে এবার নিজের কাজে লাগ!'

নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাটিটা দেবার ইশারা করল পালোয়ান। ইশারাটা লোকে বুঝল। বাটির জিনিশে পাথরটা ভিজিয়ে নিল পালোয়ান। তার অন্যান্য ইশারা কিন্তু লোকের মাথায় ঢুকল না। বোঝাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। বাপান্ত করে কুরবাশি তাকে বলল কী সে চায় কথায় বুঝিয়ে দিতে।

পালোয়ান হুকুম দিল যে খড় এনে সরু আঁটি করতে। তারপর তাবিব আর গৃহকর্তাকে নিজের কাছে ডেকে বলল :

'একটা আঁটি নাও তো কর্তা। আর হাকিম, আপনি পাথরটা ধরুন!'

তার আজ্ঞা পালন করা হল। তখন সে বুড়োকে বলল আঁটিটা জ্বালিয়ে কুরবাশির মুখের কাছে ধরতে।

'তাতে হুজুরের ভালো চোখটা খারাপ হয়ে যেতে পারে!' আপত্তি জানাল বুড়ো।

'ভালো চোখটা একটা রুমালে বেঁধে দাও তাহলে,' হুকুম দিল পালোয়ান।

চোখ বাঁধার পর তাবিব আর বুড়োকে কুরবাশির সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ দিল সে।

এবার মোমবাতিটা জ্বালানো হোক। 'দেখতে হবে আলোটা যাতে নিভে না-যায়,' বলল সে।

মোমবাতি জ্বালানো হল। দপদপে শিখার দিকে তাকাল পালোয়ান। তাবিবের দিকে ফিরে বলল :

'হাকিম পাথরের ধারালো দিকটা কানা চোখের দিকে ধরে এভাবে দোলান!'

কী করতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান। তাবিব পাথরটা কয়েকবার ছুঁড়ে লুফে নিয়ে এদিক-ওদিক দোলাতে শুরু করল।

'আস্তে, আরো আস্তে!' চেঁচিয়ে উঠল পালোয়ান। 'মা ছেলেকে যেমনভাবে দোল দেয় সেটা ভাবুন!'

মনে হল মায়ের দোলানি তাবিব কখনো দ্যাখেনি, কেননা পালোয়ান বারবার তাকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল :

'আস্তে, আস্তে, রয়ে সয়ে...'

তাবিব যতই চেষ্টা করুক, পালোয়ান চ্যাচাতেই লাগল :

'ওভাবে নয়, ওভাবে নয়! আবার শুরু করুন!'

ইতিমধ্যে খড়ের চতুর্থ আঁটিটা ধরিয়েছে বুড়ো, জ্বলন্ত খড়ের ধোঁয়ায় আরোগ্যপ্রার্থী কুরবাশির দম বন্ধ হবার জোগাড়।

শেষ পর্যন্ত তার সহ্যের সীমানা পেরিয়ে গেল। তাবিবের অপটুতায় বিরক্ত হয়ে কুরবাশি হুঙ্কার দিল :

'ওকে পাথরটা দিয়ে দাও, তাবিব! যেভাবে দোলাতে চায় নিজে দোলাক।'

আর কুরবাশির কাঁধের উপর ঝুঁকে উলেম ফিসফিস করে তার কানে কী যেন বলল। খুব সম্ভব সাবধান করল যে প্রভুর হুকুমটা বিপজ্জনক, কেননা কুরবাশি তাকে গালি দিল।

'বেটা গর্ভস্রাব আমার কী করতে পারে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল। 'জল্লাদ আর তলোয়ার হাতে দুটো লোক তাহলে আছে কেন? ওরা আরো কাছে সরে আসুক, লোকটাকে আনুক এখানে!'

ওরা পালোয়ানকে নিয়ে গেল মঞ্চে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল অসিধারীরা।

কুরবাশির সামনে নতজানু হয়ে পালোয়ান বলল :

'হুজুর! উলেমের মনে যাতে কোনো খটকা না-থাকে সেজন্য আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হোক!'

ধোঁয়ায় কাশতে-কাশতে কুরবাশি বলে উঠল, 'ওর চোখ বেঁধে দে।'

চোখ বাঁধার পর পালোয়ান বলল, 'হাকিম, আমাকে পাথরটা দিন।'

তার প্রসারিত হাতে পাথরটা ঠেলে দিয়ে বিব্রতভাবে পাশে সরে দাঁড়াল তাবিব।

'মোমবাতিটা দেখবেন, হাকিম!' বলল পালোয়ান। 'আর দেখবেন ছুঁচলো দিকটা যেন সবসময় কানা চোখের সামনে থাকে। হুজুর, কাজ শুরু করছি!'

...আস্তে-আস্তে, সমানভাবে পালোয়ান সামনে-পেছনে দোলাতে লাগল পাথরটা। দোলানিতে খড় আরো জোরে জ্বলে উঠল, ধোঁয়া উঠল ঘন আরো ঘন হয়ে, ঢেকে গেল আহমেদ পালোয়ান ও কুরবাশির মাথা। দৃষ্টিদাতার পিছনে মোমবাতির শিখা কাঁপছে, দপদপ করছে। তাবিব আর সবাই তাকিয়ে রয়েছে শিখাটার দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে নজর রেখেছে পালোয়ানের হাতের উপর।

চোখ বাঁধা সত্ত্বেও সে হাতের গতিবিধি এত নিখুঁত যে, পাথরের ছুঁচলো দিকটা সবসময় কানা চোখের সামনে রয়েছে। লক্ষ্য থেকে পাথরটা একটু সরে গেলে হুঁশিয়ারি দেবার সময় পর্যন্ত পেল না তাবিব, কারণ দৃষ্টিদাতা সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: 'আলো!' আর তখন নিমেষের জন্য সবাই তাকাল মোমবাতিটার দিকে, তাবিবও।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাথরের ছুঁচলো কোণটা ভেদ করল কুরবাশির রগ।

পরমুহূর্তে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল জল্লাদের তলোয়ার, আর পালোয়ানের মৃতদেহ পড়ে গেল মৃত কুরবাশির উপর।

তলোয়ার মোছবার সময় পর্যন্ত পেল না জল্লাদ, একটি ঘোড়সওয়ারের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটল।

প্রথম গুলির পর আর-একটা গুলি, তারপর আর-একটা। কুরবাশির সহচররা এ ওকে হত্যা করতে শুরু করল দারুণ যুদ্ধে। মাঝরাত পর্যন্ত চলল লড়াই।

মাঝরাতে বাদুড়মার্কা খুদে বুড়োর বাড়িটায় আগুন লাগল। আলোর বিরাট একটা শিখা শূন্যে উঠে আশেপাশের গ্রামকে জানিয়ে দিল মরণ ঘটেছে সেই কুরবাশির, যাকে অনেক লোক 'কানা বাঘ' বলে ডাকত।

অনুবাদ: সমর সেন

ওয়ালিদ ইখ্‌লাস্‌সি

মরা বিকেল

দেয়ালঘড়িতে বাজলো পাঁচটা, আর সেই ঢং ঢং সারা বাড়ি ভ'রে দিলো। আমার জানলা থেকে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম সোয়ালোর ঝাঁক : তারা উড়ে যাচ্ছে শহরের আকাশ দিয়ে ; হাজার-হাজার সোয়ালো, কালো-কালো কত-যে চলন্ত ফুটকি।

সন্ধ্যা, এরই মধ্যেই, একটা নতুন দিনের মধ্যে তার জায়গা দখল ক'রে নেবার জন্য তৈরি।

'আল্লাহ্‌ যেন ওদের দোয়া করেন,' আমি বললাম নানীকে। নানীর নমাজ শেষ হয়েছে ততক্ষণে।

'বিকেলের নমাজ শুরু করতে দেরি ক'রে ফেলেছিলাম,' নানী উত্তর দিলেন হালকা সুরে।

'তো কী। আরো তো বিকেল হবে।'

নানী কিন্তু আমার কথা শুনতে পাননি।

জানলার কাচে প্রকাণ্ড এক মাছি ব'সে আছে, আমি তাকিয়ে দেখলাম : মনে হ'লো মাছিটা যেন আমাকে মানছে না, অবাধ্য আর উদ্ধত, একেবারে আমার নাকের ডগায় ব'সে আছে যেন।

'এই মাছিটা সারাদিন ধ'রে আমাকে জ্বালিয়েছে,' আমি বললাম, 'আর আমি কিনা এটাকে এখনো খতম করতে পারলাম না!'

নানী কোনো উত্তর দিলেন না : তিনি ততক্ষণে আবার এক নমাজ শুরু ক'রে দিয়েছেন।

সময় কীভাবে কেটে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার ছিলো না : মাছিটাই আমার সময়ের অনেকখানি দখল ক'রে নিয়েছিলো। জানালায় টোকা মেরে-মেরে আমি তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে তাতে একচুলও নড়েনি। আমার নখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম

সেগুলো বেশ বড়ো হ'য়ে গেছে। একটা কাঁচি নিয়ে এসে আমি নখ ছাঁটতে বসলাম।

নরম অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে আকাশ। শুধু আমার নানীর নমাজ পড়ার গুনগুন ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোথাও। নানী ব'সে আছেন তাঁর ঘোড়ার চামড়ার আসনে। আর ঢং ঢং ক'রে তারপর বাজলো ছটা।

পাশের ঘর থেকে আমার ছোটো বোন এসে হাজির হ'লো।

'আজ আমরা আখরোট দেয়া কুনাফা খাবো,' সে ঘোষণা করলো।

'কুনাফা আমার ভাল্লাগে না।'

আমার বোন হেসে উঠলো। 'আজ সকালেই তো তুই বলেছিলি তুই কুনাফা খেতে চাস।'

'কুনাফা আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

আবার জানলার দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম : মাছিটা এখনো ঘুমিয়ে আছে।

নানী আমার ছোটো বোনকে আদর ক'রে বললেন : 'রেডিও চালিয়ে দে তো, তাহ'লে ফিরুজকে শুনতে পাবো।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'আমরা দুপুরবেলায় ওকে শুনেছি।' বাইরের অন্ধকার সোয়ালোগুলোকে আর দেখতে দিচ্ছে না। তাহ'লে কী হয়, আমার, তবু, ফিরুজের গলা ভালো লাগে।

'আমরা আবার ওকে শুনবো,' বললেন নানী।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমি তখন ঘুমন্ত মাছিটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছি।

হঠাৎ এক পিলে-চমকানো ভাবনা খেলে গেলো মাথায় : আমি যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে আছি, তখন যদি ওদের কেউ আমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, তখন কী হবে?

শুনতে পেলাম, আমার বোন নানীর কাছে আব্দার ধরেছে আজ সন্ধ্যেয় 'গায়ক বুলবুলে'র গল্প শুনবে ব'লে, আর নানী বলছেন, 'সে-গল্পটা তো আমরা কালই শেষ করেছি, করিনি?'

বাচ্চা মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'কাল! কাল তো ক-থ-ন শেষ হ'য়ে গেছে!'

'গায়ক বুলবুলের গল্প আর তুমি কোনোদিনও শুনতে পাবে না,' আমি আপন

মনেই ফিসফিস ক'রে বললাম, আর কেমন একটা কষ্টের ভাবে আমার ভেতরটা ভ'রে গেলো।

'আজ তোদের একটা নতুন গল্প বলবো,' নানী বললেন।

'উঁহু, আমরা নতুন গল্প চাইনে,' আমার বোন ব'লে উঠলো।

আমি বোনটিকে মাফ ক'রে দিতে চাইলাম; নানীর কোল থেকে লাফিয়ে নেমে ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; কিন্তু তবু কেমন বিরক্তও লাগলো, আমিও তো সেই পুরোনো গল্পটাই শুনতে চাইছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নানীর কথাই শুনলাম আমি, রেডিওটা চালিয়ে দিলাম, তারপর কোনো-একটা স্টেশন ধরবো ব'লে কাঁটা ঘোরাতে লাগলাম। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং ক'রে সাতটা বাজলো, একটা স্টেশন ধরতে পারলাম আমি।

আমি গলার স্বরের ওপর স্তব্ধতার পর্দা চাপিয়ে দিলাম।

'খবরটা শুনতেই দে না,' নানী আপত্তি ক'রে বললেন।

সকালের খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে আমি বললাম: 'যত বাসি পচা খবর!'

'নতুন-কিছুও তো ঘটতে পারে, বাছা,' বুড়ির গলায় হঠাৎ যেন বয়েসের ছাপ ফুটে উঠলো।

আমি কাগজ থেকে শিরোনামগুলো প'ড়ে শোনালাম: দুপুরবেলাতেও প'ড়ে শুনিয়েছি। এ-সব খবর আর আমাকে ছোঁয় না।

হঠাৎ আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু কোথায় যাবো? আমার তো যাবার কোনো জায়গা নেই, কাজেই মত পালটে ঠিক করলাম, এখানেই বরং ব'সে থাকি।

বাচ্চা মেয়েটি তার পুতুল নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'সুজানকে তুমি একটা গল্প শোনাবে?' ও জিগেশ করলো নানীর দিকে তাকিয়ে, তার চোখে কেমন একটা জেদের ভাব।

বুড়ি নানী হেসে উঠলেন।

আমি ফিরে গেলাম জানলায়: সারা আকাশ জুড়ে ঘন হ'য়ে চেপে বসেছে অন্ধকার।

হঠাৎ মনে হ'লো ঘুমন্ত মাছিটাকে চটিয়ে দিলে কেমন হয়। মাছিটার বিরুদ্ধে আর আমার রাগ হচ্ছে না, আমি তার ঔদ্ধত্য বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

'বাঃ রে, সুজানকে তুমি কোনো নতুন গল্প শোনাবে না?' আমার বোন জিগেশ করলো।

সত্যি-বলতে, কোনো গল্পই আমি জানি না। তখন হঠাৎ মনে পড়লো দুপুরবেলায় যেটা রেডিওতে শুনেছিলাম।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'তোকে আমি "ভালুক আর মৌচাক"-এর গল্পটা বলবো।'

'বাঃ রে। সে তো কবেকার কোন্ পুরোনো গল্প,' আমার বোন চেঁচিয়ে উঠলো।

কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমি আবার মাছিটাকেই নিরীক্ষন করতে লাগলাম।

'কী ওটা?' আমাকে জানলার পাশে বসতে দেখে বাচ্চা মেয়েটি এগিয়ে এলো।

'একটা মাছি—ঘুমোচ্ছে।'

'মাছি—ঘুমোচ্ছে?' ভুরু কুঁচকে বোন বললো।

'এটা বুঝি তোর নতুন গল্প?'

'ও ঘুমোচ্ছে, ক্লান্ত কিনা।'

'গল্পটা তুই সুজানকে বলবি?' ও জিগেশ করলো।

'ঠিক আছে। এই গল্পটাই না-হয় বলবো।'

আমার বোন কাছে ঘন হ'য়ে এলো।

'ও-কিসের দিকে তুমি তাকিয়ে আছো?' ও জানতে চাইলো।

'আমি মাছিটার দিকে তাকিয়ে আছি।'

একটা চেয়ারের ওপর উঠে ও মাছিটাকে ভালো করে দেখলো। তারপর জয়ীর সুরে রিনরিনে গলায় ঘোষণা করলো:

'কিন্তু ওটা তো ম'রে গেছে।'

মেয়েটি এখন ঠিক আমার সমান লম্বা হ'য়ে গেছে—দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হ'লো।

'না, ঘুমিয়ে আছে।'

'না, মরা!' আমার নিবুর্দ্ধিতায় অবাক হ'য়ে আমার বোন বললো।

আমি খুব সাবধানে জানলার পাল্লা খুললাম, তারপর আস্তে ক'রে পাখিটার গায়ে ফুঁ দিলাম: এক চিলতে কাগজের মতো সেটা প'ড়ে গেলো।

আমার মনে প'ড়ে গেলো কিছুক্ষণ আগেই ও আমার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো, আরো মনে প'ড়ে গেলো, গোড়ায় ওর ওপর আমার বেজায় রাগ হয়েছিলো, পরে কেন যেন তাকে আমার মনে ধ'রে যায়।

'তুমি কি সুজানকে "ঘুমন্ত মাছি"র গল্পটা শোনাবে না ?'

আমি ওকে কোনো উত্তর দিলাম না। আমি তখন শুনছি দেয়ালঘড়ির ঢং ঢং, আর সারা বাড়ি জুড়ে তারই ঝমঝমে প্রতিধ্বনি।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফারুক ধন্ধী

সাপের লেজে নুন

বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাবার একটা ছোট রাস্তাও আছে, আবার একটা ঘোরা রাস্তাও আছে। জলিল লম্বা রাস্তাটাই ধরল, কারণ ও যতক্ষণে ইস্কুল থেকে বেরোল, ততক্ষণে ওদের বাড়ির অন্য যে ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে তারা সবাই চলে গেছে। মিস্টার মরিসন ওকে ইস্কুলের পরে ওঁর অফিসঘরে খানিকক্ষণ আটকে রেখে কয়েকটা বই দেখাচ্ছিলেন।

"তোমার ইংরিজিটা নিয়ে কিছু তো করতে হয়," মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "চারটে বাজতে দশ মিনিটের সময়ে আমার ঘরে এস, আমরা দুজনে কিছু পড়ব।"

জলিল আপত্তি করতে চায়নি ; বাড়ি ফেরার জন্যে ওর এত তাড়া কেন তাও সে মরিসনকে বলতে চায়নি। সাধারণত ও পাঁচ-ছজন ছেলের সঙ্গে ফেরে যাদের দেশ এশিয়ায়। এটা পরিকল্পিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। সকলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরলে পথে ইস্কুলের সামনে বড় শাদা ছেলেগুলোর জটলাটাকে ওরা নির্ভয়ে পেরিয়ে যেতে পারে। ওরা ছোট রাস্তাটা ধরে ফেরে, ওদের রাস্তার শেষে শাদাদের পাড়ায় যদি দুশ্‌মনি মুখগুলোকে পেরোতে হয় তবে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললেই হল, ভিড়ের মধ্যে থাকার উষ্ণ আশ্বাসটা তাতে পাওয়া যায়। একা যদি ওদিক দিয়ে যেতে হয়, তাহলে হোয়াইট্ চ্যাপেল রোড ধরে ঘোরাপথে ফ্ল্যাটগুলোর সামনে আসতে হয়।

মিস্টার মরিসন্ বলেছিলেন, "আমি পাব্লিক লাইব্রেরি থেকে বিশেষ করে তোমার জন্যেই একটা জিনিস এনেছি, জলিল," বলে যুদ্ধবিদ্যার ওপরে একটা বই জলিলকে দেন। মিস্টার মরিসনকে কদিন আগেও বলেছিল এই ব্যাপারটায় সে উৎসাহী। মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "ছবিগুলোর দিকে অমন একদৃষ্টে চেয়ে থেকো না, খানিকটা পড়তে চেষ্টা করো।"

ও যখন মোটা বইটাকে আঁকড়ে ধরে বাড়ি ফিরল তখন ওর বাবা মিঞাসাহেব বললেন. "যাও, মুখ ধুয়ে নমাজ পড়ো।"

জলিল আপত্তি তুলে বলল, "মস্‌জিদে তো আর এক্ষুনি যাচ্ছি না।" বলে

ভেতরের যে-ঘরে ও আর ওর বোন শোয় সেদিকে এগিয়ে গেল। ওর বাবা এর মধ্যেই শাদা মসলিনের টুপি পরে তৈরি। লক্ষণ ভালো নয়, জলিল ভাবল। এর মানে হল বাবা এখন উপদেশ দেবার মেজাজে আছেন, ওকে নিয়ে পড়বেন খানিকক্ষণ। কড়া সুরে বললেন, "নমাজ শুরু করো। ধার্মিক লোকে জুম্মাবারে যতবার পারবে ততবার নমাজ পড়বে। আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের আর কেউ সহায় নেই। কার সঙ্গে বাড়ি ফিরেছ?" জলিল উত্তর দিল না, বিছানায় বসে মিস্টার মরিসনের দেওয়া বইটা খুলল। সাধারণত ও যখন বাড়ি ফেরে, তখন ওর বাবা সামনের ঘরে সেলাইকলে বসে মাইল-মাইল সেলাই করে চলেন অর্ডার দাখিল করবার জন্যে।

জলিল মিস্টার মরিসনকে গোপন কথাটা বলেছিল। কুংফু ও ব্রুস্ লীকে ওর কেন ভালো লাগে তাও বলেছিল। মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "যা ইচ্ছে পড়ো, নেহাৎ যদি চাও তো কমিকও না-হয় পড়ো।" জলিল ভাবল, উনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি, সে-ও তো আর-একধরনের পড়া তৈরি করা। ওর বন্ধু এরোল কুংফুর বিষয়ে জানে, শনিবারে ওর বাড়ি যাবার সময়ে ও বইটা নিয়ে যাবে।

জলিল পাতা ওলটাতে লাগল। ব্রুস্ লী-র পেশীগুলো যেন ফুলে উঠে ফোটো থেকে বেরিয়ে পড়ছে ; আঙুল-মেলা হাতদুটো যেন বাতাস আঁচড়িয়ে কী এক শক্তি টেনে নিচ্ছে। গায়ের লাল চিহ্নগুলো রক্তঝরা ক্ষতচিহ্নই হবে। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন নিপুণ নক্শায় খোদাই করা। আর মুখটা, জলিল ভাবল, মুখটায় সাধারণ মানুষেরই প্রবল প্রতাপ। উলটোদিকের পাতার লেখাটা জলিল পড়তে চেষ্টা করল। কথা প্রত্যেকটাই সে বুঝতে পারে, কিন্তু সব মিলে কোনো মানেতে পৌঁছতে পারল না। ছবিগুলো বলে দিতে পারে না কেমন করে সত্যি ওটা প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু একটা কাহিনী ওরা ঠিকই প্রকাশ করে। ব্রুস লী সাধারণ একজন মানুষ, হয়তো প্রথম শুরু করার সময়ে গরিবই ছিলেন। রাস্তার ছোকরাদের মতোই জামাকাপড় পরা, বয়স্ক লোকের থেকে দু-সাইজ ছোট। একটা ছবিতে তিনি শূন্যে যেন একটা হিংস্র জন্তু, পুমার মতো নিচে পড়ছেন, চারজন সন্ত্রস্ত দর্শকের ওপরে।

জলিল বিছানা ছেড়ে উঠে তাকের কাছে গিয়ে আয়না দেখল। ওর মা ঘরে ঢুকে পেতলের পানবাটাটা নিলেন, তার মধ্যে ন্যাকড়ায় ওঁর পানসুপুরি জড়ানো থাকে। "যাও, মুখ ধুয়ে এসো, আব্বা আবার ভীষণ রেগে যাবেন।"

জলিল চোখ ছুঁচলো করে শার্টের তিনটে বোতাম খুলে আয়নার দিকে তাকাল। নিজের চোয়ালের হাড়গুলো ছুঁয়ে দেখল; হ্যাঁ, অনেকটা ক্লস্ নীর মতনই বটে।

হঠাৎ ওর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এইসব মূর্তিপুজোর বই তুমি বাড়িতে আনো?" জলিল হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল; ওর বাবা বিছানা থেকে বইটা তুলে নিয়েছেন, প্রবল আপত্তির ভঙ্গিতে পাতা ওলটাচ্ছেন। মিঞাসাহেব গলায় একটা শুকনো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুললেন যেন ঘেন্না দেখাবার জন্যে থুতু জমাচ্ছেন।

"ওটা ইস্কুলের," জলিল বলল।

"এই সব আধ-ন্যাংটো অভিনেতাদের ছবি দিয়ে কে অল্প বয়সের ছেলেদের মাথা খাচ্ছে? ছোটদের এইরকম লা-পরওয়া করে তুলছে কে?" "আমাকে দাও আমি সরিয়ে রাখছি," বলে জলিল বাবার হাত থেকে নিতে গেল।

"তোমার তো কোরান পড়া উচিত, তবে আল্লাহ্‌কে আমি ধন্যবাদ দেব, যদিও তিনি আমাকে একটা নাস্তিক ছেলে দিয়েছেন। এসব চীনম্যানের কারসাজি পড়ার আগে যে-সব বই পড়লে কাজ দেয় সেগুলোই পড়লে ভালো হয়, বাবা। বাপ কথা বললে আজকাল তার জবারও দাও না। নয়?"

"প্রশ্নটা কী?" জলিল জিজ্ঞেস করল যেন বাবাকে অন্যমনস্ক রেখে বইটা নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে।

"কার সঙ্গে ইস্কুল থেকে ফিরেছ?"

"এরোল।"

"এরোল? হ্যাঁ? ঐ কালোগুলোর সঙ্গে ঘোরাফেরা ছাড়বার সময় হয়েছে। নিচের তলায় কাজিসাহেবের কাছে আরবি পড়তে শেখা উচিত।"

"কাজির ক্লাসে তো যত ছোট ছেলেরা যায়," জলিল বলল।

"নম্র হয়ে আল্লার কথা শোনা ও শেখার পক্ষে কেউ কখনোই বড় হয়ে যায় না।"

"যাই হোক, আমি তো আরবী জানি, উর্দু জানি··· আলেফ্, বে পে তে জাল, জিন, সব।"

"উর্দু যেটুকু তুমি জানো তা ঐ সব ছাইপাঁশ সিনেমা থেকে। তোমার কোনো ইসলামের জ্ঞান নেই। ঐ সব নোংরা অভিনেতা আর চীনেম্যানের ছবিওয়ালা যাচ্ছেতাই বই বাড়িতে নিয়ে আসো।"

জলিল বলল, "উনি অভিনেতা নন, উনি বাঘ।"

"একটা বাজে কুস্তিগির। বাঘ আর যাই হোক, বোকা জন্তু। আল্লার দয়ার জগতে ঠাঁই নেই ওদের; কয়েকটি তালপাতা দিয়ে তৈরি গর্তের ফাঁদে পড়ে যায়।"

বাবা যে কখন বাংলাদেশ নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবেন তা জলিল ঠিক টের পায়। এই গল্পটা ও বিশবার শুনেছে, সেই যে; ও বাঘটা মনে করত সব-পায়ে হাঁটারাস্তাই ওর থাবা দিয়ে তৈরি, আর যখন দেখল একটা বাঁদর ওর কাটা রাস্তা দিয়ে জলের গর্তের দিকে যাচ্ছে তখন অবাক হয়ে গেল। জলিল ও গল্পটার শেষটা আর শুনতে চায় না। ও ঘুরে রান্নাঘরে গিয়ে বৌদিকে জিজ্ঞেস করল দাদা কখন বাড়ি আসবে।

"ও মিটিং-এ গেছে।"

"ওরা সবসময়ে এই বাজে মিটিং করছে। এই হতভাগা দেশে ওরা আল্লাহ্‌কে ভুলেছে, মনে করে শাদা লোকগুলোর সঙ্গে লড়তে পারবে। কত শাদা লোক আছে, জানো তা?" বাবা রান্নাঘরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন। বাড়ির মেয়েরা কোনো উত্তর দিল না।

"আমি মিটিংএ যেতে চেয়েছিলাম।"

"ওরা শুধু কথাই বলবে। বাঙালিরা লম্বাই চওড়াই কথা বলতেই ভালোবাসে," বাবা বললেন।

গত সপ্তাহে একটা ব্যাপার হয়েছে। কাজ থেকে ফেরার পথে এক বাঙালির কানে ছোরা মেরেছে; যে শাদারা মেরেছিল তারা দৌড়ে পালিয়েছে। জলিলরা যেবাড়িতে থাকে সেখানকার কয়েকটা ফ্ল্যাটের লোকেরা সমস্ত পরিবারের লোকদের নিয়ে একটা মিটিং ডাকে। জলিলের দাদা খলিল গিয়ে খবর নিয়ে আসে যে তারাবাড়িটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। ছোরা মারার রাত্রে বাঙালি তরুণের দল ব্রিক্ লেনের রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়েছিল যে সব শাদারা মারধোর বা অপমান করবে তাদের দেখিয়ে দেবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। পরদিন একটা একতলার জানলা দিয়ে কে যেন একটা ইঁট ছুড়েছিল। তাই আর-একটা মিটিং ডাকা হয়; এবারে পুরো বাড়িটার সকলকে নিয়েই।

ফিরে খলিল বলল, "ওরা যদি লড়াই চায়তো লড়াই হবে।"

"ভগবানের শুভেচ্ছা জেহাদের সঙ্গে না থাকলে কি আর করবে?"

"ভগবানকে ছাড় তো" খলিল বলল, "আমরা ছাদের ওপরে ইঁট-পাথর

জড়ো করছি। যদি গুণ্ডারা আক্রমণ করতে আসে তো আমরা সকলে ওপরে উঠে লড়তে পারব।"

"সাপ যদি তোমাকে একবার কামড়ায় তো পেছন ঘুরে তো তাকে তাড়া করো না যাতে সে তোমাকে আবার কামড়াতে পারে। ছেড়ে দাও —"। মিঞা সাহেব ছেলেকে বললেন।

"কিন্তু সেটা যদি ঘুরে আবার কামড়ায় তখন কী করো ?"

"তার লেজে নুন দিয়ে দিই।"

উনি সবসময়েই ঐ ধরনের কথাই বলেন, যেন সেগুলো সব দৈব সত্য। কখনও কখনও জলিল ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে যায়। বাবার প্রবাদে বাক্যগুলোর মাথামুণ্ড সে বুঝতে পারে না। বাবা বলেন, চালের প্রত্যেক দানার উপরে যে খাবে তার নাম থাকে। কিংবা বলেন সাপের লেজে নুন দিয়ে দাও, আর সে তোমাকে জ্বালাবে না। আবার একদিন জলিল যখন আলুভাজার ওপরে নুন ছিটোতে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে নুন ছড়াচ্ছে তখন বাবা চেঁচিয়ে বললেন যে আল্লার সামনে হাজির হলে জীবনে যত কণা নুন নষ্ট করেছে তার সব কটিই চোখের পাতায় করে তুলে দিলে পর তবে বেহেশতের দরজা খুলবে। সব গাঁজা।

কিন্তু মিঞা সাহেব খুব স্পষ্ট কেজো স্বরে কথাগুলো বলেন। এ-সব জীবনের সত্য, যেমন সত্য শুক্রবারে মসজিদে যাওয়া বা বাবা বললে সেলাইকলে বসা।

যখন একটা অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিতে হবে শুধু তখনই জলিলকে কলে বসতে হয়। তখন সে ইস্কুল কামাই করে বাবা আর বৌদির সঙ্গে বসে, ওঁরা সারাদিন সামনের ঘরের কলের সামনে থাকেন। অর্ডার জরুরি হলে সেলাইকলের আওয়াজ চলে রাত পর্যন্ত। কলে সেলাই করতে জলিলের ভালো লাগে না, কিন্তু বাবাকে সে সে-কথা বলে না। মিঞাসাহেব বলেন টাকা দু-রকমের হয়, ঘামের আর জলের; জলের টাকায় একটা পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখা যায় না। খেতে হলে ঘাম ফেলতে হয়। জলিল কলে সুতো পরায়, নাইলনের গাঁটগুলো গুটিয়ে রাখে, ঘন্টায়-ঘন্টায় সেলাই-করা কাপড়গুলোকে কাটা টুকরো-গুলো থেকে আলাদা করে রাখে, দরকার হলেই চা আনে, জমা দুধ আর সিগারেট কিনতে দোকানে ছোটে।

"সোমবারে ইস্কুল কামাই করে তোমাকে এই আস্তরগুলো করে দিতে হবে," বাবা বলেন।

"শনি-রবিবারে কেন এগুলো শেষ করে রাখি না ?"

"শনিবারে আমরা কাজ করি না" মিঞাসাহেব বলেন "আর রবিবারে ক্যা-মার্কেটে গিয়ে ক-টা চেয়ার কিনতে হবে। তোমার মায়ের জন্যে ক-টা চেয়ার কিনে দিতেই হবে।" "সোমবার আমার ইস্কুলে যেতেই হবে।"

"কিসের জন্যে ?" । লেখাপড়ায় এত মনে তোমার কবে থেকে হয়েছে ?"

"তৃতীয় শ্রেণীর সব ছেলেকে একটা কুং ফু ফিল্ম দেখাচ্ছে" জলিল বলল, "এটা হল কুং ফু-স্টারশক্তির আসল কথাটা নিয়ে। মিঃ মরিসন একটা ছবি নিয়ে আসছেন, তাতে সব বোঝা যাবে।

"সবকিছু কখনোই বোঝা যাবে না," বাবা বলেন "এই সব বাজে কাজে যদি তুমিদিন কাটাও তবে তোমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে ভিখিরি কুস্তিগির হয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বোকাদের লড়াই করতে ডাকবে।"

"কাল আমি কাজ করব,একদিন আমি একশোটা আস্তর তৈরি করতে পারি।"

করে দেবে, ও মনে করল। পুরোনো বাড়িতে থাকতে তখনো একাজে একটা আনন্দ ছিল, আঙুলের ফাঁকে ছুঁচের আনাগোনা। দর্জির কাজে আঙুলগুলো খুব চটপটে হয়, কিন্তু বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আঙুলগুলো যেন যন্তর হয়ে যায়। কুং ফু ওগুলো অস্ত্র করে গড়ে নেন।

এ-সব কথা বাবা বুঝবেন না। 'কালো ড্রাগন ব্রুস্ লী'র বদলা নিল' বলে একটা ছবি দেখেছিল। নায়ক অনেকগুলো বদমায়েসের চোখ উপড়ে নিয়েছিল আর তেমনই নিষ্ঠুরভাবে অন্য অনেকের মুখ ভেঙে দিয়েছিল। শত্রুর মুখের সামনে হাতটা ঘোরাতে হয়, একটা কায়দা আছে। হাত দুটোকে শেখাতে হবে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে গুণ্ডাদের খতম করতে। একবার ওস্তাদ হয়ে গেলে পর, জলিল ভেবে রেখেছে, ও ওর ছবি তুলতে দেবে। ও ঠিক ঐরকমের বীর হতে চায়। খুব ভালো শিখলে ও মার্শাল আর্টস ও ফিল্ম ফেয়ার পত্রিকায় নিজের ছবি দেবে, এগুলো বৌদি পড়েন। ও হবে বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধবিদ্যাবীর, ওর ছবি রাজেশ খান্নার ছবির চেয়ে ভালো কাটবে, যে রাজেশ খান্নাকে বৌদি পুজো করেন। তখন ও মস্ত শাদা একটা মার্কিন গাড়ি কিনবে। কিন্তু বিখ্যাত হলে পর ফিল্মস্টারদের মতো বোম্বাইয়ের মালাবার হিলসে থাকবে না। ওর শক্তি ও অন্য কাজে খাটাবে, অনেক অন্যায়ের প্রতিকার করবে। লড়াই-করা মানুষদের মস্ত নেতা হবে।

বাবা একবার গল্প করেছিলেন কেমন করে একজন বিচক্ষণ লোক সিলেটের

দূর গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন। উনি বলেন বুড়ো দস্যুদের আত্মা সদ্যোজাত ছেলের দেহে আশ্রয় নেয় আর সাধুদের পরিবারে দেহ নিয়ে ফিরে আসে। জ্ঞান একমানুষ থেকে অন্যমানুষে সঞ্চারিত হয়, বাবা বলেন। শক্তি ভগবানের দান, তাকে শেষ করা যায় না, এ যেন একটা শিক্ষা যা শুধু পোড়া জ্বালানিই ফেলে রাখে না, তাপও রেখে যায়। জলিল ভাবতে লাগল ব্রুস লী-র আত্মা কোনো উদীয়মান তরুণের দেহে আশ্রয় নেবে কিনা। বাবার এই একটা গল্প ও বিশ্বাস করতে চায়।

গত ক-মাসে মিঞাসাহেব এমন অনেক গল্প বলেছেন। জলিল লক্ষ করেছে যত শাদাদের উপদ্রব বাড়ছে ওর বাবা ততই দার্শনিক হয়ে যাচ্ছেন। নমাজের টুপি মাথায় দিয়ে বাড়ির সকলের উদ্দেশে উনি বিড়বিড় করে বকেন। খলিল আর ওঁর কথায় কোনো কান দেয় না।

খলিল বলে গণ্ডগোল আরও বাড়বে। গরম পড়লে শাদারা খেপে উঠবে, হয়তো বা বন্দুক নিয়ে হানা দেবে। খলিলের সঙ্গীরা বলে ওরা তৈরি থাকতে চায়। কিন্তু জলিল জানে কেমন করে তৈরি থাকতে হবে তা ওরা জানে না। প্রথম কাজই হল বাড়িটাকে রক্ষা করা। এখানে পঞ্চাশটি বাঙালি পরিবার বাস করে, সবাই বাস্তুহারা। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ওরা বাড়িটাকে দখল করে ঢুকেছে। ক-টি তরুণ বাঙালি প্রথম পবিরার-গুলিকে এনে তুলেছিল। ব্রিক লেন ও তার আশেপাশে খবরটা ছড়িয়ে যায়। অন্যদের মতো জলিলের পরিবারও ওদের আত্মীয়ের বাড়ির পেছনের কামরাটা ছেড়ে নতুন জায়গায় তোশক বাসনপত্র নিয়ে এসে উঠেছিল। নতুন একেবারেই নয়, বলাই বাহুল্য, পুরোনো একটা বাড়ি যা আর কেউই চায়নি। প্রথমদিনটায় প্রচুর আনাগোনা হচ্ছিল, ভ্যানে করে পুলিস আর শাদারা এসে যে তরুণরা সব ব্যাপারটা তদারক করছিল তাদের দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে। ওরা ততদিনে পাকাপাকি বাস করতে শুরু করেছে, কিন্তু একমাস পরে গোলমাল শুরু হল। কয়েকজন বাঙালি খুব চড়া মেজাজের। তারা লড়াই, পরিবার ও আত্মীয়দের রক্ষা করা সম্বন্ধে খুব তেজি বক্তৃতা করল। জলিলের বাবা কোনো বক্তৃতা করেননি। অন্তত প্রকাশ্যে নয়। তিনি বাড়িতে খলিলের সঙ্গে তর্ক করেন।

খলিল বলত, "এ তো জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। এ-দেশে থাকতে হলে লড়াই করতেই হবে।"

খলিল কিন্তু চিত্রতারকাদের মতো চুল আঁচড়াত, ভাল জামাকাপড় পরে বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াইট চ্যাপেল্ ও ব্রিক লেনে বেরোত, ওয়েস্ট এণ্ডে যেত। খলিলও বুঝত না ওদের কী করতে হবে। ব্রিক লেনে ঘোরাফেরা করে কেউ কি শক্তিশালী হয় না, শরীর ওতে গড়ে ওঠে না, ওতে অপদার্থ শাদা-গুলোর আঁতে ভয় ঢোকে না। জলিলের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মসংযত ও একচিত্ত হবে, কারণ মিস্টার মরিসন, বলেছেন যে-কোনো ব্যাপারে সুদক্ষ হওয়া কঠিন কাজ। সব শক্তির মূলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও একচিত্ততা। কিন্তু কেমন করে সেটা হওয়া যাবে? দেয়ালে ও একশোবার চাঁটি মেরেছে, একশো গুণতে-গুণতে কারণ গুণলে ওর মন ব্যথা থেকে সরে যায়।

যখন বাড়ির ভেতরে বা বাইরের উঠোনটায় এ-বাড়ির ছোটো ছেলেদের সঙ্গে থাকবে তখন ও লাথিমারা অভ্যাস করবে। প্রত্যেকবার হাঁটুটা বেশি-বেশি তুলতে চেষ্টা করবে, পা-টা নিচে থেকে বের করে বিদ্যুদ্বেগে লাথিটা কষাবে। এখনও ও ভারটা রাখার সাধনা করছে। একদিন সফল হবে। কুং ফু ক্লাসে যাবে, ও একদিন কালো বেল্ট জিতে নেবে।

জলিল জানে এরোলও তালিম দিচ্ছে। আর এরোল নম্র হতে শিখেছে। ইস্কুলের খেলার মাঠে ও কখনোই বাহাদুরি দেখাবে না। ঘুসি বা লাথি ওঁচাবে না। কিন্তু জলিল জানে যে এরোল একাগ্র সাধনায় মুঠিটাকে শক্ত করে তুলেছে, চাইলে এক ঘুসিতে ও কাঠের তক্তা ফাটাতে পারে। ও জলিলকে দেখিয়েছে কেমন করে বাড়ানো হাতের মুঠি মুচড়ে দিতে হয়। এটা ওর একটা গোপন কথা। এ একটা শক্ত সুনিয়ন্ত্রিত ও অনায়াস সুন্দর ভঙ্গি, ঠিকমতো করতে গেলে ভালো করে শিখতে হয়। খুব ত্বরিত গতিতে করতে হয়। ঐ গতি হল আর-একটা গোপন কথা। নীরবতা আর-একটা। অতর্কিত শক্তি অনেক বেশি ভয়াবহ। পুরোহিতের মতো দেখতে হবে আর বাঘের মতো আচরণ। তবেই নির্ভর করা যায়। এরোলে বা আর কারও সামনে যে জলিল তালিম দেয় না তার আর-একটা কারণ হল ওরা তাকে দেখে হাসতে পারে। ওরা হাসলে মনটা সেঁতিয়ে যায়; তখন মুঠিটা যতই কর্কশ আর কঠিন হোক না কেন ওদের চাহনি আর হাসির কাছেই হেরে যেতে হয়। নিজের ভরসাতেই ওদের চাহনি আর হাসিকে হারিয়ে দিতে হবে।

"টুপিটা পরো, নমাজে যাচ্ছি, মিঞাসাহেব বললেন। জলিল কোট পরে

টুপিটা পকেটে নিস ; রাস্তায় সে ওটা পরে যাচ্ছেনা। বাবা আলগা পায়ে সামনে-সামনে হাঁটছেন। ওরা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুরোনো তোরণটার সামনে এল তখনও দিনের আলো আছে। বাবা বাঁ দিকে এগোলেন। ওরা শাদাদের মহল্লার পাশের রাস্তাটা দিয়ে যাবে। ছোটো ছেলেরা তখনো উঠোনে খেলছে। ওরা জঞ্জালের স্তূপের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফ্রেম-ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে নিচের তলার খালি ঘরগুলোতে আনাগোনা করছে। বাংলা আর চড়া ইংরাজি বুকনি-ভরা ওদের গলার স্বরের প্রতিধ্বনি উঠছে উঠোনটাতে। সেলাইকলের আওয়াজ, মশলাভাজার গন্ধ ভেসে আসছে খোলা দরজা দিয়ে।

"শুনছিস ?" জলিলের বাবা বললেন "ওরা রোজ কেয়ামতের দিনেও কল থামাবে না। ওদের নিজেদের মুসলমান বলা উচিত নয়। ক-টা পেনির আশ্বাসে আমাদের লোকগুলো কী হয়ে যায় দেখেছিস তো ?"

মুখে থুথু জমিয়ে ফুটপাতের ওপরে একদলা ফেললেন ! সরু বাঁধানো গলিটায় ওরা হাঁটতে লাগল, তক্তাঘেরা গুদামগুলো পেরিয়ে মসজিদের দিকে। জলিল জানে রাস্তার মোড়ের শাদা মহল্লার ছোঁড়াগুলো এ এলাকাটাকে 'পাকিল্যাণ্ড্' বলে। ঐ নোংরা কংক্রিটের ফ্ল্যাটগুলো পেরিয়ে গেলে তবে ওরা নিরাপদ হবে। তখন নতুন কংক্রিটের জায়গায় দেখা দেবে আধপোড়া ফ্যাকটরি আর বাড়ির একটা জায়গা ; বাবা যাকে বাংলায় শুয়োরের চর্বি বলেন তার জায়গায় এশিয়াবাসীদের পাড়ার চমৎকার ধনে-রসুনের গন্ধ উঠে ঘিরে থাকবে মসজিদের এলাকাকে।

জলিল ওদের দেখতে পেল আর দেখল যে বাবাও ওদের দেখেছেন : ডজন খানেক শাদা ছেলেমেয়ে ওদের এলাকা ঘিরে যে কংক্রিটের রেলিং তাই ধরে বা তার ওপরে ঝুঁকে বসে আছে। জলিলের মনে হল ওদের অন্য রাস্তায় যাওয়া উচিত ছিল। বাবার পাশাপাশি হাঁটবার জন্যে ও পা চালিয়ে দু-পা এগিয়ে এল। ওর বাবা ছোটো ছোটো দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছেন। উনি সোজা সামনের দিকে চেয়ে হাঁটছেন, ভিড়ের লোকগুলোর চোখগুলো যে ওঁদের আসার অপেক্ষায় আছে তা যেন ওঁর নজরেই আসেনি। জলিলের গলায় যেন একটা দলা আটকে গেল। এখনও ঘুরে অন্যপথে যাওয়া যায়, যদিও তাতে আরো আধ মাইল হাঁটতে হবে। কিন্তু ঠিক এইটেই ওদের করা উচিত নয়। বাবা এমন-ভাবে হেঁটে চলেছেন যেন ও কথাটা তাঁর মনেই ওঠেনি।

ওরা কাছে আসতেই ঐ দলটা নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে দিলে। চাপা আক্রোশে চুপ করে দাঁড়াল। ওদের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে জলিল ওদের পায়ের দিকে দেখল। মুখ তুলে ওদের মুখের দিকে দেখতে চাইল না পাছে তাতে ওরা চটে। আঁটো জামা কাপড়ে ও ছোটো করে ছাঁটা চুলে ঐ শাদাগুলোকে ঠাশা প্রকাণ্ড দেখাছিল।

"আল্লা পথ দেখাবেন", জলিলের বাবা চাপাস্বরে যেন নিজেকেই বললেন।

ওরা ও-দলটাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে কে ওদের পেছন থেকে বলে উঠল, "ও-ই পাক্‌-এ ম্যাক।"

"হেঁটে চল," জলিলের বাবা ওকে বললেন যেন ওদের পা-চালানোটাকে উনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যদিও ভয়ের চোটে ওদের পা খুবই হালকা চালে চলছিল। জলিল বুঝতে পারছিল, ওর বাবা ভয় পেয়েছেন। হয়তো এই বদমায়েসের দলও ওঁর ফাঁকিটা টের পেয়েছে।

"একটু সবুর করতে পারো না, না ?" একটা ছোকরা বলল, "হুড়োহুড়ি করে গিয়ে একটু বাড়তি রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, না ?" এশিয়ার লোকের উচ্চারণের (স্বরাঘাতগুলি) নকল করছে ছেলেটা।

রেলিংএর ওপর থেকে একটা মেয়ে বলল, "ছেড়ে দাও আজ, কোনোদিন এই লোকগুলো তোমাদের ওপর একহাত নেবে।"

"হাসিও না," ছেলেটা বলল, "এ-লোকগুলোর একহাত নেওয়া হল শুধু বিপদে পড়লে খাটের তলায় ঢোকা। শিগ্‌গিরই তাতেও সুবিধে করতে পারবে না।"

মিঞাসাহেব প্রায় দৌড়ুতে শুরু করেছেন।

"একেবারে জঙ্গল পর্যন্ত দৌড়ুতে হবে তোমাদের।" দলটার একজন চেঁচিয়ে ওদের পেছন থেকে বলল।

জলিলের বাবা বললেন, "দেখলি তো কোরানে কেন আমাদের মদ খেতে বারণ করেছে ?"

জলিল কোনো জবাব দিল না।

মসজিদে জলিল নমাজে মন দিতে চেষ্টা করল। তখনও বুক ঢিপঢিপ করছে। কেবলই ভাবতে লাগল ওরা কী করতে পারত। চারপাশে চেয়ে দেখল অন্য লোকেরা হাঁটু গেড়ে নমাজের সুরের তালে-তালে শরীর নোয়াচ্ছে। জলিল একটা স্বস্তি বোধ করল। এতগুলো লোক, ও ভাবল, এতগুলো লোক।

ওরা আমাদের কোথাও তাড়িয়ে দিতে পারে না। খলিল বলে শাদাগুলো ওদের ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিতে চায়, রাস্তা হাঁটতেও ওরা তখন এত ভয় পেয়ে যাবে যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাংদেশে ফিরে যাবে।

বাবার দিকে চেয়ে দেখল। ওঁর আতঙ্ক কেটে গেছে। উনি প্রশান্তভাবে নমাজে ডুবে আছেন, চোখ খুলছেন, বুঁজছেন। ওর মনে হচ্ছিল জীবন শুধু এনে দেবে একটু শাসানি, একটু অস্বস্তি। জলিল ওর বাবাকে চেনে ; ওঁর কাছে এটার কোনো গুরুত্ব নেই। হয়তো এই যারা হাঁটু গেড়ে আছে তাদের কারু কাছেই এর গুরুত্ব নেই। এই যে আতঙ্কের শাসানি তাদের জীবনের চারিদিকে উদ্যত হয়ে আছে এ যেন শীতের বরফ-পড়া ও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতোই, যেন ইংল্যাণ্ডের আর-একটা চেহারা মাত্র। বাংলাদেশের গ্রামের আকাশে চিলের মতো, মৃত্যুবাহী মেঘের মধ্যে যে-পঙ্গপাল ঝড়ের মতো এসে শস্য ধ্বংস করে যায়, তেমনই এই 'নচ্ছার' শাদাগুলো (যেমন ওরা বলে), এ-দেশের ভূদৃশ্যের মতো এও মেনে নিতে হবে। কিন্তু জলিলের কাছে এটা অন্যরকম। ছ বছর ও শাদাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ছে। ওরা যে-ভাষায় কথা বলে তার সব কটি খাঁজ ওর জানা। ওরা যে তামাশা করে তা ও বোঝে। ওদের যুক্তি-কুযুক্তি ও জানে। ওর বাবার কাছে শাদারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। ওদের মন্তব্য যেন সূর্যাস্তে গাছের ডালে কাকের ডাকের মতোই, মানে কিছুই নেই।

মস্‌জিদ থেকে বেরিয়ে জলিল দেখল ওর বাবা দেরি করছেন যাতে বাড়ির অন্যদের সঙ্গ ধরতে পারেন।

"শেয়ালকে কখনও ডরাসনে," উনি জলিলকে বলেন, "ঐ শাদাগুলো যদি আমাকে আক্রমণ করতে বা অন্যকিছু করতে আসত তো আমি আচ্ছা করে ওদের ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

"আমাদের অন্য রাস্তা ধরে যাওয়া উচিত," জলিল বলল।

"মোটেই না," বাবা বললেন, "হাঁটবার জন্যেই রাস্তা।" দৃঢ় প্রত্যয়ে উনি থুথু ফেললেন।

"ওরা যখন আমাদের অপমান করছিল তখন ওদের গায়ে থুথু ফেললেই পারতে", জলিল বলল।

"জিব শুকিয়ে গিয়েছিল, বাবা।"

পরদিন বিকেলে জলিল এরোলের বাড়িতে ছিল। এরোলের ঘরের দেয়াল জুড়ে কুং ফুর ছবি। মিস্টার মরিসন যে-বইখানা দিয়েছিলেন সেটার কথা জলিল এরোলকে বলে।

"ও হল কুংফুর বিষয়, খুব ভারি একখানা বই, ভাই, শুধু কালো কোমরবন্ধ-ওয়ালাই ওসব বুঝতে পারে। এ তো ফুটবল নয়, যা যে-কেউ বুঝতে পারবে। কুং ফু হল ভারি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, যদি একচিত্ততা তোমার না-থাকে তাহলে কিস্সু করতে পারবে না।" এরোল বলে।

জলিল যখন বাড়ি ফিরল তখন ওর বাবা আর বৌদি সেলাইকলে বসে। এমনিতে বাবা জলিলকে আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে একাই মসজিদে যান, জলিল ঘণ্টা দুই কাজ করে। আজ উনি নড়লেন না। বৌমার দিকে ফিরে বললেন জলিল এসেছে তিনি এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন। আগের সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবা বাড়ির কাউকে বলেননি।

রবিবারে জলিল বাবার সঙ্গে ডগ্ মার্কেটে গেল। খুব ভিড়। দু-পাশে পুরোনো-রদ্দি জিনিশের দোকানের মাঝখানের গলি দিয়ে লোক হাঁটছে। ঐ-সব দোকানে সবজি থেকে পুরোনো গ্রামোফোন পর্যন্ত সবই বিক্রি হয়। বাবা বেশ কয়েকটা পুরোনো মালের দোকানে ঢুঁ মেরে ক-'টা চেয়ারের খোঁজ করলেন।

একটা দোকানের সামনে বসে-থাকা মস্ত ভুঁড়িওয়ালা লোকটাকে বললেন, "চেয়ার খুঁজছি, ভালো চেয়ার।"

"কীরকম চেয়ার?"

"বসবার জন্যে।"

"ভেতরে দেখুন, দাদা, আমার অনেক চেয়ার আছে।"

বাবা ভেতরে ঢুকলেন সেখানে, তোশক, পুরোনো টেবিল, ক্যাম্বিসের চাদর আর ভাঙা আশবাব ঠাশা। স্তূপের ওপর থেকে একটা ভালো চেয়ার তুললেন।

"ওগুলোতে, আপনার সুবিধে হবে না, দাদা, ওগুলো দামি পুরোনো জিনিশ?" লোকটি বলল।

"কত?"

"বলে কী লাভ? যখন আপনি কিনবেন না?"

"আমি নেবো," মিঞাসাহেব বলেন। জলিল বুঝতে পারল, দোকানদার যে ওঁকে অপমান করতে চাইছে তা ওর বাবা বুঝতে পারছেন।

"ঠিক আছে। ধরুন বারো পাউণ্ড করে, ঠিক আছে? খুশি তো?"

মিঞাসাহেব চেয়ারটা স্তূপের ওপরে রেখে দিলেন।"

"এদিকে এসে এগুলো দেখুন, আপনাদের মতো জিনিশ। ভালো মজবুত চেয়ার, আপনার ছেলের নাতিরা স্পিটসফিল্ডে যখন ছুটে বেড়াবে তখনও টিকে থাকবে। দু-শিলিং করে।" লোকটা বলল, স্টীলের ফ্রেমে প্ল্যাস্টিক ঢাকা-দেওয়া চেয়ারগুলো এগিয়ে দিতে-দিতে বলল। চেয়ারগুলো ঝেড়ে-মুছে দিল। মিঞাসাহেব টাকা গুনে দিলেন।

"আপনাদের চিনি, দাদা, আপনারা কীরকম জিনিশ পছন্দ করেন, তাও জানি।" জলিল একটা চেয়ার নিল, ওর বাবা একটা নিলেন। ওরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল।

"ন্যায্য দামে কেমন করে জিনিশ পাওয়া যায় তা জানতে হয়। এই বেনেগুলো বেজায় ধড়িবাজ।" যখন ওরা দোকানের গণ্ডগোল থেকে বেরোচ্ছিল তখন জলিলকে ওর বাবা বললেন। জলিল জানে ওদের অপমান করা হয়েছে, ঐ লোকটা ওদের বিদ্রূপ করেছে। ফুটপাথের দিকে চোখ রেখে ও হাঁটছিল। অপমান হজম করে দুনিয়ার দিকে চোখ তুলে চাওয়া যায় না। একদিন, ও মনে ভাবল, একদিন ও প্রস্তুত হবে। সারাক্ষণ এই ভয়ে-ভয়ে পথচলা ও মেনে নেবেনা।

ওরা যখন চিক্স্যাণ্ড স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছে, বাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছে; প্রতি পদে থামতে-থামতে ও চেয়ারগুলোর বেয়াড়া ভার একহাত থেকে অন্যহাতে নিতে-নিতে, তখন জলিল দেখতে পেল দুজন যুবককে, যারা শুক্রবারের গুণ্ডাদলে ছিল। তারা ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আছে, যেমন সে-রাত্রে ছিল।

"ঐ হতভাগাগুলো ওখানে আছে," ওর বাবা বললেন। "একজন দুজন করে যখন থাকে, তখন ওরা তেমন বেপরোয়া হয় না? আমাকে কিছু বললেই আমি চেয়ারটা ওদের মাথায় ভাঙব।" বেশ সাহসভরে এখন হাঁটছেন উনি।

"মরতে মানুষের যেমন ভয়, মারতেও তেমনি হওয়া উচিত।" বলে উনি মুখে থুথু জমিয়ে ফুটপাথে ফেললেন।

আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে থুথু ফেলছ যে বড়ো?" সামনে আসতেই একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও," মিঞাসাহেব ইংরাজিতে বললেন।

"ছেড়ে দেওয়া দেখাচ্ছি তোমায়," ওরা পেরিয়ে যাবার সময়ে সামনে এসে বলল ছোকরা।

"চলে চল, ও এগোলে চেয়ারটা সামনে বাড়িয়ে ধরবি।" মিঞাসাহেব বাংলায় জলিলকে বলেন। ছেলেটা সামনে এসে পড়ল। পেছন থেকে খপ্ করে মিঞাসাহেবের কোটের কলারটা টেনে ধরল। উনি চেয়ারটা নামিয়ে রেখে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেন।

ছেলেটা লাল সোয়েটার পরে ছিল, এত এঁটে বসেছে সেটা যে ওর পেশী-গুলোকে ভয়ানক রকমের মোটা দেখাচ্ছিল। ওর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ঝিলিক খেলে গেল।

"ওহে, ঐ থুথুর দলাটা তোমাকে গিয়ে সাফ করতে হবে।"

"না, ধন্যবাদ।" জলিলের বাবা তাড়াতাড়ি বললেন ; বাংলায় জলিলকে বললেন "নে, এগিয়ে চল, তাড়াতাড়ি চল তো।"

"ওঃ, ইঙ্গিরি আসে না তেমন, না ? কী বলেছি বিলক্ষণ বুঝেছ, এখন এসে এটা সাফ্ করে যাও দেখি !"

অন্য ছেলেটা হেলতে-দুলতে এসে জলিলের বাবার সামনে খাড়া হল।

"কোথাও আর পালাতে পারছনা ওহে বাঁকাটুপি", ও বলল, "আমার দোস্ত যেমন বলেছে তেমনি থুথুটা সাফ্ করে ফ্যাল দিকিন ?" যে চেয়ারটা মিঞা-সাহেব নামিয়ে রেখেছিলেন, সেটা তুলে সে ধপ করে ফুটপাথে রাখল ; তারপরে ওটাতে বসে পড়ল।

জলিলের বাবা বললেন, "বুড়োমানুষকে কেন কষ্ট দিচ্ছো ?" মিনতি করতে শুরু করলেন যেন। হঠাৎ জলিলের মনে হল সে আর সহ্য করতে পারছে না। বসে-থাকা ছেলেটার কাছে ছুটে এসে ও চেয়ারটাকে ওর নিচে থেকে টান মারতে-মারতে বলল, "ওঠো, এটা আমাদের চেয়ার।"

"ওহে খোকা পাকি, নিজের দাঁতগুলো গিলতে সাধ গেছে নাকি ?" ছেলেটা বলল।

"ও নেহাৎ ছোটো ছেলে, একেবারে ছেলেমানুষ," ওর বাবা হাত তুলে যেন হার মানার ভঙ্গিতে বললেন। যেখানে থুথু ফেলেছিলেন সেখানে গিয়ে ফুটপাথের ওপরে জুতো ঘসতে লাগলেন।

"জিভ দিয়ে বলেছি, টেস্কো জুতো দিয়ে নয়," ছেলেটা বলল।

যে-চেয়ারটা জলিল নিয়ে যাচ্ছিল সেটা তুলে ও ছেলেটার দিকে দৌড়ে

গেল। ও তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে, হাত থেকে চেয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে, ক'-হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার পর লাফিয়ে জলিলের ওপরে পড়ে ওর দু-গালে হাতের পাঞ্জা দিয়ে চড় মারল, মারের ফাঁকে যখন জলিল ওর ওপরে এসে পড়ছিল তখন তাকে ঠেলে ফেলতে লাগল।

দাঁতে দাঁত ঘসে ছেলেটা বলল, "আমার সঙ্গে বেশি কায়দা করতে আসিসনে।" জলিল আবার ওর ওপরে পড়ল। ছেলেটা জলিলের শার্টের সামনেটা ধরে ঠেলে ধরে ওকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর জলিল যখন নিজের মুখটা চাপা দিতে চেষ্টা করছিল তখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি মারতে লাগল।

তখন ও পেছন থেকে বাবার গলা শুনতে পেল, "ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে," উনি বলছেন আর তারপরে উর্দুতে বললেন, "সর্বদর্শী আল্লার দোহাই।"

যে-ছেলেটা জলিলকে লাথি মারছিল সে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

'আ—হ্! বেজন্মা কোথাকার!' জলিল ওকে বলতে শুনল; ও ফুটপাথে ধপ করে পড়ল যেন কোনো জিনিশ সশব্দে ফেলেছে। জলিলের বাবা চেঁচিয়ে ওকে চেয়ার ফেলে রেখে দৌড়ে পালাতে বললেন। ও কোনোমতে দাঁড়িয়ে উঠে বাবার পেছনে ছুটতে লাগল। ক-সেকেণ্ড পরে অন্য ছেলেটাও ওদের পেছনে ছুটল, তারপর ফিরে সঙ্গীর কাছে গেল; সে ছেলেটা তখনও ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে চ্যাচাচ্ছে, যেন সে খুন হতে দেখেছে। জলিল ফিরল না। যতক্ষণ নিজেদের বাড়ির ভাঙা ফটকটার সামনে এল ততক্ষণ ও বা ওর বাবা থামল না।

ওরা যখন ঢুকল তখন খলিল বাড়িতে ছিল।

মা জিগেস করলেন, "চেয়ারের কী হল?" তারপর জলিলের মুখে লাল দাগ দেখে বললেন, "হা ভগবান, তোর কী হয়েছে?"

"চেয়ার পেলাম না, বাবা বললেন।" "আসবার সময়ে জলিল হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।"

"না, পড়িনি," জলিল সবাইকে চীৎকার করে বলল, "আমরা ছুটছিলাম..." বলতে যেতেই "বাবাকে মিথ্যাবাদী বোলো না" মিঞাসাহেব বললেন "ভেতরে গিয়ে মুখ ধোও।"

"কেন দৌড়ে আসছিলে?" খলিল জেদ করে জিগেস করল, "কে তাড়া করেছিল? মেরেই ফেলব তাকে।"

"আমি মারামারি করার মানুষ নই," বাবা বললেন, "যে-দিন আমার ছেলেরা

আমাকে কর্তব্য নিয়ে উপদেশ দিতে আসবে সেদিন থেকে আমি আর বাঁচতে চাই না।'

ই‍ঁদুরের মতো যদি বেঁচে থাকো তো এখনই তোমার বাঁচা ফুরিয়ে গেছে।" খলিল বলে।

"মুখে-মুখে জবাব দিও না, বাপু, কারু আঘাত লাগেনি, আমরা ভালোই আছি। আল্লাহ্ নিরাপদে আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন।"

আল্লার বিরুদ্ধে খলিল কথা বলতে চায় না। ও পেছন ঘুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চড়ে এবং অপমানে জলিলের মুখ এখনও জ্বালা করছে। কী যে হয়েছিল তা ও মাকেও বলতে পারল না। ওর মনে হল চেয়ারের চেয়ে অনেক বেশিই ওদের ওরা খোয়া গেছে; রাস্তায় হাঁটবার অধিকার খোয়া গেছে। ওদের আত্মসম্মান গেছে। যে-পাদুটো দিয়ে ওর বিপদের মুখে লাথি মরবার কথা সে-দুটো পা একে-একে চালিয়ে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে।

সেরাত্রে ও চিৎ হয়ে জেগে শুয়ে রইল, মনটা অসহায়তার রাগে জ্বলছে। বাড়ি অন্ধকার, আর সকলে ঘুমোচ্ছে। রান্নাঘরে একটা শব্দ শুনতে পেল। কল-খোলার আওয়াজ শুনল, কে যেন পা টিপেটিপে হাঁটছে, তারপর কাঠের মেঝেতে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। ও বিছনা থেকে উঠে সামনের ঘর পেরিয়ে আস্তে-আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি মারল। বাবা অন্ধকারে মেঝের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। জলিল আসতে উনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন।

"ঘুমোতে যাও," কড়া করে উনি বললেন।

বাবার কথা না-শুনে জলিল অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। রান্নাঘরের মেঝের ঢাকাটা উলটে তোলা, বাবা একটা হাতুড়ি নিয়ে একটা তক্তায় ঘা মারছেন। উনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিশফিশ করে বললেন, "দ্যাখ বেটা, চেয়ার যে কেনা হয়েছিল, বা ঐ লোকগুলো যে ইজ্জোত পাকিয়েছিল সে-ব্যাপারটা বলিসনে কাউকে, তোর মাকেও না, খলিলকেও না।"

"বলবো না," জলিল বলল। ওরা দৌড়ে পালিয়েছে; ও কাউকেই বলতে চায় না যে ওর বাবা ভিতু; বলল, "ভয় নেই, আমি বলবনা।"

পরদিন সকালে মা একটা শাদামতো পুলটিশ তৈরি করে এনে জলিলের গালে লাগিয়ে দিলেন। জলিল ওটা ধুয়ে ফেলল, চুল আঁচড়ে লম্বা ঘোরানো রাস্তা ধরে স্কুলে গেল।

স্কুলের খেলার ঘরে অন্ধকারে ছেলেরা শিস্ দিচ্ছে। বাহবা দিচ্ছে যখনই ব্রুস লী সিনেমার পর্দায় দেখা দিচ্ছে বা দেওয়াল টপকাচ্ছে, বন্দুকের গুলি এড়িয়ে যাচ্ছে বা জনা ছয়েক শত্রুকে একসঙ্গে সামলে ধরাশায়ী করছে। তারপর ছবিটা রঙিন থেকে শাদাকালো হয়ে গেল। স্যুটপরা এক ভদ্রলোক দর্শকদের সম্বোধন করে বলছেন : "এ-বার আমরা সেই পৃথিবীর দিকে দেখছি যেখানে এই আন্তর্বিশ্ব বীরেরা আছে। আমরা দেখছি কেমন করে এই খেলাটা খেলা হয়, আমরা কুং ফুর ম্যাজিক এবং মোহ দেখছি..." কড়া হাতের পাঞ্জার ঘায়ে লোকে অন্যের মাথা নামিয়ে নিচ্ছে এমন-সব ছবি দেখা গেল। রক্ত ঝরতে লাগল, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা বাহবা দিতে লাগল। শ্বেতাঙ্গটি আবার ছবির পর্দায় দেখা দিলেন। জলিল ভাবল, উনি ব্যাখ্যা করবেন, গোপন সূত্রটা বলে দেবেন। উনি যখন কথা বলছেন তখন ছবিতে দেখা গেল একটা স্টুডিওতে পেছন দিকে জিনিশপত্র গুছিয়ে রাখছে। তারপর যাকে উদ্দেশ করে শ্বেতাঙ্গটি কথা বলছিলেন সেই চীনা লোকটি যে-দেওয়ালের ওপরে বসেছিলেন সেখান থেকে লাফিয়ে নামলেন। নামবার সময়ে হাতদুটো ছড়িয়ে দিলেন। শ্বেতাঙ্গ ভাষ্যকারটি ছবিটা দর্শকদের সামনে তুলে ধরলেন।

"এ-বার তাহলে উলটোদিক থেকে দেখা যাক," উনি বললেন। ফিল্মের প্রজেক্টরের ফিল্মটি উলটোদিক থেকে দেখানো হল, লাফটাও উলটো করে দেখা গেল, যেন চীনা লোকটি লাফিয়ে দেওয়ালে উঠলেন।

জলিল নীরবে দেখল। ছবিটা স্টুডিওর অন্য একটা ঘরে গেল। একজন অভিনেতা নিজের একটা কৃত্রিম মূর্তির পাশে দাঁড়ালেন।

"দারুণ, না?" পাশের একটা ছেলে বলল।

মূর্তিটার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হল, রক্তের স্রোত বয়ে গেল। মুণ্ডুটা তুলে দর্শকদের দেখানো হল কেমন করে কলমের সাইজের একটা ক্যাপ্‌সুল্ থেকে রক্তটা ঝরানো হচ্ছে। "এ-সবই সেকেণ্ডে চব্বিশটা হারে সাধারণ ছবিতে দেখানো হয়, যে-সবটা বাস্তব জীবনে ঘটে না। ক্যামেরাটার গতি কমালে কী হয়? চীনা লোকটি অন্য অভিনেতাদের চোয়ালে লাথি মারছেন সে ছবি দেখা গেল। অতি ধীরে যেন ভেবেচিন্তে মারছেন। ছবির নির্দেশক খুচরো অভিনেতাদের দিয়ে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলছেন। আরো একটা ছবিতে সেই অভিনয়ই অবিশ্রান্তগতিতে দেখানো হল।

"অতিমানব কুং ফু দৌড়চ্ছেন, লাফ দিচ্ছেন, রেগে প্রচণ্ড বেগে ঘুষি মেরে লড়াই করছেন — এ-সবই রুপোলি পর্দার সৃষ্টি।"

সমস্ত ফিল্মটাই ঐ রকম। যখন বাতি জ্বলল আর মিস্টার মরিসন ঘরের সামনে এসে বললেন টিফিনের ছুটি দশ মিনিট বেশি দেওয়া হবে তখন জলিল এরোলের দিকে ফিরল। অন্যরা বেশিরভাগই যা দেখল সে-সম্বন্ধে উদাসীন।

"মিস্টার মরিসন যে-বইটা আমাকে দিয়েছেন তাতে আছে ব্রুস লী সত্যিই লাফিয়ে দশ ফুট উঁচু দেওয়ালে উঠতে পারেন।"

"ব্রুস লী মারা গেছেন," এরোল বলল।

"আমার মনে হয় এটা একদম বাজে," ঐ লাইনের আর — একটা ছেলে বলল "কুং ফু চীনেদের জন্যে।"

"শাদাগুলো সব মাটি করে দেয়।" এরোল বলল।

বিকেলে জলিল আর স্কুলে দেরি করল না। বাড়ি ফিরে গেল। ছিন্ন-ভিন্ন গোপন সূত্রটা সম্বন্ধে ঠিক কী ওর মনে হচ্ছে তা ও ঠিক করতে পারল না। হয়তো ছবিটা মিথ্যে বলছে, কুং ফুর সবটাই ও-রকম নয়, সবই শুধু কারসাজি নয়।

বাড়ির কাছে এসে জলিল দেখতে পেল তিনটে পুলিসের গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে। উঠোনে পুলিস, ফ্ল্যাটের অনেকে বাইরে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েরা বাচ্চারা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

ওদের ফ্ল্যাট থেকে জলিল ঝড়ের বেগে বেরোল। বাবা সেলাইকলে বসে আছেন, নাক থেকে চশমা নেমে এসেছে।

"কী হচ্ছে এখানে? আমাদের বাড়িতে পুলিস কী করছে?"

"সংসারের সব ব্যাপার তোমাকে দেখতে হবে বুঝি? তাহলে তো একলক্ষ জীবন দরকার।"

খলিল বলল, "কাল সন্ধেয় একটা শাদা ছেলেকে রাস্তার মোড়ে কে ছোরা মেরেছে।"

খলিল ওদের জানলা থেকে দেখছিল। "পুলিস খোঁজ করছে ছোটোদের কেউ রাস্তায় ছোরা বা অন্য কিছু পেয়েছে কিনা।"

ছুঁচে সুতো পরাতে-পরাতে বাবা বললে "শাদাদের ঝগড়ায় আমরা থাকতে যাই কেন?"

"শাদা কেউ ছোরাটা মারেনি," খলিল বলল, "মেরেছে কোনো বাঙালি; তারা ফুটপাথে ছোরার ফেলে এসেছে।"

"আজেবাজে বকিস না, যা মুখে আসে বলে যাস না। আমাদের যা চেয়ার দরকার সে-সবই তো বাড়িতেই আছে।" সেলাইকলে বসেই বাবা বললেন।

তারপর জলিলের দিকে ফিরে বললেন "দু—পাউণ্ড নিয়ে ব্রিক লেনে গিয়ে দর্জির কাঁচি একটা কিনে আন তো। সোজা রাস্তাটা ধরে যাস।"

অনুবাদঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য

ফারুক ধন্ধী

মেকাতে এসো

রাগ হলেই সহিদের মাথার ছোটো করে ছাঁটা চুলগুলো ঝগ্‌ড়ুটে মোরগের ঘাড়ের পালকের মতো উঠে দাঁড়াত। সহিদের সেদিন বেজায় রাগ হয়েছিল। আমরা চারজন কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরুতেই সহিদ সোজা ওর চাচার বাড়ি যেতে চাইল।

"চাচা গভনরের সঙ্গে ফয়সালা করলেন। আমি ওই শালা রসুলকে দেখে নেব। ভাড়াকরা মেয়েছেলের বাচ্চা কোথাকার! কারখানা থেকে বেরুলেই দেখে নেব।" এই বলে সহিদ ফুঁসছিল।

আমি বললাম, "ত্যাখ, রাস্তায় গণ্ডগোল করিস না। গভনর তাহলে পুলিশ ডাকবে। চল্, এখান থেকে সরে পড়ি।" তারপর মাস্টারজির বাড়ির দিকে এগোলাম। সহিদের চাচাকে আমরা মাস্টারজি বলতাম। একসময় উনি আমাদের গ্রামের ইস্কুলে পড়াতেন। সহিদ আর কথা না-বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাঁটছিল।

"আমি চাকরি যাওয়ার তোয়াক্কা রাখি না! ওই শালা ওর চাকরি রেখে দিক। আমাদের অনেক চাকরি আছে। আমার চাচাতুতো ভাইয়ের কারখানা আছে। আমি তোর জন্যেও একটা চাকরির চেষ্টা করব।" আমাদের একজন বলেছিল। সহিদ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আমরা আর কোথাও চাকরি করতে যাচ্ছি না। এই গভনরকে আগে শায়েস্তা করি। আমি যদি কিছু করব বলি তো করেই ছাড়ি। ফরিদকে তুই জিগেস কর।"

মাস্টারজি দরজা খুলতেই আমরা দাঁতে দাঁত চেপে "সালাম্-আলিকুম্" বিড়্-বিড়্ করতে-করতে ঘরে ঢুকলাম। মাস্টারজি ঠাট্টা করে বললেন, "ন্যাজ-আলিকুম-সালাম্," তারপর সহিদ কথার তুবড়ি ফোটাতে লাগল। সেই শুনে মাস্টারজি বললেন: "এক কাপ চা খাও আগে, এখুনি ট্রেন ধরছ নাকি?" কিন্তু সহিদ যখন বলল ওই বেজন্মা গভনরের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে আমাদের চাকরি গেছে, তখন মাস্টারজির গলার স্বর পালটে গেল "আগে বোসো, তারপর সবকিছু গোড়া

থেকে খুলে বলো দেখি। আর ওসব বাজে কথা গুরুজনদের সামনে ব্যবহার কোরো না।"

সহিদ লজ্জায় জিভ কেটে নিজের দু-গালে আস্তে থাপ্পড় মেরে গল্পটা শুরু করল।

আমরা সে-সময় 'নিউ ল্যাক ফ্যাশনসে' কাজ করছি। সারা বছরটাই কাজ করছিলাম শুধু অফ্‌সিজন ছাড়া। আমি সহিদ আর দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু একসঙ্গে ইস্কুল থেকে বেরিয়েছি। এক বন্ধুর ভাই আমাদের চারজনকে "নিউ ল্যাকে" নিয়ে গিয়ে ওদের বড়ো কর্তাকে বলেছিল সেলাইকলে কাজের জন্যে চারজন লোক এনেছি।

গভনর আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝেছিলেন আমরা ইস্কুল থেকে সোজা বেরিয়েছি। তার মানে নয় যে আমরা কোনো কাজ জানতাম না। আমাদের প্রত্যেকেই আব্বা আর আম্মার সঙ্গে বাড়িতে কিছু-কিছু দর্জির কাজ শিখেছিল। আর ইস্ট এণ্ডের সকলেই সেলাইকল চালাতে জানত। দশ বছর বয়স হলেই আমরা বাংলাদেশ বিমানে পাইলট হওয়ার কথা ভুলে যেতাম, আর দর্জির কাজের কথা ভাবতে শুরু করতাম। প্রথম-প্রথম অবশ্য আমাদের ইস্ত্রি করা, চা করা কি দোকান থেকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিনে আনার ফরমাশি খাটতে হত। তবে আমাদের বন্ধুর ভাই বলেছিল 'নিউ ল্যাকে' এত রাশি-রাশি কাজ জমা হয়ে আছে যে গভনর আমাদের সোজা সেলাই কল চালাতে দেবে। গোড়ার দিকে কাজ শিখছি বলে অল্প মজুরি দিচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা দিনে প্রায় দশটা জামা তৈরি করছিলাম। গভনর এক-একটা কাজের জন্য ষাট পেন্‌স করে দিচ্ছিল। এদিকে কাটা কাপড়গুলো ঘরের কোনায় আর গভনরের টেবিলের ওপর জমা হচ্ছিল।

কিছু বয়স্ক লোক আমাদের সঙ্গে একই ঘরে কাজ করত। তারা আমাদের দুগুণ এক পাউণ্ড কুড়ি পেন্‌স করে পেত। আর হিন্দি গানের তালে-তালে খুব জোরে সেলাইকল চালাত, সেই সঙ্গে কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করত।

গভনর থেকে থেকেই সহিদের সেলাইকলের পাশে দাঁড়িয়ে বলত, "তুমি এর জন্যে গাধার মাইনে পাবে। কেটে পঞ্চাশ পেন্‌স করে দেব।" প্রথমদিকে এটা ঠাট্টার মতো ছিল। কিন্তু গভনর যখন রোজই এ-কথা বলতে লাগল তখন ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। আমরা বাড়ি যেতে চাইলেই রেগে উঠত। একদিন বলেই বসল, "এমনকি একটা ছোটো ছেলেও এর চেয়ে

তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে।" সহিদ বলে উঠল, "তাহলে আমার ছোটো বোনকে নিয়ে আসব।"

গভনর লোকটা খুব খারাপ ছিল না। গায়ের চামড়া শাদা হলেও লোকটা একটু-একটু বাঙলা বুঝত। মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসাও করত। বাথরুমে যেতে চাইলেই বলত "তোমরা বাথরুমে অতক্ষণ কী কর? আমাদের কিন্তু অত সময় লাগে না।"

ষাট পেন্সের কাজ কি কেউ পঞ্চাশ পেন্সে করতে চায়। বড়োকর্তা একদিন বলল যে কাজ ঠিক সময় শেষ না-করতে পারার জন্য ওর জরিমানা হয়েছে। এই আলসে বাঙালিগুলোর জন্যেই ওর ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে। আমাদের আব্বা আর চাচারা খালির টাকার কথা ভাবে, আর আমরা কেবল মেয়েছেলের কথা ভাবি। ও আরো বলল একটা জামার মজুরি খালি পঞ্চাশ পেন্স দেবে, আর এক পয়সাও বেশি নয়। বড়োকর্তার মেজাজটা যাচ্ছেতাই। পরের দিন সকালবেলায় সবাই যখন কারখানায় ঢুকছিল ও আমাদের চারজনকে থামিয়ে দিয়ে বলল—"আজ থেকে একটা জামার মজুরি পঞ্চাশ পেন্স। বুঝলে, বাছাধনরা। যদি দিনে পঁচিশটা জামা সেলাই করতে পারো তবেই পুরোনো রেট পাবে।"

আমরা সবাই সেলাই কলে বসে গেলাম। সহিদ বলল আধ পেন্স কমালে ওর জন্যে কি ওর দাদার জন্যেও কাজ করব না। বড়কর্তা রেগে গিয়ে বলল: তোমরা কাগজপত্র নিয়ে এখান থেকে সরে পড়। তোমাদের মতো ছেলেদের রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার কাজ নেওয়া উচিত। যত ইচ্ছে সময় নিয়ে কাজ করতে পারবে।"

সেদিন কারখানার কাজের শেষে লোকটা ওর কোটের পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগ বের করে খানকয়েক নোট আমাদের চারজনের হাতে ধরিয়ে দিল। সেই সঙ্গে বলল— "গত দুদিনের টাকা জামা পিছু ষাট পেন্স দিলাম। কাল থেকে আর আসার দরকার নেই।"

পরের দিন আমরা প্রতিদিনের মতোই কাজে গেলাম। সহিদ বলেছিল সেলাইকলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু কাজ শুরু না-করতে। আমরা হাত গুটিয়ে একখানা ঘরের কারখানার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"ছেলেরা, বেরিয়ে যাও, বলছি। আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। তোমরা নতুন রেটে কাজ না-করলে, কী হবে, আজকাল অনেক লোক কাজের জন্যে ঘুরছে।" বড়োকর্তা এই বলে নিজের কাজে মন দিল। ও তখন ঘুরে-ঘুরে সেলাই-এর কাজ দেখছিল। মাঝে-মাঝে অফিসের খাতায় হিজিবিজি করে কী-সব লিখছিল।

আমরা প্রায় দু-ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। দুপুরবেলা বড়োকর্তা সাণ্ডউইচ আর বিয়ার খেতে বেরিয়ে গেল। অন্যদিন আমাদেরই একজন রাস্তার দোকান থেকে হুকুম মাফিক কিনে আনত। সহিদ তখন অন্য শ্রমিকদের বাঙলায় কিছু বলল। শ্রমিকদের একজন সহিদকে বলল যে ওরাও অল্প পয়সাতেই কাজ করতে রাজি হয়েছে। আর একটু লজ্জা পেয়ে সেলাইকলে মাথা গুঁজে কাজ করতে লাগল।

সহিদ বলত ওর বয়স ষোলো বছর হলে কী হবে কে সত্যি কথা বলে কে মিথ্যে কথা বলে ও বুঝতে পারে। ও আরো বলত, লোকগুলো পুরুষমানুষ নয়, ওদের চুড়িবালা আর শাড়ি পরে ঘরে বসে থাকা উচিত।

গভনর রসুলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রসুলকে আমরা চিনতাম। বাংলাদেশের লোক, বেশ বয়স হয়েছে। চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যেত যে লোকটা ধূর্ত। গভনর রসুলকে সহিদের কলটা দেখাতেই রসুল টুলের ওপর বসে পড়ল।

এবার সহিদ জোর গলায় বলল: "রসুল, তুমি তাহলে আমার পেটের ভাত মারতে এলে ?"

রসুলটা ভেড়ার মতো সহিদের ফেলে রাখা কাপড়টা তুলে নিয়ে সেলাই কলে চালাতে শুরু করল। সেইসঙ্গে মিন্‌মিনে গলায় উত্তর দিল: "এতটুকু একটা পুঁচকে ছেলের অত বড়ো-বড়ো কথা কিসের।"

তখন সহিদ বলল: "আমার নরম গালে তোমার শাদা দাড়ির চেয়ে অনেক বেশি আত্মসম্মান আছে। যাদের কেউ নেই তারাই শুধু পঞ্চাশ পেন্‌সে কাজ করে।"

রসুল সেলাই কল চালাতে-চালাতে বলেছিল, "আমি যা পাই তাতেই কাজ করি। তুমি যখন তিন ছেলেমেয়ের আব্বা হবে তখন শুঁড়িখানায় যাওয়া আর শাদা মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে পয়সা খরচ করা বন্ধ হয়ে যাবে।"

সহিদ গভনরকে বলেছিল "তোমার মার মত সাদা মেয়ে, বুঝলে ?"

শুনেই গভনর বলেছিল: "এবার বেরিয়ে যাও বলছি। যথেষ্ট হয়েছে।" আমি যদি সহিদকে কারখানা থেকে টেনে বের করে না-আনতাম তাহলে রসুলকে ও হয়তো ওখানেই পিটিয়ে ছাড়ত।

সহিদ চ্যাচাতে-চ্যাচাতে বেরিয়ে এল, "বাইরে বেরুলে দেখে নেব।" আর রসুল হেসেছিল।

মাস্টারজি খুব মন দিয়ে গল্পটা শুনলেন। সহিদ রাগে গজরাতে লাগল: "ওই রসুলটা একটা শূয়রের বাচ্চা!"

মাস্টারজি কোট গায়ে দিয়ে লাঞ্চের সময় আমাদের সঙ্গে কারখানায় গেলেন। অনেক শ্রমিক তখন খেতে বের হচ্ছিল। মাস্টারজি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এমনকি তিনজন বয়স্ক শ্রমিককে সেদিন সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ীতে আসতে রাজি করিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় আমরা মাস্টারজির বাড়িতে দেখা করলাম। মাস্টারজি বলেছিলেন কারখানায় আমাদের ধর্মঘট ডাকা উচিত, নাহলে গভনর খুন করে পার পেয়ে যাবে। আমরা ক্রীতদাস হতে বিলেতে আসিনি।

একজন বুড়ো শ্রমিক বলেছিল, "আমাদের কথা কেউ শুনবে না। তোমরা তো জানই বাঙালিদের স্বভাব।"

মাস্টারজি বলেছিলেন, "বাঙালিদের নামে আমার সামনে অমন কথা বোলো না। আমার দেশের লোকের সম্পর্কে বাজে কথা আমাকে বোলো না।"

সহিদ বলেছিল, "দেখুন, মাস্টারজি, দেখুন, ওই রসুলটা কেমন লোক। আমি ওকে মেরেই ফেলব।" মাস্টারজি এর উত্তরে বলেছিলেন, "তুমি রুগীকে মারবে না। রোগের জীবাণু মারবে।"

আমাদের ধর্মঘটের ব্যাপারে লোকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। পরের দিন আমরা কারখানার বাইরে বাঙলায় লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম "উপযুক্ত মজুরি দিতে হবে।"

আস্তে-আস্তে অনেক শ্রমিকই আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ফুটপাথের ওপর বেশ বড়ো একটা দল জড়ো হয়েছিল। আমরা তখন চ্যাঁচাতে শুরু করলাম। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গভনর পুলিশ ডেকে আনল। সেদিন একজন লোকও কাজে আসেনি। তারপর পুলিশ এল, খবরের কাগজের লোকেরা এল। তৃতীয়দিনে এক বুড়োমতন লোক মাস্টারজিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমরা তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। আমাদের বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধবও আমাদের সাহস জোগাতে এসেছিল। বুড়ো লোকটা বলেছিল যে ওর কাজে ফিরে যেতেই হবে।

ওর বিবিজানের অসুখ। তার ওপর ওর অনেক ধার হয়েছে। মাস্টারজি বলেছিলেন লোকটার অবস্থাটা বিবেচনা করে আমাদের ওকে কাজে ফিরে যেতে দেওয়াই উচিত। আর লোকটাকে সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত কাজ করতে যেতে দেওয়াও উচিত। যাতে ও শুক্রবারে মাইনেটা পায়। সহিদ মুখ

ভার করে গজগজ করছিল, কিন্তু মাস্টারজির সঙ্গে তর্ক করেনি। আমরা জানতাম শুক্রবারদিন কী হবে। শুক্রবারে শ্রমিকরা সে-সপ্তাহের দুদিনের মাইনে নেবার জন্যে কাজে ফিরে যেতে চাইবে। ঠিক তাই হয়েছিল। একে-একে সবাই ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করল। গভনর দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের খুব হুম্‌কি দিলেন। আমরা আর উত্তর দিই-নি। সবাই ফিরে গেলে দুপুরের পর ওখানে মাত্র আমরা চারজন ছিলাম।

ঠিক সেদিন দুপুরেই বেটী আর সিলভিয়া কারখানার দরজার মুখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দূর থেকে দেখেছিলাম দুজন শাদা মেয়ে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে অল্ডগেটের দিক থেকে আসছিল। মেয়ে দুটো আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল আমরাই ধর্মঘটের কমরেড কি না।

আমি বললাম, "এটা তো ঠিক ধর্মঘট নয়। গভনর মত না পালটানো অব্দি আমরা কাজ করব না।"

আমরা যা বললাম ওরা সব লিখে নিল। বেটী আবার আমাদের একটা ছবি তুললো। আমরা বেশ ভাল করে চুল আচড়ে দাঁড়ালাম। ওরা আমাদের প্ল্যাকার্ডটা উঁচু করে তুলে ধরতে বলল। বাঙলায় লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছবি তোলার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমরা পাশাপাশি কাঁধ ধরাধরি করে 'নিউল্যুক' সাইনের ঠিক নিচেই দাঁড়ালাম। বেটী ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় হাটু গেড়ে বসে ছবি তুলেছিল। সেইসঙ্গে রাস্তায় গাড়িগুলোর থামতে হল। বেটী এমন একটা ভাব করছিল যেন ও গাড়িওলাদের চ্যাচানি বা হর্ন কিছুই শুনতে পায়নি।

সহিদ আমাকে বাঙলায় বলল, "মেয়েটা ফাজিল, বুঝলি।" দিন কয়েক বাদে আমরা ব্রিকলেনের একটা কাফেতে বসে চা খাচ্ছিলাম। বেকার ছেলেরা সাধারণত এখানকার পাঁচ ছটা কাফেতে ঘোরাফেরা করত আর কাপের পর কাপ চা খেত। কবে কোন চাকরি পাবে সেই আশায় অপেক্ষা করত। আমরা অনেক আগে থেকেই বুঝেছিলাম যে চাকরির মরশুম শেষ হয়ে গেছে। এখন অভিজ্ঞ লোকও কাজ পাচ্ছে না। বেটী কিন্তু কাফেতে ঢুকেই আমাদের চিনতে পারল। ছবি তোলার দিন বেটী জিনস, চামড়ার কোট আর সোয়েটার পরেছিল। সোয়েটারের ওপর কালো মুঠো করা হাতের ছবি। আজকে ও দিব্যি দেখতে একটা জামা পরে এসেছে। মাথার চুলগুলো শ্যাম্পু করে আঁচড়ানো।

বেটী সহিদকে বলল, "আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। আমরা তোমাদের বিষয়ে দারুণ লিখেছি।"

তারপর টেবিলের ওপর এক পাঁজা খবরের কাগজ রেখে বেটী একটা কাগজের পাতা ওলটাতে লাগল।

শাদা মেয়েরা এই কাফেতে খুব কমই আসত, এলেও ওদের পুরুষদের নিয়ে আসত। কিছু বাজে মেয়েমানুষ অবশ্য কাফেতে সারা দিন বসে থাকত। অনেক পুরুষরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করত, আর পয়সা দিলে মেয়েগুলো পুরুষদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেও রাজি হত! বাঙালি মেয়েরা কখনোই কাফেতে আসত না, তবে কিছু উগণ্ডার ভারতীয় ছেলেমেয়েরা আসত। আর আসত সাজ-গোজ করা পাঞ্জাবি মেয়েরা। তাদের ছেলেবন্ধু থাকলে বাড়িতে আপত্তি করত না। ওরা ওদের ছেলেবন্ধুর সঙ্গে কাফেতে আসত। ওরা সব ভালো-জাতের মেয়ে, কেউ ওদের নিয়ে বাজে কথা বলতে সাহস পেত না। বেটীও খুব ভালো মেয়ে—ওর ইংরিজি উচ্চারণ শুনেই সেটা বেশ বোঝা যেত। কিন্তু অন্য শাদা মেয়েদের মতো বেটী আদবকায়দা জানত না। কোথায় যেতে হয় কোথায় না-যেতে হয় সে কিছুই জানত না। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেত, কেউ ওকে কিছু বলত না।

আমরা বেটীকে অসম্মান করতে চাইনি, তাই ওকে আলাদা টেবিলে বসে কফি খেতে বলেছিলাম। আমাদের সঙ্গে যে-ছেলেরা বসত, তারা বেটীর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বিচ্ছিরি করে হাসছিল। ছেলেগুলো একেবারে থার্ডক্লাশ ছেলে। কোনো কম্মের নয়, হাড় বজ্জাত! আমরা ওদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ওরা আমাদের বোঝাচ্ছিল কেমন করে পুরোনো গাড়ি বেচে কিনে পয়সা রোজগার করা যায়। বেটী কিন্তু ঠেশাঠেশি করে আমাদের টেবিলেই বসল। কাগজে আমাদের ছবি দেখলাম। কাগজে লিখেছে "শ্রমিকদের ঘামেভেজা কারখানায় কালোপায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" সহিদ লেখাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। বেটীকে সেটা পড়ে বুঝিয়ে দিতে বলল।

সহিদ বলেছিল, "আমাদের কারখানায় কোনো কালো লোক নেই। সবই বাঙালি।"

বেটী তখন বুঝিয়ে বলল, "কালো পা মানে যারা শ্রমিকদের আক্রমণ করে। যারা শ্রমিকদের শত্রু।"

সহিদ বলল, "আমাকে কেউ আক্রমণ করলে আমি তাকে এক ঘুষি মারব।"

কাফের অন্য লোকদেরও খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সবাই কাগজটার কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। লোকের হাতে-হাতে কাগজটা ঘুরছিল।

আমি বেটীকে বললাম ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। বেটী বলেছিল সেটা খুবই লজ্জার কথা।

সহিদ বলল, "আমার লজ্জা করছে না।"

বেটী খবরের কাগজে কাজ করে আর পাঁচ পেন্‌সে কাগজটা যে-কোনো লোককেই বিক্রি করতে চাইছিল।

বেটী সহিদকে ডেকে বলেছিল, "আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তোমাদের ঘামেভেজা কারখানার সব খবর দিয়ে একটা গল্প চাই।"

আমি বলেছিলাম, "আমরা বেশি গল্প জানি না। শুধু বাঙলা গল্প জানি।"

বেটী বলেছিল, "তোমাদের ঘামেভেজা কারখানার গল্প, নিউ ল্যাকের গল্প।" সহিদ বুঝতে পারেনি দেখে বেটী বলল, "তোমাদের কারখানাকে আমরা ঘামেভেজা কারখানা বলি। তোমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কারখানাটা তৈরি হয়েছে।"

বেটী আমাদের সব কিছু বোঝাবার জন্য খুব ব্যস্ত হচ্ছিল।

সহিদ বলেছিল, "ঘামলেই আমি চান করি। আমি ইংরেজদের মতো নই।"

বেটী তাই শুনে বলল "তুমি আমার কথা বুঝতে পারো নি। এখানকার সব কারখানাই ঘামেভেজা। তার ওপর নোংরা আর ঘিঞ্জি। পুরো এলাকাটাই নোংরা আর ঘিঞ্জি।"

আমি চটে গিয়ে বলেছিলাম, "আমার চাচাতুতোভাইয়ের কারখানাটা একবার দেখে এসো। খুব পরিষ্কার।"

"তোমার ঠাট্টা রাখো। আমি অনেক কটা কারখানাই দেখেছি।" বেটী বলেছিল।

সহিদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল "ও মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করে না।"

কাফের থেকে বেরিয়ে আমরা সহিদের বাড়ি গেলাম। সহিদ বাড়িতে কাগজগুলোর কথা বলতে বারণ করেছিল। সহিদ কাগজগুলো খুব শক্ত করে পাকিয়ে ওর জামার তলায় ঢেকে রেখেছিল। সহিদ বলেছিল ওর আব্বা কাগজগুলো দেখলেই বলবে ও বাঙালিদের নাম খারাপ করছে। আমরা সারা সন্ধেটা সহিদের বাড়িতে বসে টেলিভিশন দেখলাম। চাকরি না-থাকার জন্যে আমরা এই এক ধরনের মেজাজে দিন কাটাতাম। কোনো-কোনো দিন কমার্শিয়াল রোডে সিনেমা দেখতে যেতাম। সিনেমা থেকে ফিরে আবার টেলিভিশন দেখতাম। আর হাতে পয়সা থাকলে ওয়েস্ট এণ্ডে চলে যেতাম।

অনেক ছেলেই ওয়েস্ট এণ্ডে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলত। কেউ-বা হয়তো একটা কাফেতে গিয়ে শুধু এক কাপ চা খেয়েছিল, অথচ আমাদের কাছে বলত কোনো ক্যাসিনো'তে জুয়া খেলে পঞ্চাশ পাউণ্ড পেয়েছি। কেউ বলত, লেস্টার স্কোয়ারে এক মস্ত নাচঘরে দুজন ভীষণ সুন্দরী ভালোঘরের শাদা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মেয়েদুটোর নাকি ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তার চুলের কেয়ারি দেখে। ছেলেটা আরো বলেছিল ও নাকি ওদের সঙ্গে যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ইস্কুলে থাকতে আমরা এইসব গল্প বিশ্বাস করতাম আর অপেক্ষা করতাম কবে যে আমাদের দিন আসবে। আমরাও নাচতে যাব আর মেয়েবন্ধু জোগাড় করব। যত দিন যায় লোকে শেখে। সহিদ আর আমি যেদিন ওয়েস্ট এণ্ডে গেলাম, আমাদেরও এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার হল। কেউ বিশেষ আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি। কেবল মারামারি করার ধান্ধায় দু-একজন যেচে ভাব জমাতে এসেছিল। আমরা বাসে করে ওয়েস্ট এণ্ডে যেতাম। মেশিনে বল খেলতাম। কোনো-কোনো দিন কুৎসিত সব সিনেমা দেখতাম। তারপর আইসক্রীম খেয়ে শেষ টিউব ট্রেন নিয়ে অল্ডগেটে ফিরতাম। পয়সা ফুরিয়ে গেলে হেঁটেই বাড়ি ফিরতাম—প্রথমে হাঁটতাম টেমস্ নদীর ধার দিয়ে, তারপর 'সিটী'র পাথরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে।

আমাদের ভবিষ্যত বলতে কিছুই ছিল না। আমরা একেবারে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরছিলাম। বেটী আমাদের খুঁজে বের না-করা পর্যন্ত সহিদ অন্তত খুবই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন রাস্তায় সহিদের বেটীর সঙ্গে দেখা হল। সঙ্গে-সঙ্গেই ও আমাকে নিয়ে বেটীর বাড়ি গিয়ে দেখা করার জন্যে দিন ঠিক করেছিল।

শুনে আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "কীরে, তোর তো একটা ব্যাবস্থা হয়ে গেল।"

তাই শুনে সহিদ তেড়ে এল, "মেয়েটা খুব ভালো, লেখাপড়া শিখেছে, তোর মতে নয়।"

আমি বললাম, "মেয়েটার বাবা আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দেবে।"

সহিদ একটু ভেবে বলল, "এ-সব মেয়েদের বাবা থাকে না।"

"তাহলে ওর দাদারা—" আমি জবাব দিলাম।

সহিদ বলল, "চুপ কর্। কথা না-বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চল্।"

পরের দিন আমরা বেটীর বাড়িতে গেলাম। বেটীর ঘরটা আমাদের অদ্ভুত লেগেছিল। আমরা সবাই মেঝেতে বসলাম। ওর একটা সোফা পর্যন্ত ছিল না। বিছানা বলতে গ্রামের লোকেদের মতো মেঝেতে একটা তোষক ফেলা। সারা ঘরে রাশি-রাশি বই ছড়ানো। যারাই ওর ঘরে আসছিল হয় মেঝেতে বসছিল, নয় কুশনের ওপর বসছিল—বইখাতা, চায়ের মগ আর ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে। এমনকি আলোটা পর্যন্ত একটা কাগজের বাটীতে সিলিং, থেকে মেঝে অব্দি ঝুলছিল। আর রঙিন মোমবাতির মোম সব জায়গায় ছড়ানো।

বেটী আমাদের বলেছিল ও অনুবাদক। কিছু রাশিয়ান আর ফরাশি বই দেখিয়েছিল। সহিদ ওকে রাশিয়ান আর ফরাশিতে কিছু বলতে বলল। বেটী কিছু বলতেই আমরা হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম এর মানে কী। ও বলেছিল, "এর মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি।" আমরা সবাই আবার হেসে উঠলাম। বেটী বুঝতে পেরেছিল যে সহিদ ভাবছে বেটী বুঝি ওকেই কথাগুলো বলেছে। তাই বেটী বলল, "যে-কোনো ভাষাতেই এই কথাগুলো বলাই সবচেয়ে সোজা।" তারপর আমি বাঙলায় বললাম। সহিদ সিনেমার ভঙ্গিতে উর্দুতে বলল। বেটী উর্দুটা বলার চেষ্টা করেছিল।

এরপর আমরা যতবারই বেটীর ওখানে গেলাম ও শুধু ধর্মঘটের কথাই জিগেস করেছিল। অথচ প্রথমবারের পর আমাদের আর নতুন কিছুই বলার ছিল না।

বেটী আমাদের বোঝাচ্ছিল আমরা শুধু বাঙালিই নই, আমরা এখানকার শ্রমিকশ্রেণীরও অংশ। তাই আমাদের নিজেদের শুধু বাঙালি মনে করার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম আমি চিরকাল বাঙালিই থাকব। সহিদ আমাকে বলেছিল আমি বেটী কি বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারি নি।

আমি আবার বলেছিলাম, "শ্রমিক শ্রেণীর লোকরা থার্ডক্লাশের লোক।" বেটী তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে এ-সব আমরা খবরের কাগজ পড়ে শিখেছি। আর খবরের কাগজগুলো শ্রমিকদের বিপক্ষে কথা বলে।

বেটী সবসময়েই আমাদের এইসব কথা বোঝাতে ভালোবাসত। ও খুব আস্তে-আস্তে কথা বলত, তাই আমাদের আর "আবার বলো" বলতে হত না। মনে হত সহিদ বেটীর গলার স্বর শুনতেই খুব ভালোবাসত। যদিও বেটীর অর্ধেক কথার মানে সহিদ বুঝতে পারত না।

সহিদ যেতে চাইত বলেই আমি ওর সঙ্গে বেটীর কাছে যেতাম। বেটী বলত আমরা ওকে এশিয়ানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বলেছি। এই বলে ও আমাদের কাছে ওর রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলতে শুরু করল। ও একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেটা গুপ্ত দল নয়, যে-কেউ তাতে যোগ দিতে পারত।

সহিদ জিজ্ঞাসা করেছিল, "বেটী, তুমি কমিউনিস্ট ?" বেটী জবাব দিয়েছিল, আসলে আমি হচ্ছি সোসালিস্ট। সব শ্রমিকদেরই সোসালিস্ট আর ট্রেড ইউ-নিয়নিস্ট হওয়া দরকার। এভাবেই শুধু শ্রমিকরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কমিউনিজম্ আসবে এর পরে।"

আমি বললাম,"কমিউনিস্টরা কোনো কাজের নয়। ওরা ভারতবর্ষে রেলগাড়িতে বোমা ফ্যালে।"

সহিদ রেগে গিয়ে বলেছিল, "তুই একটা উজবুক। তুই তো জানিস মৌলানা ভাসানি কমিউনিস্ট ছিলেন। উনি কি কখনো ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছিলেন ?"

"উনি তো সাধু ছিলেন।"

"তুই একটা আস্ত বোকা। মাস্টারজি বলেছেন উনি কমিউনিস্ট ছিলেন।"

সহিদ মিটিংএ যেতে রাজি শুনে বেটী খুব খুশী হয়েছিল। সহিদ আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বেটীর হালকা ছাই রঙের চোখ দেখে সহিদ বলেছিল ওর চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মতো। শুনে বেটী জানতে চেয়েছিল আমরা বিড়ালকে সুন্দর দেখতে মনে করি কি-না।

সহিদ বলেছিল ওর মতে বিড়ালরা সত্যি খুব সুন্দর দেখতে। আর ওরা বড়ো ইঁদুর ধরতে পারে।

আমাদের সঙ্গে একা থাকলে বেটী অনেক কথা বলত, অথচ মিংটিএ কিছুই কথা বলত না। প্রথমবার যখন বেটী আমাদের মিটিংএ নিয়ে গিয়েছিল, মিটিংটা একটা বাড়িতে হয়েছিল। হিপিদের মত বাউণ্ডুলে লোকরা সেই লাইনের সব বাড়িগুলোই দখল করেছিল। প্রত্যেক মিটিংএ জনা বারো লোক আসত। ওদের নেতা একজন দাঁড়িওলা ভদ্র লোক। উনি কখনোই সবার আগে বলতে শুরু করতেন না। সাধারণত কেউ একজন ওঁকে শুরু করিয়ে দিত। সহিদ জানতে চেয়েছিল উনি ওদের সভাপতি কি না। বেটী বলেছিল ওদের সভাপতি থাকে না, ভদ্রলোক খুব বুদ্ধিমান, আর দলের জন্যে অনেক কাজ করেন। প্রথমবার উনি বেটীকে নিউল্যাকের ধর্মঘটের কথা বলতে বললেন। বেটী যা বলেছিল তাতে আমরাও এক মত ছিলাম। তারপর

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরে সোজা বললেন ধর্মঘটে জিততে হলে আমাদের ইউনিয়ন গড়া উচিত। আর একজন বলেছিল যে আমরা আগে বাঙালিদের সঙ্গে ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য কথা বলি। তারপর নিউল্যাকে গিয়ে সেখানকার প্রত্যেক শ্রমিককেই ইউনিয়নে যোগ দিতে বলি। ঘরের প্রত্যেকেই বলল তাই ঠিক, বেটীও তাতে একমত। বেটীর এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। ফেরার রাস্তায় সহিদ মুখটা ভার করে ছিল আর বলেছিল ও বাঙালিদের একটুও বিশ্বাস করে না। বাঙালিরা কিছুতে যোগ দেওয়ার জন্য এক পয়সাও খরচ করবে না। তার ওপর ওদের নেতা ওই দাঁড়িওলা লোকটাকেও এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না। আমি বলেছিলাম আমি কিছুতেই 'নিউল্যাকে' ফিরে যাব না। এমনকি একটা কোটের জন্যে হাজার পাউণ্ড দিলেও না।

পরের দিন যখন বেটীর বাড়িতে গেলাম, সেই দাঁড়িওলা ভদ্রলোকও এসেছিলেন। পরনে তাঁর চেক প্যাণ্ট। বেটী অন্যদিনের মতো আমাদের সঙ্গে অত গল্প করল না। তাতে সহিদও বেশ হতাশ হয়েছিল। তার বদলে বেটী বলল ওদের পরিকল্পনা হল যে 'নিউল্যাকে'র সমস্ত শ্রমিকদের ওদের দলে ঢোকাতে। আর আমরা বাঙালি বলেই ওরা আমাদের চায়। তারপর দাঁড়িওলা ভদ্রলোক ঘরের ভিতর পায়চারি করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সহিদ শুনতে চাইছিল না। বলেছিল ওর আমার জন্য ওকে একবার হেসেল স্টিটে যেতে হবে। বেটী তাও বলেছিল আমাদের বক্তৃতাটা শোনা উচিত। বক্তৃতার শেষে ওকেও কেনাকাটা করতে বাজারে যেতে হবে। ওদের নেতা বলেছিলেন আমরা শুধু 'নিউল্যাকে'র ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছি না, আমরা পুরো একটা 'সিস্টেমের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। পুলিশও এই ম্যানেজারের সপক্ষে, সরকারও তাই, এমনকি বাংলাদেশ সরকারও 'নিউল্যাকে'র ম্যানেজারের পক্ষে।

সহিদ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি চীনদেশকে পছন্দ করেন?"

সহিদ কথার মাঝখানে প্রশ্ন করাতে ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "চীনের সঙ্গে আমাদের থিওরিটিক্যাল মতভেদ আছে।"

সহিদ তা সত্ত্বেও বলে চলেছিল, "আপনি তাহলে চীনদেশ পছন্দ করেন না। আমার চাচা কিন্তু চীনের পক্ষে।"

"আমরা চীনের সমাজবাদী রাজতন্ত্রবাদের (Social imperalism) সঙ্গে একমত নই। দেখলে না, ওরা চিলিতে কী কাণ্ড করল।"

সহিদ সে-বিষয়ে কিছু জানত না। শুধু বলল ওর চাচার কাছে চীনের

অনেক বই আছে। এঘরে যত বই আছে তার চেয়েও বেশী। তবে বইগুলো সবই বাংলাদেশে পড়ে আছে। ও চাইলে ওর চাচা ওকে কিছু বই ধরে দিতেন। বইগুলো পড়ে ও হয়তো কিছু বুঝতে পারত। সহিদ হার মেনে ভদ্রলোককে এইসব বলেছিল। ভদ্রলোক শুধু বেটীর দিকে ফিরে বলেছিলেন "এ ভাবে কি কোনো কাজ হয় ? এর উত্তরই বা আমি কি দেব।"

বেটী দেখতে পেল আমার অস্বস্তি লাগছে আর সহিদেরও ভদ্রলোকের ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

তারপর খানিকক্ষণের জন্যে সবাই চুপ, তাই সহিদ আর আমি উঠে পড়লাম। বেটী আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, "রজার একটুতেই অধৈর্য্য হয়ে যায়, ও কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। আমাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেই তুমি ওর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।"

তারপর বেটী এগিয়ে এসে সহিদের হাতটা চেপে ধরেছিল। ও আগে কোনোদিন এ-রকম করেনি। সহিদের দিকে হেসে বোঝাতে চেয়েছিল যে ও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সঙ্গে বসে কফি খেতে চায় আর রজারের সঙ্গে এ-রকম গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়াতে ও খুবই দুঃখিত হয়েছিল।

তারপর বেটী বলেছিল "এরপরের মিটিংএ তোমাদের আসতেই হবে। সেটা খুব দরকারি মিটিং।

"আমরা এরমধ্যে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। সেই সঙ্গে সব থিওরিগুলো বোঝার জন্যে তোমাদের একট ট্রেনিং দেব। আমি সত্যি-সত্যি চাই যে তোমরা আমাদের দলটাতে বেশ ভালোমতো যোগ দাও।" সেই সঙ্গে বেটী একটু চোখ টিপে হেসেছিল।

চলে আসার সময় সহিদকে হঠাৎ খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছিল। বেটী যে হাতটা ধরেছিল সহিদ সেটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকল—যেন ও বেটীর হাতের সুগন্ধটাকে ধরে রাখতে চাইছিল। আমি কিছু বললাম না। কিছু বলারও ছিল না।

আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম আমরা কিছু আজেবাজে শাদা মেয়েকে চিনতাম, কিন্তু কখনো তাদের বাড়িতে যেতাম না। ওদের সঙ্গে কাফতে দেখা করতাম। আর 'জুক বক্সে' হিন্দি গান শুনতাম। 'কভি-কভি' কিংবা সে-সময়কার কোনো চলতি গান। কোনো-কোনো দিন যদি লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারতাম তবে ওরা আমাদের চুমু খেতে দিত। বেটীর মতো কোনো মেয়ের সঙ্গে আমাদের চেনা ছিল না।

সহিদ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "বেটীর বন্ধু ওই সিল্‌ভিয়াকে তোর ভালো লাগে ?" আমার সহিদের কথাটা ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিল সহিদ যেন আমাকে ওর কাছে সিল্‌ভিয়ার হাত পাততে বলছে।

পরের মিটিংটাতে বেটী আমাদের সঙ্গে বসেনি। ও রজারের পাশেই বসেছিল আর একটা বক্তৃতা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বেটী উঠে দাঁড়িয়ে "ন্যাশনাল ফ্রন্টে"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছিল। 'জু' আর 'এশিয়ান'দের বিষয়েও কিছু বলেছিল। বেটী আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় "বাঙালি" বলেই আমাদের উল্লেখ করত। কিন্তু বক্তৃতার সময় ও 'এশিয়ান' শব্দটা ব্যবহার করত। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'কে রাস্তায় কাগজ বিক্রি করার জন্যে বেটী যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছিল। বেটীকে মুখ খারাপ করতে দেখে সবাই খুব হেসেছিল। এক ঘর লোকের সামনে অমন গালাগাল দেওয়ার ক্ষমতা দেখে সহিদের যেন বেটীর ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

সহিদ আমাকে বলেছিল বেটীর মতো মেয়েরা মুখ খারাপ করলে তাতে দোষ নেই। এতে ওদের পরিবারের নাম খারাপ হয় না। এতে শুধু এইটুকু বোঝা যায়—যে-সব পাজি লোক 'এশিয়ান'দের আক্রমণ করে বেটীর তাদের ওপর অসম্ভব রাগ।

মিটিংএর পর সহিদ বেটীর বাড়িতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বেটী রাজি হয়নি। বেটী সামনের শনিবারে মিটিং-এর আগে সহিদকে একবার অবশ্যই আসতে বলেছিল। সহিদ আমাকে বলেছিল এটা এক ধরনের ইশারা। তাই এবার আমার ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। বেটী নাকি ওকে একাই যেতে বলেছে। আমি সবই বুঝলাম।

পরপর তিনদিন আমার সহিদের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম তাড়াতাড়ি কিছু পয়সা কামাবার জন্যে এক বন্ধুর কারখানায় কাজ করছে। শনিবারে মিটিংটা দুটোর সময় শুরু হওয়ার কথা। আমি আর যেতে চাইলাম না। সহিদ আমার ভাইয়ের মতো। সবসময় ওর যাতে সুবিধে হয় সেটাই দেখতাম। তাই "কাবাব মে হাড্ডি" হতে চাইলাম না। মানে সহিদের পথের কাঁটা হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

সকাল দাশটা থেকে আমি রোজকার মতো কাফেতেই বসে ছিলাম। এগারোটার সময় সহিদ এল, ওর মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছিল। গায়ে নতুন নীল পুরু ডোরা কাটা স্যুট। নতুন সার্টের বিরাট কলারটা জ্যাকেটের চওড়া বোতামের পটিটাকে ঢেকে দিয়েছিল। ওর ভ্যাবলার মতো মুখের চেহারা দেখেই

আমি বলে দিতে পারছিলাম ও যেমন ভেবেছিল সেইমতো কিছু ঘটেনি। ওর ডান ব্যাগের তলায় একতাড়া খবরের কাগজ।

কাফের চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা, তারপর বলল, "আমার সঙ্গে আয় একটু।" কাফের ম্যানেজার ঠাট্টা করে বলল "তোমার বিয়ে নাকি ?"

"বিয়ে করতে যাব কেন। আমি তোমার মেয়েবৌকে যখন বিনা পয়সায় পেতে পারি।" এই বলে সহিদ বেরিয়ে এল।

আমি বললাম, "এত তাড়া কিসের, যাচ্ছিস্ কোথায় ?"

কাগজের গাদাটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—

"ওরা আমাকে এগুলো দিল যে।"

আমি বললাম, "তোর আবার ছবি তোলা হল ?"

সহিদের তখন নষ্ট করারমত সময় ছিল না। ও বলেছিল, "আমাকে এগুলো 'এশিয়ান'দের কাছে বিক্রি করতে হবে।"

"বেটী কি ওখানে ছিল না ?"

"বেটী ছিল, ওরা সবাই ছিল। আমাকে মিটিংএর আগে ডেকে সবাইকে বলল আমি ওদের দলের কাজে সাহায্য করতে চাই। শনিবার মিটিংএর আগে সবাই ওর বাড়িতে জমায়েত হয় কাগজ বিক্রির জন্যে।"

"এগুলো বিক্রি করবি কোথায় ?"

"কেন, টাওয়ার ব্রিজে।" সহিদ রাগে ফুঁশছিল আর জোরে-জোরে হাঁটছিল।

"টাওয়ার ব্রিজে আমাদের দেশের লোক কেউ নেই। সবই বিদেশী ট্যুরিস্ট।"

সহিদ ঠোঁট চেপে বলল, "অনেক সময় সিগাল পাখীরা থাকে।"

আমি সহিদকে কথা বলাবার চেষ্টা করছিলাম—

"এ কদিন কোথায় ছিলি ?"

"বোকার মতো পয়সা রোজগার করছিলাম।"

আমরা অল্ডগেটের গোল চত্বরটা ঘুরে এ্যালি স্ট্রীট ধরে গেলাম। শেষকালে সহিদ বলল "আমি বেটীকে মেকাতে আসতে বলেছিলাম।"

"তাহলে তো কিছুদূর এগিয়েছে। তা এত রাগ কিসের ?" এবার সহিদের মুখ খুলল," বেটী সবাইয়ের জন্যে কফি বানাতে রান্নাঘরে গিয়েছিল, আর আমিও ওর পিছন-পিছন গেলাম। আমি ওকে আমার সঙ্গে মেকাতে যাবার জন্য বলেছিলাম। মেয়েটা এত বোকা যে ভাবল আমি ওকে আরবের মক্কার কথা

বলছি। বেটী বলল ও তো মুসলমান নয়। আর আমি কি কয়তে ধর্মে বিশ্বাস করি। ওর মতে ধর্ম তো নেশাধরা ওষুধের সমান। তাই ওকে খুলে বললাম আমি মেক্কা নাচঘরের কথা বলছি, সন্ধ্যেবেলায় আমার জন্যে। ও ভাবল আমি বাজে সময় নষ্ট করছি।"

"বেটী তোর সঙ্গে যাবে বলেছে? ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাস?"

সহিদ কোনো উত্তর দেয়নি। ততক্ষণে আমরা টাওয়ার ব্রিজে পৌছে গেছি। সহিদ আমার হাত থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা নিল। কাগজের সামনের পাতায় প্রথম লাইনে লেখা: "ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" আমরা ব্রিজ ধরে এগিয়ে গেলাম। ব্রিজের মাঝামাঝি যেখানে নদীর জলটা পাথরের থামের চারদিকে পাক খাচ্ছিল, ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে সহিদ কাগজের বাণ্ডিটা ছাইরঙা রেলিংএর ওপর দিয়ে জোয়ারের তোলপাড় জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আমি বললাম, "কী মাথামুণ্ডু করছিস? পুলিশ জলে কাগজ ফেলার জন্যে আমাদের ধরবে না।"

তারপর কাফেতে ফিরে এলাম। কফি খেলাম। আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলাম সেদিনকার ফুটবল খেলার ব্যাপারে। সেদিন দুপুর দুটোর পর ভ্যালেন্স রোডের মাঠে ওয়েস্ট কেয়ার টীম আর নবীন সঙ্ঘের মধ্যে খেলার কথা ছিল।

বেটী সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে যখন কাফেতে এল আমরা নিজেদের কথার মধ্যে ডুবেছিলাম। বেটী সোজা আমাদের কাছে এল ওর দু-হাত ভর্তি কাগজের বাণ্ডিল। বেটী জিজ্ঞাসা করেছিল "তোমাদের কাগজগুলো কোথায়? এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই বিক্রি করতে পার না?" সহিদ ওর দিকে একটু তাকিয়ে কোন পাত্তা না-দিয়েই বলেছিল হ্যাঁ বাণ্ডিলটাই বিক্রি করে দিয়েছি।" বেটী বলেছিল "দারুণ ব্যাপার! আমরা তাহলে কালো লোকদের মনে বেশ একটা দাগ কেটেছি। 'এশিয়ান'দের নিয়ে তাহলে কাজ শুরু করা যাক।"

বেটী হাসল। তারপর বেটী আর সিলভিয়া নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

সহিদ হঠাৎ বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটা টেনে বের করে গোটা দুয়েক পাউণ্ড নোট বেটীর দিকে তুলে ধরল। আর বলল, "তোমাকে তো আমার দাম দিতে হবে, কাগজগুলোর জন্যে।"

অনুবাদঃ শিবানী রায়চৌধুরী

ভিক রীড

॥ কিশোর যোদ্ধা ॥

অনুবাদ :

সৌরীন ভট্টাচার্য

১

প্রশ্ন আর উত্তর

'টমি! এবার উঠে পড়্!' বাবার বাজখাঁই হাঁক শোনা গেলো।

টমির আধভাঙা ঘুম এবার পুরোপুরি ভেঙে গেলো। গাছের পাতার ভেতর দিয়ে আসা রোদের আলোর দিকে তাকালো সে। তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠেই তার ছুরির খোঁজ করলো। ছুরি ছাড়া টমি কখনো ঘুমোতে যায় না। সে তো মেরুনের ছেলে। মেরুন লোকেরা কখনো তাদের ছুরি ছাড়া থাকে না।

'খোকা, উঠছিস?' আবার বাবার গলা।

'এই আসছি, বাবা।' টমি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়।

এবার সে তাড়া করলো। আজ তার জীবনের এক মস্ত বড়ো দিন: আজ তার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উৎরোতে পারলেই সে 'কিশোর যোদ্ধা' হবে। আজ তার জন্মদিনও বটে। আজ চোদ্দ বছর বয়স হ'লো টমির।

সে তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র টানটান ক'রে গুছিয়ে রাখলো। বাবার নিজের হাতে তৈরি করা তাদের এই ছোটো বাড়ি। মোট তিনখানা ঘর তাদের। এই ঘরটা টমির নিজের।

টমি ঘর থেকে বেরিয়েই পাহাড়ের পেছনে ঝিলের দিকে ছুটলো। চটপট জামাপ্যান্ট খুলে ঝুপ ক'রে জলে ঝাঁপ দিলো সে।

উঃ, কী ঠাণ্ডা জল! হাত-পা যেন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। বেশি স্নানের সময় নয় আজ। তাড়াতাড়ি উঠে এসে গা-হাত-পা মুছে নিলো ঘ'ষে-ঘ'ষে। আর অমনি বেশ শুকনো ও গরম-গরম লাগছে এখন। সব মেরুন ছেলেরা যেমন চওড়া ট্রাউজার পরে টমিও তাই প'রে নিলো। বুকের উপর দিয়ে বেল্ট ঝুলিয়ে দিলো, তাতে ছাগলের চামড়ার থলে বাঁধা। ঐ থলেয় তার ছুরিটাকে ঠিক খাপে-খাপে ঢুকিয়ে নিয়ে গ্রামের ভেতর ছুটলো টমি।

তাদের গ্রামের নাম পাহাড়চুড়ো। গ্রামের ঠিক মাঝখান ভেতর দিয়ে একটা পথ—তার দুধারে সারি-সারি কুঁড়ে ঘর। এই রাস্তার শেষে মিটিং ঘর।

এই মিটিং ঘর এতই বড়ো যে পাহাড়চুড়ো গ্রামের সব মেরুন এতে একসঙ্গে ধ'রে যায়।

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লো টমির। ওরাও সব গাঁয়ের মধ্যিখানে গিয়ে জড়ো হবার জন্যে দৌড়ুচ্ছে। সবাই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। ওরাও বোধহয় আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে পরের দিনের পরীক্ষার কথা ভাবছিলো। সবাই ওরা পরীক্ষা পেরিয়ে কিশোর যোদ্ধা হবে।

গ্রামের মধ্যিখানে প্যারেড-গ্রাউণ্ড। মস্ত একটা খোলা জায়গা। মেরুনদের তীরধনুক খেলা, নাচগান সব এখানেই হয়।

ছেলেরা সব দৌড়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ডে গিয়ে জড়ো হ'লো। টমি ছাড়া আরো চারজন ছিলো। ওরা সবাই প্রায় এক-বয়সী। চার্লি কেবল মাস ছয়েকের বড়ো। এ ছাড়া ছিলো ডেভিড আর ইউরিয়া, আর টমির প্রাণের বন্ধু জনি। ওদের চোখেমুখে এখন আর কোনো হালকা ভাব নেই। এই দিনটার গুরুত্ব কতখানি, তা ওরা বোঝে।

প্যারেড-গ্রাউণ্ডে ছেলেরা সব লাইন ক'রে দাঁড়ালো। এক মাথায় দাঁড়ালো চার্লি, অন্য মাথায় টমি। টমির ঠিক পরেই জনি।

সূর্য এখন গাছের মাথায়। গাঁয়ের লোকেরা সব প্যারেড-গ্রাউণ্ডের ধার দিয়ে-দিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। মিটিং ঘরের বন্ধ দরজার দিকে যাবার মতো একটা পথের জায়গা খালি রইলো কেবল।

'টমি, ভয় পেয়েছিস ?' জনি ফিশফিশ ক'রে জিগেস করলো।

একটু ভেবে নিলো টমি।

'হ্যাঁ,' সে বললো, 'আর তুই ?'

'আমি তো ভালো তীরধনুক ছুঁড়তে পারি না। বাবা নিশ্চয়ই ভীষণ রাগ করবে।' জনি বললো।

'কিন্তু আরো তো অনেক জিনিস আছে। তুই তো সে-সব ভালো পারিস,' টমি বললো। 'দৌড়ে তো আমাদের মধ্যে তুইই সবচেয়ে ভালো।'

'কিন্তু আমি যদি তোর মতো তীরধনুক ছুঁড়তে পারতুম,' জনি বললো।

'আর আমি যদি তোর মতো দৌড়ুতে পারতুম,' টমি বললো।

মেরুন গাঁয়ের বড়োরা সব হাসছে আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি করছে। কিন্তু হঠাৎ সব চুপ হ'য়ে গেলো। আবেং-এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

গোরুর শিঙ থেকে বানানো হয় এই আবেং। প্রথমে আওয়াজটা খুব নিচু ছিলো তারপর আস্তে-আস্তে জোর হ'তে লাগলো আবেং-এর আওয়াজ। সমস্ত মেরুনদের এক জায়গায় জড়ো করবার জন্য এই আবেং বাজানো হয়। বেশ কয়েক মাইল দূর থেকেও এর আওয়াজ শোনা যায়।

আবেং-এর শেষ ফুঁ বেজে গেলো। মিটিং ঘরের দরজা এবার খুললো। ঐ তো সর্দারকে দেখা যাচ্ছে।

সর্দারের চেহারা খুব লম্বা, ঘন কালো রং, বেশ সুপুরুষ। তাঁর পরনে শার্ট আর আঁটো ট্রাউজার। অত্যন্ত সবল দুই বাহু। ডান হাতে তাঁর বন্দুক, আর কাঁধের উপর বারুদভর্তি শিং। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দু-চোখ একবার বুলিয়ে নিলেন প্যারেড-গ্রাউণ্ডের উপর দিয়ে। গ্রামের অন্য বয়স্ক মানুষেরা সব সর্দারের পেছনে দাঁড়িয়ে।

সর্দার ও তাঁর সঙ্গীরা খোলা পথ দিয়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ডে এগিয়ে এলেন। সর্দারের চোখ ঐ ছেলে পাঁচটির দিকে। টমি স্পষ্ট বুঝতে পারছে জনি তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

টমি ফিশফিশ ক'রে বললো, 'সাহস কর, জনি। তুই খুব ভালো করবি।' টমি নিজেও অবশ্য জনির মতোই কাঁপছিলো।

সর্দারের যদিও বয়েস হয়েছে তবুও তাঁকে এখনো বড়ো যোদ্ধার মতো দেখায়। ইংরেজ লালকোর্তাদের সঙ্গে তিনি বহু বছর যুদ্ধ লড়েছেন। এই গ্রামের লোকেরা যখন দল বেঁধে শিকারে যায়, তখন বিশ্রামের সময় আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশ ঘিরে ওঁর লড়াইয়ের গল্প এখনো ওদের মুখে-মুখে ফেরে।

সর্দার একটু-একটু ক'রে এগিয়ে এসে ছেলেদের থেকে ঠিক দশ ফুট দূরে থামলেন। চার্লির থেকে শুরু ক'রে তিনি প্রত্যেকের দিকে একে-একে চেয়ে দেখলেন। তারপর তিনি হাত উঁচু করলেন। প্যারেড-গ্রাউণ্ডের সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেলো।

তিনি বললেন, 'আমার মেরুন ভাই-বোনেরা! সব্বাইকে নমস্কার।'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো: 'নমস্কার, সর্দার!'

'আজ আবার আমরা সবাই এখানে এক জরুরি কাজে মিলিত হয়েছি। আমাদের দেখে নিতে হবে যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে কেউ "কিশোর যোদ্ধা" হবার মতো তৈরি হয়েছে কিনা।' সর্দার ব'লে চললেন। 'কিন্তু ওদের

শক্তিপরীক্ষার আগে যাচাই করতে হবে ওরা আমাদের ইতিহাসের কতটুকু জানে।'

সর্দার আবার ছেলেদের দিকে তাকালেন।

'তুমিই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবে।' ইউরিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন। 'ইউরিয়া, মেরুন কাদের বলে ?'

'মেরুনরা হ'লো এক সাহসী জাত যারা তাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে।'

ভিড়ের মধ্যে সব লোক সহাস্যে হাততালি দিয়ে উঠলো। ইউরিয়ার বাবার মুখে মৃদু হাসি।

সর্দার ফিলিপ আবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ডাকলেন, 'চার্লি !'

ডাক শোনা মাত্র চার্লি লাফিয়ে উঠলো। এপাশে তাকালো। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তবু চার্লি ঘামছিলো। টমি বুঝতে পেরেছিলো চার্লি ভয় পেয়েছে।

'চার্লি, মেরুনরা কোথায় থাকে ?' চার্লির মুখ একটু ফাঁক হ'লো কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোলো না। ওর বাবার মুখে রাগ ফুটে উঠছে।

'ভয় পেয়ো না,' সর্দার ফিলিপ অভয় দিলেন। 'বলো, বলো, কথা বলো।'

'প্-প্-পাহাড়ে', চার্লি বললো।

'হ্যাঁ, তা আমরা জানি ; কিন্তু পাহাড়ের কোথায় ?'

'এ্যা-এ্যা—আকম্পঙে আর ট্রে-ট্রে-ট্রেলনি শহরে,' চার্লি উত্তর দিলো।

'বলো, ব'লে যাও,' সর্দার ফিলিপ আদেশ দিলেন।

'আর ন্-ন্—নানি শহরে।' কাঁপতে-কাঁপতে কোনোমতে জবাব দিলো চার্লি।

'আর কোথাও থাকে না তারা ?' সর্দার ফিলিপ জিগেস করলেন।

চার্লি কিছু বলতে পারলো না। ভিড়ের লোকেরা সব হেসে উঠলো।

'তুমি কোথায় থাকো ? তুমি কি মেরুন নও ?' সর্দার এবার ধমকের সুরে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও মেরুন।' চার্লি কোনোরকমে উত্তর দিলো।

'তবে তোমার গ্রামের নাম কী ? কোথায় থাকো তুমি ?'

'পাহাড়চুড়ো।'

'তাহ'লে ?'

চার্লি এতক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। অন্য ছেলেদের খারাপ লাগছে তার দশা দেখে। টমি এবার দেখলো সর্দার ফিলিপ তার দিকে তাকাচ্ছেন।

সর্দার হাঁকলেন, 'টমি!'

'বলুন,' টমি এত জোরে বললো কথাটা যে জমায়েতের সব লোকে আবার হেসে উঠলো।

'মেরুনরা পাহাড়ে থাকে কেন?' সর্দার প্রশ্ন করলেন।

'কারণ, যুদ্ধের সময়ে আমরা বনের গাছের মতো দেখতে হ'য়ে যাই।' টমি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললো।

'কী বলতে চাও, বুঝিয়ে বলো।'

'যুদ্ধের সময়ে আমাদের যোদ্ধারা তাদের গায়ে গাছের ছালের পোশাক পরে।' টমি উত্তর দিলো। এখন সে বুঝতে পারছে যে তার আর ভয় করছে না।

'তা গাছপালার পোশাক পরে কেন তারা?'

'কারণ, ইংরেজ লালকোর্তারা তাহ'লে তাদের আর দেখতে পাবে না। আমাদের যোদ্ধারা ঝোপঝাড়ের মতো দেখতে হ'য়ে যায়। যেহেতু আমরা সংখ্যায় কম, তাই যুদ্ধ জিততে আমাদের কৌশল করতে হয়।'

এবার লোকেরা হেসে-হেসে তাকে উৎসাহ দিলো। টমি দেখতে পেলো তার বাবাও হাসছেন, আর অন্যদের চেয়ে একটু জোরেই।

সর্দার ফিলিপ আবার হাত উঁচু করলেন, আর সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেলো। জনির দিকে তাকিয়ে উনি তাঁর হাতের বাজু উঁচু ক'রে দেখালেন। একটা সোনালি ফিতে রোদে চকচক্ ক'রে উঠলো।

'আমার হাতের বাজুতে এটা কী, জনি?'

'স্পেনের রাজা আমাদের জনগণকে যে সোনার ফিতে উপহার দিয়েছিলেন এটা সেই ফিতে।' জনি উত্তর দিলো।

টমি নিজের মনে একটু হাসলো। তার বন্ধু যে মোটেই ভয় পায়নি এতে সে ভারি খুশি।

'স্পেনের রাজা এই সোনার ফিতে আমাদের কেন দিয়েছিলেন?'

'কারণ আমরা সত্যিকার জ্যামেকাবাসী হিশেবে আমাদের দেশপ্রেম দেখাতে পেরেছিলাম। আমরা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম।'

'কবে থেকে আমরা যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম ?'

'১৬৫৫ সাল থেকে।'

'সে কতদিন আগে ?' সর্দার জিগেস করলেন।

'ঐ সময়ে যে-যোদ্ধা জন্মেছিলেন আজ তাঁর বয়স নিশ্চয়ই আশির বেশি।' জনি উত্তর দিলো।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। সর্দার এবার ডেভিডের দিকে ফিরলেন।

'ডেভিড, তুমি বলো, ১৬৫৫ সালে কী হয়েছিলো ?'

ডেভিড সাধারণত গল্প বলতে ভালোবাসে। কিন্তু আজ যে তার কী হয়েছে। সে ভয়ের চোটে যেন দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না।

'ঐ – ঐ বছরে ইংরেজরা এই দ্বীপ স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে জিতে নেয়। তারপর থেকে ইংরেজরাই হ'লো জ্যামেকার নতুন রাজা। কিন্তু মেরুনরা কখনো হার মানেনি এবং আর তারা কখনো এই দ্বীপ ছেড়ে অন্য-কোথাও যায়নি। কাজেই আমরাই সত্যিকার জ্যামেকান।' ডেভিড বললো।

'চমৎকার! চমৎকার!' মেরুনরা একসঙ্গে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসতে-হাসতে মাটিতে পা ঠুকে তারা তারিফ জানালো।

সর্দার ফিলিপ হাত উঁচু ক'রে সবাইকে চুপ করতে ব'লে আবার চার্লির দিকে ফিরলেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন হেসে উঠলো। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর মুখের রেখাগুলো রাগে টান্‌টান্‌, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সবাই অমনি চুপ।

'চার্লি!' খুব নরম গলায় তিনি শুরু করলেন। 'পাহাড়চুড়োর মেরুনদের কর্তব্য কী ?'

চার্লি উত্তর দেবার সময়ে শক্ত ক'রে তার দু-হাত শরীরের পাশে চেপে রাখলো। 'আ-আমাদের সর্দারকে আর তাঁর পরামর্শসভার সবাইকে মেনে চলা আর কখনো স্কাউটদের পেছনে রেখে এগিয়ে না-যাওয়া।'

'সর্দার আর পরামর্শসভাকে কেন মেনে চলতে হয় ?'

'কারণ তাঁরাই তো আইন তৈরি করেন। আর আইন মেনে না-চললে কোনো জাতিই বড়ো হ'তে পারে না।'

এবার মেরুনদের ভিড়ের মধ্যে একটু যেন প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন শোনা

গেলো। চার্লি এ-প্রশ্নটার খুব লাগসই একটা জবাব দিয়েছে। এখন আর তারা চার্লিকে নিয়ে হাসছে না।

'আর স্কাউটদের পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে নেই কেন?'

'কারণ, আমাদের গ্রাম পাহাড়ের ওপর খুব গোপন জায়গায় হ'লেও ইংরেজ লালকোর্তারা সবসময়েই আমাদের তল্লাশ করছে। আর তাই আমাদের স্কাউটরা দিনে-রাতে সবসময়ে তাদের নিজেদের জায়গায় চারদিকে নজর রাখছে। আর লালকোর্তাদের দেখা পেলেই তারা আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছে।'

চার্লি শেষ করলে সবাই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো। সে যে এবার আর ভয় পায়নি তাতে সবাই খুশি। এমনকি সর্দার ফিলিপও একটু-একটু হাসছেন।

'মেরুন ভাইবোনেরা! আমাদের প্রশ্নের পালা এবার শেষ হ'লো। আমরা এখন আনন্দ করতে পারি যে আমাদের ছেলেরা কেউ ফেল করেনি। আসুন, অন্যান্য পরীক্ষার জন্য মাঠ যতক্ষণ-না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ একটু গানবাজনা শোনা যাক।'

ছেলেদের মা-বাবারা আর অন্য-সবাই তাদের নাম ধ'রে ডাকাডাকি করছে। সবার মধ্যেই একটা ফুর্তির ভাব। ছেলেরা কিন্তু শান্ত চুপচাপ হ'য়ে আছে। ভালো যোদ্ধার তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ ক'রে শান্ত হ'য়ে থাকবার কথা। যুদ্ধে কিংবা শিকারে ভালো যোদ্ধাকে তো কখনো-কখনো গাছের মতো স্থির হ'য়ে যেতে হয়।

গানবাজনার লোকেরা এবার প্যারেড-গ্রাউণ্ডে ঢুকলো। ড্রাম আর অন্যান্য বাজনা নিয়ে তারা মাঠে ঢুকে আস্তে-আস্তে বাজানো শুরু করলো। ওদের সংগীত এমনিতে বড়ো মিষ্টি, তবে মাঝে-মাঝেই বড়ো করুণ। গানবাজনা যখন চলছে তখন মেরুনদের কেউ-কেউ মাঠের একধারে পরীক্ষার জন্য টার্গেট বসাচ্ছে। বড়ো-বড়ো চারটে কাঠের মধ্যে বিভিন্ন আকারের ফুটো করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ফুটোটা এত বড়ো যে মুঠো-করা হাত অনায়াসে তার মধ্যে দিয়ে গ'লে যাবে। আর সবচেয়ে ছোটোটা এতই ছোটো যে একটা তীরও বোধহয় তার মধ্যে দিয়ে গলবে না।

২

পরীক্ষা

সর্দার ফিলিপের হাতের ইঙ্গিতে গাইয়ের দল গানবাজনা বন্ধ ক'রে আস্তে-আস্তে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। পরামর্শসভার একজন ধনুক ও ছুঁচলো তীর হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। সর্দার কথা বলতে আরম্ভ করলে সব একেবারে নিশ্চুপ হ'য়ে গেলো।

'তোমাদের প্রথম পরীক্ষা হবে তীর ছোঁড়া।' সর্দার বললেন। 'চার্লি, তুমিই সবার বড়ো, তুমি প্রথম ছুঁড়বে।'

ধুলোর মধ্যে একটা লাইন টানা হ'লো। চার্লি সেই পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। তার পায়ের আঙুল লাইনটাকে একটু ছুঁয়ে আছে। পরামর্শসভার সদস্য তার হাতে তীরধনুক তুলে দিলেন। চার্লি ধনুকে তীর লাগালো। সে টার্গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে প্রথমে সবচেয়ে বড়ো ফুটোতে ছুঁড়তে হবে, পরে একে-একে অন্য সবগুলোতে।

তৈরি হ'য়ে নিয়ে চার্লি ধনুক তুলে তাক করলো। তীরটা যেন সোজা ছুটে গেলো টার্গেটের দিকে। ফুটোর ভিতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেলো। এপাশে-ওপাশে একটুও লাগলো না কোথাও।

তীরটা আবার তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো। চার্লি একই ভাবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় ফুটোর মধ্যে দিয়েও তীরটাকে পাঠিয়ে দিলো। এইবার সেই ছোট্ট ফুটোটা। তীরটা আবার হাওয়ায় ছুটে গেলো। কিন্তু এবার যখন তীর ফুটোটার মধ্যে দিয়ে গেলো আশেপাশের দু-একটা পালক খ'সে পড়লো। তবুও সবাই হাততালি দিলো। কিশোর যোদ্ধাদের মধ্যে কেবল-দু-একজনই মাত্র সব ফুটোর মধ্যে দিয়ে তীর চালাতে পারে। চার্লি যে-ফুটোটা ভালোভাবে পার করতে পারেনি, অনেকেই সেটা পারে না।

ডেভিড আর ইউরিয়াও প্রথম দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে তীর ঠিকভাবে চালালো। ডেভিড তৃতীয়টা পারলো না, আর জনি আটকে গেলো শেষেরটাতে। এবার টমির পালা।

টমি তীরধনুক নেবার আগে নিজের প্যাণ্টে খুব ক'রে হাত ঘষে নিলো। তারপর ধনুকের তারে তীর লাগাতে-লাগাতে সে সারাক্ষণ চাঁদমারির দিকে

স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো। এবার সে সোজা চাঁদমারির দিকে তীর ছুঁড়লো। বাঃ, চমৎকার! আরো দুবার টমি একই ভাবে তীর ছাড়লো। মেরুনরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ করছে। টমি যেন ঠিক কোনো ওস্তাদ তীরন্দাজের মতোই তীর চালাচ্ছে! টমির বাবা যে ভালো তীরন্দাজ এটা ওরা জানতো, কিন্তু টমি যে এত ভালো তীরন্দাজি শিখেছে এটা ওদের জানা ছিলো না।

এখন বাকি কেবল সেই চতুর্থ ফোকরটা। এখান থেকে ওটাকে দেখাচ্ছে একটা ছোট্ট কালো দাগের মতো। ওর ভেতর দিয়ে তীর চালানো প্রায় অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। কিন্তু টমি মেরুনের ছেলে, তাছাড়া বাবার হাতে ও জুতসই তালিম পেয়েছে। ছোটো ফুটোর জন্যে তৈরি হবার সময়ে ও একবারও ফুটো থেকে চোখ সরায়নি।

টমি আস্তে-আস্তে ধনুকটাকে তুললো। ডান হাতে সে তীর টানলো—যতক্ষণ-না ওর বুড়ো আঙুল কানের কাছে ছুঁয়ে যায়। ও বাঁ-চোখ বন্ধ ক'রে চাঁদমারির দিকে তাক করলো। তারপর দ্রুত ডান হাতের আঙুল ছেড়ে দিলো। তীর উড়ে গেলো বিদ্যুৎবেগে।

তীরটা যখন সোজা ফুটোর মধ্যে দিয়ে গ'লে গেলো মেরুনরা সবাই এক প্রচণ্ড চাৎকারে ফেটে পড়লো। কোনো কিশোর যোদ্ধাকে এভাবে তীর ছুঁড়তে ওরা অনেকেই দ্যাখেনি।

সর্দার ফিলিপ আবার হাত উঁচু করতেই সবাই চুপ ক'রে গেলো।

'এবার ছুরি ছোঁড়ার পরীক্ষা হবে।' সর্দার ঘোষণা করলেন। 'চাঁদমারি তৈরি করো।'

ছুরি নিয়ে দুটো পরীক্ষা ছিলো। প্রথম পরীক্ষায় ছুরি ছুঁড়তে হবে কাঠের চাঁদমারিতে। তার ঠিক মধ্যিখানে থাকবে একটা কালো দাগ। সবাই অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে কে তার ছুরির ফলা ঐ কালো দাগে লাগাতে পারে। ছেলেদের পাঁচজনেই উৎরে গেলো। ওরা সবাই কালো দাগের ওপরেই ছুরি ছুঁড়তে পারলো।

দ্বিতীয় পরীক্ষা আরো শক্ত। একটা গোলাপজাম ছুঁড়ে দেওয়া হ'লো হাওয়ায়। ছেলেরা তাদের ছুরি ছুঁড়লো ঐ ফলের দিকে। চার্লি, ডেভিড এবং টমির ছুরিতে ফলের ছোটো-ছোটো টুকরো কেটে এলো। জনির ছুরি আদৌ ফলের গায়ে লাগলো না। কিন্তু ইউরিয়ার ছুরি একেবারে জামটার মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো আর ফলটা ওর ছুরির ডগায় গাঁথা অবস্থায় মাটিতে এসে পড়লো।

'আমার চোখে যদি রোদ না-পড়তো তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে হারিয়ে দিতাম,' চার্লি বললো ইউরিয়াকে। ইউরিয়া ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কিশোর যোদ্ধা হবে আর ছুরি ছোঁড়বার সময়ে চোখে রোদ পড়া ঠেকাতে পারবে না, তা তো হয় না।'

সর্দার ফিলিপ ওদের দিকে তাকালেন।

'পাথর ছোঁড়ার পরীক্ষার জন্য তৈরি হও,' উনি আদেশ দিলেন।

ছেলেরা তাদের ছাগল চামড়ার থলে থেকে ছুরিগুলো বার ক'রে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। কোমরের বেলট খুললো। বেলটের দুই মাথা এক ক'রে ডান হাতে ধ'রে রাখলো ওরা। পরামর্শসভার একজন ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। ওঁর দু-হাত ভর্তি বড়ো-বড়ো পাথরের টুকরো। ছেলেদের প্রত্যেকে দুটো ক'রে পাথর তাদের বাঁ হাতে নিলো।

সর্দার ফিলিপ মাথা উঁচু ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে একটা লম্বা গাছ পরীক্ষার জন্য ঠিক করেছিলেন। আঙুল দিয়ে গাছের ডগার দিকে দেখিয়ে বললেন,—'দ্যাখো, গাছের ডগায় ঐ ছোট্ট পল্লব। মনে করো ওটা একটা পাখি। দেখি কে ওটাকে পেড়ে আনতে পারো।'

প্রথম চেষ্টা করলো চার্লি। ডানহাতে সে ওর বেলটে ধরলো। বেলটের দু-মুখ ঘুরিয়ে যে-গোল করেছিলো তার ভেতরে নিচের দিকে পাথর রাখলো। তারপর বেলটটাকে বেশ ক'রে কয়েক পাক দোলালো। এইভাবে যখন দোলানি বেশ বেড়ে উঠেছে তখন একটা মুখ আলগা ক'রে ছেড়ে দিলো। পাথরের টুকরো সাঁ ক'রে ওপরে উঠে গেলো, কিন্তু পল্লবের গায়ে লাগলো না। প্রত্যেকেই চেষ্টা করলো পল্লবের গায়ে লাগাতে। ডেভিড প্রায় পেরে গিয়েছিলো। ওর ঢিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে একটু ছুঁয়ে গেলো পল্লবটাকে।

মেরুনদের সব চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। এরা সকলেই চাইছে যে ছেলেদের মধ্যে কেউ-একজন পারুক। কেউই না-পারলে সেটা কিন্তু খুব বাজে ব্যাপার হবে।

এবার শেষবারের মতো পাথর ছোঁড়বার পালা। গাছগুলো হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। চার্লি ছুঁড়লো, কিন্তু পারলো না। পর-পর ডেভিড আর ইউরিয়াও চেষ্টা করলো, কিন্তু ওরাও পারলো না। এই সময়ের মধ্যে টমি কিন্তু একবারের জন্যেও তার চোখ গাছ থেকে সরিয়ে নেয়নি। দেখতে-দেখতে সে বুঝে ফেললো গাছটা ঠিক কখন সবচেয়ে বেশি হেলছে।

টমি ভাবলো, 'গাছটা কখন সোজা হয়, সেই অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক সময় বুঝে ছুঁড়তে হবে ঢিলটা।'

তার পাশেই জনির বেলট ঘোরাবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে টমি। বেলট দুলিয়ে ঢিল ছুঁড়ে দিলো জনি। ঢিল খুব কাছ দিয়ে গেলো বটে, কিন্তু ডালের গায়ে লাগলো না।

এবার তার ছাগলের চামড়ার বেলটের মধ্যে ঢিল পুরে নিলো টমি। সে প্রথমে খুব আস্তে দোলালোতার বেলট, আর অপলকে গাছটাকে দেখতে থাকলো। হাওয়ায় গাছ বেশ খানিকটা নুয়ে পড়লো। টমি অপেক্ষা করলো গাছ ঠিক কখন সোজা হ'তে শুরু করবে। গাছটা যখন সবে ফিরতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে টমি ঢিলটা ছুঁড়লো। সোঁ ক'রে উঠে গেলো তার পাথরের টুকরো। আর, বাঃ, একেবারে ডালের মধ্যিখানে গিয়ে লাগলো!

মেরুনরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'টমি! টমি!'—'টমির মতো টিপওয়ালা শিকারী থাকতে পাহাড়চুড়োর মানুষদের কখনো খিদেয় কষ্ট হবে না!'

সর্দার ফিলিপ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমরা যদি পরীক্ষা শেষ হ'তেই না-দাও, তাহ'লে আর ওকে শিকারী হ'তে হবে না কোনোদিন।'

'চুপ করো, সবাই চুপ! এবার আসছে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।'

সর্দার ছেলেদের দিকে ফিরলেন। ওঁর মুখ এখনো খুব টান-টান দেখাচ্ছে। তবে ওরা বুঝতে পারছে উনি ভিতরে-ভিতরে খুব খুশি হয়েছেন।

'তোমরা সবাই সত্যিই খুব ভালো করেছো। তবে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এখনো বাকি। তোমরা কি জানো সেটা কী? বলো দেখি, তোমাদের কী শেখানো হয়েছে।'

'মান-ইজ্জতের পরীক্ষা,' ছেলেরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললো।

'কেন? মান-ইজ্জতের কথা আসছে কেন?'

'কারণ, আমরা সবাই একটা ক'রে প্রতিশ্রুতি দেবো। আর মেরুন যোদ্ধারা কখনো তাদের কথার খেলাপ করে না।'

'কী প্রতিশ্রুতি দেবে তোমরা?' সর্দার জিগেস করলেন।

'আমরা এখান থেকে দৌড়ে লুক্‌আউট্ পাহাড় পর্যন্ত যাবো। ওখানে পাথরগুলো সব রক্তের মতো লাল। আমরা না-থেমে সবাই একটা ক'রে পাথর নেবো আর এক দৌড়ে আবার পাহাড়চুড়ো পর্যন্ত ফিরে আসবো। আর ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু খাবোও না।'

'এখন কি তোমাদের খিদে পেয়েছে?' সর্দার জিগেস করলেন।

ঘুম থেকে ওঠবার পরে ওরা কেউ কিছু খায়নি। সর্দারের কথা শুনে ওদের খিদে আরো যেন চেতিয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, এখন আমাদের খিদে পেয়েছে বটে, তবে লুক্‌আউট্‌ পাহাড় থেকে ফিরে না-আসা পর্যন্ত কিছু খাবো না আমরা।' ওরা সবাই বললো।

সর্দার বললেন, 'বেশ কথা! তৈরি হও, আবেং-এর আওয়াজ শুনলেই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

ওরা দূরে পুবের দিকে তাকালো। ওখানে লুক্‌আউট্‌ পাহাড়ের মাথায় সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ঐ পাহাড়টার রং গোলাপি। আশে-পাশের সব পাহাড়ের চেয়ে উঁচু। গতবারের মেরুন যুদ্ধে ঐ পাহাড়ের চূড়ো থেকেই মেরুনরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর নজর রেখেছিলো। তাই ওর নাম লুক্‌আউট্‌ পাহাড়। রোদের আলোয় পাহাড়টাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কিন্তু টমি এবং অন্যেরা সকলেই জানতো ঐ লুক্‌আউট্‌ পাহাড় পর্যন্ত যাওয়া ও ফিরে আসা কী নিদারুণ শক্ত ব্যাপার। ওদের যে ভয় করছিলো তা নয়, তবে বেজায় খিদে পাচ্ছিলো।

চারদিকে সব চুপচাপ। ছেলেরা অপেক্ষা করছিলো আবেং-এর প্রথম আওয়াজ শোনবার জন্যে। সর্দার ফিলিপ হাত নামালেন আর ছেলেরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

ওদের পাঁচজনের মধ্যে জনিই সবচেয়ে ভালো ছুটতে পারতো। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পরেই টমি খুব জোরে দৌড়ুতে আরম্ভ করলো, চার্লি তারও আগে-আগে। জনি টমিকে একটু ঠেকিয়ে রাখলো।

'আমার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ো তো,' জনি ফিশফিশ ক'রে টমিকে বললো। 'চার্লি এতই জোরে দৌড়ুচ্ছে ও তো চট ক'রেই হাঁপিয়ে পড়বে।'

টমি তারপর থেকে জনির পাশে-পাশে দৌড়ুতে থাকলো। ডেভিড ও ইউরিয়া ওদের একটু আগে, তবে চার্লির মতো অত দূরে নয়।

প্রথম দিকে পথ ছিলো মসৃণ। ওরা লম্বা গাছের সারির মধ্যে দিয়ে দৌড়ুচ্ছিলো। পায়ের নিচে ঝরাপাতায় ঢাকা মাটি নরম-নরম ঠেকছে।

ওরা যখন শুরু করেছিলো তখন গাছের তলা ছিলো ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ। কিন্তু দৌড়ুতে-দৌড়ুতে গা আস্তে-আস্তে গরম হ'য়ে উঠলো। একটু পরেই ওরা বাইরে খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুলো। চারদিকে ফলন্ত গাছ। টমি দিব্যি

পাকা ফলের গন্ধ পাচ্ছে নাকে। হলুদ আখে ভরা এক মাঠের মধ্যে দিয়ে ওরা দৌড়ুলো। পাহাড়চুড়োর লোকেরা অল্প পরেই এসে পড়বে আখ কাটবার জন্যে। বড়ো-বড়ো পাত্রে ঐ আখের রস সেদ্ধ হবে। সেদ্ধ রস ঠাণ্ডা হ'লে তার থেকে বানানো হবে চিনি।

পাকা তরতাজা আখ যখন ওরা মাঠে-মাঠে খেয়ে বেড়াতো সেই স্বাদ ছেলেদের মনে এলো। ভাবতে গিয়ে টমির মুখ জলে ভ'রে এলো। ও জনির দিকে তাকালো। জনিরও সেই একই অবস্থা।

'খাবার জিনিসের কথা ভাবা চলবে না এখন।' জনি বললো। টমিও মেনে নিলো।

'ক্লান্ত লাগছে?' জনি জিগেস করলো।

'না, এখনো তেমন-কিছু না।' টমি বললো। 'আমরা তো খুব আস্তে-আস্তে ছুটছি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু ফেরবার পথে আমরা ওদের পেছনে ফেলে যাবো।' জনি বললো।

'তুই ঠিক জানিস?' টমি জিগেস করলো। 'কিন্তু ততক্ষণে ওরা হয়তো আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকবে।'

'ডেভিড আর ইউরিয়া বেশ যাচ্ছে। তবে চার্লি বড্ড তাড়াতাড়ি ছুটছে,' জনি বললো।

দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ওরা কিন্তু চোখ-কান খোলাই রাখছিলো। কারণ বনের মধ্যে বিপদ-আপদ তো আছেই। বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় রয়েছে, আর তাছাড়া সব মেরুনের মতোই লালকোর্তাদের দিকে ওদের নজর সবসময়ে সজাগ।

পথ আস্তে-আস্তে খাড়াই হ'য়ে উঠলো। পায়ের নিচের মাটি এখন আর তত নরম নয়। এখন মাটি পাহাড়ি এবং আলগা পাথরের নুড়িতে ছাওয়া সারা পথ। এর আগে অনেক মেরুনের পা ভেঙেছে এই পথে।

কিছুক্ষণ পরে টমি ও জনি ঝোপে ঢাকা একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলো। ঝোপঝাড়গুলো কখনো-কখনো ওদের মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু, বুক সমান তো সব জায়গাতেই। খোলা জায়গায় এসে পড়লেই মাথায় রোদ লাগছে দারুণ চড়া। টমি দেখলো যে পথের রঙ একটু-একটু গোলাপি হ'য়ে উঠছে। অর্থাৎ, ওরা লুকআউট্ পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ছে।

একটু পরেই পথ এত খাড়া হ'য়ে উঠল যে আর দৌড়ুনো চলে না। ওরা কিছুটা পথ শুধু হেঁটেই পেরুলো। এবার ওরা একটা জায়গায় পৌছলো— চারধারে বেশ কিছু গাছ। জনি টমির কাঁধে হাত দিয়ে একটু খোঁচা দিলো। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো এবং একেবারে চুপচাপ। ডান-দিককার ঝোপের মধ্যে থেকে যেন একটা আওয়াজ আসছে। ওরা কান পেতে শুনলো। বেলটের খোপ থেকে ছুরি বার ক'রে নিয়ে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়লো। একটু-একটু ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। ঝোপের কাছে পৌছে পাতার ফাঁক দিয়ে টমি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। বিস্ময়ে ওর চোখ বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠলো।

জনির দিকে ফিরে ও ফিশফিশ ক'রে বললো, 'আয়, দেখে যা।'

জনিও হামাগুড়ি দিতে-দিতে চটপট ওর পাশে এসে পড়লো।

'এ কী! এ যে চার্লি!' জনি ফিশফিশিয়ে বললো। টমির মতো তারও একেবারে হতভম্ব দশা।

টমি তার নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখলো, 'কিছু বলিসনে।'

চার্লি মাটির উপরে ব'সে ছিলো। ও খাচ্ছিলো আর ওর পাশে তখনো এত-এত ফলের গাদা প'ড়ে রয়েছে। ডেভিড আর ইউরিয়া অন্য পথ ধ'রে গেছে, তাই ওরা ওকে দেখতে পায়নি। টমি ও জনি একটু সময়ের জন্যে চার্লিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। চার্লি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে কী যেন খুঁজলো। ও একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ভালো ক'রে নজর বুলিয়ে দেখলো। পাথরের টুকরোটা ভালো ক'রে মুছে-টুছে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। একটা গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে নিয়ে চার্লিও জায়গা ছেড়ে চললো। এ কী! ও যে লুক্আউট্ পাহাড়ের দিকে না-গিয়ে পাহাড়চুড়োর দিকে চললো, ।

'ও তো প্রতিজ্ঞা রাখলো না,' জনি বললো।

'শুধু তাই, নয়,' টমি ধীরে-ধীরে বললো। 'ও তো পাহাড় অব্দি না-গিয়েই পেছন ফিরলো।'

'সেইজন্যেই তো পাথরটা কুড়িয়ে নিলো। দেখলি না, পাথরটা লাল রঙের ছিলো, ঠিক যেন লুক্আউট্ পাহাড়ের পাথর,' টমি বললো।

'তা, আমরা তাহ'লে কী করবো?' জনি জিগেস করলো।

'জানি না,' টমি বললো। 'কিন্তু আমাদের এখুনি দৌড়ুতে হবে লুক্আউটের দিকে, বেশ খানিকটা দেরি তো হ'য়েই গেছে।'

ছেলেরা আবার দৌড় শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনে সেই বড়ো পাহাড় দেখা গেলো। ঐ পাহাড়ের চারপাশের মাটি-পাথরের রঙ সব লাল। ছেলেরা কেউ থামলো না, ওরা প্রত্যেকে একটা ক'রে পাথরের টুকরো তুলে নিয়েই আবার পাহাড়চুড়োর দিকে দৌড়ুলো।

ফিরতি পথে দৌড়োবার সময় ওরা চার্লির কথা ভাবছিলো। ওরা কেমন একটু ভয় পেলো, আবার খুব দুঃখও হ'লো ওদের। মেরুনছেলেরা যে এমনি ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এ ওরা কখনো শোনেনি। ওদের তাহ'লে কী করা উচিত?

পাহাড় থেকে নিচে নামছে ব'লে এবার ওদের পক্ষে দৌড়ুনো সহজ হ'লো। টমি বুঝলো জনিই ঠিক বলেছে। যদিও ওর খিদে পেয়েছিলো আর ক্লান্ত লাগছিলো তবুও ও জানতো যে নিজেদের গ্রাম পর্যন্ত ও ঠিক দৌড়ুতে পারবে। গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে ওরা ডেভিড ও ইউরিয়াকে ছাড়িয়ে গেলো। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতেই শুনতে পেলো হৈ-হৈ আনন্দের ধ্বনি। বুঝলো কিসের আওয়াজ। চার্লি তো দৌড়ে জিতে গেছে, কাজেই তাকেই গ্রামের লোকেরা সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

টমি ও জনি যখন গ্রামে ঢুকলো ততক্ষণে চার্লি প্যারেড-গ্রাউণ্ডে পৌঁছে গেছে। ও তখন সর্দার ফিলিপের হাতে পাথরটা দিচ্ছে। একটু পরেই ডেভিড ও ইউরিয়াও এসে পৌঁছে গেলো। গ্রামের লোকেরা সবাই খুশি। ছেলেদের সবাই তো বেশ ভালো করেছে।

টমি সর্দারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মনে হ'লো যেন সর্দার একটু বেশি সময় ধ'রে চার্লির দিকে এবং পাথরের টুকরোটার দিকে লক্ষ ক'রে দেখছেন। কিন্তু একবার আবেং-এর শব্দ হ'তেই, সর্দার ফিলিপ ওঁর হাত তুললেন। সবাই চুপ ক'রে গেলো।

খুব উঁচু গলায় সর্দার বললেন, 'পরীক্ষা শেষ হ'লো। আজ থেকে এই পাঁচজনকে "কিশোর যোদ্ধা" হিশেবে মেরুনদের মধ্যে গণ্য করা হবে। এবং ওদের উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে।'

মেরুনরা সব একসঙ্গে বিরাট এক চীৎকার ক'রে উঠলো।

গাইয়ে-বাজিয়ে যারা ছিলো তারা খুব ফুর্তির সুরে একটা গান বাজালো। সবাই হাত ঝাঁকিয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। ছেলেদের প্রত্যেকের বাবা হাতে ধনুক ও তূণ ভর্তি তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। খুব সুন্দর ছাগলের চামড়ায় ঐ তূণ বানানো। পালিশের জন্য চকচক করছে এখন।

টমির বাবা ওকে চুমো দিলেন। উনি ঐ নতুন তীর ধনুক ওকে উপহার দিলেন। টমি একটা তীর তুলে নিয়ে শূন্যে ধ'রে রইলো।

টমি বললো, 'সুন্দর জিনিস দিয়েছো, বাবা। ধনুকটা চমৎকার। আর তীরগুলো সোজা সাঁই-সাঁই ক'রে ছুটবে।'

বাবা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে চাইলেন।

'তোর কথায় মনে হচ্ছে তুই খুশি। কিন্তু গলার স্বরে যেন অন্যরকম লাগছে। কেন? কী, হয়েছে কী?'

'না, তেমন-কিছু না তো।'

'দৌড়ে সেরা হ'তে পারিসনি ব'লে খারাপ লাগছে? না কি ছুরি ছোঁড়ায় জিততে পারিসনি ব'লে?'

'আমি তো সবগুলোতে জিতবো ব'লে ভাবিনি কখনো।'

'কিন্তু তীর-ধনুক ছোঁড়ায় তো তুইই সবচেয়ে ভালো। ওটাও কি তুই জিতবি ব'লে ভাবিসনি?' বাবা জিগেস করলেন।

'ওটা বোধ হয় ভেবেছিলাম,' টমি বললো।

ছেলের কী হয়েছে ঠিক বোঝা গেলো না। টমি এত ভালো করেছে, অথচ একটা কী যেন হয়েছে ওর।

'ঠিক আছে, চল, বাড়ি যাই। তোর মা অপেক্ষা ক'রে আছেন। উনি এখন খেতে দেবেন তোকে। খাইয়ে-খাইয়ে আজ মোটা ক'রে দেবেন।'

বাবার কথায় টমি আরো বেশি ক'রে চার্লির কথা ভাবলো। কী যে করা উচিত ও কিছু ভেবে পাচ্ছেনা। চার্লির কথা ব'লে দেওয়া উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছে না। চার্লি ওর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে এবং মেরুন জাতির পক্ষে সে একটা জঘন্য কলঙ্ক। কিন্তু এ-কথা ব'লে দিলে, সেটাও চার্লির পক্ষে হবে মারাত্মক। হয়তো ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে, বা হয়তো একঘরে ক'রে রাখবে।

টমি বাড়িতে ফিরলে ওর মা মাথায় চুমো দিলেন। আনন্দে ওঁর চোখ দিয়ে তখন জল বেরোচ্ছে।

'খোকা, তুই খুব ভালো করেছিস। আমাদের সবার গর্ব তুই, খোকা। বড়ো হ'য়ে একদিন তুই বাবার মতো বড়ো যোদ্ধা হবি।'

টমি ভাবলো বোধহয় ঠিক এই সময়ে চার্লির মাও চার্লিকে এইসব কথাই বলছেন। চার্লির ব্যাপার ব'লে দিলে মা-বাবাও মনে আঘাত পাবেন।

'ভালো ক'রে খেয়ে নে,' টমির বাবা বললেন। 'আজই বিকেলে তুই আবার শিকারে যাবি।'

মেরুনদের মধ্যে এটা একটা প্রথা। 'কিশোর যোদ্ধা' হবার পরে ছেলেরা সবাই একসঙ্গে শিকারে যায়। জীবনে এই প্রথম ওরা বড়োদের বাদ দিয়ে শুধু নিজেরাই যাবে। এবং রাত্রেও বনের মধ্যে কাটাতে হবে ওদের।

টমির মা ওকে অনেক খাবার-দাবার দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই যেন তার মুখে রুচতে চাইছে না। বাবা দেখছিলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না।

'খোকা, যা, এবার একটু বিশ্রাম ক'রে নে।' খাওয়া শেষ হ'তেই মা বললেন। 'পরে যখন শিকারে যাবি, তখন কিন্তু এটা পরবি।'

উনি ছেলেকে একটা নতুন জামা দিলেন। যোদ্ধারা যে-রকম জামা পরে, ঠিক সেইরকম। টমির খুব গর্ববোধ হ'লো। তবে এখন সে খুব ক্লান্ত। শিকারে যাবার আগে একটু বিশ্রামের দরকার। টমি বিছানায় গিয়ে শুতে না-শুতে ঘুমিয়ে পড়লো।

৩

মৃগয়া

টমির ঘুম ভাঙলো একেবারে বিকেল গড়িয়ে। এত খুশি লাগছে যে ওর গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো। একে সে এখন 'কিশোর যোদ্ধা', তাতে মা ওকে একটা নতুন জামা দিয়েছেন। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ও বাইরে ছুটলো।

তখনও বেশ রোদ্দুর রয়েছে। আকাশে ছোটো-ছোটো হালকা মেঘের টুকরো। দেখাচ্ছিলো ঠিক ভেড়ার পালের মতো।

টমির মা একটা গাছের ছায়ায় ব'সে ছিলেন। উনি কাছে ডাকলেন। টমি ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'শিকারে যাবার জন্যে তৈরি?' মা জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ, এই তো। জনিরা সব কোথায় গেলো তাই দেখতে যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'মনে রাখিস, এই প্রথম বাবাকে ছাড়া শিকারে যাচ্ছিস। বাবা যা-যা শিখিয়েছেন সব মনে থাকবে তো?'

'থাকবে।'

'তোর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিয়েছি। দরজার কাছে আছে।'

বুনো শুয়োরের চামড়ায় তৈরি সুন্দর একটা থলে ঘাসের উপরে প'ড়ে রয়েছে। থলের পাশে একটা জলের বোতল। আর তার ওপরে একটা ছবি —পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্য উঠছে।

টমি খুশিতে ডগমগ হ'য়ে জিগেস করলো, 'এটা কি আমার জন্যে নাকি?'

'হ্যাঁ,' মা হেসে বললেন, 'এ-ছবিও তোরই।'

টমি বুঝতে পারলো না কী বলতে হবে। সে এখন ঐ জলের বোতলের কথা ভাবছে। ঐ বোতলটাকে চিরকাল দরজার পেছনে ঝুলতে দেখেছে সে। তার ঠাকুর্দা যখন 'কিশোর যোদ্ধা' হয়েছিলেন তখন তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো ঐ জলের বোতল।

মা এবার উঠে আস্তে-আস্তে টমির দিকে এগিয়ে এলেন। উনি ওঁর হাত রাখলেন টমির কাঁধে। 'এটাকে যত্ন ক'রে রাখিস, খোকা। এই যে

পাহাড়ের ছবি, এর মানে হ'লো গোটা পৃথিবী। আর এই সূর্য মানে তোর দাদু। এখন এর মানে তুই নিজে। এই পৃথিবীকে তুই আলো দিবি, ভালোবাসা দিবি, যাতে ক'রে তুই আছিস ব'লে পৃথিবী খুশি হ'য়ে ওঠে। দাদু এই জলের বোতলটা তোর বাবাকে দিয়েছিলেন, যখন উনি "কিশোর যোদ্ধা" হয়েছিলেন। আর আজ তোর বাবা এটা তোকে দিলেন।'

'কিন্তু আমি কী ক'রে পৃথিবীকে আলো দেবো?' টমি জিগেস করলো। 'এই পৃথিবী কী প্রকাণ্ড আর আমি তো মাত্র এইটুকু।'

'নিজের কাজ কর। অন্যদের প্রতি দয়ালু হ। কঠোর পরিশ্রম কর। তাতেই তোর জন্য পৃথিবী আরো সুন্দর হ'য়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, মা,' টমি বললো, 'আমি তোমার কথা বোঝবার জন্য খুব চেষ্টা করছি।'

'যা, এবার শিকারে বেরিয়ে পড়, মজা কর।'

টমি আস্তে-আস্তে দরজার দিকে এগোলো। ঐ ভারি থলেটা তুলে নিলো। নিজের বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলো থলেটাকে। ভেতরে একবার তাকিয়ে দেখলো। মা ওকে প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়ে দিয়েছেন। একটু হেসে সে জলের বোতলটা তুলে নিলো। তারপর একে-একে নিলো তার ছুরি এবং তীরধনুক। মাকে 'আসি' ব'লে বেরিয়ে পড়লো। দৌড়ুলো জনিকে খুঁজে বার করার জন্য। একটু পরেই ছেলেরা সবাই এক জায়গায় এসে জড়ো হ'লো।

গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জড়ো হয়েছে ওদের বিদায় জানাবার জন্যে। গানবাজনার দলের লোকেরাও আছে। সবাই চীৎকার ক'রে ওদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। 'যাত্রা শুভ হোক,' 'শিকারে সফল হও'—এইসব আওয়াজ চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। ছেলেরা যাত্রা শুরু ক'রে দিলো।

সার বেঁধে, একজনের পেছনে আর-একজন, এইভাবে, ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো। টমিই ওদের নেতা—কারণ, চারটে পরীক্ষার মধ্যে ও দুটোতে জিতেছে। ওরা উত্তরের দিকে এগোলো। কারণ, দক্ষিণে ইংরেজদের শিবির, আর তাছাড়া এই দ্বীপের উত্তরের দিকটাই শিকারের পক্ষে ভালো।

ওরা যখন গ্রাম থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে, তখন টমি হাত উঁচু করলো। ছেলেরা সবাই চুপ ক'রে গেলো এবং মাটিতে ব'সে পড়লো।

বনের চারদিক শান্ত নিস্তব্ধ। ছেলেরা নিঃশব্দে ব'সে রইলো। ওরা জানতো যে পাখি ও অন্যান্য ছোটোখাটো জন্তুজানোয়ার আশপাশেই আছে। কিন্তু ঐ 'ক্ষুদ্র অরণ্যবাসীরা'ও এই শিকারীদের মতোই চুপচাপ।

বাবারা যেমন শিখিয়েছিলেন টমি ও তার বন্ধুরা ঠিক তেমনিই করছিলো। শিকারে গেলে মেরুনরা সবসময়েই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকতো। ওদের ধারণা এতে ক'রে বন ওদের কিছুটা জানবার সুযোগ পায়। বনের পাখি এবং জন্তু-জানোয়ারেরা ওদের বন্ধু ব'লে ভাবতে পারে আর তাতে শিকারের সুবিধে হয়।

খরগোশ এবং বাচ্চা শুয়োর শিকারের সময় ওরা খুব চুপিসাড়ে চলাফেরা করছিলো। একটু শব্দ হ'লেই শিকার পালিয়ে যাবে। আবার পাখি ও অন্যান্য ছোটো জানোয়াররা যদি খুব চুপচাপ থাকে তাহ'লেও খরগোশ ও বাচ্চা শুয়োর শিকারী এসেছে ব'লে বুঝে ফেলবে। ছেলেরা কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করলো।

একটু পরেই ঝোপের মধ্যে ছোটোখাটো আওয়াজ শুরু হ'লো। পাহাড়ের পেছন থেকে ছোটো জানোয়াররা বেরিয়ে আসছে, পাখিরা এগাছ থেকে ওগাছে ওড়াউড়ি করছে। সবকিছুই আবার যেন জেগে উঠছে। আগের মতোই।

বন্ধুদের নিয়ে টমি উঠে দাঁড়ালো। ওরা খুব আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে হাঁটতে থাকলো। শুকনো পাতা এড়িয়ে চললো, নরম সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলে-ফেলে ওরা এগোচ্ছে। ওদের চলায় একটুও শব্দ হচ্ছে না।

পাহাড় টিলার উপর দিয়ে পথ বেয়ে-বেয়ে ওরা উঠলো। উঠতে হবে সেই উঁচু পর্যন্ত, যেখানে খরগোশদের বাসা। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে নেমে গেছে, হাওয়াও একটু-একটু ঠাণ্ডা হ'তে শুরু করেছে। মায়ের দেওয়া জামাটার কথা ভাবতে টমির ভালো লাগছে—তাছাড়া ও-যে একলা নয়, সেজন্যেও বেশ খুশি লাগছে। বনের বড়ো-বড়ো গাছের কাছে দাঁড়িয়ে টমির নিজেকে আরো ছোটো লাগলো। এবার অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কিন্তু পথ যে হারায়নি সেটা টমি বেশ বুঝতে পারছে। একটু পরেই ওরা গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পাহাড় টিলার মধ্যে এসে পড়বে।

এক মহান মেরুন সর্দারের নামে নাম দেওয়া হয়েছে যে-পর্বতের, তারই চূড়ায় ঐসব ছোটো পাহাড়গুলো। সর্দার নেই আজ অনেক বছর হ'লো। ওঁর নাম ছিল হুয়ান দে বোলাস। উনি ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অনেক লড়াই জিতেছিলেন। ওঁকেই সেই সোনার ফিতে দেওয়া হয়েছিলো যা এখন সর্দার ফিলিপের হাতে পরা।

যখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে তখন টমি আবার হাত তুললো।

'আমরা এখানে বিশ্রাম করবো,' টমি শান্ত গলায় বললো।

'আর খাওয়া-দাওয়া করবো,' ডেভিড বললো। ডেভিড সবসময়েই খাবার জন্যে প্রস্তুত।

'ঠিক,' ইউরিয়া বলল। 'আমরা কি এখন খেতে পারি, সর্দার?'

ইউরিয়া যখন এ-সব বলছিলো তখন চার্লি কিন্তু হাসেনি। টমি ওদের সর্দার ব'লে চার্লি বেশ চটেছে।

'ও আবার কিসের সর্দার?' চার্লি এবার ব'লেই ফেললো। 'ওর চেয়ে তো আমি বড়ো, আমি তোদের সবার চাইতেই বড়ো।'

'কিন্তু পরীক্ষায় ও আমাদের সবার চাইতে ভালো করেছে।' ডেভিড বললো। 'আর তাই তো ও আমাদের সর্দার।'

'কিন্তু লুকআউট পাহাড়ের সবচেয়ে শক্ত পরীক্ষায় তো আমিই জিতেছি,' চার্লি নাছোড়বান্দা।

টমির পাশেই বসেছিলো জনি। সে টমিকে একটু কনুইয়ের খোঁচা দিলো। টমি অবশ্য কিছুই বললো না।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা ওকে সর্দার না-হয় না-ই বললাম। নেতা ব'লে ডাকলেই হ'লো', ইউরিয়া বললো, 'কিন্তু আমার এখন খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, ইউরিয়া, আমরা এবার খাবো,' টমি বললো।

ছেলেরা তাদের ব্যাগ থেকে খাবার বার ক'রে খেতে শুরু ক'রে দিলো। চারপাশে ছোটো-ছোটো জীবজন্তুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাত এখন বেশ ঠাণ্ডা। কিশোর যোদ্ধারা হয়তো আগুন জ্বালাতো, কিন্তু তাদের বাবাদের নিষেধ আছে। ইংরেজ সৈন্যরা যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড়ের মধ্যে এসে পড়তে পারে। যে মেরুন স্কাউটরা পাহাড়চুড়োর গ্রাম পাহারা দিতো ছেলেরা এখন তাদের ছাড়িয়ে এসেছে।

জনি ফিসফিস ক'রে টমিকে বললে, 'চাঁদ উঠছে।'

টমি উপরের দিকে তাকালো। গাছের ডগায় যেন রুপোলি রেখার ছোঁয়া লেগেছে। একটু পরেই আলো জোরালো হ'য়ে উঠলো। আকাশটা এখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। টমির মনে পড়লো যে এখন কথকেরা গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে। কোথাও এক জায়গায় ব'সে পড়বে তারা। গ্রামের মেয়ে, পুরুষ ও কাচ্চা-বাচ্চারা এসে জড়ো হবে। পুরোনো দিনের সেই জমকালো মাকড়শা অ্যানান্সির উপকথা ব'লে যাবে একনাগাড়ে একটার পর একটা।

ছোট্ট চালাক ব্রাদার অ্যানান্সির গল্প, দুষ্টু ব্রাদার টাকোমার গল্প, দয়ালু জোয়ান ব্রাদার বুল-এর এবং আরো কত।

ডেভিড, যে গল্প বলতে খুব ভালোবাসতো, হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'অনেক অনেক দিন আগে……'

ডেভিডের বন্ধুরা আরো কাছ ঘেঁষে ঘন হ'য়ে বসলো। চাঁদ আরো ওপরে উঠলো, বাতাস বইছে তিরতির ক'রে।

'অনেক, অনেক দিন আগে, ব্রাদার অ্যানান্সি তার গ্রাম ছেড়ে চললো। সে চলেছে এক দূর দেশে। হাঁটতে-হাঁটতে সে এসে পৌঁছলো এক রাজার বাড়ি। হেঁটে-হেঁটে সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তাই সে রাজার বাড়ির ফটকে গিয়ে কড়া নাড়লো। কারুর সাড়া নেই। তখন তো রাত্তির। তাই দারোয়ানরাও ভয়ে সাড়াও দিচ্ছে না, ফটকও খুলছে না। কিন্তু ব্রাদার অ্যানান্সির গানের গলা ছিলো খুব সুন্দর। সে গান ধ'রে দিলো :

যখন দ্বারের পাশে
ক্লান্ত কোনো রুগী, না-হয়
গরিব লোক আসে,—
খোলো, দুয়ার খোলো—
সকল সময় লগ্ন শুভ,
দেরি হয়নি বোলো।

রাজা ছিলেন খুব দয়ালু লোক। অসুস্থ রোগী কিংবা গরিব লোককে ফটক থেকে ফিরিয়ে দিলে তিনি রেগে যাবেন। তাই দারোয়ানরা ভেতর থেকে অ্যানান্সিকে জিগেস করলো, "তুমি কে হে বাপু? অসুস্থ রোগী? না গরিব লোক?"

'অ্যানান্সিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "আমি এক অসুস্থ গরিব লোক।"

'দারোয়ানরা বললো, "দাঁড়াও রাজাকে ডেকে আনি।"

'একটু পরে দারোয়ানের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তার একটু পরে রাজার গলা পাওয়া গেলো, "তুমি কে? আর এত রাত্রে আমার প্রাসাদেই বা এসেছো কেন?"

'ব্রাদার অ্যানান্সি তার ছোট্ট গানটা আবার গাইলো। এই গরিব অসুস্থ লোকটির মিষ্টি গলা শুনে রাজার খুব দুঃখ হ'লো। রাজা সবে দারোয়ানকে ফটক খোলার কথা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে—এমন সময়ে পেছনের ঝোপের

মধ্যে একটা কিসের আওয়াজ শুনতে পেলো ব্রাদার অ্যানান্সি। সে ফিরে তাকালো। এ কী! চাঁদের আলোর মধ্যে ও যে দুষ্টু ব্রাদার টাকোমা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! ফটক খোলা পেলেই ব্রাদার টাকোমা হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়বে আর রাজাকে খেয়ে ফেলবে। ব্রাদার অ্যানান্সি যে নিজের জন্যে ভয় পেয়েছে তা নয়। দয়ালু রাজাকে যে ব্রাদার টাকোমা মেরে ফেলবে এটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না।

'তাই দারোয়ান যখন ফটক খুলতে যাচ্ছে তখন ব্রাদার অ্যানান্সি আবার জোরালো গলায় গেয়ে উঠলো ;

না, না, দরজা খুলো না!
নইলে হবে বিষম দেরি,
কেউই রক্ষে পাবে না।
টাকোমা ঐ ঝোপে
গ্যাখো ওৎ পেতে রয় ব'সে,
দরজা খোলা দেখতে পেলে
ধাক্কা দেবে ক'ষে…
অলুক্ষুণে সময় কিনা,
হায়রে, অক্কা পাবো শেষে!'

ডেভিড মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, 'অ্যানান্সি কী বলতে চায় রাজা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। ওঁর লোকদের মধ্যে একজনকে বললেন ব্রাদার বুলের জন্য আবেং বাজাতে। জোয়ান, সদাশয় ব্রাদার বুল আবেং-এর শব্দ শুনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে সোজা রাজার প্রাসাদে চ'লে এলো। পালাতে পারার আগেই সে ব্রাদার টাকোমাকে পাকড়ে ফেললো। তারপর ওকে মেরে গবাগব খেয়ে ফেললো।'

একসঙ্গে সব ছেলেরা ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো, 'তা ব্রাদার অ্যানান্সির কী হ'লো?'

ডেভিড ব'লে চললো, 'রাজা তাকে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেলেন। তারপর ও যা খেতে চাইলো, যত ধনরত্ন চাইলো রাজা ওকে সব দিলেন। রাজা ব্রাদার অ্যানান্সির ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। ওর খুব শীত করছিলো, খিদে পেয়েছিলো, তা সত্ত্বেও ও তো নিজের কথা আগে ভাবেনি।'

ডেভিডের গল্প ফুরোলে বন্ধুরা সবাই হেসে উঠলো।

৪

খরগোশের পাড়া

ছেলেরা আবার এগোবার জন্যে তৈরি হ'লো। ওদের থলেগুলোকে ওখানেই রেখে দিলো। ওরা এখন বেড়ালের মতো হেঁটে চললো—খরগোশের পাড়ায় এসে গেছে যে ওরা। হাওয়া কীভাবে বইছে লক্ষ রাখতে হবে। গর্তের মধ্যে থেকে খরগোশ ধরতে গেলে শিকারীকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। শত্রু আছে কিনা বোঝবার জন্যে খরগোশেরা ওদের চোখ ও নাক দুই-ই কাজে লাগায়। তাই হাওয়ার উলটো দিকে থাকা দরকার। তাহ'লেই ওদের গায়ের গন্ধ হাওয়ায় অন্য দিকে ভেসে যাবে।

একটু পরেই একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পৌঁছুলো ওরা। অমনি টমি থেমে পড়লো।

'খরগোশদের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা,' টমি বললো। 'আমাদের তীরধনুক সব ঠিক ক'রে রেখে তারপর আমাদের পরামর্শের কাজ শুরু হবে।'

'শুনলি সবাই!' চার্লি বললো, 'ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছে যে ও সত্যিই সর্দার।'

'দরকার বুঝলে পরামর্শসভা করার অধিকার টমির আছে,' ইউরিয়া বললো, 'কারণ ওই তো আমাদের নেতা।'

'কিন্তু পরামর্শসভার তো কোনো দরকার নেই', চার্লি ব'লে চললো, 'কারণ, আমরা সবাই আগে খরগোশ শিকার করেছি আর কখন কী করতে হবে তা তো আমরা জানি।'

টমি উত্তর দিলো, 'ঠিক। কিন্তু এর আগে যা শিকার করেছি সে তো আমাদের বাবাদের সঙ্গে। আজ রাত্রেই আমরা প্রথম নিজেরা একলা, তাই আমাদের কী করা উচিত তা নিজেদেরই ভাবতে হবে। আমরা অনেক খরগোশ শিকার ক'রে গ্রামে ফিরতে চাই, যাতে সবাই বুঝতে পারে আমরা কত ভালো শিকারী। তাছাড়া আমরা যে কিশোর যোদ্ধা। তাই একটা পরামর্শ সভা দরকার যেখানে আমরা আলোচনা ক'রে নিতে পারি যে, সবচেয়ে ভালো ক'রে কীভাবে খরগোশ শিকার করা যায়।'

জনি, ডেভিড, ইউরিয়া সবাই টমির সঙ্গে একমত হ'লো ব'লে চার্লি বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ছেলেরা সব কাছাকাছি গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, ফিসফিস ক'রে কথা বললো।

'খরগোশ কী ক'রে শিকার করতে হয়, তা তো আমরা জানি,' টমি বললো। 'খরগোশেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে গেলে ওদের গর্তের মধ্যে পাথরের টুকরো পুরে দিতে হয়। তাহ'লে ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়িতে ওদের গর্ত খুঁজে পাবে না। গর্ত বন্ধ করার আগে যেন খরগোশ ধরার চেষ্টা না-করি। প্রথমে আমাদের তীরধনুক ছুরি সব এখানে রেখে খরগোশদের আস্তানায় ঢুকবো আর ওদের গর্তগুলো খুঁজে বার করবো।'

'ওদের ধরতে শুরু করবো কখন?' ডেভিড জিগেস করলো।

'আমি তিনবার ব্যাঙ ডাকবো,' টমি উত্তর দিলো। 'আমার ব্যাঙ ডাকা শুনতে পেলে তোরা ফিরে এসে তীরধনুক নিবি।'

'কিন্তু আমাদের ছুরি এ-সব এখানে রেখে যেতে হবে কেন?' চার্লি প্রশ্ন তুললো।

'কারণ ওগুলো নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারবো না, শব্দ হবে,' টমি উত্তর দিলো।

চার্লি একটু রাগত ভাবেই বললো, 'তুই কি আমাদের বিশ্বাস করিস না?'

টমি কোনো উত্তর দিলো না, কিন্তু লুকআউট পাহাড়ের দৌড়-প্রতিযোগিতার কথা তার মনে প'ড়ে গেলো। অন্য কিশোর যোদ্ধাদের সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে, কিন্তু না, চার্লিকে না।

'ওঃ চার্লি, তুই বড্ড কথা বাড়াচ্ছিস,' ইউরিয়া বললো, 'আমরা জানি টমি কী বলতে চায়।'

'ঠিক আছে, টমি,' জনি বললো, 'তুই আমাদের আগে চল এবং কখন ধনুক রাখতে হবে ব'লে দিস।'

টমি আবার চলতে শুরু করলো, আর অন্য সবাই নিঃশব্দে ওর পেছন পেছন চললো। সামনে যখন একগাদা পাথরের চাঁই চোখে পড়লো তখন টমি ওর হাত উঁচু করলো, আবার নামিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা তাদের ধনুক মাটিতে নামিয়ে রাখলো। টমি ওর হাত টান-টান ক'রে কাঁধ পর্যন্ত তুললো, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই হাত জোড়া লাগালো।

মেরুনদের মধ্যে এটা একটা শিকারের সংকেত। ছেলেরা এ-সংকেত জানতো। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে হাতের উপর ভর দিয়ে ব'সে পড়লো। টমি যখন ওর জোড়া লাগানো হাত ওপরে তুললো এবং তারপর হাতের জোড়া খুললো, ওরা একটু-একটু ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকলো।

টমি একেবারে মাটিতে ঘেঁষে রয়েছে এবং গুঁড়ি মেরে একটু-একটু ক'রে এগোচ্ছে। ওর দু-চোখ মাটিতে খরগোশের গর্ত খুঁজছে। একটু পরেই সে প্রথম গর্তটা দেখতে পেলো এবং পাথর চাপা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলো। ক্রমে-ক্রমে চারদিকে অনেক গর্ত দেখা গেলো। সবেমাত্র টমি পাথর দিয়ে একটা বড়ো গর্তের মুখ যেই বন্ধ করেছে অমনি সে তার প্রথম খরগোশ দেখতে পেলো। বেশ দিব্যি গোলগাল একটা খরগোশ, আর তার গায়ের লোম চাঁদের আলোয় এত সুন্দর ধূসর দেখাচ্ছে। খরগোশটা ব'সে ব'সে ওর ছোট্ট কানদুটো সামনে পেছনে আর নাকটাকে হাওয়ায় নাড়াচ্ছিলো। ও যেন হাওয়ায় কোনো গন্ধ খুঁজছে। এই যাঃ, খরগোশটা হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো।

আবার চলতে শুরু করার আগে টমি একটু অপেক্ষা করলো। একটু পরেই গাছপালার জঙ্গল শুরু হ'লো। টমি বুঝলো যে ওরা খরগোশদের আস্তানা পার হ'য়ে এসে পড়েছে। ও তিনবার ব্যাঙ ডাকলো আর তাই শুনে ছেলেরা তাদের ধনুকের জন্য পেছন ফিরলো।

'আমরা আবার ভেতরে যাবো,' টমি বললো। 'আমরা প্রত্যেকে যে-যে হাতিয়ার সবচেয়ে ভালো চালাতে পারি তাই ব্যবহার করবো। ইউরিয়া আর চার্লি, তোরা ছুরি নে। ডেভিড, তুই শিকার করিস ঢিল ছুঁড়ে। জনি আর আমি ধনুক ছুঁড়বো।'

'আমিও কেন ধনুক ছুঁড়তে পারবো না?' চার্লি জিগেস করলো।

'কারণ, আমরা চাইনা যে তুই খরগোশের বদলে আমাদের গায়েই তীর ছুঁড়িস,' হাসতে-হাসতে বললে ডেভিড।

ছেলেরা খুব চুপিসাড়ে এগোচ্ছিলো। মেরুনরা তো শিকারের উপরেই জীবনধারণ করতো আর পাহাড়চুড়োর মানুষেরা এই খরগোশ খাবে। তীর, ছুরি ও পাথর ছোঁড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ছেলেরা শিকারী হিশেবে সত্যিই ভালো। খরগোশ বেচারিরা প্রায় কেউই রেহাই পেলো না।

একটু পরে টমি আবার ব্যাঙ ডাকলো এবং সব ছেলেরা ওর কাছে চ'লে এলো। ওরা তখন হাঁপাচ্ছে, পাহাড়ের ওপর ওঠা-নামা করা বেশ পরিশ্রমের কাজ।

'এবার খরগোশগুলো সব জড়ো করা যাক, চল্, শিবিরে ফিরে যাই,' টমি বললো। 'চাঁদ ডুবে যাচ্ছে এবার। এখন যদি খরগোশ আসেও তাহ'লে আর দেখতে পাবো না।'

'হ্যাঁ, আর কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে আমাদের,' ইউরিয়া বললো।

ছেলেরা ওদের খরগোশ জড়ো ক'রে শিবিরে ফিরে এলো। ওরা যে সব থলে এনেছিলো খরগোশগুলোকে তার মধ্যে পুরে নিলো। তারপর গাছের ডালপাতা দিয়ে একটা বিরাট ঝোপের মতো বানালো। আর তার নিচে ওরা গুঁড়ি মেরে-মেরে ঢুকে গেলো। একটু পরেই ওদের গা গরম হ'য়ে এলো, আর আরামে ওদের চোখে ঘুম নেমে এলো।

৫

লালকোর্তারা

গাছের মধ্যে দিয়ে সকালের আলো ফুটতেই টমির ঘুম ভাঙলো। ওর পাশে জনিও নড়াচড়া করছিলো। অল্প পরে, একটু-একটু ক'রে অন্য কিশোর যোদ্ধারাও জেগে গেলো। ওদের মাথায় আর মুখের চারপাশে পাতার ছাওয়া। এ ওর দিকে তাকিয়ে ওরা হাসলো।

হাসতে-হাসতে ওরা যে যার জিনিসপত্রও গোছাচ্ছিলো। ওরা পাহাড়ের আরো ভিতরে পিমেনটো সড়ক ব'লে একটা জায়গার দিকে যাবে। ওখানে পাখি শিকার হবে। সবাই যখন তৈরি হ'লো, টমি তখন আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এবার ওরা পুবের দিকে ফিরলো। ওদের খরগোশ-ভর্তি থলেগুলো পাতার নিচে রেখে পাথর চাপা দিয়ে ওরা চ'লে গেলো।

পিমেনটো সড়ক হ'লো গাছগাছালিতে ভর্তি একটা জায়গা। ওখানে খাবারের সন্ধানে নানারকম পাখি আসতো। যেতে-যেতে ছেলেরা হাতের নাগালে যে-সব গাছ পাচ্ছে তাদের ডালপালা ভাঙতে-ভাঙতে এগুচ্ছে। ঐ সব ডালপালা দিয়ে ওরা নিজেদের আপাদমস্তক মুড়ে নিলো। ওদের দেখাচ্ছিলো ঠিক যেন একেকটা চলন্ত গাছ। প্রত্যেকটি কিশোর যোদ্ধা গাছের ডাল-পালায় ঢাকা পড়েছে, কেবল ওদের হাতগুলো আলগা রয়েছে।

টমির সংকেত পাবামাত্র ছেলেরা সব আলাদা-আলাদা হ'য়ে গেলো। প্রত্যেকে যে যার পছন্দমতো কোনো জায়গা বেছে নিলো। চারদিকে সব নিস্তব্ধ, ছেলেরা চুপচাপ অপেক্ষা করছে। আস্তে-আস্তে পশ্চিম দিক থেকে দলে-দলে পাখিরা আসতে শুরু করলো। মেরুন ছেলেরা সূর্যের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো। ওরা মুহুর্মুহু ধনুকে তীর পরাচ্ছে আর ছুঁড়ছে। কয়েকটা তীর ফসকালো বটে, তবে পাখিও মরলো বেশ অনেক। এবং মাটিতে-পড়া এ-সব পাখি পাহাড়চুড়ো গ্রামের রান্নার হাঁড়িতে যাবে।

পাখিগুলো কুড়োতে-কুড়োতে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলো। শিকার ভালোই হয়েছে।

'মনে আছে গতবার বা তার আগের বার যখন কিশোর যোদ্ধারা শিকারে

বেরিয়েছিলো ?' ডেভিড জিগেস করলো। 'ওরা কিন্তু আমাদের মতো এতটা ভালো করতে পারেনি।'

'আমরা কিন্তু গর্ব ক'রে বলতে পারি,' ইউরিয়া বললো, 'গ্রামের লোকেরা অনেকদিন ধ'রে আমাদের খাবারই খাবে।'

'এবার আমাদের ফেরা উচিত,' টমি বললো। 'চলো, পাখিটাখি কুড়িয়ে নিয়ে এবার চলো।'

ছেলেরা পাখিগুলো কুড়োতে আরম্ভ করলো। অন্য ছেলেরা যখন কথা বলছিলো জনি ততক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো। সে এবার ঘাড় একদিকে কাত করলো। যেন সে কিছু শুনছে।

'কী হ'লো, জনি ?' টমি জিগেস করলো।

'জানি না তো।' জনি বললো।

'তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' জনি বললো। ওর চোখ আধবোঁজা।

টমি জানতো যে জনির চোখ ও কান অন্য অনেক ছেলের চেয়ে বেশি সজাগ। তাই সে এক অদ্ভুত ধরনের বাঁশি বাজালো। আর ছেলেরা চুপচাপ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। টমি বিপদের সংকেত দিয়েছে। ও ওর হাত উঁচু করলো এবং ওরা সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

জনি এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। একটু পরেই, বন্ধুরা দেখলো ও পুবের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কিছু পাখি গাছ থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।

জনি ফিসফিসিয়ে একটিই শব্দ বললো, 'লোক।'

'কে ?' টমি জিগেস করলো।

'দেখা যাক,' জনি বললো।

একটু পরে ও যেন পশ্চিম দিক থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছে মনে হ'লো। আরো-কিছু পাখি হঠাৎ গাছ থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।

'হ্যাঁ, ওদিকেও,' জনি বললো, 'লোক।' মেরুন তরুণেরা সব টমির দিকে ফিরলো। ওই তো তাদের নেতা। সত্যিই যদি বিপদ এসে থাকে তাহ'লে সে ব'লে দেবে কী করতে হবে।

সত্যিই যদি বনের মধ্যে অন্য লোক এসে থাকে, তবে সেটা ছেলেদের পক্ষে খুবই বিপদের কথা। এ-লোকেরা নিশ্চয়ই মেরুন নয়। মেরুনরা এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে পাখিরাও তাদের অস্তিত্ব টের পায় না।

'টমি, আমরা কী করব এখন?' চার্লি ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো। ও যেন ভয় পেয়েছে।

টমি ঠিক বুঝতে পারছে না কী করা উচিত হবে। দেশের ভেতরে তো সে কখনো শত্রু দ্যাখেনি। মেরুন ও লালকোর্তাদের যুদ্ধের কথা সে কেবল গল্প শুনেছে মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ কী ক'রে করতে হয় এবং বনের মধ্যে কীভাবে চলতে হয় এ-সব বিষয়ে তো তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই সে চার্লির দিকে চেয়ে অল্প-একটু হাসলো।

'কিছুটা স্কাউটিং করতে হবে আর কি,' টমি বললো।

'স্কাউটিং? কিন্তু আমরা পালিয়ে যাচ্ছি না কেন? আমরা তো ছোটো ছেলের দল! আর ওরা যদি সত্যিই ইংরেজ সৈন্য হয়, তাহ'লে আমরা তো ওদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবো না।' চার্লি প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো।

'ওদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করতেই হবে টমি তো সে-কথা বলেনি,' ইউরিয়া বললো। 'ও বলেছে যে আমাদের একটু স্কাউটিং করা উচিত, তাহ'লেই বুঝতে পারবো ওরা কারা।'

'হ্যাঁ, ওদের পেছন-পেছন গিয়ে দেখার চেষ্টা করা উচিত,' ডেভিডও ওদের মতে মত দিলো। ও চার্লির দিকে তাকিয়ে বললো, 'চার্লি আর আমিই যাবো।'

'না, আমি বলছি আমাদের পালানো উচিত। আমাদের এখুনি পাহাড়-চুড়োয় ফিরে গিয়ে ওদের জানানো দরকার।' চার্লি বললো।

'কী বলবো ওদের আমরা?' টমি জিগেস করলো। 'বলবো যে কিছু পাখি বনের ভিতর থেকে উড়ে আসছিলো, আর তাই দেখে আমরা দৌড়ে পালিয়ে এসেছি?'

'ওদের বোলো যে বনে ইংরেজ এসেছিলো,' চার্লি চীৎকার ক'রে বললো।

'কিন্তু সর্দার ফিলিপ জিগেস করবেন পাহাড়ের মধ্যে ক-জন ঢুকেছিলো,' টমি বললো। 'জানতে চাইবেন ওদের হাতে অস্ত্র ছিলো কিনা, বন্দুক ক'টা ছিলো। আর তা ছাড়া, আমরা তো জানিই না ওরা সত্যিই লালকোর্তার দল কিনা।'

'টমি, যদি স্কাউটিং করতে হয়, তাহ'লে কিন্তু এখনি শুরু করা দরকার,' জনি বললো।

'ঠিক আছে জনি, চলো,' টমি বললো। 'ডেভিড, তুমি আর আমি পুবের দিকে যাবো। জনি আর ইউরিয়া, তোমরা অন্য দিকে যাও।'

'আর আমি কী করবো?' চার্লি জিগেস করলো।

'আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছো,' টমি বললো।

'আমি তো আর একলা যেতে পারবো না,' চার্লি বললো।

'তাহলে এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করো। যে-সব পাখি শিকার করা হয়েছে সেগুলোকে লুকিয়ে রেখো। দেখো যেন তীরটির মাটিতে প'ড়ে না থাকে। আর লোকেরা পার হ'য়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রেখো। ওরা যদি আমাদের বন্ধু হয় তা'হলে আমরা সঙ্কেত দেবো।'

অন্যান্য ছেলেরা চার্লিকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলো। টমি ও ডেভিড গেলো পুবের দিকে। একেবারে নিঃশব্দে ওরা এক গাছ থেকে আর-এক গাছের পিছনে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে গেলো। পায়ের আঙুলের ঠিক নিচে পায়ের তলার নরম অংশের উপরে ভর দিয়ে-দিয়ে ওরা হাঁটলো। এইভাবেই হাঁটতে শেখানো হয়েছে ওদের।

একটু দূর যাবার পর টমি ও ডেভিড কিছু একটা শোনবার জন্য থেমে দাঁড়ালো। শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এ ওর দিকে তাকালো ওরা। যে-লোকেরা এগিয়ে আসছে তারা মেরুন হ'তে পারে না। ছেলেরা ওদের অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, মাটিতে বুটের খটখট শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

'এ তো প্রায় ঘোড়ার আওয়াজের মতো,' ডেভিড ফিশফিশ ক'রে বললো। 'ওদের যদি শিকার ক'রে জীবনধারন করতে হয়, তাহ'লে আর খাবার জোটাতে হবে না কোনদিন।'

টমি ইঙ্গিতে মাটির দিকে দেখালো। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে একবারে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো। এ ওর দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো। টমির গোড়ালির পিছন দিকে কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো। ডেভিড তার উপর আরো-কিছু পাতা চাপা দিলো।

সোজা মাটি ঘেঁষে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো টমি। ডান দিকে সে একটা গাছের গুঁড়ি দেখতে পেলো। এক সারি পিঁপড়ে গাছটা বেয়ে উঠছে আবার ঘুরে নেমে আসছে। যখনই দুটো পিঁপড়ে পাশাপাশি পার হয় তখনই যেন একটু করে থেমে যায়। টমি জানতো যে ওরা গন্ধ শুঁকে-শুঁকে নিজেদের পথের নিশানা ঠিক রাখে। টমি নিজের আঙুল দিয়ে একটা ছোট্ট জায়গা একটু টিপে দিলো। প্রথম পিঁপড়ের দল যারা ওখানে এলো সব দলা পাকিয়ে থেমে গেলো। পরে আরো এক দল এলো। কেউ

কেউ থামলো, কেউ-কেউ এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে পড়লো। টমি হঠাৎ পিঁপড়ে দেখা বন্ধ করলো। বুটের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

প্রথম সৈন্যদের যখন দেখতে পেলো, তখন টমি সত্যি দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। ওদের ঐ বুট দেখেই তার ভয়। বিরাট বড়ো-বড়ো বিশ্রী দেখতে বুট-গুলো, আর তার নিচে যাই পড়বে তাই গুঁড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। টমি সামনের লোকটিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। এই প্রথম সেই লাল কোট দেখা, যে লাল কোটের জন্য ওদের নাম 'লালকোর্তা'। সৈন্যটির মুখ সে দেখতে পায়নি, কিন্তু তার হাতে যে বন্দুক ছিলো সেটা টমি স্পষ্ট দেখেছে।

ওর পেছনে-পেছনে আরো অন্য সৈন্যরাও ছিলো। ওরা সবাই খুব আস্তে হাঁটছিলো। টমি বুঝলো স্কাউট হিসেবে ওরা এখনো তত পোক্ত নয়। কিন্তু হঠাৎ ডান হাতের একটা যন্ত্রণায় ওর চিন্তা সৈন্যদের থেকে স'রে গেলো। ও নিচু হ'য়ে তাকালো। দুটো পিঁপড়ে হাতের নিচের দিকে ঢুকেছে। ওদের চলবার পথ তো ভেঙে গেছে, তাই ওরা এখন এধার-ওধার এলোমেলো করছে।

টমি আরো-একবার তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো। ও ঘামতে শুরু করলো। কিন্তু নড়াচড়া করতে সাহস হচ্ছে না। লালকোর্তারা একজন দুজন ক'রে এখনো যাচ্ছে। এই ভাবে প্রায় আরো দু-মিনিট পিঁপড়েরা একটু একটু ক'রে টমির মাংস খুবলে খেলো, আর তাকে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে হ'লো।

শেষ সৈন্যটি চ'লে গেলে ডেভিড ওর দিকে তাকালো। টমির মুখের উপর এখনও বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ওর মনে হ'লো টমি খুব ভয় পেয়েছে।

'কী, খুব ভয় পেয়েছিস নাকি?' ডেভিড ফিসফিস করে জিগেস করলো। টমি কোনো উত্তর দিলো না। বদলে, সে তার হাতখানা টেনে এনে ডেভিডকে দেখালো। একটা পিঁপড়ে প'ড়ে গেছে, কিন্তু আর-একটা তখনো কামড়ে ধ'রে রয়েছে। হাতের পিছন দিকটা ইতিমধ্যেই একটু ফুলতে শুরু করেছে।

'এ কী!' ডেভিড চমকে উঠলো। 'কখন হ'লো? যখন সৈন্যরা যাচ্ছিলো তখন নাকি?'

'হ্যাঁ,' টমি উত্তর দিলো। ডেভিড টমির হাতের উপর থেকে শেষ পিঁপড়ে-টাকে রগড়ে মাটিতে ফেলে দিলো। হাতের ব্যথাটাও অমনি একটু কমলো। খুশি হ'য়ে টমি হাসতে-হাসতে ডেভিডের দিকে তাকালো।

'দোষটা অবশ্য আমারই,' টমি বললো। কী ভাবে ও পিঁপড়ের সারির যাবার পথ নষ্ট করেছিলো সে-কথা ডেভিডকে বললো।

'ক'জন সৈন্য ছিলো?' টমি জিগেস করলো।

ডেভিড ওর দুহাত দু-বার তুলে দেখালো। তার মানে কুড়িজন। ওরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো যাতে সৈন্যরা চার্লিকে পার হ'য়ে যায়। একটু পরে ওরা চার্লির ব্যাঙ ডাকা শুনতে পেলো। উঠে, তাড়াতাড়ি ওরা চার্লির কাছে ফিরে গেলো। জনি আর ইউরিয়া ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

চার্লি বলছিলো, 'ওরা প্রায় আমার গা ঘেঁষে যাচ্ছিলো। আমি প্রায় ওদের ছুঁয়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু ওরা তো অন্ধ ছিলো।'

'তীর এবং অন্যান্য জিনিস সব মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলে তো?' জনি জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই', চার্লি বললো।

'নিয়ে থাকলে ভালোই, কেননা একজন সৈন্য কিন্তু আবার ফিরে আসছে,' জনি বললো।

ছেলেরা আবার নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে গেলো। টমি জনির দিকে চেয়ে দেখলো ও তার মাথার পিছন দিয়ে অনেক দূরের দিকে দেখছে। টমিও সেইদিকে তাকালো। ওরা একজন লালকোর্তাকে দেখতে পেলো। ঐ পাশের পরিষ্কার জায়গায় সবে এসে দাঁড়িয়েছে সৈন্যটি। গাছের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর হাতের বন্দুক একেবারে তৈরি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু ওর চোখে তো গাছ ছাড়া কিছুই পড়ছে না। টমি ও তার দলের কিশোর যোদ্ধাদের তো ও দেখতেই পাচ্ছে না। কারণ ওরা তো গাছের ডালে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে। তারপর সৈন্যটি তার হাতের কি যেন একটা জিনিসের দিকে তাকালো। এ কী! এ যে তীর!

সৈন্যটি নিজের মনেই বললো, 'এ নিশ্চই কোনো পুরনো তীর, এখানে তো কাছাকাছি লোকজন কাউকে দেখছি না।' ও আবার পিছন ফিরে ওর নিজের দলের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইউরিয়া ঝট ক'রে চার্লির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তুমি না বললে যে সবকিছু তুলে নিয়েছো মাটি থেকে! তোমাকে আমরা কী মনে করি, জানো? শুনতে চাও!'

চার্লি খুব লজ্জা পেলো।

'আমি সত্যিই দুঃখিত', চার্লি বললো। 'আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে সবগুলো তোলা.হ'য়ে গেছে। যাক, কোনো ক্ষতি তো হয়নি।'

'নাঃ, ক্ষতি আর কী! আমরা সবাই মিলে ধরা পড়তে পারতাম, খতমও হ'তে পারতাম,' ডেভিড বললো। 'তোমাকে কেন কিশোর যোদ্ধা করা হয়েছিলো, বলতে পারো?'

'চুপ।' টমি শক্ত ভাবে বললো। চার্লির মুখের রেখায় সে যন্ত্রণার ছায়া দেখতে পেয়েছে। জনি আর সে তো জানতো যে চার্লি কী ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। সে যে সবাইকে ঠকিয়েছে, নিজেই তা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

'ঠিক আছে। ভুল তো আমরা যে কেউই করতে পারতাম।' টমি বললো। 'কিন্তু এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পাহাড়চুড়োয় ফিরে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা পরামর্শসভা ক'রে নেওয়া যাক। চার্লি, তুমি কিছু বলতে চাও?'

চার্লি মাথা নেড়ে 'না' ব'লে দিলো। টমি অন্যান্যদের প্রত্যেকের দিকে তাকালো। যখন ইউরিয়ার সময় এলো সে বললো:

'এই পাখি এবং খরগোশগুলো আমাদের সংগ্রহ হয়েছে। এগুলোকে নিয়ে তো তাড়াতাড়ি চলা বেশ মুশকিল হবে।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাহলে, কী করা হবে?' টমি জিগেস করলো।

'আমাদের মধ্যে একজনের যাওয়া উচিত,' জনি বললো।

'জনি ঠিক বলেছে, কিন্তু আমি দু-জনকে পাঠাতে চাই। একলা পেলে যদি তার কিছু হয়,' টমি বললো।

'আর অন্যেরা পিছন-পিছন আস্তে-আস্তে যাবে, এই বলতে চাইছো তো?' ডেভিড বললো। 'আর তারাই পাখি আর খরগোশগুলো নিয়ে যাবে।'

'হুঁ', টমি বললো, 'সত্যিই যদি লালকোর্তারা গ্রাম আক্রমণ করে, তাহ'লে তো পাখি, খরগোশ আরো বেশি ক'রে লাগবে। কাজেই ওগুলো আমাদের নিতেই হবে।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের গ্রাম কিছুতেই খুঁজে পাবে না,' ইউরিয়া বললো।

'ওরা ন্যানি শহর খুজে পেয়েছিলো,' জনি শান্ত ভাবে বললো।

মেকনদের ইতিহাসের এক অতি করুণ কাহিনী মনে প'ড়ে গেলো সবায়। ন্যানি শহরও ছিলো পাহাড়ের উপর অনেক উঁচুতে, কিন্তু লালকোর্তারা ঠিক পাহাড় বেয়ে-বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলো। লোকজনদের একেবারে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে ওরা গোটা গ্রাম ধ্বংস ক'রে ফেলেছিলো। সেই থেকে

পাহাড়চুড়োর মতো গ্রাম থেকে পাহারার জন্য সবসময়ে স্কাউট পাঠানো হয়।

জনি টমিকে বললো, 'ইউরিয়া আর আমি যে সৈন্যদের দেখেছিলাম তাদের কাছে কিন্তু ঘুরন্ত বন্দুক ছিলো।'

ঘুরন্ত বন্দুক! সেইসব বড়ো বন্দুক, যেগুলো সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে চারদিকে ঘোরানো যায়। ন্যানি শহর তো এই ঘুরন্ত বন্দুকেই ধ্বংস হয়েছিলো।

'কিন্তু পাহাড়চুড়োয় অত সুবিধে হবে না,' টমি বললো। 'আমাদের স্কাউটরা চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। তবে স্কাউটরা যখন ওদের দেখতে পাবে তখন ওরা গ্রামের খুব কাছে গিয়ে পড়বে, এবং ওদের হাতে থাকবে সেই ঘুরন্ত বন্দুক। জনি আর আমি তো লালকোর্তাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। আমাদের স্কাউটরা লালকোর্তাদের দেখতে পাবার আগেই আমরা পাহাড়চুড়োয় পৌঁছে যাবো।'

'তুমি আর জনি যাচ্ছো?' ইউরিয়া জিগেস করলো। 'তার চেয়ে চার্লিকে সঙ্গে নাও না কেন? লুকআউট দৌড়ে ওই তো জিতেছিলো।'

টমি চার্লির চোখের দিকে তাকালো, কিন্তু চার্লি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

'চার্লি তোমাদের পাখি ও খরগোশগুলো ব'য়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে,' টমি বললো। 'জনির চাইতে ওর গায়ে জোর বেশি, কাজেই ও বেশি বোঝা বইতে পারবে। ঠিক না, চার্লি?' টমি ওকে জিগেস করলো।

চার্লি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হ'য়ে গেলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোঝা বইবো।'

ডেভিড যেন একটু অবাক হ'য়ে তাকালো। 'এই প্রথম চার্লি একটা ভারি কাজ করতে রাজি হ'লো,' ডেভিড বললো।

'ও ঠিক আছে, ঠিক আছে,' টমি তাড়াতাড়ি বললো। 'এখুনি যেতে হবে আমাদের। তোমরা তো সবাই জানো খরগোশগুলো কোথায় আছে। গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে খুব সাবধান হবে। লালকোর্তারা সাধারণতঃ খুব আওয়াজ-টাওয়াজ করে বটে, কিন্তু ওদের গায়ের মধ্যে গিয়ে প'ড়ো না যেন। খাওয়া দাওয়া বা কোনোকিছুর জন্য তো হঠাৎ কোথাও থেমে যেতে পারো। যাই হোক, খুব সাবধান।'

টমি আর জনি ওদের ধনুক খুলে অন্য ছেলেদের হাতে দিলো। ওদের তীরও ছেলেদের দিয়ে দিলো। ওদের হাতে এখন শুধু ছুরি। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

৬

মেরুনদের পরিকল্পনা

টমি ও জনি এত জোরে এর আগে আর কখনো দৌড়োয়নি। লালকোর্তারা তাদের গ্রাম খুঁজে পাবার আগে সর্দার ফিলিপের হাতে কতটা সময় থাকবে তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। তিনি হয়তো গ্রামের মহিলাদের এবং বাচ্চাদের অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ছুটতে-ছুটতে জনি টমিকে একটা সাংঘাতিক কথা বললো। টমি যে সৈন্যদলকে দেখেছে তারা নাকি আসল দল নয়। জনি শ' খানেকের বেশি লোক এবং নিদেন পাঁচটা ঘুরন্ত বন্দুক দেখেছে।

ওরা অনেকটা ঘুরপথে দৌড়ুচ্ছিলো যাতে কোনো লালকোর্তার চোখে প'ড়ে না যায়। ফলে নিজেদের কোনো স্কাউটকেও ওরা দেখতে পায় নি। গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে টমি বার দুয়েক পড়ো-পড়ো হয়েছিলো, তবে না-থেমে সে দৌড়েই চললো। জনি নিজের বেগ একটু কমিয়ে ওর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ুলো।

ওরা ঠিক দুপুর বেলায় গ্রামের রাস্তায় এসে পৌঁছলো। গ্রামের একজন ওদের দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলো। দেখতে-দেখতে অনেক লোক এসে জড়ো হ'লো, অনেক আনন্দধ্বনি হ'লো এবং ওদের একেবারে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে চললো সকলে। তারপর একটা গাছের ছায়ার নিচে ওদের নিয়ে নামালো। সেখানে ওরা সব খুলে বললো। মেরুনদের কয়েকজন তখুনি ছুটলো সর্দার ফিলিপকে খবরটা দেবার জন্য। একটু পরে আবেং-এ যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো, আর গ্রামের সব লোক চারদিক থেকে দৌড়ে এসে জড়ো হ'লো।

টমিও আবেং-এর আওয়াজ শুনেছিলো। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ওর মা ওকে চেপে ধ'রে বসিয়ে দিলেন।

'এটা খেয়ে নে, বাবা', মা বললেন। মা ওকে চা খাওয়াচ্ছিলেন। আখের রস দিয়ে মিষ্টি-করা চা। টমি সবটুকু খেয়ে ফেললো।

'এখন কেমন লাগছে রে?' মা জিগেস করলেন।

'অনেকটা ভালো,' টমি বললো। 'আমি সত্যিই এখন উঠে পড়তে পারি।'

'যাও এবার তাহ'লে সভার ঘরে যাও। সর্দার ফিলিপ তোমাকে ঠিক ঢুকতে দেবেন।'

হ্যাঁ, মা ঠিকই বলেছিলো। টমি দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলে সভার একজন ওর জন্য দরজা খুলে দিলো।

'এই তো, তোমাকে ডাকতে সবে লোক যাচ্ছিলো,' লোকটি বললো, 'যাও, জনি ভেতরে আছে। সর্দার তোমাদের দুজনকেই চান। যাও, ভেতরে যাও তোমাদের সবার জন্য আমরা সত্যিই গর্বিত।'

একটা বড়ো ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকলো টমি। পরামর্শ পরিষদের সব লোক আর বড়ো যোদ্ধারা সবাই উপস্থিত আছেন। টমির বাবাও ঘরের মধ্যে কোথাও আছেন নিশ্চয়ই, তবে টমি ওঁকে খোঁজার চেষ্টা করলো না। সে সোজাসুজি সর্দার ফিলিপের দিকে তাকালো।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা ছোটো তক্তপোশের উপরে বসেছিলেন সর্দার। জনিকেও সেই একই তক্তপোশের উপরে বসে থাকতে দেখে টমি আনন্দে প্রায় লাফিয়েই উঠেছিলো। সে নিজে বসেছিলো সর্দারের পায়ের কাছে মেঝেতে। হঠাৎ শুনতে পেলো সর্দার টমির নাম ধ'রে ডাকছেন।

'টমি, উঠে এসে জনির সঙ্গে বোসো,' সর্দার ফিলিপ বললেন।

টমি তড়াক ক'রে এক লাফে তক্তপোশের উপরে উঠে বসলো। তার সবটা স্বপ্নের মতো লাগছে।

জনিকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিলো। সে বললো, 'টমি, আমার পাশে এসে বোস।'

'তোর ভয় করছে না, জনি?' টমি ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো।

'না,' জনি বললো। 'আমার বরং বনের মধ্যে ভয় করছিলো'

টমি ভাবলো, 'এ তো বড়ো আশ্চর্য! আমার এখনই ভয় করছে, আর জনির এখন একটুও ভয় হচ্ছে না। অথচ বনের মধ্যে আমার একটুও ভয় করে নি।'

সর্দার কথা বলতে শুরু করলেই টমি নিজের চিন্তা বন্ধ করলো।

'ক্যাপটেন ডিক, আপনি কি স্কাউটদের সংখ্যা বাড়িয়েছেন? পাহারা দেবার লোক কি আরো পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সর্দার', ক্যাপটেন ডিক বললেন। 'আগে যেখানে একজন স্কাউট ছিলো এখন সেখানে তিনজন আছে। পাহারাদারের সংখ্যাও ঐ রকমই

বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু গাছে ওদের চড়ানো হয়েছে, এবং এক-একটা গাছ আমাদের পাহাড়চুড়ো থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। আর আমাদের স্কাউটরা আরো দূরে চ'লে গেছে। ওরা লালকোর্তাদের দেখার চেষ্টা করছে, খবর পেলেই তা আমাদের জানিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে,' সর্দার বললেন। 'যদি দরকার হয় তাহ'লে কিন্তু গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। মেয়েরা যেটুকু জিনিসপত্র নিজেরা বইতে পারবে মাত্র সেইটুকুই যেন নেয়। আমাদের হয়তো খুব তাড়াতাড়ি যেতে হ'তে পারে। এবার একটু যুদ্ধের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার। টমি আর জনির কথা অনুসারে লালকোর্তারা সংখ্যায় প্রায় একশো কুড়িজন। ওদের হাতে আছে ছ-সাতটা ঘুরন্ত বন্দুক। আর আমাদের আছে মাত্র জন পঞ্চাশেক লোক। এর মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁরা আছেন আর কিশোর যোদ্ধারাও আছে। অথচ আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কিন্তু সাহায্য আসতে-আসতে হয়তো গ্রাম রক্ষা করার সময় আর পাওয়া যাবে না,' যোদ্ধাদের মধ্যে একজন বললো।

মেরুনদের মধ্যে অনেকে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো। মাঝে-মাঝে সর্দার এক-একজনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। তখন সে-ই কথা বলছে, অন্যেরা চুপ ক'রে যাচ্ছে।. এইভাবে আলোচনায় যুদ্ধের অনেক পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হ'লো। কিন্তু কোনোটাতেই একমত হওয়া গেলো না।

'দয়া ক'রে...' জনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সর্দার ওর কথা শুনতে পেলেন না।

'সর্দার, দয়া ক'রে যদি একটু শোনেন,' জনি এবার জোরে চীৎকার ক'রে বললো।

বিস্ময়ে টমির চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে উঠছে। জনি করছে কী? সে কি কাউন্সিলের মিটিং-এ বক্তৃতা করবে না কি? ছেলেদের মধ্যে কাউকে এর আগে সেখানে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

'সর্দার, দয়া করে', এবার জনি ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে বললো। আর সেই সঙ্গে জোরে সর্দারের পা চেপে ধরলো।

সর্দার রাগত ভাবে জনির দিকে তাকালেন। আর এবার টমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলো।

'সর্দার, দয়া ক'রে শুনুন। আমরা খরগোশগুলোকে যা করেছিলাম, আপনি লালকোর্তাদের তাই করছেন না কেন?' জনি ব'লে ফেললো।

সর্দার ফিলিপ হাত উঁচুতে তুললেন। সকলেই চুপ ক'রে গেলো। সবাই এখন জনির দিকে তাকিয়ে।

'তুমি কী বলতে চাও?' সর্দার জিগেস করলেন। 'খরগোশ ধরার মতো ইংরেজ সৈন্য ধরব কী ক'রে আমরা?'

'কাল রাত্রে টমি আর আমি খরগোশ ধরার জন্য একটা ভারি বুদ্ধি বার করেছিলাম,' জনি ব'লে চললো। 'আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সেই একই বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারি।'

সর্দার মাথা নাড়ালেন। ওঁর মুখ ভাঁজে-ভাঁজে শক্ত হ'য়ে উঠছে।

'ঠিক এই মুহূর্তে একজন কিশোর যোদ্ধা রসিকতা করবে এটা আমি ভাবিনি,' উনি বললেন।

'আমি রসিকতা করিনি, সর্দার,' জনি বললো।

এবার বন্ধুর হ'য়ে টমিও দুটো কথা বলবে ব'লে ঠিক করলো।

'জনি ঠাট্টা করছে না, সর্দার,' টমি বেশ জোর গলায় বললো। 'আমাদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে চালাক।'

সর্দার ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা সত্যি কী দাঁড়াচ্ছে?

'বেশ জনি,' উনি অনুমতি দিলেন। 'বলো, তুমি কী বলতে চাও।'

'তবে সবাই শুনুন, গত রাত্রে আমরা বুঝেছিলাম যে খরগোশগুলোকে গর্তে ঢুকতে দিলে আমাদের চলবে না। তাই পাথর চাপা দিয়ে তাদের গর্তের মুখ আমরা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। আর তাই খরগোশদের বাইরে রাত কাটাতে হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব তো আমরা জানি। কিন্তু লালকোর্তারা তো আর গর্তে ঢুকতে চাইবে না,' সর্দার ফিলিপ বললেন।

'না, তা চাইবে না। তবে তারা আমাদের গ্রামে ঢুকতে চেষ্টা করবে। কাজেই সেটা আমাদের বন্ধ করতেই হবে।'

টমি এতক্ষণে স্বস্তি বোধ করলো। ওর বন্ধু যে কী বলতে চায় সেটা এবার ও বুঝতে পারছে।

'হ্যাঁ, জনি ঠিক,' টমি চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমরা ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে ওদের দূরে নিয়ে যাবো।'

'আর এইভাবে যখন ওদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই অবসরে আপনি সাহায্য চেয়ে পাঠাতে পারেন,' জনি ব'লে চললো।

একসঙ্গে একটা বিরাট আওয়াজ ক'রে উঠলো সকলে। লোকেরা সব লাফিয়ে উঠে ছেলেদের অভিনন্দন জানালো। সর্দারও ওদের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন।

অবশেষে সর্দার ওঁর হাত তুললেন এবং গোলমাল থেমে গেলো।

'পরামর্শ পরিষদের সদস্য ও যোদ্ধারা,' সর্দার ব'লে চললেন, 'আজ আমরা যা শুনলাম তার অর্থ বুঝতে পারছেন আপনারা? দুই মেরুনের ছেলে বলছে যে আমরা লালকোর্তাদের খরগোশ বানাই না কেন?'

সভাঘরের সব লোক হেসে উঠলো। যোদ্ধাদের মধ্যে টমি ওর বাবাকেও দেখতে পেলো। ওঁর দু-চোখ গর্বে জ্বল জ্বল করছে। জনির বাবাকে দেখাচ্ছিলো আরো গর্বিত। ওঁর পাশে যে-সব যোদ্ধা বসেছিলো তারা ওঁর কাঁধে চাপড় দিয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলো। সর্দার ফিলিপ ওদের হাসবার জন্য কিছুটা সময় দিয়ে তারপর থামতে বললেন।

'ঠিক আছে, আপনারা তো সবই শুনলেন। আমাদের দুই কিশোর যোদ্ধা কী রকম মোক্ষম মতলব ফেঁদেছে। কিন্তু এইবার সবকিছু ঠিকঠাক করা দরকার। আমাদের তৈরি হ'তে হবে। প্রত্যেক ক্যাপটেনকে দেখতে হবে যে তাঁর লোকেরা যেন তৈরি থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো মরবে, কিন্তু মেরুনরা তো মরতে ভয় পায় না। আমরা আমাদের মান-ইজ্জত কখনো নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনারা আপনাদের তরোয়াল ছুঁয়ে শপথ করুন।'

সব লোকেরা সমবেত চীৎকারে সভাঘরকে যেন কাঁপিয়ে দিলো। তারা সবাই একসঙ্গে তাদের তরোয়াল খুলে উঁচু ক'রে ধরলো।

যোদ্ধারা চীৎকার ক'রে বললো, 'মেরুনদের এই তরোয়ালের নামে শপথ।'

তারপর সবাই একসঙ্গে সভাঘর থেকে লাইন ক'রে বেরোলো, ওদের মধ্যে টমি জনিও ছিলো।

ছেলেরা ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলো। যোদ্ধাদের প্রস্তুতি দেখবার জন্যে তারা গিয়েছিলো। বড়ো-বড়ো তূণগুলো চটপট তীরে ভ'রে গেলো। বন্দুকগুলোকে পরিষ্কার ক'রে-ক'রে চকচকে ক'রে তোলা হ'লো। গ্রামের

কয়েকজন মহিলা রান্না করছিলেন। এই খাবার যোদ্ধারা সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর এক কোণে, আগুন জ্বেলে কয়েকজন যোদ্ধা মিলে বুলেট বানাচ্ছে। ইংরেজদের কাছ থেকেই পাওয়া সীসে দিয়ে এইসব বানানো হচ্ছে। পাত্রের মধ্যে রেখে এই সীসে ফোটানো হচ্ছে। পুরো ফুটন্ত অবস্থায় মাটির টুকরোর মধ্যে ও-গুলোকে ঢেলে ভর্তি করা হচ্ছে। মাটির টুকরোগুলোর চেহারা বুলেটের মতো। তারপর ঐ মাটির টুকরো ঠাণ্ডা জলের পাত্রে ডোবানো হচ্ছে যতক্ষণ না সীসেটা ঠাণ্ডা হয়। এরপর বুলেটগুলোকে পাতার উপরে রাখা হচ্ছে যাতে শক্ত হ'তে পারে।

এদের অধিকাংশ লোকদেরই বন্দুক ছিলো, তবে কয়েকজনকে নির্ভর করতেই হচ্ছে ধনুকের উপরে। এরা শত্রুদের খুব কাছে চ'লে যায় এবং গাছের ভিতর থেকে তীর ছোঁড়ে। মেরুনদের প্রত্যেকেরই টিপ প্রায় নিখুঁত। কী ধনুক, কী বন্দুক, তাদের লক্ষ্য বড়ো-একটা ফসকায় না।

জনি কোথায় যেন চ'লে গেলো। টমি ওকে খোঁজবার জন্য রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে এমন সময়ে কে যেন ওর নাম ধ'রে ডাকছে শুনতে পেলো। ও পেছন ফিরে দেখলো একজন যোদ্ধা।

'টমি,' যোদ্ধাটি বললেন, 'সর্দার তোমাকে সভা-ঘরে যেতে বলেছেন, তোমাকে আর জনিকে।'

'আমি তো জনিকেই খুঁজছি', টমি বললো।

'ওকে আমি দেখছি, তুমি সর্দারের কাছে যাও,' যোদ্ধা বললেন।

টমি আর জনি একই সঙ্গে সভা-ঘরে এসে হাজির। ওরা দুজনেই অবাক হ'য়ে এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সর্দার কেন ওদের ডেকেছেন। এখন শুধু পরামর্শ পরিষদের সদস্যেরাই সর্দার ফিলিপের সঙ্গে রয়েছেন। ছেলেরা ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'এই-যে, টমি আর জনি', সর্দার বললেন, 'তোমরা কি আবার বনের মধ্যে যেতে ভয় পাবে?'

'না, কখনোই না', দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললো।

'অন্য মেরুনদের কাছ থেকে আমাদের সাহায্য পেতেই হবে,' সর্দার বললেন। 'কিন্তু গ্রাম থেকে আর-কাউকে আমি এখন পাঠাতে পারছি না। যোদ্ধাদের সবাইকেই এখন এখানে থাকতে হবে। তোমরা দু'জন কি যেতে রাজি আছো? মনে রেখো, কাজটা বিপজ্জনক।'

'নিশ্চয়ই যাবো,' ছেলে দুটি সমস্বরে ব'লে উঠলো।

'শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র কিন্তু শত্রুরা আরো সাবধান হ'য়ে যাবে,' সর্দার ফিলিপ বললেন। 'তোমাদের কিন্তু খুব বুদ্ধি ক'রে, সাহসে ভর ক'রে ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে হবে।'

'আপনি কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাদের?' টমি জিগেস করলো।

'পশ্চিমের পাহাড়ে আর-একদল মেরুন আছে, তোমরা সেখানে যাবে,' সর্দার বললেন।

তারপর যে-নদী পার হ'য়ে যেতে হবে উনি তার কথা বললেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে যে বিশেষ ক'রে সাবধান হ'তে হবে তাও বললেন। কারণ লালকোর্তারা ঐসব জায়গাতেই বিশ্রাম করে। তাছাড়া পাহাড়ের উপত্যকায় আখের ক্ষেতের মধ্যেও লালকোর্তা সৈন্যরা থাকতে পারে।

এইসব ব'লে সর্দার ফিলিপ ওঁর হাত তুললেন। যে-যোদ্ধা আবেং-এ ফুঁ দিচ্ছিলেন তিনি এগিয়ে এলেন।

'তোমরা পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেলে জানবে যে মেরুনদের দেশে পৌঁছে গেছো।' কিন্তু না-ডাকলে তোমরা ওদের হয়তো আদৌ দেখতে পাবে না।' সর্দার ফিলিপ ব'লে চললেন। 'আর সেইজন্যে কীভাবে আবেং বাজাতে হবে তা তোমাদের শিখিয়ে দেওয়া হবে। সেইভাবে বাজালে তোমাদের বন্ধু মেরুনরা ঠিক বেরিয়ে আসবে। তখন তাদের বলবে যে, আমি সাহায্যের জন্যে তোমাদের পাঠিয়েছি। ওদের নাম হ'লো মোচো মেরুন, আর ওদের সর্দারের নাম জেম্‌স্‌।'

বিকেলের দিকে চার্লি, ডেভিড আর ইউরিয়া পাখি ও খরগোশগুলো নিয়ে গ্রামে এসে পৌঁছুলো। টমি আর জনি যে আবেং বাজাতে শিখছে এ দেখে ওরা একেবারে অবাক। ফুঁ দিতে গেলে ওদের দেখাচ্ছিলো ঠিক যেন দুটো বাচ্চা শুয়োর। আর তাই দেখে বন্ধুরা সব হেসে গড়াগড়ি। কিন্তু শেষমেষ চেষ্টা ক'রে ওরা আবেং-এ সাহায্যের ফুঁ দিতে শিখে ফেললো।

রাত্রের মধ্যেই গোটা গ্রাম যুদ্ধের জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলো। স্কাউটরা নাকি শত্রুসৈন্যকে দেখতে পেয়েছে ব'লে খবর এসেছে ইতিমধ্যে। লালকোর্তারা অবশ্য জানতেও পারেনি যে তাদের দেখা গেছে।

ঐদিন সন্ধ্যের বেশ অনেক পরে একজন যোদ্ধা টমি আর জনিকে ক্যাপটেন ডিকের কাছে নিয়ে গেলো। উনিই যুদ্ধের নেতা।

'এইমাত্র স্কাউটদের কাছ থেকে একটা খারাপ সংবাদ পেয়েছি আমরা,' উনি বললেন। 'লালকোর্তারা পাহাড়ের মধ্যে চতুর্দিকে এতই ছড়িয়ে রয়েছে যে তোমাদের দুজনকে আমরা একলা ছাড়তে পারি না।'

'ক্যাপ্টেন ডিক, আমরা ঠিক চ'লে যেতে পারবো,' টমি বেশ জোর দিয়ে বললো।

ক্যাপ্টেন ডিক হাসলেন। 'কিন্তু আমরা তো কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না, টমি। তোমাদের যদি ওরা ধ'রে ফ্যালে তাহ'লে তো আমরা যে সাহায্য চাইছি তা কোনোদিনই পাবো না।'

'আপনি কি আমাদের যেতে দেবেন না বলছেন?' জনি জিগেস করলো।

'তোমরাই যাবে,' ক্যাপটেন ডিক বললেন। 'কিন্তু তোমাদের আমরা ইংলিশ লাইনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো।'

'ইংলিশ লাইনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ, এখন যাও, তৈরি হ'য়ে নাও।' আবেং বাজলে আমরা বেরিয়ে পড়বো।'

ছেলেরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেলো। টমির বাবা ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। টমি দেখলো বাবা যুদ্ধের সাজে তৈরি।

টমির মা দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকলেন। সে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মা দু-হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগলেন, 'আমি জানি, বাবা, যে তুই তোর বাবার মতোই যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরি।'।

'ক্যাপটেন ডিক কি তোমাকে কিছু বলেছেন?' বাবা জিগেস করলেন।

টমি বললো, 'হ্যাঁ, তুমিও কি যাবে নাকি বাবা?'

'আমি যোদ্ধাদের সঙ্গে উত্তরের দিকে যাবো। তোমরা যাবে পশ্চিমের দিকে। ভয় পেয়ো না, ক্যাপটেন ডিক তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আমি ভয়ের কথা বলছি না, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে বেশ হ'তো,' টমি বললো।

'টমি,' বাবা বলে চললেন, 'তোমাকে সবেমাত্র কিশোর বাহিনীতে নেওয়া হয়েছে এবং এই যে-সম্মান তোমাকে দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু খুবই বড়ো সম্মান। কিন্তু মনে রেখো, তুমি কী ভাবে কী করছ তা কিন্তু মেরুন লোকেদের পক্ষে খুব জরুরি ব্যাপার। শুধু আমাদের পাহাড়চুড়োর মেরুনদের জন্যে নয়, সব মেরুনদের জন্যেই!

'ভবিষ্যতে আমাদের কথকেরা তোমার আর জনির গল্প সবাইকে শোনাবে,' মা বললেন, 'ছেলেমেয়েরা সব জ্যোৎস্নার আলোয় ব'সে কথকের মুখে শুনবে টমি আর জনি নামে দুই সাহসী কিশোর বীর যোদ্ধার কথা। কাজেই আজ রাতে তোমাকে সাহসী হ'তে হবে, বাবা।'

'ওর সাহস ঠিকই থাকবে,' বাবা বললেন। 'মার কাছে কাজ সারা হ'লে রাস্তার আগুনের ধারে এসো। তোমাকে তৈরি ক'রে দিতে হবে।'

মার কাছ থেকে বেরিয়ে টমি তাড়াতাড়ি আগুনের ধারে চ'লে গেলো। ওর তখন জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কী ক'রে ওকে তৈরি করা হবে। জনিও তার বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গেছে। হাতে একটা পাত্র নিয়ে এক বৃদ্ধ যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। টমি ও জনি দুজনকেই জামা খুলে ফেলতে বলা হ'লো। ওদের বাবারা তখন ঐ পাত্র থেকে কিছুটা ক'রে মলমের মতো কী একটা জিনিস নিয়ে ওদের বুকে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগিয়ে দিলেন। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

'গাছগাছড়া থেকে তৈরি এই মালিশ,' বৃদ্ধ যোদ্ধা বললেন। 'এই মালিশের জন্য তোমাদের গা থেকে গাছের গন্ধ বেরোবে, আর তাই লাল-কোর্তারা সহজে তোমাদের খুঁজে পাবে না।'

ওরা যখন সব যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাচ্ছে তখন চার্লি, ইউরিয়া ও ডেভিডের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তো এদের দুজনকে দেখে একেবারে অবাক।

'তোমরা গাছগাছড়া থেকে বানানো মালিশ মেখেছো, তাই না?' ইউরিয়া ফিশফিশ করে বললো। 'তোমরা এখন পুরোপুরি যোদ্ধা হয়ে গেছো।' টমি আর জনি একটু হাসলো।

'তোমরা যাচ্ছো তাহ'লে?' চার্লি বললো।

'শুনেছি, এত লালকোর্তা এসেছে যে তাদের পার হওয়া খুব শক্ত হবে!'

'হ্যাঁ, কাপটেন ডিক তাই খানিক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবেন,' টমি বললো।

'আমাকে পাঠানো উচিত ছিলো। আমিই সবার বড়ো আর খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম,' চার্লি বললো।

'কিন্তু লালকোর্তারা কাছেপিঠে থাকলে তো তোমার সবকিছু হুঁশ থাকে না। সেই যে তারগুলো মাটিতে ফেলে রেখেছিলে মনে নেই?' ডেভিড বললো।

অন্য ছেলেরা একটু হাসলো।

'লালকোর্তারা তোমাদের ধ'রে ফেললে তো সোজা ফাঁসিতে লটকাবে। আশা করি সর্দার ফিলিপ তখন আমাকে পাঠাবেন,' চার্লি তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো টমিকে বললো।

'আর এবার আশা করি তুমি কাজটা শেষ না-ক'রে ফিরে আসবে না। তুমি তো লুকআউট পাহাড়ের দৌড়ের সময় তাই করেছিলে,' টমি বললো। সে এত চুপি-চুপি কথাগুলো বললো যে কেবল চার্লি ছাড়া আর কেউ সে-কথা শুনতে পেলো না।

চার্লি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থ হ'য়ে গেলো আর তার চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠলো সেই লজ্জার ছায়া। সে ভাবতে পারেনি যে কেউ তাকে দেখে ফেলেছে।

জনির সঙ্গে টমি দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেলো। চার্লিকে আঘাত দিয়ে ও দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথাটা জানা বোধহয় চার্লির দরকার ছিলো। ভবিষ্যতে যাতে আর এ-রকম ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করে।

৭

শত্রু শিবিরের মধ্য দিয়ে

মেরুনরা যখন গ্রাম থেকে বেরোলো তখন চাঁদ ওঠেনি। ক্যাপটেন ডিক চেয়েছিলেন লালকোর্তারা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসুক যাতে টমি ও জনি সেই ফাঁকে সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ওঁর মতলব ছিল সকাল হবার ঠিক আগে ইংরেজদের ঘাঁটির কাছে গিয়ে পৌছোনো।

'ঐ সময়ে সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে,' উনি বললেন। 'শত্রু শিবিরে কখনো মাঝরাত্তিরে আক্রমণ করবে না, কারণ ঐ সময়ে পাহারাদাররা ভীষণ সজাগ থাকে। ভোর হবো-হবো এই সময় সবচেয়ে সেরা—তখনই আক্রমণ করবে। ঐ সময়টাতে সবাই ধ'রে নেয় যে বিপদ কেটে গেছে।'

মেরুনরা খুব সাবধানে ওদের প্রথম স্কাউট দলের কাছাকাছি এগোলো। কখনো একটু থামছে, কখনো ক্যাপটেন ডিক প্যাঁচার ডাক ডাকছেন এমনি ভাবেই ওরা এগোলো। ক্যাপটেন ডিক তিনবার প্যাঁচার ডাক ডেকে থামলেন, তারপর আবার ডাকলেন। একটু পরে ওরাও একটা প্যাঁচার ডাক শুনতে পেলো। এই ওদের সাড়া। সবাই থেমে চুপ ক'রে অপেক্ষা করলো।

টমি ও জনির কেউই কোনো স্কাউটকে এগিয়ে আসতে দেখলো না। তারা কেবলমাত্র শুনতে পেলো দু'জন লোক ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে। আর তখন তারা সবাই আবার সামনে এগোলো। দলটা যখন আবার একবার থামলো তখন গাছের মাথায় সবে চাঁদ উঠছে। এবার, প্যাঁচার ডাক শুনতে পাবার পরে টমি একজন স্কাউটকে দেখলো। উনি তো খুব বিখ্যাত লোক— ওঁনাম পিটার। চাঁদের আলোয় ওঁর কাঁধদুটো যেন চকচক করছে। টমি জানতো যে ওঁর কাঁধেও সেই মলম মালিশ করা হয়েছে।

'লালকোর্তারা কী করছে ?' ক্যাপটেন ডিক জিগেস করলেন।

ওদের স্কাউটরা ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে আছে,' পিটার উত্তর দিলো।

'আমরা তো স্কাউটদের দেখা দিতে চাই না,' ক্যাপটেন ডিক বললেন।

'আপনাদের জন্যে যে জায়গা সাফ করে রেখেছি সেখানে নিয়ে যাবে আপনাদের। স্কাউট জিম আর আমি ওখানে ওদের তিনজন স্কাউটকে খতম করেছি।'

'ঠিক আছে, চলো,' ক্যাপটেন ডিক বললেন। তারপর উনি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ব'লে গেলেন: 'আমরা এখন কিন্তু ইংরেজদের শিবিরের একেবারে কাছে রয়েছি। তোমরা আমার পাশে-পাশে থাকবে, কিন্তু একদম চুপচাপ।'

সমস্ত রাত্রি ধ'রে মেরুনরা আবার পথ চললো। খুব দ্রুত পায়ে ওরা এক গাছের ফাঁক থেকে আর-এক গাছে স'রে-স'রে গেলো। ক্যাপটেন ডিক যা-যা করলেন টমি ও জনি ঠিক তাই-তাই করবার চেষ্টা করলো।

সূর্য ওঠবার ঠিক আগে দলবল সমেত ক্যাপটেন ডিক একসারি নিচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে ওঁরা ইংরেজ ক্যাম্প স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে আক্রমণ করাও চলতে পারে। গাছগুলো বেশ উঁচুই আছে, তার আড়ালে লুকোনো যাবে। ওখানেই ব'সে প'ড়ে ওঁরা অপেক্ষা করলেন।

দূরের পাহাড়ে যেই মাত্র সূর্য দেখা গেলো অমনি ক্যাপটেন ডিক ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'লালকোর্তারা আমাদের পিছু-পিছু স'রে না-যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এখানে অপেক্ষা করবে।' উনি ব'লে চললেন, 'ওদের যখন আর একটুও দেখতে পাবে না, সেই ফাঁকে বেরিয়ে টুক ক'রে স'রে পড়বে। যদি ধরা প'ড়ে যাও, বলবে শিকারে বেরিয়েছো। কখনো বোলো না যে সাহায্য আনবার জন্যে যাচ্ছো। তৈরি হ'য়ে নাও। হ্যাঁ, শোনো, লালকোর্তারা আমাদের পিছনে চ'লে না-যাওয়া পর্যন্ত বেরোবে না।'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' ছেলেরা বললো।

'মঙ্গল হোক,' এই ব'লে ক্যাপটেন ডিক ওদের আশীর্বাদ করলেন।

বারুদভর্তি শিঙা থেকে উনি কিছুটা বারুদ তুলে নিলেন। একটা বুলেট আর ঐ বারুদ বন্দুকের মধ্যে ভ'রে নিচের দিকে ঠেসে চেপে দিলেন। অন্য মেরুনরাও তাদের বন্দুক বারুদে ভ'রে নিয়ে ক্যাপটেন ডিকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ছেলেরা গাছের ফাঁক দিয়ে ইংরেজ শিবিরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। একটা ছোটো আগুনের চারপাশে ঘিরে একদল সৈন্য ঘুমোচ্ছিল। ওরা তখনও জানতো না যে, ওদের স্কাউটরা পিটার আর জিমের হাতে খুন হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ টমির কাঁধে যেন কিসের ছোঁয়া লাগলো। সে ফিরে তাকালো। দেখতে পেলো জনি, ডান দিকে কিছু-একটা দেখাচ্ছে। ক্যাপটেন ডিক বন্দুক ছোঁড়বার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

এক ঝলক আগুন আর একটা বিরাট আওয়াজ। তারপরেই ক্যাপটেন ডিক লাফিয়ে উঠে ভীষণ জোরে মেরুন চীৎকার ছাড়লেন।

সমস্ত ইংরেজ সৈন্য এক লাফে উঠে বসলো। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বন্য জন্তুর মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। ক্যাপটেন ডিক যখন আবার একবার চীৎকার করলেন তখন ওরা ওঁর দিকে ফিরলো। উনি হাতের বন্দুক নাড়িয়ে আবার চীৎকার করলেন। তারপর উত্তরের দিকে দৌড়ে গেলেন। দৌড়ুতে-দৌড়ুতে আবার বন্দুকে বারুদ ভ'রে নিলেন।

একের পর এক সব ক-জন মেরুন ঠিক একই রকম করলো। এখন টমি বুঝতে পারছে, কেন ক্যাপটেন ডিক আক্রমণের জন্য এই জায়গাটা বেছে নিয়েছেন। ওরা এখান থেকে গুলি ছুঁড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগে একবার নিজেদের দেখিয়ে যেতে পারবে। ফলে লালকোর্তারা ওদের পিছু-পিছু যাবে। গেলোও তাই।

লালকোর্তারাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে মেরুনদের পিছন-পিছন দৌড়ুলো। এখন দু-পক্ষই গুলি চালাচ্ছে। টমি আর জনিকে দারুণ উত্তেজিত লাগছে। ওরা দেখলো, ইংরেজ শিবির একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। ওরা সেই সুযোগে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। ওরা খুব জোরে দৌড়ুচ্ছিলো যাতে লালকোর্তারা ফিরে আসবার আগেই জায়গাটা পার হ'য়ে চ'লে যেতে পারে। পাহাড়ের নিচে উপত্যকাটা বেশ চওড়া। অল্প পরেই ওরা বড়ো-বড়ো শ্বাস ফেলতে থাকলো: পা দুটো বড়ো বেশি ভারি আর ক্লান্ত লাগছে।

লালকোর্তাদের একজন শিবিরে ফিরে আসছিলো। ওদের দেখেই সে নিজের চোখ রগড়ে নিলো।

'থামো!' লালকোর্তা চীৎকার ক'রে বললো, আর সঙ্গে-সঙ্গে ওদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো।

কিন্তু টমি ও জনি তখন অনেকটা দূরে ছিলো। গুলি ওদের গায়ে লাগলো না। ওরা দৌড়ুতেই থাকলো। ওরা উপত্যকার অন্য দিকটায় পৌঁছে গেলো আর চটপট ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকলো। অল্প পরেই ওরা চারদিককার গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। কিন্তু তবুও ওরা থামলো না, কেননা লালকোর্তারা ওদের পিছু-পিছু আসতে পারে। খুব ক্লান্ত, তবু ওরা

দৌড়েই চলেছে। সূর্য এখন ওদের পিছন দিকে। তাই বুঝলো যে ওরা পশ্চিমে যাচ্ছে।

হঠাৎ জনি থেমে গেলো আর কান পেতে কী যেন শুনলো। ওর চোখে-মুখে বিস্ময়, কিন্তু কিছু বললো না। কিছুক্ষণ পরে ও নিচু হ'য়ে মাটিতে কান পাতলো।

'তোমাদের পিছু-পিছু কেউ আসছে?' টমি জিগেস করলো।

'যদি আসেও তবে সে লালকোর্তা নয়। একমাত্র মেরুনরাই অত চুপি-সাড়ে চলাফেরা করতে পারে। আর যদি মেরুন হয় তাহ'লে সে তো বন্ধু,' জনি উত্তর দিলো। ওরা আবার এগিয়ে চললো।

ওরা যখন থামলো সূর্য তখন মাথার উপরে। খাবে ও বিশ্রাম নেবে ব'লে ওরা একটা সুন্দর জায়গা বেছে নিলো। আশেপাশে ঝোপগুলো ঘন ও নিবিড়। মাঝখানে একটু জায়গা পরিষ্কার, সেখানে ওরা গড়াতেও পারে। জনি ঐ পরিষ্কার জায়গাটায় ঢুকতে যাচ্ছিলো, তড়াক ক'রে এক লাফে বেরিয়ে এলো। একঝটকায় টমিকেও সরিয়ে আনলো।

'আরে, ওর ভেতরে এক বুনো বরা,' ও ফিশফিশ ক'রে বললো।

চট ক'রে ওরা উলটো দিকে ফিরে সুবিধেমতো একটা গাছ খুঁজলো। সামনেই এক গাছের ডাল ধ'রে তার উপরে চ'ড়ে বসলো দুজনে। একটুর জন্য বেঁচে গেছে। এক বুনো শুয়োর ঘোঁত-ঘোঁত করতে-করতে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তার চোখদুটো জ্বলছে আর বিরাট জোরে গজরাচ্ছে। বরা একটু থেমে বাতাসে নাক উঁচু ক'রে গন্ধ শুঁকলো। ওর দিকে তাকিয়ে টমি ভয়ে কেঁপে উঠলো।

ওরা জানতো যে বরা গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সব টের পায়। কিন্তু হাওয়া তখন ওদের বিপরীতে বইছে। কাজেই আশা আছে যে ওদের গন্ধ সে পাবে না। কিন্তু ওরা যে-গাছে লাফিয়ে উঠেছিলো সেটা ছিলো খুব মোটা। তাই সহজে উপরে উঠতে পারছিলো না। অথচ ডাল ভেঙে গেলে তো একেবারে মাটিতে পড়তে হবে।

এদিকে বরাটাকে ওরা তীর ছুঁড়ে মারতেও পারছে না, কারণ ওদের ধনুক তখন মাটিতে। দৌড়ে এসে যখন গাছে চড়েছিলো, তখন তাড়াহুড়োয় ধনুক মাটিতে ফেলে এসেছিলো। এদিকে হাতে খিল ধ'রে যাচ্ছে, অথচ বরার নড়বার লক্ষণ নেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'আর ধ'রে থাকতে পারছি না।' জনি ফিশফিশ ক'রে বললো।

'তুমি হাত ছেড়ে দিলে আমিও দেবো,' টমি বললো। 'তখন হয় দৌড়ে পালাতে হবে নয়তো শুধু ছুরি নিয়ে ওর সঙ্গে লড়তে হবে।'

কিন্তু ওরা দুজনেই জানতো যে, শুধু ছুরি নিয়ে বুনো বরার সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না।

'দাঁড়াও!' জনি চুপিচুপি বললো, 'কিসের যেন একটা আওয়াজ পাচ্ছি।'

ধাড়ি বরা ওর যে-বাচ্চাগুলোকে ফেলে রেখে এসেছিলো তারা ভয় পেয়ে এতক্ষণে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ধাড়িটা এবার পিছন ফিরে বাচ্চাগুলোর দিকে ছুট দিলো। তক্ষুনি, ওরা দুজন গাছ থেকে লাফিয়ে নামলো। ওদের ধনুক তুলে নিয়ে সেই ফাঁকে এক দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

এবার ওরা গাছপালার মধ্যে একটা নিরাপদ লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করলো। ভিতরে ঢোকবার আগে দুটো তীর ঝোপের ভিতরের দিকে ছুঁড়লো। কোনো আওয়াজ হ'লো না। তারপর ভিতরে ঢুকে ওদের তীর কুড়িয়ে নিলো।

ভিতরটা খুব ঠাণ্ডা আর শান্ত। মাটিও নরম। ওরা এখানেই ব'সে প'ড়ে বিশ্রাম নিলো। সঙ্গে যে-সব খাবার ছিলো তার থেকে কিছুটা খেলো এবং টমির সেই কায়দা-করা বোতলের জল পান করলো। অল্পক্ষণ পরেই ওদের চোখ বুঁজে এলো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো ওরা।

জনির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলো। কেন, তা সে বুঝতে পারলো না। শুধু বুঝতে পারলো যে ভয় পেয়েছে। টমি তখনও ঘুমোচ্ছে। জনি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো। টমিও জাগলো। জনি ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ ক'রে থাকতে বললো। ও ফিশফিশ ক'রে বললো, 'লোকজন আসছে এদিকে।'

টমি তড়াক ক'রে উঠে বসলো। ও শুনতে পাচ্ছে, পায়ের শব্দ বেশ কাছে এসে গেছে।

'তুমি আগে যে-পায়ের শব্দ শুনেছিলে সেও কি এই রকম?' টমি জিগেস করলো।

'না, এ-শব্দের আওয়াজ অনেক জোরালো। এদের পায়ে বুট রয়েছে।' জনি বললো।

ওরা গুঁড়ি মেরে-মেরে ঝোপের একেবারে ধার পর্যন্ত চ'লে গেলো। শব্দের দিকে কান পেতে রইলো ওরা।

লালকোর্তাদের দুজনকে দেখা গেলো।

ওরা ছেলেদের দেখতে পেয়েছে ব'লে মনে হ'লো না। মাটির দিকে নজর ছিলো না ওদের। ওরা এদিক-ওদিক চারপাশে তাকাচ্ছিলো এবং নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলো। ছেলেরা নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো এবং অপেক্ষা করলো লালকোর্তাদের চ'লে যাবার জন্য।

কিন্তু টমি আর জনিকে বেজায় ঘাবড়ে দিয়ে ওরা ওদের লুকিয়ে থাকার পরিষ্কার জায়গাটার ঠিক উলটো দিকে এসে থেমে দাঁড়িয়ে রইলো।

৮

চার্লির আবির্ভাব

কিশোর মেরুন দুজনে এ ওর দিকে তাকালো। ঠিক যেন নিজেদের গর্তে খরগোশের মতো ধরা প'ড়ে গেছে ওরা। যদিও লালকোর্তারা ওদের দেখতে পায়নি, কিন্তু ওদের লুকোনোর জায়গায় ঠিক উলটো দিকেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ওখানেই লালকোর্তা দু-জন ব'সে পড়লো এবার, একটা লম্বা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে।

'ওঃ, ঠিক যেন ক্লান্ত ঘোড়ার মতো লাগছে!' ওদের একজন বললো।

'এই মেরুনের বাচ্চারা যে কী ভাবে বনের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে তা কে জানে! আমাদের তো চলতে গেলে, হয় পাথরের নুড়িতে, নয় গাছের ডালে কেবল পা আটকে-আটকে যায়,' অন্যজন বললো।

'বোধহয় ভুল দেখেছো তুমি, মেরুন বাচ্চা নয় ও-সব,' প্রথম জন বললো। 'বাচ্চা জন্তুজানোয়ার কিছু দেখে থাকবে হয়তো, আর ভেবেছো ঐ তো মেরুন।'

'বলছি আমি ঠিক দেখেছি। তোমাকে যেমন দেখছি এখন, তেমনি স্পষ্ট দেখেছি ওদের।'

টমি আর জনি নড়াচড়া করবে কি, ভয়ে একেবারে অসাড় হ'য়ে গেছে। সৈন্যরা ওদের কথাই বলাবলি করছে যে! ওদের মধ্যে একজন তো সেই লোক যে উপত্যকার মধ্যে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো। টমি ভাবলো দেখাই যাক না একবার ওদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে। ঝোপের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে সে ওদের দিকে তাকালো। সৈন্যদের একেবারে মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো।

টমি ঠিক পাথরের মতো নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই সৈন্যরা দেখে ফেলবে। ওদের মধ্যে একজন খুব লম্বা, লাল চুল। আর একজন বেঁটে, মোটা। ওরা টুপি ও বেল্ট খুলে ফেলে মাটিতে রাখা বন্দুকের পাশে রেখে দিয়েছে।

'আমরা কতদূর এসেছি?' লম্বা জন অন্য সৈন্যকে জিগেস করলো।

'তা জানি না, তবে অনেকদূর তো হবেই,' বেঁটে মোটা জন উত্তর দিলো। "আর গেলেই তো পথ গুলিয়ে ফেলবো, আমি বাবা আর যাচ্ছি না।'

'ক্যাপটেনের হুকুম মনে আছে তো? ঐ ছেলেদুটোকে খুঁজে বার ক'রে একেবারে ধ'রে নিয়ে যেতে হবে। ওঁর ধারণা কাছে-পিঠেই কোথাও একটা মেরুন গ্রাম আছে। ঐ ছেলেদুটো আমাদের পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ওদের পেলে পরে পায়ের গোড়ালি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবো,' লম্বা জন ব'লে চললো, 'কিন্তু তাদের তো চিহ্নমাত্র পাচ্ছি না।'

'এই মেরুনগুলো সব যেন ঠিক বেড়ালের মতো। বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় একটু মাত্র চিহ্ন রেখে যায় না।'

'আর লুকোতেও সবাই ধুরন্ধর ওস্তাদ,' লম্বা সৈন্যটি ব'লে চললো'। 'এমনকী হয়তো এখানেই কোথাও আছে। আমাদের সঙ্গে আরো লোকজন আনা উচিত ছিলো, তাহ'লে ভালো ক'রে খুঁজে দেখা যেতো।'

সৈন্যরা যখন ওদের লুকোবার জায়গার দিকে ফিরে তাকালো তখন ছেলেরা ভয়ে কেঁপে উঠলো। মনে হ'লো, ওরা যেন একেবারে সোজা তাদেরই দিকে তাকাচ্ছে।

'সূর্যের দিকে চেয়ে দ্যাখো,' মোটা জন বললো। ও চিত হ'য়ে শুয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখছিলো। 'এখানেও বেশ গরম।'

'বেশি আরাম ক'রে শুয়ো না, তাহ'লে ঘুমিয়ে পড়বে।'

রোদে পুড়ে-পুড়ে গোটা বনটা এখন ভীষণ গরম। পাইন গাছের ছুঁচলো পাতার গন্ধ টমির নাকে আসছে। ক্রমে-ক্রমে পাইনের গন্ধ বেশ জোরালো হ'য়ে উঠছে। এই জোরালো গন্ধে আবার হাঁচি না পেয়ে যায়!

ঠিক সেইসময় জনি ওর হাত চেপে ধরলো। টমি চট ক'রে ফিরে তাকালো। জনি একটা হাত নাকের উপরে চেপে ধরেছে আর তার দু-চোখ জলে ভ'রে গেছে। টমি তো বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। জনির হাঁচি পাচ্ছে।

টমিরও চোখ বড়ো-বড়ো এবং মুখ বিরাট হাঁ হ'লো।

'চেষ্টা করো হাঁচি চাপতে,' সে ফিশফিশ ক'রে বললো।

জনি কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলো। চোখের জল এতক্ষণে কেটে গেছে, সে নাকের উপর থেকে হাতও সরিয়ে নিলো।

'পাইনের গন্ধ নাকে গেলেই আমার হাঁচি পায়,' জনি ফিশফিশ ক'রে টমিকে বললো।

'এ-কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?' টমি জিগেস করলো।

'মনে ছিলো না,' জনি চুপি-চুপি বললো।

'চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'হবে তো, কিন্তু কেমন ক'রে?'

টমি যা ভাবছিলো তা ওকে খুলে বললো।

'গুঁড়ি মেরে-মেরে অন্য দিকে গিয়ে তারপরে দৌড় লাগানো?' টমির কথা সব শুনে জনি বললো। 'কিন্তু ওরা দেখে ফেলতে পারে, আর গুলিও করতে পারে। তাহ'লে তো সর্দার ফিলিপের জন্য সাহায্য পৌছবেই না কখনো।'

'জনি,' টমি বললো, 'কিন্তু এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ, এবং তোমার যদি আবার হাঁচি পায়, তাহ'লে,...ওদের বন্দুক, বেল্ট সব মাটিতে ফেলা রয়েছে। ওরা দেখে ফেলতে-ফেলতেও আমরা কিছুটা দূর চ'লে যেতে পারবো। তারপর ওরা বন্দুক তুলে নিয়ে তবে তো আমাদের টিপ করবে।'

'দাঁড়াও, ওরা কী বলছে শোনা যাক।

মোটা সৈন্যটি কথা বলছিলো। 'আমার মনে হয় এবার ফিরে যাওয়া যাক। আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।'

'বনে তো প্রচুর ফল রয়েছে। খিদে পেয়ে থাকলে পাড়ো আর খাও।'

'ফল!' মোটা লোকটি বললো! 'মাংস চাই হে, মাংস। যা খিদে পেয়েছে তাতে ফলে কুলোবে না। মোটাসোটা একটা পায়রা কিংবা খরগোশ পেলে বেশ হ'তো।'

'হ্যাঁ, তাহ'লেই তুমি গুলি চালাতে আর মেরুনরাও চ'লে আসতে পারতো।'

'গুলি!' মোটা সৈন্যটি হাসলো। 'তুমি এই বনের ব্যাপারস্যাপার কিছুই জানো না। সবে তো ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছো। খরগোশ গুলি ক'রে মারে না। পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওদের কাবু করতে হয়। আমি পাথর ছুঁড়ে পায়রাও মেরেছি।'

'আমার পাথরের টিপ ভালো হয় না,' অন্যজন বলল। 'তার চেয়ে দেখি ফলটল কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

উঠে দাঁড়িয়ে সে একটা গাছের দিকে দেখালো। খ্যাখো 'ওখানে ওটা কী?'

'ও তো তারা-আপেল গাছ। খুবই ভালো। কিন্তু এখন তারা-আপেলে চলবে না। মাংস চাই।'

'ঐ জন্যেই তুমি এত মোটা,' এগিয়ে যেতে-যেতে লম্বা লোকটি বললো।

জনির চোখ চকচক করছে। 'যদি কোনোমতে অন্যজনের বন্দুকটাও নামিয়ে রাখা যেতো। তাহ'লে এই সুযোগে পালাতে পারতাম।' সে চুপি-চুপি বললো।

'পায়রা বা খরগোশ দেখতে পেলেই তবে ও নড়বে,' টমি বললো।

'টমি!' জনি ফিশফিশ ক'রে বললো, 'এই তো বুদ্ধি এসেছে। আমিই পায়রা হবো।'

আকাশের দিকে মুখ তুলে জনি দু-বার পায়রার ডাক ডাকলো। ওরা যে ফাঁক দিয়ে দেখছিলো সেই ফাঁক দিয়ে টমি আর-একবার দেখে নিলো। মোটা সৈন্যটি তড়াক ক'রে সোজা উঠে বসছে। এ-পাশ-ও পাশ ঘাড় ঘুরিয়ে সে পায়রা দেখবার চেষ্টা করছে।

'শুনছো? কিছু শুনতে পাচ্ছো?' ও বেশ চেঁচিয়েই অন্য সৈন্যটিকে জিগেস করল। 'পায়রার ডাক না?'

চট ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পাথর খুঁজতে থাকল। দু-একটা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলো।

'বেশ মোটাসোটা নাদুশনুদুশ একটাকে ধ'রে আনছি রাত্রে খাবার জন্য,' ও চেঁচিয়ে বললো।

কিশোর যোদ্ধারা এ ওর দিকে তাকালো এবং টুক ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে বন্দুকের দিকে দৌড়ুলো। পিছনে চীৎকার এবং দৌড়ে-আসা পায়ের শব্দ। ওরা সবে যখন বন্দুকগুলোকে তুলে নিচ্ছে সেই সময় লম্বা সৈন্যটি টমিকে পাকড়ে ফেললো। কিন্তু ওর গায়ে সেই মালিশ লাগানো ছিলো ব'লে সে টমিকে ধ'রে রাখতে পারলো না। কিন্তু একটু দেরি করিয়ে দিলো, জনি তো আর টমিকে ফেলে যাবে না।

ইতিমধ্যে অন্য সৈন্যটিও এসে হাজির হ'লো। কী ঘটছে দেখে নিয়ে সে ছেলে দুজনের দিকে ছুটলো।

টমি ও জনি হুতোশে দৌড়চ্ছে। বুঝতে পারছে যে লালকোর্তাদেব হাত থেকে ওদের আর নিস্তার নেই। যদি দুজনেই ধরা পড়ে তাহ'লে সর্দার জেম্‌সের কাছে সংবাদ নিয়ে যাবার কেউ থাকবে না। আর তাহ'লে পাহাড়চুড়োর দশাও ন্যানি শহরের মতো হবে।

হঠাৎ ওরা এমন-একটা জিনিশ দেখতে পেলো যা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ওদের ছেড়ে-আসা পরিষ্কার জায়গাটায় দেখা গেলো চার্লিকে।

৯

নদী পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর

চার্লি একেবারে সোজা মোটা সৈন্যটির পথের উপরে এসে পড়লো। লালকোর্তা ওকে ধ'রে ফেললো। চার্লি প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে বললো :

'দৌড়ো, টমি, দৌড়ো !'

চার্লির চীৎকারে লম্বা সৈন্য এদিকে ফিরলো। জনি চট্ ক'রে ভারি বন্দুকটা ওর পায়ে ছুঁড়ে মারলো। বিরাট এক আওয়াজ ক'রে সৈন্যটি মাটিতে প'ড়ে গেলো। প'ড়ে গিয়ে গড়াতে-গড়াতে জোরে চীৎকার করতে থাকলো। টমি আর জনি এই ফাঁকে পালিয়ে গেলো।

প্রাণপণে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ওরা নদী পর্যন্ত এসে পৌছলো। এর মধ্যে ওরা একবার মাত্র থেমেছিলো বন্দুকগুলোকে পাতা-লতার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জন্যে। নদীর কাছে পৌছে তীরের পাশে চিত হ'য়ে শুয়ে পড়লো একটু দম নেবার জন্যে। তারপর নদীর ধার দিয়ে নেমে গিয়ে জল খেলো।

টমি জনিকে বললো : 'আচ্ছা, তাহ'লে এখন আমাদের খাবার নেই, তীরধনুক নেই, কিছু নেই। শুধু এই ছুরি আর আবেং। আর সবই তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

'কিন্তু আমরা আর খুব দূরে নেই নিশ্চয়ই,' জনি বললো।

'না, এই তো নদীতে এসে গেছি। আর ঐ খাড়া পাহাড়টা পার হ'তে পারলেই পৌছে যাবো।'

ওরা কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এ ওর দিকে তাকালো। দুজনেই চার্লির কথা ভাবছে।

'চার্লি !' টমি ব'লে উঠলো : 'কোথা থেকে এলো চার্লি ?'

'আমাদের পিছন-পিছন যে আসছিলো সে ঐ চার্লিই,' জনি বললো। 'আমি বলেছিলাম যে সে মেরুন হবেই।'

'কিন্তু লালকোর্তারা যে ওঁকে মেরে ফেলবে !' টমি চেঁচিয়ে বললো।

'না, মারবে না, ও যদি কথা দেয় যে আমাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে দেবে তাহ'লে মারবে না,' জনি উত্তর দিলো।

'কিন্তু তা তো সে করতে পারে না ! ও যে কিশোর বাহিনীর ছেলে !'

'ওরা ওকে মেরে-ধ'রে হয়তো সেইটা বলিয়ে নেবে,' জনি বললো।

'আর চার্লিকে তো খুব সাহসী ব'লে মনে হয় না,' টমি বললো।

'কিন্তু এইমাত্র ও দারুণ সাহসের কাজ করেছে,' জনি বললো।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। কী বলতে হবে, ওদের তা আর জানা নেই এখন।

একটু পরে টমি বললো : 'ও কেন এটা করলো বল্ তো ? তুই শুনেছিলি ও কী ব'লে চেঁচিয়েছিলো ? ও বলেছিলো : "দৌড়ো, টমি, দৌড়ো !" তা এটা ও কেন করলো ?'

'হয়তো ওর মনে হয়েছে যে ও শুধু মেরুন নয় কএজন কিশোর যোদ্ধাও,' জনি বললো। 'হয়তো লুক-আউট পাহাড়ের দৌড়ে ঠকিয়েছিলো ব'লে লজ্জা পেয়েছে এখন সে, সেই গ্লানি একটু কাটাতে চায়।' টমি বললো : 'আমি ওকে বলেছিলাম যে আমরা ওই ফাঁকি দেখে ফেলেছি।'

'ও খুব লজ্জা পেলো নিশ্চয়ই,' জনি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো।

'আমিও খুব লজ্জা পেয়েছিলাম,' টমি বললো। 'ঐভাবে ওকে ব'লে ফেললাম ব'লে আমারও খুব লজ্জা হয়েছিলো।' এই পর্যন্ত ব'লে টমি নদীর দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো : 'ওকে উদ্ধার করতেই হবে আমাদের। সৈন্যরা ওকে মারধোর করতে পারে। তার ফলে ও যদি গ্রামের পথ বাৎলে দেয়। তাই ওকে আমাদের ছাড়িয়ে আনতেই হবে,' টমি বললো।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়,' জনি বললো।

'কিন্তু প্রথমেই আমাদের সর্দার জেম্‌সের কাছে যাওয়া দরকার,' টমি বললো। 'আয়, নদীটা পার হওয়া যাক।'

নদী যে খুব চওড়া ছিলো তা নয়, তবে বেশ গভীর। ধারের গাছ থেকে কেটে-কেটে ডাণ্ডা তৈরি করলো তুজনে, সেগুলোকে মোটা ঘাস দিয়ে বেঁধে ভেলা বানালো। তারপর নদীর ধার দিয়ে যতক্ষণ শান্ত জল না পায় ততক্ষণ হাঁটলো। স্থির জলের কাছে এসে তাদের ভেলা জলে ভাসালো। নিজেরা ভেলার উপর চ'ড়ে ব'সে হাত দিয়ে দাঁড় টেনে-টেনে এগিয়ে চললো। ভেলা বেশ তরতর ক'রে নদীর জল কেটে চললো। একটু পরেই ওরা অন্য পারে এসে পৌছলো।

এবারে কিন্তু বেশ দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে সূর্য নিচে নেমে গেছে।

সর্দার ফিলিপ ওদের যে পাহাড়ি খাড়াই-এর কথা ব'লে দিয়েছিলেন সেটাকে এখন ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সর্দার ব'লে দিয়েছিলেন, অন্ধকারের আগেই খাড়াই-এ পৌছুতে। রাত্রে খাড়াই-এ ওঠা প্রায় অসম্ভব।

'ঐ পাহাড়গুলোতে পৌছুবার কি আর-কোনো পথ নেই?' জনি জিগেস করলো। 'এই খাড়াই পার হ'য়ে যাওয়া কিন্তু বেশ শক্ত হবে।'

'অন্য পথে গেলে আমরা হয়তো সৈন্যদের মুখোমুখি প'ড়ে যাবো। সর্দার তো তাই বলেছিলেন,' টমি বলল।

'আমি অবশ্য এখন দু-একজন সৈন্যের মুখোমুখি পড়তেই চাইছি, জনি বললো।

'কেন?' টমি অবাক হ'য়ে জিগেস করলো।

'তাহ'লে রাতের খাবার হিসেবে ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতো।'

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো। দু-একটা তারা-আপেল ও অন্যান্য ফল পেড়ে নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি পা চালালো। যেতে-যেতে টমি আবেং-এর থেকে জল ঝেড়ে ফেললো।

অল্প পরেই ওরা খাড়াই-এর নিচে পৌছে গেলো। খাড়াই-এর গায়ে তিনটে বড়ো-বড়ো গর্ত দেখা গেলো। মেরুন কথকেরা বলেছিলো যে এক সময়ে ওখান দিয়ে তিনটে নদী বইতো। ওরা দেখলো যে, খাড়াই-এর নিচের দিকে বেশ বড়োবড়ো লতা গাছ জন্মেছে। লতাগুলো বেশ মোটা, লম্বা। দেখতে বড়ো-বড়ো সাপের মতো। তারা ছুরি দিয়ে ঐ লতা কাটতে লাগলো যাতে ওগুলো দিয়ে দড়ি বানানো যায়। তারা খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিলো, দড়িও খুব চটপট তৈরি হ'য়ে গেলো।

খাড়াই-এর গা এতই এবড়ো-খেবড়ো যে দড়ি ছুঁড়ে আটকাবার জায়গা সহজেই পাওয়া গেলো।

'ঐ দেখছো, বড়ো ছুঁচের মতো যে-চাঁইটা বেরিয়ে আছে,' জনি বললো 'ওটাতে দড়ি আটকাতে পারলে আমরা কিন্তু খাড়াই-এর আদ্ধেক মেরে দেবো।'

'হ্যাঁ,' টমি উত্তরে বললো। 'কিন্তু ওখানে একবার উঠে গেলে তো আমরা আটকে যাবো। একটা দাঁড়াবার জায়গা বার করা দরকার, যাতে ক'রে সেখান থেকে আমরা আরো উপরে দড়ি ছুঁড়তে পারি।'

এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে ওরা যেমন খাঁজ চাইছিলো সে-রকম একটা দেখতে পেয়ে গেলো।

প্রথম জনি দড়ি ছুঁড়লো কিন্তু লাগাতে পারলো না। তারপর টমি চেষ্টা

করলো, ওরও ফসকালো। জনি অপেক্ষা করলো বাতাস কখন একটু থামে। তারপর সুযোগ বুঝে আবার ছুঁড়লো। দড়ির পাকানো গোল্লা হাওয়ায় উঠে গেলো এবং ঠিক পাথরের চাঁইএ আটকে গেলো। ওরা ভালো ক'রে টেনে-টেনে দেখে নিলো কতটা জোরে আটকেছে। হ্যাঁ, বেশ শক্ত হয়েছে।

এবার ওরা খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলো, টমি আগে-আগে। দু-হাতে লতার দড়ি চেপে ধ'রে খাড়াই-এর গায়ে পায়ের আঙুল দিয়ে-দিয়ে সাবধানে ওরা উঠলো। উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো ওদের এবং মাঝে-মাঝে হাওয়া যখন একটু জোরে বইছিলো ওরা খাড়াই-এর গায়ে আছড়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে উপরের সেই খাঁজ পর্যন্ত উঠতে ওদের দম একেবারে ফুরিয়ে গেলো।

পিছনে তাকিয়ে দেখলো দূরে নদী দেখা যাচ্ছে। ওদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে সব-কিছু। ক্রমেই দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে আর তার ওপর ঐ খাঁজটাও খুব সরু। আর-একটা পাথরের চাঁই খুঁজে বার করতে হবে যার গায়ে দড়ি আটকানো যায়। কিন্তু দেরি হ'য়ে গেলে আর কিছুই দেখা যাবে না। আর ঠিকমতো পা না-ফেলতে পারলে সোজা খাড়াই বেয়ে নিচে!

'আমাদের এখন যেতেই হবে,' টমি বললো। ওর হাত-পা যন্ত্রণায় টনটন করছে।

পাথরের চাঁই থেকে ওরা ওদের দড়ি টেনে বার ক'রে নিলো। আবার ওটাকে টেনেটুনে পরীক্ষা ক'রে নিলো। বেশ শক্তই আছে এখনো। চোখে পড়লো খাড়াই-এর একেবারে মাথার কাছাকাছি একটা পাথর বেশ জুতসই ভাবে বেরিয়ে আছে। তবে ওখানে সুবিধেজনক কোনো খাঁজ নেই। না থাক। মনে হ'লো, ওখান থেকে সোজা মাথায় উঠে যাওয়া যাবে। খাড়াইটা ওখানে খুব চড়া মনে হ'লো না।

এবারে টমি ওদের মাথার উপরের পাথরের চাঁই-এর উপর দিয়ে দড়ি ছুঁড়লো। সে নিজেই ওঠবার জন্য তৈরি হ'লো এবার। খাড়াইটা এখানে খুব চড়া নয় ঠিকই, তবে অনেক আলগা পাথরের টুকরো রয়েছে। আর একসঙ্গে দুজনে যাবার মতো জায়গাও নেই। তাই ঠিক করলো আগে ও নিজে উঠবে, পরে জনি।

পাহাড়ের গায়ের একটা ছোটো ফাটলের মধ্যে পা রাখল টমি। নিচের দিকে তাকাতে পারছে না, ওর শরীর খাড়াই-এর গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে রাখতে হয়েছে। ওর দড়িতে একটা টান লাগলো।

'জনি, এখন এসো না,' ও চেঁচিয়ে বললো। 'এখানে দুজনের দাঁড়াবার জায়গা হবে না।'

কথা বলা বন্ধ করলো টমি। এখন দম রাখতে হবে, বাকি পথটা আরো ওঠবার জন্যে।

খুব তাড়াহুড়ো করা চলবে না এও সে জানে। অন্ধকার হ'য়ে আসছে, তবুও কিন্তু ধীরে, নিশ্চিত ভাবে যেতে হবে। হাত ছড়িয়ে আঙুল দিয়ে নিজের চারপাশে যতদূর-সম্ভব বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। কোথায়-কোথায় আঁকড়ে ধরা যায় বুঝে গেলো। খুব আস্তে-আস্তে টমি নিজেকে টেনে-টেনে উপরে তুলছে। পায়ের আঙুল দিয়ে বুঝে নিচ্ছে পাথরের গায়ে গর্ত-টর্ত কোথায় আছে। এইভাবে ইঞ্চি-ইঞ্চি ক'রে সে যখন প্রায় মাথা পর্যন্ত উঠে এলো তখন, একটা পাথরের টুকরো চোখে পড়লো। মনো হ'লো বেশ শক্ত, ওর শরীরের ভার ঠিক বইতে পারবে। পা দিয়ে যখন খাঁজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, সেই সময়ে যে-পাথরটা বাঁ হাতে ধরা ছিলো সেটা ভেঙে গেলো।

হঠাৎ দেখলো যে ও প'ড়ে যাচ্ছে। ডান হাতের আঙুলের জোরে গোটা শরীরকে ধ'রে রাখতে পারলো না। নিচে থেকে জনি চীৎকার ক'রে উঠলো। ঠিক যখন টমি বুঝলো যে ও একেবারে প'ড়েই যাবে, সেই সময় আবার দড়িটাকে খুঁজে পেলো। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে প্রাণপণে দড়িটা ধ'রে ঝুলে রইলো।

নিচে থেকে জনি ডেকেই চলেছে। কিন্তু ও তো উত্তর দিতে পারছে না। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। কাঁধের থেকে হাত যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

'চেপে ধ'রে থাকিস, ও টমি!' জনি নিচের থেকে চেঁচিয়ে বললো। 'একটুক্ষণ ধরে থাক! আমি আসছি।'

'না, জনি, তোকে আসতে হবে না।' টমি কোনোমতে কষ্ট ক'রে কথাগুলো বললো। 'আমি পেরে যাবো।'

ঐভাবেই একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে অপেক্ষা করলো টমি। তারপর আবার আস্তে-আস্তে কষ্ট ক'রে উঠতে থাকলো। এবার ধরবার আগে প্রত্যেকটা পাথরের টুকরো ভালো ক'রে দেখে নিলো। অবশেষে, সে খাড়াই এর মাথায় এলো। কোনোক্রমে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে উপরের ঘাসের উপরে নিয়ে এলো। ওখানে ধপাশ ক'রে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো। আর যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই শরীরে।

১০

মোচো মেরুনরা

টমি শুনতে পেলো জনি ওর নাম ধ'রে ডাকছে। চোখ মেলে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো এখন রাত্রি। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালো। খাড়াই-এর ধারে গিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখলো।

'আমি ঠিক আছি, জনি,' ও চেঁচিয়ে বললো।

'আমি যে অনেকক্ষণ ধ'রে তোকে ডাকছি। ভাবছি তোর কিছু হ'লো নাকি।'

'না, কিছুই না, শুধু ভীষণ ক্লান্ত,' টমি বললো।

'দাঁড়া, এবার আমি উঠে আসছি,' জনি বললো।

কিন্তু টমি তো জানে যে, উঠে আসবার সময়ে মাথার কাছাকাছি কী অবস্থা হয়েছিলো তার। আর এই অন্ধকারে জনি নির্ঘাত প'ড়ে যাবে। না ওকে ওই ঝুঁকি কিছুতেই নিতে দেওয়া চলে না।

'উঠিস না, জনি দাঁড়া,' টমি চেঁচিয়ে বললো। 'বলছি, কী করবো।'

টমি ঝোপের মধ্যে চ'লে গেলো। ছুরি দিয়ে গাছ থেকে একটা বড়ো ডাল কেটে আনলো। তারপর ওটার একটা ধার চাপ দিয়ে বেঁকিয়ে নিলো। তারপর খাড়াই-এর কিনারে নিয়ে সোজা শুয়ে পড়লো। বেঁকানো আঁকশির মতো ডগাটা নিচে নামিয়ে দিলো। তাই দিয়ে দড়িটা ধ'রে ফেলে টেনে উপরে নিয়ে এলো। দড়ির একদিক কাছেই একটা গাছের গায়ে শক্ত ক'রে বাঁধলো, অন্য দিকটা নিচে জনির কাছে ছুঁড়ে দিলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা দুজনেই একসঙ্গে খাড়াই-এর মাথায় এসে গেলো।

দুজনেই এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়। কিন্তু এখনো অনেক কাজ করার রয়েছে। গ্রাম যে ওদের উপরেই সাহায্যের জন্যে নির্ভর করছে।

কিছু ফল পেড়ে নিয়ে ওরা আবার এগোলো। সব কিশোর যোদ্ধাদের মতো ওরাও জানতো কী ক'রে তারার আলোয় পথ চিনে যেতে হয়।

বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের দিকে এগোলো ওরা। যখন চাঁদ উঠলো ওরা তখন একটা পরিষ্কার জায়গা পার হচ্ছে। অদ্ভুত আকৃতির এক পাহাড় ওদের সামনে। মেরুনরা যে-রকম চিনির ডেলা বানায় ঠিক যেন সে-রকম দেখতে। জনি পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

'হ্যাঁ, সর্দার ফিলিপ বলেছিলেন বটে এই পাহাড়ের কথা,' টমি বললো।

'এইবার বোধহয় আবেং-এর আওয়াজ করা উচিত আমাদের,' জনি বললো।

ওরা একটু থামলো। টমি শিঙা লাগালো ঠোঁটে। তারপর সাহায্যের আওয়াজ ক্রমে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠলো। তারপর আস্তে-আস্তে নেমে যেতে-যেতে আওয়াজ একেবারে মিলিয়ে গেলো। মিলিয়ে-যাওয়া ঐ আওয়াজের রেশও ওরাও শুনতে পেলো।

পর-পর ওরা দুজনেই আবেং-এর আওয়াজ করেছিলো। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ওদের চারপাশে বন। বড়ো-বড়ো গাছগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা ব্যাং ডাকছে। ছেলেরা দুজনে গায়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। ওরা জানতো যে অন্য মেরুনদের চোখও হয়তো ওদের লক্ষ করছে। তাই ওরা দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করলো সেখানে।

একটু পরে ওরা একটা গলার স্বর শুনতে পেলো।

'অচেনা কিশোর' এরা কারা? 'এই রাত্রে আবেং বাজাচ্ছে?'

'আমরা পাহাড়চুড়োর কিশোর যোদ্ধা। সর্দার ফিলিপ আমাদের পাঠিয়েছেন,' টমি খুব গর্বের সঙ্গে বললো।

'হঃ, খোকা মুরগি!' গলার স্বর বললো।

'আমরা দুজন,' জনি বললো। কিশোর যোদ্ধা ভয় পেয়েছে ব'লে যেন কখনো মনে না-হয়।

'দুই হাবা হাঁসের মতো তোমরা এই রাতে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছো। আর শত্রুরা কেউ তোমাদের পিছু নিয়েছে কিনা তাও তো দেখছো না।'

'আমরা জানতাম যে আপনারা কাছেই আছেন,' টমি বললো। 'মেরুন যোদ্ধা যদি দেখা দেবে না ব'লে ভাবে তাহ'লে গাছেরাও তাদের দেখতে পায় না।'

মেরুন যোদ্ধা হেসে উঠলো এবং এবার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো।

'আমার নাম জন, মোচো মেরুনদের স্কাউট আমি,' সে বললো। 'সর্দার ফলিপের কাছ থেকে কী সংবাদ এসেছে?'

'মোচো মেরুনদের জন্য সর্দার ফিলিপের কাছ থেকে একটা সংবাদ এনেছি আমরা,' টমি বললো। 'কিন্তু উনি তো কোনো স্কাউটের কাছে সে- সংবাদ বলতে বলেননি।'

একটু থেমে স্কাউট বললো : 'হুম্...না :, হাবা হাঁস নয়তো, দুই তুখোড় পথিক। ঠিক আছে। আমার সঙ্গে এসো।'

সে খুব জোরে হাঁটছিলো বনের মধ্যে দিয়ে আর ছেলেরাও ওদের পিছন-পিছন তাড়াতাড়ি হাঁটছিলো। কিন্তু ওরা এত ক্লান্ত ছিলো যে স্কাউটকে প্রায়ই থেমে এদের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো।

'এ কী? পাহাড়-চুড়োয় কিশোর যোদ্ধাদের কি বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শেখানো হয়নি?'

'আমরা খুব ক্লান্ত,' জনি বললো।

স্কাউট ওদের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো।

'তোমরা যাত্রা শুরু করেছিলে কখন?' সে জিগেস করলো।

'কাল রাত্রে, চাঁদ ওঠাবার আগে,' টমি বললো।

'অ্যাঁ? তোমরা ঐ খাড়াই পার হ'য়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ,' টমি সায় দিলো।

'তাহ'লে তো তোমরা খুবই ক্লান্ত,' নরম গলায় যোদ্ধাটি বললো। 'তোমরা তো ঘুমিয়েই পড়বে।'

'হ্যাঁ, পারলে এখানেই,' টমি বললো।

যোদ্ধাটি একটু সময়ের জন্য ভেবে নিলো। তারপর ওর আঙুল দুই ঠোঁটের ফাঁকে রেখে শিস দিলো। অমনি আর একজন যোদ্ধা এসে হাজির। জনের মতো, সেও একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'এও আমার মতো আর-একজন স্কাউট,' জনি জানালো।

'অভিবাদন।'

'স্বাগত,' নতুন স্কাউট বললো।

'এরা হ'লো পাহাড়চুড়োর দুজন কিশোর যোদ্ধা। ওখানে এদের বিপদ দেখা দিয়েছে,' জন ব'লে চললো।

'গত কাল চাঁদ ওঠবার আগে ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। কাজেই ওরা এখন ভারি ক্লান্ত। ওদের সর্দারের কাছ থেকে আমাদের সর্দারের কাছে

ওরা একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে। আমাদের উচিত তাড়াতাড়ি সর্দারের কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া।'

হঠাৎ, স্কাউট দুজন ছেলেদেরকে পিঠে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলো। ছেলেরা এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো যে 'না' পর্যন্ত বলতে পারলো না।

মেচো গ্রামে ঢুকে টমি আর জনিকে সোজা পরামর্শ পরিষদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে ওরা মাদুরের ওপর ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মোচো মেরাজদের সর্দার যখন ঢুকলেন তখন ছেলেরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। এদের সর্দার দেখতে রোগা, চাওড়া কাঁধ, সর্দার ফিলিপের চেয়ে বয়সে ছোটো ব'লেই মনে হয়।

'সর্দার, অভিবাদন' ছেলেরা বললে।

'স্বাগত,' সর্দার বললেন।

'পাহাড়চুড়োর সর্দার ফিলিপের কাছ থেকে আমরা আপনার জন্য সংবাদ নিয়ে এসেছি,' টমি বললো।

'বলো, কী সংবাদ।'

'সর্দার ফিলিপ বলেছেন যে লালকোর্তারা তাদের ঘুরন্ত বন্দুক নিয়ে ওঁকে আক্রমণ করতে চলেছে। ওঁকে হয়তো পাহাড়ের আরো ভেতরে ঢুকে যেতে হ'তে পারে। কিন্তু সর্দার জেম্‌স্‌ ও তাঁর বিখ্যাত মোচো যোদ্ধারা যদি তাঁকে সাহায্য করে তাহ'লে তিনি লালকোর্তাদের ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারেন।'

সর্দার জেম্‌স্‌ নীরবে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন।

'পাহাড়চুড়োর কী হবে?' সর্দার জিগেস করলেন।

'সর্দার ফিলিপ বলেছেন, দরকার হ'লে পুরো গ্রামটাই পুড়িয়ে দেবেন,' টমি উত্তর দিলো।

'পুড়িয়ে দেবেন?' সর্দার জেমস শান্তভাবে বললেন, 'দিয়ে পাহাড়ের মধ্যে থাকবেন।'

'উনি বলেছেন যে, ন্যানি শহরের মতো ওটাকেও তিনি নষ্ট ক'রে দেবেন,' জনি বললো।

বলতে-বলতে ওদের দুজনের চোখেই জল এসে গেলো। ওরা ওদের পাহাড়-চুড়োর ছোট্ট গ্রামকে ভালোবাসতো।

'ঠিক আছে। তোমরা এখন বিশ্রাম করো। শুনলাম যে তোমরা নাকি

গত কাল চাঁদ ওঠবার আগে হাঁটতে শুরু করেছো। খুব ভালো ছেলে। তোমরা একটু বিশ্রাম করো। আমি ইতিমধ্যে পরামর্শ পরিষদের সভা সেরে ফেলি।'

'আমার আর-একটা কথা আছে, যদি দয়া ক'রে শোনেন একটু,' টমি বললো।

তারপর সে সর্দার জেম্‌স্‌কে চার্লির কথাটা খুলে বললো। সর্দার শুনে মাথা নাড়ালেন।

'সর্দার ফিলিপের হাতে অনেক সাহসী ছেলে আছে মনে হচ্ছে,' উনি বললেন। 'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়। তবে তোমাদের কি মনে হয় যে এই ছেলেটি, চার্লি, লালকোর্তাদের শেষটায় গ্রামের পথ দেখিয়ে দেবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না, জানেন। কারণ, চার্লি সাহসী তা আমরা জানি, কিন্তু লালকোর্তারা ওকে মারধোর করতে পারে।'

'তাহ'লে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা উচিত,' সর্দার জেম্‌স্‌ বললেন। 'ওরা যন্ত্রণা দিয়ে-দিয়ে ওকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে।'

১১

লালকোর্তাদের এক বন্দী

চার্লি নিজেও জানতো না কেন সে পাহাড়চুড়ো থেকে টমি আর জনিকে অনুসরণ ক'রে পিছন-পিছন এসেছিলো। কিন্তু এটা সে জানতো যে সে ভয় পেয়েছিলো। টমি তো জেনে গেছে যে সে লুক্‌আউট পাহাড়ের দৌড়ে সবাইকে ঠকিয়েছে। হয়তো সর্দার ফিলিপও এতক্ষণে ব্যাপারটা জেনে গেছেন। তাই ভয় পেয়ে সে ক্যাপটেন ডিকের দলের পিছনে-পিছনে বনের মধ্যে ঢুকেছিলো। ওদের পিছনে খুব কাছ ঘেঁসেই চলছিলো। ক্যাপটেন ডিক যখন স্কাউট পিটারকে দেখতে পেয়েছিলেন, তখন চার্লি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। ইংরেজ শিবিরের উপর আক্রমণের সময় ও অপেক্ষা করেছিলো। ইংরেজ সৈন্যরা যখন মেরুনদের অনুসরন করছিলো, তখনও সে উপুড় হ'য়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে উপত্যকা পার হয়েছিলো। লম্বা সৈন্য যে টমি ও জনির দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো তাও সে দেখেছে। তারপরেই ও এগিয়ে যায়। ভেবেছিলো বন্ধুদের সে সাহায্য করতে পারবে। আর তাহ'লেই ওরা হয়তো তাকে ক্ষমা করবে।

বুনো বরার থেকে যখন টমি ও জনি পার পেলো তখনও সে দেখেছে। সৈন্যরা যখন এলো তখনও ও লুকিয়েই ছিলো। এখন চার্লি ঐ মোটা সৈন্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে আর চীৎকার ক'রে যাচ্ছে।

'থামো এবার, নইলে মাথা ভেঙে দেবো।' লালকোর্তা চ্যাঁচালো।

চার্লির তুলনায় ওর জোর তো অবশ্যই বেশি। একটু বাদেই চার্লিকে ওর মুঠোর মধ্যে ধ'রে ফেললো। তার হাত পিছন দিকে ঘুরিয়ে মুচড়ে দিলো। চার্লি যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে থাকলো।

অন্য সৈন্যটি তখনও মাটিতে ব'সে-ব'সে তার পা রগড়াচ্ছিলো। টমি আর জনি ওদের বন্দুক চুরি ক'রে নেওয়ায় ওরা দুজনেই বেজায় খেপে গেছে।

'ঠিক আছে, এবার আমার সঙ্গে এসো,' মোটা সৈন্য বললো। চার্লি এতক্ষণে লড়াই করা থামিয়ে দিয়েছে।

চার্লির হাত ধ'রে সামনে ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চললো তারা।

'ঐ ছেলেগুলো হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হ'লো বলো তো?' মোটা জন অন্য জনকে বললো।

লম্বা জন মাথা ঝাঁকালো। ওর মুখ তখনো যন্ত্রণায় কুঁচকে রয়েছে।

'জানি না। হয়তো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদের বন্দুকের দিকে দৌড়ুচ্ছে। আর তক্ষুনি একজন আমার পায়ে জোরসে এক ঘা ঝাড়লো।

'পা ভেঙেছে নাকি?'

'তা মনে হচ্ছে না। তবে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে।' ওর রাগ ভাব এখনো কাটেনি। 'মাংসের লোভে যদি অতটা খেপে না-উঠতে তাহ'লে কিন্তু এমন কাণ্ড হ'তো না।'

'মেজাজ দেখিয়ো না আমাকে। ধরেছি তো ওদের একজনকে।'

লম্বা সৈন্য তখন চার্লির দিকে তাকালো। চার্লি দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

'একটা পাথরের ঢিল দাও তো দেখি, ওর সব হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিই,' লম্বা সৈন্য বললো।

'না-না, ওকে এখন আমরা শেষ করবো না। ক্যাপটেন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। ও ইচ্ছে করলে মেরুন গ্রামে আমাদের নিয়ে যেতে পারে।'

চার্লি কাঁদতে আরম্ভ করলো।

'তাহ'লে ওকে বেঁধে রাখো আর আমার পায়ের একটা ব্যবস্থা করো,' লম্বা জন বললো।

মোটা সৈন্য তার জলের বোতল থেকে লম্বা এক টুকরো চামড়া বার করলো, আর তাই দিয়ে চার্লির হাত পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রাখলো। তারপর ওকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

লম্বা সৈন্যটির ব্যথা তখনো কমেনি। সে তার বুট খুলে নিলো। পা বেশ ফোলা। মোটা সৈন্য তার জামা থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পায়ের ফোলা জায়গাটা বেঁধে দিলো! দুজনেই খুব রাগতভাবে কথাবার্তা বলতে থাকলো।

শিবিরে ফিরে তাকে কী করা হবে সে-কথা চার্লিকে বিশদ ক'রে বললো ওরা। এতে চার্লি এত ভয় পেয়ে গেলো যে সে গুঁড়ি মেরে-মেরে স'রে যেতে চেষ্টা করলো। লম্বা সৈন্য ওর হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চার্লির মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালো।

চার্লি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। ওর মুখ দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে আর একটা দাঁত আলগা হ'য়ে গেছে।

'তুই আবার পালাবার চেষ্টা ক'রে ছাখ, তোকে একেবারে খতম ক'রে দেবো,' লালকোর্তা চীৎকার ক'রে বললো।

এরপর চার্লিকে সামনে রেখে ওরা শিবিরের দিকে যাত্রা শুরু করলো। ওখানে পৌছলে ইংরেজ সৈন্যরা সবাই চেঁচিয়ে ওদের অভিনন্দন জানালো। চার্লিকে ক্যাপটেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো। লালকোর্তাদের একজন যখন গোটা কাহিনীটা বলছে তখন চার্লি সারাক্ষণ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি বাপু যাচ্ছিলে কোথায়?' ক্যাপটেন বাজখাঁই গলায় চার্লিকে জিগ্যেস করলেন।

'না-না—কোথাও না তো,' চার্লি বললো। ও খুবই ভয় পেয়েছে।

'মিথ্যে কথা বলছো,' ক্যাপটেন চীৎকার ক'রে উঠলেন।

এবার ক্যাপটেন তরোয়ালের উপরে ওঁর হাত রাখলেন। চার্লির মনে হ'লো ঐ তরোয়াল দিয়েই উনি ওকে মারবেন এবার। ভাবতেই সে ভয়ে শিউরে উঠলো।

'শি-শি-শিকারে, আমরা শিকারে যাচ্ছিলাম,' ও চেঁচিয়ে বললো।

ক্যাপটেন মাথা নাড়লেন।

'আবার মিথ্যে কথা বলছো! আমরা এখানে আছি জেনে মেরুনরা তো এখন এখানে শিকার করতে আসবে না। আজ সকালের হামলাটা খুব অদ্ভুত ছিলো। মেরুনরা চেষ্টা করছিলো এখান থেকে আমাদের টেনে বার করতে। ওরা আমাদের সরিয়ে দিতে চাইছিলো কেন?' উনি চ্যাঁচালেন।

চার্লি কিছুই বললো না। ক্যাপটেন যেন ওকে আস্ত খেয়ে ফেলবেন মনে হ'লো।

"তোমাদের ছেলেদের এখান দিয়ে পার ক'রে দেবার জন্যে কি? আসল কারণটা কী? মেরুনরা কি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে কোথাও?' ক্যাপটেন আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

চার্লি ভয়ের চোটে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। ও চাইছিলো এক ছুটে পালাতে, কিন্তু চারদিকে তো লালকোর্তা ঘিরে রয়েছে। চার্লি ওদের চামড়ার গন্ধ পাচ্ছে, ওদের গোল বড়ো-বড়ো মুখ সব দেখতে পাচ্ছে।

ক্যাপটেন একেবারে চার্লির মুখের কাছে ওঁর মুখ নিয়ে এলেন।

এক ভয়ংকর রকমে ফিশফিশিয়ে উনি বললেন, 'তোমাকে এখুনি কথা বলাচ্ছি আমরা।'

চার্লির উপরে ওঁর চোখ স্থির রেখে একজন সৈন্যের দিকে ইশারা করলেন।

উনি আদেশ করলেন, 'তোমরা একটা আগুন জ্বালিয়ে তাতে একটা লোহা গরম করো তো। ওর জিভের গোড়াটা একটু গরম ক'রে দিলে নিশ্চয়ই কথা বলবে।'

চার্লি চীৎকার ক'রে উঠলো, ওর দু-হাঁটু কাঁপছে। কাঁপতে-কাঁপতে সে মাটিতে প'ড়ে গেলো।

'তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালাও!' এক মারাত্মক গলায় ক্যাপটেন চীৎকার করলেন। এবার আস্তে-আস্তে উনি তরোয়াল খুলতে লাগলেন।

১২

উদ্ধারের উদ্দেশে

ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়ার পর টমি ও জনি তখুনি ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর স্কাউট জন ওদের জাগিয়ে দিলে তার পিছন-পিছন ওরা পরামর্শ পরিষদের সভাঘরে গেলো। সর্দার জেম্‌স্‌ ও তাঁর লোকেরা ততক্ষণে সবাই ওখানে এসে গেছেন। মোচোর পথ-ঘাট তখন মেরুনে-মেরুনে ছেয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র হাতে যোদ্ধারাও আছেন তার মধ্যে।

সর্দার জেম্‌স্‌ টমি ও জনিকে বললেন, 'আমাদের যোদ্ধারা দল বেঁধে পাহাড়-চুড়োয় যাচ্ছেন। তোমাদের বাবাদের কাছেও আমি খবর পাঠাচ্ছি যে, তোমরা ভালো আছো। তোমরা কি আর-কিছু খবর পাঠাতে চাও?'

ছেলেরা পরস্পরের দিকে তাকালো। মনে হ'লো ওরা যেন নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে একটু শলাপরামর্শ ব'লে নিলো।

টমি চেঁচিয়ে বললো, 'কিন্তু আমরা তো যোদ্ধাদের সঙ্গেই ফিরতে চাই। চার্লিকে উদ্ধার করতেই হবে, তা ছাড়া আমরাও তো আমাদের গ্রামের জন্য যুদ্ধ করতে চাই!'

সর্দার জেম্‌স্‌কে গম্ভীর দেখালো।

'কিন্তু তোমরা তো ক্লান্ত! তোমরা তাড়াতাড়ি কুচকাওয়াজ ক'রে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

'আমরা পারবো, সর্দার। আমরা অনেকক্ষণ টানা বিশ্রাম করেছি,' জনি বললো। 'আর তা ছাড়া যেখানে ঐ ইংরেজদের বন্দুক দুটো আমরা লুকিয়ে রেখে এসেছি সে-জায়গাটাও দেখিয়ে দিতে পারবো।'

পরিষদের লোকেরা সব একসঙ্গে হেসে উঠলো।

'আমরা ঐ ইংরেজদের বন্দুক দুটো ব্যবহার করতে পারি অবশ্য,' সর্দার বললেন। 'কিন্তু তোমরা মোটেই বেশিক্ষন ঘুমোওনি, মাত্র কয়েক মিনিট ঘুমিয়েছো।'

'আমাদের অল্পসল্প বিশ্রাম করার অভ্যেস আছে,' টমি তাড়াতাড়ি বললো।

'খুব ভালো কথা। আমরা অবশ্য ভেবেছিলাম যে তোমরা ফিরে যেতেই চাইবে। কিন্তু কথা দাও যে, সব সময় ক্যাপটেনকে মেনে চলবে।'

ছেলেরা প্রতিশ্রুতি দিলো।

দিনের আলো ফোটবার আগেই যোদ্ধারা ছাউনি ছেড়ে চললো। টমি ও জনি কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারলো যে কেন ওদের কাছ থেকে ক্যাপটেনকে মেনে চলার কথা আদায় করা হ'লো। ওরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার একটু পরেই দুজন যোদ্ধা ছেলে দুজনকে এক ঝটকায় কাঁধের উপরে তুলে নিলো।

'না, না, আমাদের ব'য়ে নিতে হবে না, আমরা হাঁটতে পারবো,' টমি চ্যাঁচামেচি করলো। 'আমরা কিশোর যোদ্ধা।'

'হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই কিশোর যোদ্ধা,' ক্যাপটেন বললেন। 'আর সেই কারণেই তো তোমরা প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারো না। তোমরা সর্দার জেম্‌স্‌কে কথা দিয়েছো যে আমাকে মেনে চলবে।'

ছেলেরা বুঝলো উনি ঠিকই বলছেন। মোচো যোদ্ধারা এরপর ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো।

সৈন্যরা কিন্তু খাড়াই-এর পথে নামলো না। ওদের একটা গোপন পথ ছিলো: পাহাড়ের মধ্যে গর্তের ভিতর দিয়ে ওরা একটা গুহা পর্যন্ত গেলো। গুহার পর গুহা—তার ভিতর দিয়ে দিয়ে ওরা অনেকক্ষণ হাঁটলো। তারপর একসময়ে ওরা সেই লম্বা-লম্বা ঘাসের জায়গাটতে এলো যেটা ছেলেরা আগের দিন পার হয়েছে।

বিকেল পড়তে না-পড়তেই ওরা নদীর ধারে পৌঁছে গেলো।

'নৌকোটা বার করো,' ক্যাপটেন আদেশ দিলেন।

ছেলেদের চোখ এবার বিস্ময়ে বড়ো-বড়ো হ'য়ে গেলো। ছুরি দিয়ে মোচো মেরুনরা একটা বড়ো গাছের ধারের নরম মাটি খানিকটা কেটে ফেললো। তার নিচে থেকে বেরিয়ে পড়ল মস্ত একটা বড়ো নৌকো। নৌকোটা পরিষ্কার রাখার জন্যে ওর মধ্যে ঘাস ভর্তি ক'রে রাখা হয়েছিল।

'এটা এলো কোথা থেকে?' টমি একজন যোদ্ধাকে জিগেস করলো।

যোদ্ধা হেসে উত্তর দিলেন, 'এটা মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেই এটা লুকোনো থাকে। মাছ ধরবার সময় এখান থেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা। আবার কাজ হ'য়ে গেলে ঢেকেঢুকে এখানেই রেখে যাই।'

দুজন লোক নৌকোটাকে সামনে পিছনে ক'রে বেয়ে আনলো। অল্পক্ষণ

বাদেই সব যোদ্ধারা নদী পার হ'য়ে আবার বনের মধ্যে এসে পড়লো। ওরা এগিয়ে চললো, তাড়াতাড়ি চটপটে পায়ে, কিন্তু নিঃশব্দে। ছেলেদের লুকোনো বন্দুকগুলোও একটু পরে পেয়ে গেলো ওরা। যোদ্ধারা একটু হাসলো এবং টমি ও জনির দিকে যেন বেশ সম্মানের দৃষ্টিতে তাকালো। ইংরেজ শিবিরের কাছাকাছি এসে মোচো যোদ্ধারা থামলো। ওখান থেকে ওরা স্কাউটের দল পাঠালো পাহাড়-চুড়োর মানুষদের দেখবার জন্য।

মেরুনরা নিজেরা শিবির বানালো না। ওরা ঘাসের উপরে ব'সেও রইলো না। ক্যাপটেন ওঁর হাত উপরে তুলে রাখলেন। হাত যখন নামালেন তখন যোদ্ধারা সব হঠাৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

যতক্ষণ-না অন্ধকার হ'য়ে এলো ওর সব এইভাবেই রইলো। তারপর ওদের ক্যাপটেন খুব আস্তে একটা শিশ দিলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে গেলো। অপেক্ষা করলো কতক্ষণে স্কাউটরা ফিরে আসে। একটু পরেই ওরা পাহাড়চুড়োয় মানুষদের দেখা পেলো।

১৩

ক্যাপটেন ডিকের সম্মতি

'আমরা চ'লে যাবার পরে আর কি কোনো যুদ্ধ হয়েছে ?' টমি ওর বাবাকে জিগেস করলো।

'না।'

'তাহ'লে আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি,' টমি বললো।

একটা গাছের নিচে বাবার পাশে শুয়ে-শুয়ে টমি কথা বলছিলো। তুই মেরুন সৈন্যের দল বনের ঠিক মধ্যিখানে একটা শিবির পেতেছে। সর্দারেরা পরামর্শ সভা করছিলেন। শিবিরের চারদিকেই স্কাউট। সকলেই ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে। কোনো আগুন জ্বালানো হয়নি।

'তুমি আর জনি একটা দারুণ কাজ করেছো,' টমির বাবা বললেন। 'সর্দার ফিলিপ তোমাদের জন্যে খুব গর্বিত। আমরা সকলেই গর্বিত।'

'আমরা নিজেরা অবশ্য বেশির ভাগ সময় এমন ভয় পেয়েছিলাম,' টমি বললো।

'মানুষ অধিকাংশ সময় ভয় পেলেই তবে সবচেয়ে সাহসের কাজটা করতে পারে,' ওর বাবা উত্তর দিলেন।

'চার্লি নিশ্চয়ই এখনো ভয়ে সিঁটিয়ে আছে,' টমি বললো।

বাবা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে আরাম ক'রে পাশ ফিরে শুলেন।

'একটা কথা বলি তোমাকে,' উনি খুব চাপা গলায় বললেন।

'হ্যাঁ, বলো।'

'চার্লি যে লুকআউট পাহাড়ের দৌড়ে ফাঁকি দিয়েছে তা সর্দার ফিলিপ এবং আমরা কয়েকজন জানতাম।'

টমি খুব অবাক হ'য়ে গেলো।

'কী ক'রে জানলে তোমরা ?' সে জিগেস করলো।

'আমরা তো মেরুন। এইসব পাহাড়-পর্বত আমরা চিনি। চার্লি যখন ফিরে এলো তখন ও তেমন ক্লান্ত ছিলো না, তা ছাড়া ও ভালো ক'রে মুখ মোছেনি। ফলে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ও ইতিমধ্যে খেয়েছে।'

টমি চুপ ক'রে থাকলো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলো: সর্দার তাহ'লে সবই জানতেন গোড়া থেকে? তা এখন তাহ'লে ওকে কী করা হবে? ওকে কি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে?' সে বাবাকে জিগেস করলো।

'আমাদের কোনো যোদ্ধাকে তো আমরা এখন চার্লিকে উদ্ধার ক'রে আনবার জন্যে পাঠাতে পারি না,' বাবা উত্তর দিলেন। 'এটা যুদ্ধ। সবার আগে গ্রামকে বাঁচাতেই হবে।'

টমি উঠে বসলো।

'কিন্তু চার্লি যে সমস্ত গ্রামকে বাঁচিয়েছে! চার্লি হঠাৎ গিয়ে না-পড়লে লালকোর্তারা জনিকে ও আমাকে নিশ্চয়ই ধ'রে ফেলতো।'

টমির বাবা বিষণ্ণ বোধ করলেন। উনি বুঝতে পারছেন যে চার্লি তার কর্তব্য করেছে। টমি অবশ্য সে-কথা ভাবছিলো না। সে চায় চার্লি নিরাপদে ফিরে আসুক।

'হ্যাঁ, চার্লি তখন গ্রামকে বাঁচিয়েছে বটে। কিন্তু ভয় কী জানো? চার্লি হয়তো এতোক্ষণে আমাদের সম্বন্ধে সব কথা লালকোর্তাদের ব'লে দিয়েছে। ইংরেজরা ওকে যে-শাস্তি দেবে তাতে ওর মনের জোর ও সাহসে হয়তো কুলোবে না।'

'তুমি কী বলতে চাও?' টমি জিগেস করলো।

'সে হয়তো ইংরেজদের পাহাড়চুড়োয় আসবার পথ দেখিয়ে দেবে,' বাবা বললেন।

'তা সে কখনোই দেবে না!' টমি বেশ রাগত স্বরেই বললো। 'জনি আর আমাকে বাঁচাবার সময় সে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে।'

'ঠিক, টমি, এ-কথা ঠিক। চার্লি তখন খুবই সাহস দেখিয়েছে। চার্লি যদি আমার বন্ধু হ'তো তাহ'লে আমি হয়তো অন্যান্য কিশোর যোদ্ধাদের নিয়ে ক্যাপটেন ডিকের কাছে যেতাম। ক্যাপটেন ডিকই তো আমাদের নেতা,' বাবা খুব শান্ত গলায় বললেন।

টমি উঠে দাঁড়ালো। শিবিরের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে সে তিনবার ব্যাঙের ডাক ডাকলো। একে-একে জনি, ডেভিড ও ইউরিয়া এসে জড়ো হ'লো। বাবার কথা ও সবাইকে সবিস্তারে বললো। ওরা চটপট ঠিক করলো যে ক্যাপটেন ডিকের কাছে যেতে হবে।

পরামর্শসভা থেকে ফেরবার পথে ওরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলো।

'ক্যাপটেন ডিক, দয়া ক'রে আমাদের একটা কথা শুনুন,' টমি বললো।

কাপটেন থামলেন। 'তুমি টমি?' উনি বললেন। 'আর এরা কিশোর বাহিনীর অন্যান্যেরা?'

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন ডিক, আমরা কখন চার্লিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে যাচ্ছি?'

'আক্রমণের আগে নয়,' ক্যাপটেন ডিক উত্তর দিলেন। 'এখুনি চার্লিকে আনতে যাবার মতো অত যোদ্ধা আমাদের নেই।'

'আক্রমণ করছি?' জনি জিগেস করলো। ও খুব অবাক হ'য়ে গেছে।

'হ্যাঁ, কারণ ইংরেজ সৈন্যরা তো আশা করবে না যে আমরা ওদের আক্রমণ করবো।'

'কিন্তু আক্রমণ করলে তো আমাদের অনেক লোকজন হারাতে হবে,' টমি বললো। 'আমাদের অনেক লোক যুদ্ধে নিহত হবে। তার চেয়ে আমরা ওদের একটা ফাঁদে ফেলছি না কেন?'

ক্যাপটেন ডিক উত্তর দেবার আগে অনেকক্ষণ থেমে রইলেন। তারপর খুব নিচু স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। 'এর দুটো কারণ আছে। তোমাদের সব কথাই বলবো। সব তোমাদের জানা দরকার। তোমরা গ্রামের জন্যে সত্যিই ভালো কাজ করেছো। প্রথম কারণ হ'লো যে, লালকোর্তারা এখন কোনো ফাঁদে পা দেবে না। গতকাল ওরা বুঝে গেছে যে, আমরা ওদের টেনে বার করবার চেষ্টা করছি। এবং তার কারণও ওরা এতক্ষণে আন্দাজ ক'রে ফেলেছে। ওরা হয়তো জানে যে আমরা সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ, ওরা হয়তো চার্লিকে দিয়ে জোর ক'রে আমাদের গ্রামের পথ বার ক'রে নিতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহ'লে ফাঁদে ফেলবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওদের ঘুরন্ত বন্দুকে আমাদের টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবে। ফাঁদে ফেলবার মতো জায়গাও একটাই মাত্র আছে। তারা-আপেল খাদে। ওখানে ওরা ঘুরন্ত বন্দুক চালাতে পারবে না।' তারা—আপেল খাদ জায়গাটা ছেলেরা সবাই চিনতো। ওখানকার আপেল গাছ বিখ্যাত, ফাঁদের পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। দু-দিকেই ঘন নিবিড় বন। মেরুনরা দুদিকেই লুকিয়ে থেকে গুলি গোল্লা চালাতে পারে।

'কিন্তু চার্লি সৈন্যদের গ্রামে আনবার আগেই তো আমরা ওকে বার ক'রে আনতে পারি,' জনি বললো।

'সে-রকম লোক আমাদের নেই। আর তা ছাড়া আজ রাতে ইংরেজ সৈন্যরা জোর পাহারা দেবে।'

হঠাৎ, টমির মাথায় একটা বুদ্ধি-এলো।

'কিন্তু আমরা তো তাকে বার ক'রে আনতে পারি, ক্যাপটেন ডিক! আমরা কিশোর বাহিনীর ছেলেরা যদি যাই, তাহ'লে আপনার যোদ্ধাদের তো পাঠাতে হয় না।'

ক্যাপটেন ডিক অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলেন। উনিও চার্লিকে আনবার জন্যে চিন্তিত। চার্লি যদিও ভুল করেছে, তবু সে কষ্টও কিছু কম পায়নি। ছেলেরা একটা বড়ো ঝুঁকি নিতে চাইছে। তবে মেরুনদের তো ঝুঁকি নিতেই হয়।

গাছের মধ্যে দিয়ে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে দেখলেন ক্যাপটেন ডিক।

'চাঁদ ওঠবার আগেই তোমাদের কাজ শেষ করতে হবে,' ক্যাপটেন বললেন।

'চাঁদ ওঠবার আগে', টমি কথাগুলো আবার বললো।

'ঠিক আছে তবে,' ক্যাপটেন ডিক চাপা স্বরে বললেন।

১৪

লালকোর্তাদের হারাবার ফন্দি

ছেলেরা যখন গ্রাম থেকে বেরুলো তখন ওদের পরনে ছিলো লম্বা ট্রাউজার আর সঙ্গে ছিলো শুধু ছুরি। ওরা গায়ের শার্ট, তীর-ধনুক সব মেরুন শিবিরে রেখে গেলো। আবারও আগের মতো, ওদের বুকে সেই মালিশ মাখানো হয়েছে। ওরা তরতর ক'রে পাহাড় বেয়ে নেমে এলো। গাছের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে চললো। কোনো ইংরেজ স্কাউট দেখা যায় কিনা দেখতে-দেখতে এগুলো।

মাইল চারেক পরে ইংরেজ শিবিরের আলো প্রথম চোখে পড়লো। টমি ব্যাঙ ডাকল আর ছেলেরা সব তক্ষুনি থেমে গেলো। টমির দিকে ঝুঁকে পড়লো সবাই।

'দুজন ভেতরে যাবে, আর দুজন এখানে থেকে পাহারা দেবে,' টমি বললো। 'প্রথম দুজন যদি ধরা পড়ে তাহ'লে অন্য দুজন ফিরে গিয়ে ক্যাপটেন ডিককে খবর দেবে।'

'কে-কে ভেতরে যাবে!' ডেভিড জিগেস করলো।

'আমি একজন,' টমি বললো। 'আর একজনকে বেছে সঙ্গে নেবো।'

মেরুনদের মধ্যে প্রচলিত একটা সহজ খেলা খেলে ওরা ঠিক করলে কে যাবে। খেলায় জিতলো ডেভিড।

'তাহ'লে ডেভিডই আমার সঙ্গে যাবে,' টমি বললো।

ওরা চটপট বেরিয়ে গেলো। জনি আর ইউরিয়া উপত্যকার কিনার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথম দিকে টমি আর ডেভিড সন্তর্পনে হাঁটছিলো, কিন্তু শিবিরের কাছাকাছি এসে ওরা হামাগুঁড়ি দিতে আরম্ভ করলো। একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে এসে ওরা তার পেছনে থেমে গেলো।

'আমি ডান দিকে দেখবো, তুই বাঁ দিকে। খেয়াল রাখিস চার্লিকে দেখা যায় কিনা,' টমি ডেভিডকে বললো।

পাহাড়ের চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো ওরা। আবহাওয়া এখন চমৎকার, তাই সৈন্যরা শিবির করেছে একেবারে খোলা জায়গায়। তিনটে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। প্রত্যেক আগুনের চারপাশ ঘিরে কয়েকজন ক'রে সৈন্য। শিবিরের চারধারে পাহারাদারদেরও দেখতে পেলো ছেলেরা। প্রত্যেক কোণে একজন ক'রে মোট চারজন পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যরা এখন খাওয়া-দাওয়া করছে।

আগুনের থেকে খানিকটা দূরে বড়ো-বড়ো ছায়া পড়েছে। তারই একটার ধারে চার্লিকে দেখা গেলো।

ওর হাতদুটো পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বাঁধা, আর একজন সৈন্য ওকে খাবার দিচ্ছে। এক-একবার এক গাদা ক'রে খাবার চার্লির মুখে পু'রে দিচ্ছে আর অন্য-একজন সৈন্য হেসে-হেসে উঠছে। রাগে টমি ও ডেভিডের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকলো।

'আমরা কি ওর খুব কাছে গিয়ে পড়ে দড়িটা কেটে দিতে পারি না,' ডেভিড বললো।

চার্লি কাঁদছিলো আর কান্নার চাপে ওর কাঁধ কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো। ওরা বুঝতে পারছে ওর কী-রকম ভয় করছে আর একলা লাগছে।

'ওকে বার ক'রে আনতেই হবে,' টমি বললো।

'কিন্তু ওকে বার ক'রে আনতে গিয়ে সৈন্যদের কেউ যদি আমাদের দেখে ফ্যালে,' ডেভিড বললো।

'ওদের নজর অন্য-কোনোদিকে যদি ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়,' টমি বললো, 'তাহ'লে সেই ফাঁকে আমি অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দড়ি কেটে দিতে পারি।'

হঠাৎ, ডেভিড খুব আস্তে একটু হাসলো। 'চার্লির ওপর থেকে ওদের নজর কী ক'রে সরিয়ে আনতে হবে তা আমি জানি,' ডেভিড বললো। 'তুই শুধু দড়িটা কাটবি, তাহ'লেই হবে। আমার দিকে নজর রাখবি। আর চার্লিকে নিয়ে যখন তৈরি তখন তিনবার ব্যাং ডাকবি।'

'কী, করবি কী তুই,' টমি জিগেস করলো।

'আমি ওদের সঙ্গে এমন-একটা গল্প ফাঁদবো যার শেষ কোনো নেই। গল্পটা হবে এক ভয়ংকর ঝড় নিয়ে, ঐ ঝড় কোনোদিনও থামবে না। তাহ'লে ঐ কথাই রইলো, চার্লির দড়ি কাটার পরে তিনবার ব্যাং ডাকবি।'

আর-কোনো কথা না-ব'লে ডেভিড এগিয়ে গেলো। ওদের লালকোর্তাদের আগুনের দিকেই হেঁটে গেলো ও।

কথা বলবে কি টমি তখন বেজায় হতভম্ব হ'য়ে গেছে। ডেভিড কি বদ্ধ পাগল হ'য়ে গেছে?

ডেভিড খুব চড়া গলায় একটা মেরুনদের গান গাইলো। পাহারাদারদের একজন ওকে থামতে বললো। কিন্তু ডেভিড এগিয়েই চললো। পাহারাদার ওর বন্দুকের টিপ করলো ডেভিডের দিকে। কিন্তু সে গান গেয়েই চললো। একটা আগুনের ধারে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি বিরাট চীৎকার ক'রে-একটা আদেশ দিলেন। পাহারাদার তার বন্দুক নামিয়ে নিলো। ডেভিড তার গান গাইতে-গাইতে এগিয়েই বললো। ও একবারও চার্লির দিকে তাকায়নি। আগুনের কাছে না-আসা পর্যন্ত ওর গান শেষ হয়নি। কাছাকাছি এসে ও থামলো। সৈন্যরা সব একসঙ্গে চার্লির দিক থেকে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ডেভিড দু-হাত মাথার উপরে তুলে চেঁচিয়ে বললো: 'নমস্কার লন ভদ্রজন, লালকোর্তা মহাপ্রভুগণ।'

এক মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ। পরক্ষণেই ক্যাপটেন বেয়াড়া হুংকার ছাড়লেন:

'ছেলেটিকে এ-ধারে নিয়ে এসো!'

দুজন সৈন্য ডেভিডকে ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে দ্রুতপায়ে ক্যাপটেনের দিকে এগিয়ে গেলো। মাথা নুইয়ে ওঁকে নমস্কার জানালো।

'কে তুমি? কী চাও এখানে?' ক্যাপটেন চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমার নাম ডেভিড, আমি এক মেরুনের ছেলে। আমি গান গেয়ে-গেয়ে বেড়াই আর অ্যানান্সির গল্প বলি। বনের মধ্যে ঘুরছিলাম। দেখলাম লালকোর্তা প্রভুদের আগুন জ্বলছে। তাই অ্যানান্সির গল্প শোনাতে চ'লে এসেছি। সদয় ইংরেজগণ যদি একটা টাকা দেন আর দু-মুঠো ভাত।'

'তুমি, মেরুনের বাচ্চা, ইংরেজদের কাছে দু-মুঠো ভাতের জন্য এসেছো? তোমার কি মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ,' ক্যাপটেন হেসে উঠলেন।

সৈন্যরাও সব হেসে উঠলো। কিন্তু, ওরা যখন হাসছে, ডেভিড তার গল্প বলা শুরু ক'রে দিয়েছে।

'এক-যে ছিলো রাজা, তার যে-সব সৈন্যসামন্ত ছিলো, তারা সবাই পরতো লালকোর্তা। তারা সবাই ছিলো দারুণ সাহসী, গানে-গানে তাদের কীর্তি

কথা গাওয়া হ'তো। আর এই সাহসীরাই সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত জ্যামেকাবাসীদের নতুন রাজা।'

এক-এক ক'রে সৈন্যদের হাসি থেমে গেলো। ওরা ডেভিডের চমৎকার গলার স্বর শুনতে শুরু করেছে আর অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছে ওর ঝকঝকে সুন্দর কালো মুখের দিকে।

টমির তো নাড়ি থেমে যাবার জোগাড় হয়েছে। সে ছুরি বার ক'রে হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটু-একটু ক'রে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোলো। চার্লির মাথার পেছন দিকে ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। ডেভিড যে কতক্ষণ গল্প চালাতে পারবে তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে এটা জানতো যে অ্যানান্সির গল্পের ভালো কথক ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প চালাতে পারে।

'ইংলণ্ডের সাহসী লোকেরা একমাত্র পাহাড় ছাড়া দ্বীপের সর্বত্র তাদের শাসন চালালো। আফ্রিকার লোকেরা, যারা মেরুন হয়েছিলো, তাদের রাজত্ব ছিলো ওখানে,' ডেভিডের গল্প চললো।

গল্প বলতে-বলতে সে এধার ওধার হাঁটা-চলা করতে লাগলো। কখনো-কখনো একটা ঘন ঝোপের ধারে এসে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই একটা বুদ্ধি এসে গেছে ওর মাথায়।

'একদিন হ'লো' কী! বছরের ঠিক মাঝামাঝি এক দারুণ ঝড় এলো! খুব ভোর থেকে ঝড় শুরু হ'লো আর সারাদিন উলটোপালটা ঘূর্ণি বাতাস বইলো। ঝড়ে ব্রের অ্যানান্সির বাড়ি ভেঙে ধুলোয় মিশে গেলো। ব্রের অ্যানান্সির তো বেজায় মন খারাপ। ইংরেজদের অধিকার পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত কায়েম। মেরুনদের হাতে শুধু পাহাড়। কিন্তু ব্রের অ্যানান্সি চেয়েছিলো শুধু তার নিজে হাতে-গড়া বাড়িটার অধিকার রাখতে। আর এই তার প্রথম ঝড়।'

গল্প এই পর্যন্ত আসতে টমি চার্লির কাছে পৌঁছে গেছে। যে-সৈন্যটি চার্লিকে খাবার দিচ্ছিলো সেও স'রে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিশে গেছে। ওরা সবাই মন দিয়ে ডেভিডের গল্প শুনছে। টমি ঠিক চার্লির পেছনে এসে থামলো। চার্লিকে ভ্যাবাচ্যাকা দেখাচ্ছিলো।

হঠাৎ চার্লি লাফিয়ে উঠলো। ওর পেছনে একটা ফিশফিশানির শব্দ। চার্লি সবে মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করছিলো, থেমে গেলো।

'আমরা তোর জন্যে এসেছি। এক্ষুনি তোকে ছাড়িয়ে নেবো,' টমি আবার ফিশফিশিয়ে বললো।

'না-না, চেষ্টা করিসনে—আমার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ত্যাখ।' চার্লিও ফিশফিশ ক'রে বললো।

টমি তাকিয়ে দেখে আঁৎকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো আর কি! চার্লির গলায় বাঁধা একটা দড়ি, তার একটা দিক ঐ সৈন্যের হাতে ধরা। মাঝে-মাঝে সৈন্যটি দড়িতে একটু-একটু ক'রে টান দেয়। আর চার্লির মাথা দড়ির টানে-টানে একটু ক'রে লাফিয়ে উঠে এগিয়ে চলে। দড়িতে বাঁধা একটা মুরগির মতো লাগছে ওকে।

'আমি দড়ি কেটে দেবো, আর তারপর বনের মধ্যে ছুটবো আমরা,' টমি বললো। 'আগুনের আলোয় ওরা ঠিকমতো বন্দুকের তাক করতে পারবে না।'

'না, টমি, আমি তোর সঙ্গে ফিরতে পারবো না।'

'কেন? তুই নিরাপদে আবার আমাদের সঙ্গে থাকবি!' টমি চুপি-চুপি বললো।

'আমি পাহাড়চুড়োয় আর ফিরতে পারি না। আমি যে সব মেরুনদের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছি!'

'তুই লালকোর্তাদের কী বলেছিস?' টমি জিগেস করলো।

'সব ব'লে দিয়েছি। আমি ওদের বলেছি আমাদের গ্রামে মোট লোক কত। বলেছি যে সর্দার ফিলিপ সাহায্যের খবর পাঠিয়েছেন। বলেছি আমাদের গ্রামে কী ভাবে যেতে হয়। কথা দিয়েছি আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।' চার্লি ব'লে চলে। চোখের জল তখন ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'কেন বলেছিস, চার্লি?' টমি জিগেস করলো। 'কেন সব কথা বলতে গেলি ওদের?'

'ওরা গরম লোহা চেপে ধরেছিলো আমার মুখে-বুকে,' চার্লি কেঁদে ফেললো, 'আমি ভয় পেয়ে গেলাম!'

'বুঝতে পারছি সব,' টমি বললো।

'চাঁদ উঠলেই লালকোর্তারা যেতে শুরু করবে,' চার্লি বললো। 'যা, ফিরে গিয়ে সর্দার ফিলিপকে সব জানিয়ে দে।'

'আমি এখনই দড়ি কেটে দিচ্ছি। তুইও আমাদের সঙ্গে দৌড়ুতে পারবি, আর নিজেই গিয়ে সর্দারকে বলতে পারবি। এবং উনিও লালকোর্তারা গিয়ে পৌঁছুবার আগে সব মেরুনদের সরিয়ে দিতে পারবেন।'

'কিন্তু আমি তো ফিরতে পারবো না,' টমি। মেরুনদের সঙ্গে জোচ্চুরির জন্যে আমাকে লালকোর্তাদের সঙ্গেই থেকে যেতে হবে,' চার্লি কাঁদতে-কাঁদতে বললো।

'কিন্তু লালকোর্তারা তো তোকে মেরে ফেলবে!' টমি বললো।

'না, গ্রামের পথ দেখিয়ে দিলে ওরা মারবে না।'

'কিন্তু সর্দার ফিলিপ তো আক্রমণ করবেন ব'লে ঠিক করেছেন,' টমি বললো।

চার্লি একটু জোর গলায় কথা বলছে এবার। ওকে উত্তেজিত লাগছে। "ইংরেজদের আক্রমণ করবেন! মোচো মেরুনরা ওঁর সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণ ক'রে জিতবেন কী ক'রে। ওদের ঘুরন্ত বন্দুকে আমাদের সবাইকে যে ওরা মেরে ফেলবে।'

'শ্‌ শ্‌ শ্‌! লালকোর্তারা তোর গলা শুনে ফেলবে,' টমি সাবধান ক'রে দিলো।

চার্লি একটু ভেবে নিলো। তারপর বললো, 'না! তোদের সঙ্গে আমি ফিরতে পারি না, তবে লালকোর্তাদের একটা একটা ফাঁদে নিয়ে যেতে পারি আমি।'

'কিন্তু এখান থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের মধ্যে ফাঁদের জায়গা তো নেই কোথাও,' টমি বললো।

'নেই তা জানি,' চার্লি বললো 'কিন্তু একটা জায়গা ভেবে বার করা যাক। তারপর তুই সর্দার ফিলিপকে গিয়ে বলিস আমি ইংরেজদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তারা-আপেল খাদ!' টমি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললো।

'ঠিক আছে। তুই এক্ষুনি ফিরে যা। সর্দার ফিলিপকে বলিস 'আমি ওখানে ওদের নিয়ে যাচ্ছি।'

ওর গাল বেয়ে চোখের জল নামছে আর ওর কাঁধ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে ফুলে-ফুলে উঠছে।

'না, চার্লি, তুই আমাদের সঙ্গে ফিরে চল,' টমি বললো।

কিন্তু চার্লি মাথা নাড়লো।

'ফিরে যা, তাড়াতাড়ি যা তারা-আপেল খাদে!' ওর চোখের জলের মধ্যেই চার্লি বললো।

লালকোর্তার দড়ির টান পড়লো আর চার্লির মাথা আবার সামনে এগিয়ে

গেলো। টমি হামাগুঁড়ি দিয়ে পেছিয়ে এলো একটু। সে ছায়ায় অন্ধকারেই র'য়ে গেলো। ওখান থেকে সে ব্যাং ডাকলো।

ডেভিডের গলা শুনতে পাচ্ছে :

'চতুর্থ দিনের ঝড়ের পর ব্রের অ্যান্যান্সি তার নিজের হাতে গড়া বাড়ির দরজা পর্যন্ত এলো। যে-সব লালকোর্তারা ওর ওপর নজর রাখছিলো ও তাদের সবাইকে দেখলো।'

টমি বনের একেবারে কিনারে এসে গেছে। এখন সে তিনবার ব্যাঙের ডাক ডাকলো। ডেভিড মাথা উঁচু করলো। টমি যে-গাছগুলো পর্যন্ত গিয়েছিলো ওর চোখ যেন সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু ওর স্পষ্ট গলায় যে-ঝড়ের শেষ নেই তার গল্প এগিয়েই চললো।

'তখন ব্রের অ্যান্যান্সি বললো,' হেই, বোকা, ভোদা, লালকোর্তার দল! তোরা নিজের কাজ ফেলে এক মেরুন ছেলের গল্প শুনতে এসেছিস কেন? ও গল্প তো ফুরোবে না। হা, হা, হা! হোঃ হোঃ হোঃ!'

তারপর আচমকা ডেভিড যেন নিজেকে ছুড়ে ফেললো ঐ ঘন ঝোপের মধ্যে। এই ছিলো, এই নেই,—যেন চক্ষের নিমেষে উঠে গেলো।

লালকোর্তারা এ ওর মুখের দিকে চাইলো। একটু-একটু ক'রে ওরা বুঝতে পারছে ঐ ছেলে কী ক'রে ওদের ধাপ্পা দিয়েছে। রাগে চীৎকার করতে-করতে ওরা ঝোপের দিকে ছুটলো। কিন্তু ডেভিডের আর পাত্তা পাওয়া গেলো না।

১৫

যুদ্ধ

পাহাড়ের উপর সূর্য উঠলো। রোদের আলো গাছের ভিতর দিয়ে তারা-আপেল খাদে এসে পড়লো। টমি ও অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারা একটা মোটা গাছে চ'ড়ে বসেছে। ওরা খুব শক্ত ডালের উপর শুয়ে আছে যাতে তীর টিপ করার জন্য হাত দুটো ফাঁকা থাকে। টমি পাতার ফাঁক দিয়ে-দিয়ে খাদের দুই ধারে দেখে নিলো ; মেরুন যোদ্ধারা যে ওখানে লুকিয়ে ব'সে আছে সে তা জানে ! ওরা এমন-ভাবে লুকিয়ে আছে যে কিছুতেই দেখা যাবে না। কাল রাত্রে টমি যখন চার্লির খবর এনে সর্দার ফিলিপকে বললো তখন উনি সব যোদ্ধাদের আদেশ দিলেন তারা-আপেল খাদে চ'লে যেতে।

প্রথমে, ওরা ওদের সবুজ পোশাক প'রে নিলো। এটা ওদের ফাঁদের পোশাক। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গাছের ডালপালা বাঁধলো। তারপর দল বেঁধে তাড়াতাড়ি তারা-আপেল খাদে চ'লে গিয়ে যে যার জায়গায় ব'সে গেলো। গাছের থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে টমি গাছ আর যোদ্ধা কিছুতেই তফাৎ করতে পারছে না।

বাঁ দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শুনতে পেলো টমি। মাথা ঘুরিয়ে ডেভিডের দিকে তাকালো। ডেভিড ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলো।

'তারা-আপেল খাদে ঢুকলে ইংরেজ সৈন্যরা তোর বড়ো-বড়ো দাঁতগুলো দেখতে পাবে,' টমি বললো।

'ওরা ভাববে একটা দাঁতওয়ালা গাছ। অ্যানান্সির গল্পে যেমন আছে,' ডেভিড উত্তর দিলো।

'কাল রাত্রে অ্যানান্সির গল্প আর কতক্ষণ চালাতে পারতিস তুই ?' টমি জিগেস করলো।

'আমার ঝড় না-ফুরোনো পর্যন্ত,' ডেভিড হাসতে-হাসতে উত্তর দিলো।

হঠাৎ, খাদের ওপাশের গাছের ওপর থেকে, পাখিদের শব্দ শোনা গেলো। অনেক ছোটো-ছোটো গাছ যেন নড়তে থাকলো। বন্দুকে বারুদ ভর্তি করার

শব্দ শুনতে পাচ্ছে ছেলেরা। ওরা জানতো যে, পাখির শব্দ ক্যাপটেন ডিকের। এটা হ'লো বারুদ ভর্তি ক'রে নেবার সংকেত।

তারা-আপেল খাদ প্রায় একশো গজ চওড়া। যোদ্ধারা খাদের দু-পাশেই আছে ; একটা লম্বা সরু উপত্যকাপথে ওরা এই খাদে ঢুকেছে। উপত্যকার পেছনে গাছের ভেতর দিয়েও ওপাশে ওরা দেখতে পাচ্ছে। ওরা আশা করছে যে এই পথেই লালকোর্তাদের দেখা মিলবে—চার্লির পেছন-পেছন তারা এই ফাঁদে এসে ঢুকবে।

মেরুনদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো, কিন্তু ওদের তো ধৈর্যের শেষ নেই। তারপর একসময় লালকোর্তাদের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

বড়ো একটা গোরুর দলের মতো আওয়াজ করতে-করতে আসছিলো ওরা। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আওয়াজ আরো জোরালো হ'লো। তারপর লালকোর্তাদের দেখা পাওয়া গেলো।

ওদের ক্যাপটেন সবার সামনে আসছিলেন। তাঁর পাশে ছোট্টখাট্ট একজন হাঁটছিলো। সেই চার্লি-বেশ মাথা উঁচু ক'রে হাঁটছে এখন।

ওর হাত আর এখন বাঁধা নেই, কিন্তু গলার দড়িটা এখনো আছে। দড়ির একটা ধার একজন সৈন্যের হাতে ধরা। গাছের সারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ক্যাপটেন চার্লিকে কিছু বলছিলেন। মেরুন ছেলে চার্লি তারা-আপেল খাদের দিকে দেখালো।

ইংরেজ সৈন্যরা উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করলো। টমি জানতো যে মেরুন যোদ্ধাদের দুজনের চোখ চাঁদমারিতে স্থির হ'য়ে আছে। আগের রাত্রে ছেলেদের কাহিনী সব শোনবার পর ক্যাপটেন ডিক তাঁর নির্দেশ ঠিক-ঠিক সবাইকে দিয়ে রেখেছেন। 'তুমি ইংরেজ ক্যাপটেনকে টিপ করবে,' একজন যোদ্ধাকে ব'লে রেখেছেন। 'আর তুমি টিপ করবে যে-সৈন্য চার্লির গলার দড়ি ধ'রে আছে তার দিকে,' আর-একজনকে ব'লে রেখেছেন।

চার্লি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলেছে। সে জানতো যে সামনের গাছপালার মধ্যে মেরুন যোদ্ধারা তাদের বন্দুক নিয়ে ঠিক তৈরি আছে। ইংরেজ সৈন্যদের সামনের দলটা এবার খাদে ঢুকছে। ওদের ঘুরন্ত বন্দুক একদল সৈন্য টেনে-টেনে আসছে, কিন্তু তা এখনো পেছনে রয়েছে। চার্লি যখন ওদের নিচে দিয়ে যাচ্ছিলো তখন কিশোর যোদ্ধারা একবার তার দিকে তাকালো।

ওর গালের একটা দিক ফুলে রয়েছে। হয় ও প'ড়ে গেছে, না-হয়তো লালকোর্তাদের কেউ ওকে বেজায় মেরেছে।

টমি ও অন্যান্য ছেলেরা সংকেতের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ওরা যে-গাছে লুকিয়ে ছিলো আরো অনেক সৈন্য সে-গাছের নিচে দিয়ে গেলো! দেখতে-দেখতে তারা-আপেল খাদের সবটা ইংরেজ সৈন্যে ভ'রে গেলো। ওদের ভারি বুটের ঘায়ে ধুলো উড়ছে আর মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

এবার সংকেত এলো। ক্যাপটেন ডিক জোরে একটা আওয়াজ করলেন।

খাদের দু-ধারের সমস্ত গাছ যেন হঠাৎ জেগে উঠলো। গুলি-গোলার আওয়াজ, হাওয়ায় ছুটে-যাওয়া তীরের শাঁই-শাঁই শব্দ, চারদিক কেমন ভয়াবহ হ'য়ে উঠলো হঠাৎ। মেরুন যোদ্ধারা এবার তাদের যুদ্ধের হাঁক ছাড়লো আর পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলো।

ছেলেরা চার্লিকে দেখছিলো। ক্যাপটেন ও সেই-যে সৈন্য চার্লির দড়ি ধরেছিলো তারা তো সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে প'ড়ে গেলো। চার্লিও অমনি তড়াক ক'রে এক লাফে খাদের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ও যেন ঠিক খরগোশের মতো শুড়ুৎ ক'রে দৌড়ুলো। টমি ও অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারা হাততালি দিয়ে উঠলো। 'চার্লি! হুরে! হুরে!' ওরা চীৎকার ক'রে উঠলো।

'চ'লে এসো সবাই। ওদের মনে রাখার মতো একটু-কিছু দেওয়া যাক!' টমি চেঁচিয়ে বললো।

ওরা লালকোর্তাদের ঝাঁকের মধ্যে তীর ছুড়লো। তাদের কেউ-কেউ প'ড়ে গেলো। দু'-একজনে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার প'ড়ে গেলো। অনেকেই স্থির হ'য়ে গেলো। লালকোর্তারা বুঝেই উঠতে পারছে না কোনদিকে টিপ করবে। ওরা তো বুঝতে পারছে না কোনটা গাছ আর কোনটা মেরুন।

হঠাৎ, যুদ্ধের আওয়াজ ছাপিয়ে একটা শিঙার আওয়াজ শোনা গেলো। এটা হ'লো ইংরেজ সৈন্যদের পিছু হঠবার সংকেত। মেরুনরা তখন একটা বিরাট জয়ধ্বনি করলো। ওরা নিজেরা তো সাহসী এবং জানতো যে ইংরেজদের মধ্যেও অনেক সাহসী যোদ্ধা আছে। কিন্তু ওদের ক্যাপটেন নিহত, কাজেই ওদের তো পিছু হঠতেই হবে।

গুলি ছুঁড়ে পেছোতে-পেছোতে লালকোর্তারা খাদের বাইরে চ'লে গেলো। পেছোবার সময় ওরা চেষ্টা করেছিলো ঘুরন্ত বন্দুকগুলোকে নিয়ে যেতে। কিন্তু

এতে ক'রে পেছিয়ে আসাটা এত আস্তে হ'য়ে যাচ্ছিলো যে ওদের অনেক লোক হারাতে হ'লো।

মেরুন যোদ্ধাদের কেউ-কেউ লালকোর্তাদের অনুসরণ করতে চাইছিলো। কিন্তু ক্যাপটেন ডিকের আদেশে তারা থেমে গেলো।

'ফিরে চলো, ফিরে চলো! বনের মধ্যে ফিরে চলো!' ক্যাপটেন ডিক চীৎকার ক'রে হুকুম দিলেন।

টমি ওর ধনুক ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে নিলো।

'চার্লি! চলো, চার্লির কাছে যাওয়া যাক!' টমি ওর বন্ধুদের চেঁচিয়ে বললো।

কিশোর যোদ্ধা চারজন লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে তরতর ক'রে খাদের পাশ দিয়ে নেমে চ'লে গেলো। চার্লি যে-ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিলো, ওরা সেই ঝোপে ঢুকে গেলো। দৌড়ুতে-দৌড়ুতেই ওরা চার্লির মাথা দেখতে পেলো।

'চার্লি! চার্লি! বেরিয়ে আয়—বনের মধ্যে চল!'

ওরা সবাই যখন ওকে ঘিরে রয়েছে তখন চার্লির ঠোঁটে মৃদু হাসি। ওরা তাড়াতাড়ি ক'রে সবাই ওখান থেকে বনের দিকে ছুটলো। চীৎকার করতে-করতে, হাসতে-হাসতে ওরা দৌড়ুলো।

১৬

জয়

ঐ রাত্রে পাহাড়চুড়োর গ্রামে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হ'লো। ক্লান্ত বটে, তবে জয়ের জন্য মেরুনরা সবাই খুব খুশি। সারা রাত ধ'রে ওরা গান গাইলো আর নাচলো।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে বানানো মঞ্চের উপর ব'সে আছেন সর্দার ফিলিপ আর সর্দার জেম্স্। কিশোর বাহিনীর সকলে ওঁদের সঙ্গে ব'সে। বড়ো আগুনের কুণ্ডে আগুন জ্বলছে—তার আলোয় চারদিক আলো হ'য়ে গেছে। ঐ আগুনে অনেক বুনো শুয়োর আর একটা ষাঁড় সেঁকা হচ্ছে। গাদা-গাদা ফল রয়েছে। গান-বাজনার লোকেরা রয়েছে। তাদের পুরোনো দেশ আফ্রিকার অনেক নাচ নাচলো লোকেরা।

ভোজসভার শেষে সর্দার ফিলিপ উঠে দাঁড়ালেন এবং চুপ করাবার জন্যে ওঁর হাত উপরে তুললেন।

'আমার ভাই-বোনেরা, আজ শত্রুর উপরে জয়লাভের জন্যে আমরা এখানে আনন্দ করছি,' উনি বললেন। 'এটা খুবই সংগত, কারণ আমরা সত্যিই ভালো লড়াই করেছি। কিন্তু মনে রাখবেন যে ইংরেজরাও বেশ ভালো লড়েছে। এখন আমরাই পুরোনো জ্যামেকাবাসী আর ইংরেজরা নতুন। আশা করা যাক যে আমরা একসঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারবো। আর যদি আমরা একসঙ্গে থাকতে না-পারি তাহ'লে ইংরেজরা সমতলে থাকবে। আমরা আমাদের পাহাড়ের দখল রাখবো।'

'পাহাড় চাই, আমরা আমাদের পাহাড় চাই!' মেরুনরা চীৎকার ক'রে জানালো।

আবার যখন কথা শুরু করলেন তখন সর্দারের গলা বিষণ্ণ লাগছিলো, 'দু-দিকেই প্রচুর লোক নিহত হয়েছে। এটা অমঙ্গল।'

সবাই সর্দার ফিলিপের সঙ্গে একমত হ'লো। মেরুন স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা যারা তাদের স্বামী কিংবা পিতাকে হারিয়েছে তারাও বিষণ্ণ।

সর্দার ফিলিপ তখন চার্লির দিকে ফিরলেন।

'আমাদের তরুণ সাহসী চার্লিকে আমরা প্রায় হারাতে বসেছিলাম,' উনি বললেন।

সবাই মিলে এমন আনন্দধ্বনি করলো যে গাছপালা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠলো।

'অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারাও, টমি, জনি, ডেভিড এবং ইউরিয়া—এরাও সাহসের পরিচয় দিয়েছে,' সর্দার ফিলিপ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বললেন। 'ওরাই চার্লিকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছে আর পাহাড়চুড়ো গ্রামকে বাঁচিয়েছে!'

'হুরে! হুরে! হুরে!' মেরুনরা সব চেঁচিয়ে উঠলো।

এত জোর আওয়াজ হ'লো যে বনের মধ্যে বুনো বরাগুলো পর্যন্ত বেজায় ভয় পেয়ে গেলো।

———

মেরুন কারা ?

সম্পাদকের টীকা

'নতুন জগতের প্রথম সফল বিপ্লবী' ছিলেন জেনারেল কুদহোয়ে (বা কুজো)। ক্রীতদাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মেরুনরা অবিশ্রাম সংঘর্ষ চালিয়েছিলো জ্যামেকায়—প্রথমে স্পেনের কোন্‌কিস্তাদোরদের বিরুদ্ধে, পরে ইংরেজ লালকোর্তাদের বিরুদ্ধে।

মেরুনদের সব খবর ও ইতিহাস এতকাল সযত্নে তারা গোপন রেখেছিলো তাদের নিজেদের মধ্যে। তাদের সমাজ ঘননিবিড়—জ্যামেকার বাইরে তারা কিছুতেই তাদের কাহিনী ছড়াতে দিতে চাইতো না। ১৯৭৭ সালে মিলটন ম্যাকফারলেন 'কুদহোয়ে দি মেরুন' নামে একটি বই লিখে এতদিনকার অগোচর সব রহস্যের ওপর থেকে পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন। ম্যাকফারলেন স্বয়ং কুদহোয়ের বংশধর: মেরুনরা তাদের কাহিনী বংশপরম্পরায় মুখে-মুখে নিজেদেরই মধ্যে প্রচার করতো: ম্যাকফারলেন সব কাহিনী শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা গ্র্যাণ্ড-পা ওয়ালেম-এর কাছে।

মেরুনদের পূর্বপুরুষদের প্রথমে জোর ক'রে আফ্রিকা থেকে ধ'রে আনে স্পেনের বোম্বেটেরা—আনে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে জ্যামেকায়। প্রচণ্ড নির্যাতন ও অবিশ্রাম তাড়ন-পীড়ন সত্ত্বেও তারা গোড়ায় দাস হিশেবে কাজ করতে অস্বীকার করেছিলো; পরে এমন ভঙ্গি করে যেন তারা পোষমানা ও বশম্বদ হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা ছিলো তাদের রণকৌশলেরই অংশ, কারণ পাহারা একটু শিথিল হ'তেই তারা জ্যামেকার বনে-পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে; সেখানে তারা জমি চাষ করে; এছাড়া তাদের জীবন ধারণের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে প্রধান ছিলো শিকার, মাছধরা ও ফলমূল সংগ্রহ। স্পেনীয় কোন্‌কিস্তাদোররা তাদের আবার পাকড়াবার জন্য বহু নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে শেষটায় তাদের পুনর্দখল করার আশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ইংরেজরা তা করেনি; ১৬৫৫ সালে স্পেনীয়দের কাছ থেকে জ্যামেকা কেড়ে নেবার পর থেকে ইংরেজরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে মেরুনদের খোঁজ করতে থাকে: তাদের

পাকড়ে ফেলে আবাদে দাস হিশেবে কাজ করাবার প্রচণ্ড প্রলোভনই ইংরেজদের চালিত করেছিলো। জ্যামেকার সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী মানুষদের একান্ত অভাবই ইংরেজদের মেরুনদের অধিকার ক'রে নেবার কাজে এমন তীব্রভাবে একাগ্র রেখেছিলো। তাছাড়া মেরুনরা প্রায়ই অতর্কিত হামলা চালাতো আবাদগুলোয়, এবং চিরকালই তারা ছিলো পলাতক ক্রীত-দাসদের নির্ভর ও আশ্রয়। ইংরেজরা কত-রকম যে রণকৌশল ব্যবহার করেছিলো, তার ইয়ত্তা নেই ; একবার এমনকী উত্তর আমেরিকা থেকে মেস্‌কিটো ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে এসেও তাদের হদিশ করার চেষ্টা করা হয়, চেষ্টা করা হয় তাদের আস্তানাগুলো খুঁজে বার করার। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এটা মনে রাখা জরুরি। সেই জন্যেই, শেষকালে অন্য উপায় না-দেখে, ১৭৩১ সালে ইংরেজরা বাধ্য হয় জেনারেল কুদ্‌হোয়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে সন্ধিপ্রস্তাবের শর্তগুলোর মধ্যে ছিলো মেরুনদের নিরাপত্তার অভয়পত্র, পাহাড়ি এলাকাগুলোয় তাদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির নিঃশর্ত সনদ। মনে রাখতে হবে সরকারিভাবে জ্যামেকা থেকে ক্রীতদাস প্রথা কিন্তু তারও একশো বছর পর ওঠানো হয়েছিলো।

মেরুনরা তাদের ছেলেমেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই গেরিলা যুদ্ধে দীক্ষা দিতো। পশ্চিম অফ্রিকায় গোষ্ঠী হিশেবে বাস করতো, সকলের ছিলো সমান অধিকার, নেতা বা সেনাপতি সবাই মিলে মত প্রকাশ ক'রে নির্বাচন করতো। সেই ঐতিহ্য ও সূত্রের প্রতি নির্বাধ আনুগত্যই মেরুনদের প্রচণ্ড শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলো, আর তার ফলেই তারা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলো।

ভিক রীডের এই কিশোর উপন্যাস এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। 'কিশোর যোদ্ধা' উপন্যাসে মেরুনদের জীবনযাপনের রীতি-নীতির নিখুঁত ও সজীব বর্ণনা এই উপন্যাসটিকে এক বিশেষ শক্তি দিয়েছে। কাহিনীটি কাল্পনিক, কিন্তু পুরোপুরি কাল্পনিকও নয়—কারণ এখানে যে-যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এ-রকম যুদ্ধ অসংখ্যবার ঘটেছিলো। মেরুনদের মধ্যে যে-উদ্ভাবনী শক্তি, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার যে-নিবিড় সম্পর্ক ছিলো, তার অনেকটাই এই উপন্যাসে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—আর ফুটে উঠেছে স্বাধীনতার তীব্র উৎকাঙ্ক্ষা।

এখানে ব্রে-র অ্যানান্সির গল্পও ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রের মানে

ব্রাদার, আর অ্যানান্সি পশ্চিম আফ্রিকার উপকথা ও কিংবদন্তির চরিত্র। অ্যানান্সি একটি মাকড়শা—সে চালাক, কৌশলী, উদ্ভাবক, স্বাধীনতাপ্রিয়, বিদ্রোহী, রসিক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই। সে রাজনৈতিক মাকড়শা। কত-যে অজস্র গল্প মুখে-মুখে বানানো হ'তো অ্যানান্সিকে নিয়ে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এবং যেটা, আরো, মনে রাখা উচিত, তা হ'লো এখনও অ্যানান্সিকে নিয়ে অনেক গল্প বানানো হয়। অ্যানড্রু সল্‌কি অ্যানান্সিকে নিয়ে অজস্র গল্প ফেঁদেছেন। অ্যানান্সির গল্পে থাকে সমসাময়িক ঘটনার ছায়া, থাকে চমকপ্রদ সব কৌশলের বিবরণ যার সাহায্যে সবরকম দুর্যোগ ও বিপত্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করা যায়, আর সেই জন্যেই আজও এই উদ্দীপক মাকড়শাটির কাহিনী জ্যামেকাবাসীদের অফুরন্ত শক্তির ভাড়ার হ'য়ে আছে।

———

রজার মেই

স্বপ্নদেখা মানুষেরা

স্বপ্নদেখা মানুষেরা বেঁচে থাকে জীবন পেরিয়ে
তাদের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের স্বপ্নের শেষ নয়
রক্তের ক্ষরণ করে তাদের জীবন বয়ে যায়
মাটির গভীরে আর সেখানে তা হয়ে ওঠে বীজ
এক জীবনের ক্ষয়ে হারায় না সে-স্বপ্ন তাদের
বীজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাথা তোলে অজস্র সম্ভারে।

আদালত ঘরের সামনেই
মাস্তুলে ঝুলিয়ে ওরা মেরেছিল গর্ডনকে
আঠারোজনকে আরো ঝুলিয়েছে সঙ্গী হিসেবে
যিশুর দুজন শুধু ছিল
তবুও যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচেছে গর্ডন
তার সঙ্গে শেষ হয়নি সেটা
আর যিশু প্রাণ দিল মহৎ যে সমাজবিপ্লব বুকে নিয়ে
তাও তো মরেনি সঙ্গে তার
যিশুর পাশেই আরো দুজনকে বিঁধে দিয়েছিল ওরা ক্রুশে
নতুন মাস্তলে ওরা ফাঁসিতে লটকেছিল গর্ডনের সঙ্গী আঠারোকে
কিন্তু গর্ডনের সঙ্গে সমতা বা ন্যায়ের বিবেক
মাটির ভিতরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে জেগে ওঠে বীজ হয়ে অজস্রতায়
একশো বছর ধরে মাটির বুকের মধ্যে জেগে ওঠে বীজ
একশো বছর তত বেশি নয়
একশো বছর তত কমও নয়
একশো বছর সে তো একটা সময়, এক ঋতু
আর, সমস্ত কিছুরই চাই একটা সময়, এক ঋতু
আর, প্রতিটি সৃষ্টির এই একটা সময়, এক ঋতু
এই হলো পথ, অন্য কোনো পথ নেই আর

জন্মাবার, ফল ফলাবার এই তো সময় আর ঋতু
নিহিত সে বীজের স্বভাবে
নিহিত সে এর জায়মানতায়, এর ফলে
এই হলো পথ, অন্য কোনো পথ নেই আর
একশো বছর তত বেশি নয়
মাটির ভিতরে খোসা ভেঙে ফেলে বীজ
পথ চিরে নেয় আর ঠেলে ওঠে ঊর্ধ্বমুখে
জয়োল্লাসে ছুঁড়ে দেয় সূর্যকে সবুজ তার পাতা
যে বাড়ি উঠছে গড়ে তার জন্য উদ্‌বেগ কোরো না
লাঙলের নিচে আজও বপন হয়নি বলে উদ্‌বেগ কোরো না
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু।

স্বপ্ন দেওয়া হয়েছিল যাকে কোনো রাতে
রাত্রি বা আঁধার তাকে ফিরিয়ে কি নিতে পারে আর
ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল ওরা জর্জ উইলিয়ম গর্ডনকে
কেননা সে স্বপ্ন পেয়েছিল এক রাতে
সেই স্বপ্ন বয়েছিল বুকে
ওরা ভেবেছিল তাকে ধ্বংস করে দিয়ে
ধ্বংস করে দেবে স্বপ্ন তার
কিন্তু যে-মুহূর্তে ওরা খুন করে ওকে
সে-মুহূর্তে স্বপ্ন তার অমরতা পায়
কেননা স্বপ্নই সব
মানুষের তো আছে শুধু, সেই তো অমর
মানুষের সব অমরতা সে তো বেঁচে থাকে শুধু সেইখানে।

বহুকাল আগে ওরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল জর্জ উইলিয়ম গর্ডনকে
কিন্তু তত আগে নয়
বহুকাল আগে
যিশুকে ঝুলিয়ে ছিল ক্রুশে
কিন্তু তত আগে নয়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
বহুকাল আগে

চন্দনকাঠের বীজ ঠোঁটে তুলে নিয়েছিল পারাবত দল
আজ তারা ঝরে পড়ে সুগভীর উপত্যকায়
যেখানে একদিন ছিল নগ্ন পাথরের বেড়ে ওঠা
প্রথম অরণ্য হয়ে আজ তার বুকে জাগে নতুন অরণি
এই দীর্ঘ অরণির মধুর কণিকাবীজ
যেখানে ঝরিয়েছিল একদিন বুনো পাখিদল
আজ তার পাদভূমি সবুজ বনানী
বহুকাল আগে কিন্তু তত আগে নয়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
একশো বছর কাল তত বেশি নয়
একশো বছর কাল তত কমও নয়।

আঠারো জনের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল গর্ডনকে
যিশুকে পেরেক দিয়ে বিঁধেছিল দুজন চোরের মাঝখানে
কিন্তু যে স্বপ্নের জন্য বেঁচেছিল ওরা কখনো তো মৃত্যু নেই তার
একটি বীজের কণা ভেঙে গিয়ে জেগে ওঠে একদিন একটি মঞ্জরী
একটি মঞ্জরী থেকে দুই প্রজন্মের মধ্যে ভরে যায় মাঠ
এ-রকমই হতে থাকে এক পূর্ণিমার থেকে অন্য পূর্ণিমায়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
একশো বছর, তার দুই গুণও তত বেশি নয়
একশো বছর, তার দুই গুণ তত কমও নয়।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

অরল্যাণ্ডো প্যাটারসন

আগন্তুক

লোকটা অদ্ভুত। ছাই রঙা ফেল্ট্‌ টুপিটার তলায় তার দ্বিধায় ভরা হাসিটা আমায় খানিকটা বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিলো, কেননা হঠাৎ আমার কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা হ'লো যে আমি তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছি। সে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। আমি তার মধ্যে একটা অলুক্ষুনে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে ব'লে উঠলো, 'তুমি কি মিস্‌ গ্ল্যাডিসের ছেলে?' দাঁতের মাজন আর মদের একটা মৃদু গন্ধ। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, মুখটা আধখোলা। চোখদুটো কেমন জলে ভরা, কৌতুহলী আর খানিকটা ব্যথাতুর।

আমি জিগেস করলাম, 'আমি কি ওঁকে আপনার কাছে ডেকে আনবো?'

'অ্যাঁ?' আমি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারি, তাতে সে যেন কেমন চমকে উঠলো; কিংবা হয়তো এতেই যে আমি তাকে কিছু জিগেস ক'রে ফেলেছি। ঢোঁক গিলে, আরো বেশি কৌতুহলের সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ফিশফিশ ক'রে বললো, 'ওঃ, ওঁকে ডেকে দেবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো।'

দরজার দিকে যেতে-যেতে আমার মনে হ'লো লোকটা কী মজার।

'মা!'

'কী?'

'এক ভদ্রলোক এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'এক ভদ্রলোক? কে?'

'চিনি না। আগে কখনও দেখিনি।'

মা উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। এতক্ষণে আগন্তুকটির পরিচয় জানার জন্যে আমিও উদ্‌গ্রীব, তাই মা যখন জানলা দিয়ে উঁকি মারছে আমি মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। মা তাকিয়েই রইলো। একটুও

নড়লো না, জানলার পাশে মাকে কেমন পাথরের মতো দেখাচ্ছিলো। আমি ভেতরে ঢুকে মায়ের মুখের ভাব দেখে ধাক্কা খেলাম।

'কী হয়েছে, মা ?'

মা কোনো উত্তর দিলো না। আমি বুঝতে পারলাম ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। এর আগে কখনও আমি মাকে এমন কোনো অবস্থায় পড়তে দেখিনি, যা তার আয়ত্তের বাইরে। অন্তত তখন পর্যন্ত নয়।

'মা··· ?'

'ওঁকে গিয়ে বল্ যে আমি এখানে নেই ··ওঁকে গিয়ে বল্···না. দাঁড়া, ওঁকে গিয়ে বল্···বল্ যে আমি আসছি।'

আমি বুঝতে পারলাম যে আগন্তুকটি যেই হোক সে কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের···আর তক্ষুনি আমি তাকে ভয় পেতে শুরু করলাম। অথচ, যখন আমি তার কাছে ফিরে গেলাম তার চেহারা আমার মধ্যে কোনোরকম শঙ্কা জাগালো না। ওর মুখের ভাব দ্বিধাতুর, অস্পষ্ট আর সুদূর। আমার যাবতীয় ধারণার সে ঠিক উল্টো। এক মুহূর্তের জন্য আমি এই ভেবে ফেলেছিলাম যে সে আমায় ভয় পাচ্ছে। এই ভাবনা আমার ছেলেমানুষি দম্ভকে যথারীতি উসকে দিলে।

আমি তাকে বললাম, 'মা বললেন, আসছেন।' মৃদুস্বরে সে আমায় ধন্যবাদ জানালো। মা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, থেমে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মার দিকে এগিয়ে গেলো সে আর কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো যেন স্তব্ধতার কোনো চক্রান্ত শাসন করছে তাদের, কিংবা বলা উচিত আমাদের মধ্যে, কারণ ওতক্ষণে আমিও এক হতবাক্ দ্রষ্টা, পুরো ব্যাপারটা বুঝে দেখার চেষ্টা করছি। শেষ অব্দি আগন্তুকটিই স্তব্ধতাটা ভেঙে দিলে।

'এই যে, গ্ল্যাডিস্! আশা করি তোমায় খুব বেশি তাক লাগিয়ে দিইনি ?'

'কী ক'রে খুঁজে বার করলে আমার ঠিকানা তুমি ?' মার গলার স্বর অস্বাভাবিক সংযত, যদিও তার মধ্যে একটা মৃদু ভয় দেখাবার রেশও ছিলো।

'ওঃ, আমি এই শহর দিয়েই যাচ্ছিলাম। ওই চীনে লোকটার দোকানে তোমায় চেনে কিনা জিগেস করায় ওরা দেখিয়ে দিলো···'

আর এক দফা দীর্ঘ নিঃস্তব্ধতার পর মা তাকে ভেতরে ডাকলো। দরজাটা আধ-খোলা প'ড়ে রইলো আর পরের পনেরো মিনিট আমি সেই দরজার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম মা আমায় ডাকছে। শেষ অব্দি সেই আগন্তুকের রহস্য সমাধানের আশায় আমিও লাফিয়ে উঠলাম। শার্টটা

ভদ্রভাবে প্যান্টের মধ্যে গুঁজে নিলাম। মা ফের আমায় ডাকলো, কেমন যেন অধীর। আমি ছুটে ভেতরে গেলাম।

লোকটা বসে আছে আমাদের সবেধন চেয়ারটায়, মা খাটের কিনারে ব'সে। আমাকে ঢুকতে দেখে দুজনেই আমার দিকে তাকালো। আমি তাঁর দৃষ্টি এড়াবার জন্য মার চোখে আশ্রয় খুঁজছিলাম। আরো একটি দীর্ঘ বিরতির পর লোকটার দিকে কুণ্ঠিত ইঙ্গিত ক'রে মা ফিশফিশ ক'রে বললো, 'তোর বাবা।'

আমি ঠিকই একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু আহত হইনি। বরং হয়তো একটু বিমূঢ় বোধ করছিলাম। আমি জানতাম যে কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমার বাবা বেঁচে আছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিলো অস্পষ্ট আকারহীন। সে ছিলো আমার মনগড়া জগতের একটা অংশ: যা আমি ভালোবেসেছি আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেছি, দামী সোনালি মাছের মতো, কিন্তু যা আমি কখনো তেমনভাবে চাইনি, তেমন আমল দিইনি। তাকে আজ হঠাৎ সামনে দেখে, আমি নিশ্চিত যে ছেলেভোলানো ছড়ার হামটি-ডামটির মুখোমুখি হ'লেও আমি এর চেয়ে বেশি অবাক হতাম না। কী বলবো আমি? কী বলা উচিত আমার? হয়তো আমার উচিত তার দিকে তাকানো। বেশ তো, তাকালাম।

তার কপালে ভাঁজ পড়েছে, গাল দুটো খরখরে। আমার কেমন মনে হ'লো ওর রোজ দাড়ি কামানো উচিত; আমার বন্ধুরা বলে ওদের বাপুরা তাই করে। মজা হ'তো যদি আমার মাকেও রোজ দাড়ি কামাতে হ'তো; আমার বোকামিটা আমার নিজের কাছেই ধরা প'ড়ে গেলো।

সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে পছন্দ করার ভঙ্গি করলো। বললো, 'চমৎকার ছেলে।' আমি চিন্তা করছিলাম ওর কথাটার মানে। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে সেই একই দ্বিধায় ভরা নিস্তেজ গলায় আবার বললো, 'খুব ভালো ছেলে।' সাড়া দিয়ে মা কী যেন ফিশফিশ করলো, তারপর আমার দিকে তাকালো। সাধারণত আমার প্রশংসায় মায়ের চোখে যে দীপ্তি প্রকাশ পায়, আজ সেই দীপ্তি ছিলো না। বরং খানিকটা যেন সন্দিগ্ধ: তার চোখে আমি যেন একটা রাগের ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছিলাম। কেন মায়ের এমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো আমি ভেবে পাইনি। ঘাড় ঘুরিয়ে মা মাথা নীচু ক'রে রইলো, সে যদি আমারই মা না হ'তো তাহ'লে আজ আমি

নির্ঘাৎ ভেবে নিতাম যে তার চোখে ছিলো লজ্জা আর ধিক্কার। তারপর কনুই দিয়ে হাঁটুতে ভর রেখে গালে হাত দিয়ে মা যে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আমি জানি তা তার সেই পরিচিত : 'ওঃ, কী জীবন, ভগবান!' অভিব্যক্তিটির পুনরুক্তির এক নির্বাক শারীরিক ভঙ্গি।

কী যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এর আগেও কখনো কখনো বড়োদের অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেছি, আমার ছেলেমানুষি সত্ত্বেও তা আমি একটু-আধটু বুঝতাম, হয়তো সেই ধারণাগুলো খুবই স্থূল, তবু বড়োদের উদ্দেশ্য আমার কাছে একেবারে অর্থহীন ছিলো না। কিন্তু আমার মা এবং এই আগন্তুকের ব্যবহার আমাকে পুরোপুরি ভড়কে দিলো। ওরা কেন কোনো কথা বলছে না, ওরা কি পরস্পরকে ঘৃণা করে? সে যে আমার বাবা, এই ব্যাপারটায় কি আমার মায়ের এতটাই যায় আসে?

হঠাৎ, আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো যে সে হয়তো আমার মাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে এসেছে। হয়তো সেটাই ওদের চিন্তায় ফেলেছে। আমায় কী ভাবে জানাবে তা বুঝতে পারছে না হয়তো। আমার মা আমায় একেবারে একলা ফেলে চলে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে, মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, মায়ের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা আমার মনে নানা ছাপ ফেলে গেলো। মাকে আমি ভালোও বাসি না, ঘৃণাও করি না, বরং খানিকটা ভয় পাই, কারণ প্রায়ই মা আমায় নির্মম ভাবে মারে। কিন্তু তখন আমার কান্নার মধ্যে যে-রাগটা ফুটে বেরুতো তা নিছকই আমার ব্যথা লাগার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কারণ আমার কেমন যেন মনে হ'তো যে আমার মার খাওয়াটায় আমার চেয়েও আমার মার অনেক বেশি এসে যায়। মা আমায় প্রায়ই বলতো, জগৎটা কঠিন। আমি তার সন্তান আর স্বভাবতই তার ওপর নির্ভরশীল, তাই ওটাই ছিলো স্বাভাবিক। সব সত্ত্বেও একটা দৃঢ় বন্ধন আমাদের ধ'রে রেখেছিলো। তেমন আশাপ্রদ কিছুই নয়; বরং পরস্পরকে হারানোর ভয়টাই ছিলো প্রধান। একে অপরকে হারালে যেন আমাদের সবকিছু হারিয়ে যাবে। আমার কাছে সে ছিলো মা : যে আমার খাবার জোগাতো, জোগাতো পোশাক-আশাক আর আমার ইস্কুলের পাঠ্য বই। যে আমায় ভালো হ'তে শিখিয়েছিলো। অথচ ভালো হওয়া বলতে সে যে কী বোঝাতো তা কখনোই তেমন পরিষ্কার ছিলো না। বেশির ভাগ সময়ই সেটা শুধুই 'ভালো হওয়া,' কিংবা 'অকৃতজ্ঞ না হওয়া'

—ছুটো যেন প্রায় একই ব্যাপার। হয়তো তার নিজের ধরনে সে ছিলো স্নেহপ্রবণ। কিন্তু নিজেরই অজান্তে, সে আমায় শিখিয়েছিলো বেশি আশা না করতে, তাই আমি কমই কিছু চাইতাম। আমার একমাত্র ইচ্ছে ছিলো চিরটা কাল মা আমার কাছে থাকুক। এখন সেই মার চ'লে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিলো।

কিন্তু তা সম্ভব ছিলো না। আমি নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিলাম যে আমি বোকার মতোই মনে করছিলাম এই ঘর থেকে আমার চ'লে যাওয়া উচিত। হয়তো তারা বড়োদের কথাবার্তা বলতে চায়। যেই আমি দরজার দিকে এগুচ্ছি শুনতে পেলাম লোকটা যেন পুনরুক্তি করছে, 'হ্যাঁ, গ্ল্যাডিস্, অনেকদিন হ'লো।' তখন আমার আর ভাবতে বাধা রইলো না যে আমিই তাদের আপাত অস্বস্তির কারণ, নিজেকে আরো গুটিয়ে নিয়ে আমি দরজার দিকে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম মা আমার নাম ধ'রে ডাকছে। তীক্ষ্ণ ও কঠিন তার কণ্ঠস্বর; আমায় আর বুঝিয়ে বলতে হ'লো না যে আমার ঐ ঘরেই থাকা উচিত, মার গলার স্বরই যথেষ্ট ছিলো।

আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো আগন্তুক। তারপর ফের আমার মার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'লো সে চ'লে যেতে চাইছে; কিন্তু কোথায় যেন খানিকটা দ্বিধা। হঠাৎ যেন তার কী-একটা মনে প'ড়ে গেলো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ শিলিঙের নোট বার ক'রে আমার হাতে দিলো সে।

বললো, 'কিছু-একটা কিনে নিয়ো।'

অতগুলো টাকা আর এত লোক থাকতে ও যে আমায় এতগুলো টাকা দিলে এইসব ভাবনায় হতবাক্ হয়ে আমি নোট্‌টার দিকে চেয়ে রইলাম। মার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য মার দিকে তাকালাম। 'ফেরৎ দিয়ে দাও'—মার এই উক্তিতে আমি একটুও অবাক হইনি। মা তার দিকে ঘুরে বললো, 'তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি ওকে এতটা বড়ো করেছি; এখন আর তোমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই।'

আমি তক্ষুনি নোটটা ফেরৎ দিয়ে দিলাম, কারণ আমি জানি তখন মাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। মার সঙ্গে একা থাকার মুহূর্তটা আমায় ভয় পাইয়ে দিলো।

লোকটা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলো, কিন্তু হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে টাকাটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ নিয়ে নিলো। কেমন অপমানিত, দুঃখী দেখাচ্ছিলো ওকে ; ওর জন্যে আমারই কেমন খারাপ লাগতে থাকলো। ছোটো ফেল্ট্‌ টুপিটা মাথায় দিয়ে হঠাৎ সে কিছু না-ব'লেই চ'লে গেলো। ওকে আমি আর কখনও দেখিনি।

অনুবাদ : শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্টিন কার্টার

লিপ্ত সবাই তাতে

শিখেছি এই শুধু :
আজ যে কলঙ্কিত
কাল সে হবে নায়ক
নায়ক হোক বা দানব
তোমরা সবাই হজম !

নাচের লয়ে যেন
ঝাঁকিয়ে দেয় তাঁত ।
জালের মতো করে
নকশা বুনে তোলে
লিপ্ত সবাই তাতে
সবাই হলো হজম !

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

ক্লিফর্ড সিলি

তিক্ত সিদ্ধান্ত

উডফোর্ড স্কোয়ারের পোড়া ঘাসগুলোর উপর মধ্যাহ্নের দুঃসহ খরতাপ আছড়াচ্ছে। উডফোর্ড স্কোয়ার হ'লো পোর্ট অভ স্পেনের বেকার বুদ্ধিজীবীদের খোলামেলা আড্ডা। শুকনো পোড়া জমির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব'সে-থাকা জীর্ণ, বিষণ্ণ ও মুখর মেয়ে-পুরুষেরা নানা বিষয়ে আলোচনা করছে।

একদলের নিবিষ্ট আলোচনার বিষয় বিদেশের রাজনীতি; অন্য-একটি দলে সে-সময়কার এক খুনের মামলায় জুরিদের বক্তব্য বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়া হচ্ছে; তৃতীয় একটি দলে জোরালো তর্ক চলছে বন্দরকর্মীদের ধর্মঘটে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে।

যত দল, তত আলোচনার বিষয়; আর আলোচনাকারীরা তাদের স্বভাবে ও চেহারায় যতটা বিচিত্র, ততটাই বিচিত্র বিষয়গুলোর গুরুত্ব আর ধরন। স্কোয়ারের ঠিক মাঝখান থেকে উঠেছে একটা ছোট্ট সবুজ ধাতুনির্মিত মূর্তি; মূর্তিটাকে ঘিরে আছে শানবাঁধানো একটা চওড়া পুকুর—যদিও জল অবশ্য কখনোই থাকে না। এই পুকুরেরই মুখোমুখি বসানো আছে ছ'টি কাঠের বেঞ্চি—যার ঘন খয়েরি রঙের আস্তরটা অনেকদিন আগেই উধাও হ'য়ে গিয়ে খসখসে হলদে পিচ-পাইন কাঠটা বেরিয়ে পড়েছে।

এই বেঞ্চিগুলোর একটাতে ব'সে আছে তিনজন লোক। লিও ব'সে আছে মাঝখানে। লম্বা আর গাট্টাগোট্টা—তার পরনে রংচটা আর নোংরা এক খাকির স্যুট, হাত ও পায়ের অনেকটা উন্মোচিত অংশ দেখে বোঝা যায় এককালে এই স্যুটের সঙ্গে যার সাহচর্য ছিলো, সে ছিলো বেঁটে ও রোগা।

লিও-র ডানদিকে এরিক। রোগা, শুঁটকো চেহারা—তার পাৎলা কালো চামড়া ফুঁড়ে যেন হাড়গুলো বেরিয়ে আছে—তার ধূসর চোখে চকচক করছে এক ধরনের ধূর্ত দৃষ্টি।

ত্রিমূর্তিকে সম্পূর্ণ করেছে শ্যাম। বেঁটে আর একহারা—তার নিজের

কোনো পূর্বনির্ধারিত মতামত নেই—ফলে তার মত সবসময় তার দুই বন্ধুর মতামতের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

'শুনছি, সরকার জাহাজের মাল খালাস করবার জন্য লোক চায়', ফ্যাশফেশে গলায় ইঙ্গিত করলে এরিক।

লিও তার ব্যাঙের মতো পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর তার ডানহাতের কড়ে আঙুলের টোকা দিয়ে তার সিগারেটের ধূসর ছাই ঝেড়ে ফেলে বেঞ্চিটার লোহার হাতলের ওপর সিগারেটের মৃদু লাল আগুনটা আলতো ক'রে নিভিয়ে কালো ছাইগুলো সরিয়ে দিয়ে, তখনও গরম সিগারেটটা তার ডান কানের পেছনে গুঁজে রাখলো।

লিও-র মুখে কোনো কথা নেই; স্যামের মুখেও না। মাথা নিচু ক'রে সে তার ভোঁতা-ভোঁতা আঙুলগুলো দিয়ে শার্টের আলগা বোতাম নিয়ে খেলা করছে।

এই অপ্রত্যাশিত স্তব্ধতায় এরিক চটে গেলো। গাঁক-গাঁক ক'রে বললে, 'তা, এখন কী হবে? তোমরা সবাই কোনো কাজ করতে চাও তো—না কি ইচ্ছে নেই? সরকার আমাদের কাজ দিচ্ছে—আর তোমরা একেকজন বংবাজের মতো ব'সে আছো!'

এরিকের টিপ্পনি লিও-র মেজাজ খিঁচড়ে দিলো। তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, যার পেছনে ছিলো গভীর নৈতিক বিশ্বাস। 'আমাদের কালো লোকদের মধ্যে কোনো একতাই নেই। ও ধরনের কাজ যে নেবে সে তো গুলি খেতে চায়! শাদারা যখন কোনো কাজ-কারবারে নামে—সব্বাই তারা একজোট হয়। কিন্তু আমরা কালো লোকেরা যখন কিছু করি, আরেকদল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের কোনো একতা নেই—আর এটাই সোদ্দা কথা!' আবার মুখ ফিরিয়ে সে তার জ্যাকেটের হাতায় তার দাড়ি-না-কামানো গোল মুখটা মুছলো।

'তুমিই ঠিক, লিও, একেবারে হক কথা বলেছো!' স্যাম কেমন দ্বিধার সুরে ব'লে উঠলো। 'আমাদের কালো লোকদের মধ্যে সত্যি একে-অন্যের মধ্যে কোনো ভালোবাসাই নেই। এটাই আদত কথা—একেবারে খাঁটি সত্যি।'

'লিও আর তার হাঁদামিকে হিসেবে ধরো না স্যাম!' এরিকের তর্জন এলো। 'ও ঐ সব রাজনীতিবাজদের ছেঁদো কথা আওড়াচ্ছে!'

'কিন্তু, কাল লোকটা যা বলেছিলো তা তো সত্যি কথাই,' লিও বললে।

'কী বলেছিলো? ঐ লোকগুলোর কথা শুনলে হ'তো—এটা আমারও মনে হয়। কিন্তু ও-সব বক্তিমে তো আর তোমাকে স্বর্গে পৌঁছে দেবে না!' বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এরিক হাতের চেটো দিয়ে তার ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়লো। ঘৃণা আর অবজ্ঞায় তার শুকনো মুখটা কুঁচকে গিয়েছে। 'কালা আদমিদের মতো আকাট আর কোথাও নেই।' চ'লে যেতে-যেতে লিও-র কাঁধ চাপড়ালো সে—যেন কোনো অভিজ্ঞ বাবা তার বোকা ছেলেকে কৃপা ক'রে বোঝাচ্ছে। 'যা বলেছো, ঠিকই বলেছো, তার রাজনীতিটা মোটেই কালো লোকদের জন্য নয়। মানুষকে বেঁচেবর্তে থাকতে হবে।'

ঢ্যাঙা, কুঁজো চেহারার লোকটা পায়ে-চলার পথ দিয়ে হেঁটে চ'লে যাচ্ছে —তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো লিও। এরিককে তার কেমন যেন অচেনা ঠেকলো। লোকটা বদ, এটা সে জানে। তবু তার কথাগুলো লিও-র মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিতো।

স্কোয়ারে তখন দারুণ ব্যস্ততা। দোকানের লোকজন কেউ যাচ্ছে লাঞ্চ খেতে, কেউ লাঞ্চ সেরে ফিরছে। তাছাড়া খদ্দেরদেরও ভিড়; মোটা-রোগা, ঢ্যাঙা-বেঁটে মহিলারা সব কেনাকাটা ক'রে ফিরছে, তাদের হাত থেকে ঝুলছে ঠোঙা আর মোড়ক, জিভের ডগায় ঝুলছে পরচর্চা।

কাছের ট্রিনিটি ক্যাথিড্রালের ঘড়িটায় বারোটা বাজলো ঢং ঢং। আর তা শুনে লিও-র মনে প'ড়ে গেলো শিগগিরই তাকে তার স্ত্রী মেবেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। মেবেল গ্রেনাডার মেয়ে। মেবেলের কথা মনে পড়তেই তার মন গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোর ওপর গড়িয়ে গেলো।

জীবনটাই কঠিন। সে ভেবে দেখলো যে জীবন কোনোদিনই মধুময় ছিলো না; এখন তো বরং, রূঢ় আর বীভৎস। আর মেবেলের ঔদাসীন্য ব্যাপারটাকে আরো খারাপ ক'রে তুলেছে। একটাই ক্ষীণ আশা যে হয়তো তার বদল হবে—'জিশুর মহিমা' দলটায় যোগ দেবার পর থেকেই এই আশা জেগেছে। দলটা বিপথে চলা গরিব লোকের—প্রত্যেকে যারা নিজের দুর্দশায় খাবি খেতে খেতে ভাবে যে বুঝি তারা কোনো 'বার্তা' পেয়েছে, রাত্তিরে রাস্তা জুড়ে উপাসনাসভা বসিয়ে দেবার জন্য।

কাল বিকেলে 'ভাষণ' শুনে ফেরবার পর মেবেলের মেজাজ ভীষণ খিট-খিটে হ'য়ে ছিলো, এটা লিও-র মনে প'ড়ে গেলো।

'কবে তুমি চাকরি জোটাবে, লিও?' মেবেল জিগেস করেছিলো। 'এক

বছরেরও বেশি হ'লো তুমি বেকার ব'সে আছো। এভাবে আর কদ্দিন বাঁচবো আমরা ?'

'কিন্তু, মেবেল,' লিও তাকে তিরস্কার করেছিলো, 'আমি তো প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি। কত লোকই আজকাল বছরের পর বছর বেকার ব'সে আছে।'

'তারা আবার মানুষ,' রাগে ফেটে পড়েছিলো মেবেল, 'কিন্তু আমি আমিই —ওদের মতো নয়। আমি আর এভাবে বাঁচতে পারবো না। কাল কী খাবো, তার ঠিক নেই; বাড়িওলা কবে ভাড়া না-পেয়ে তাড়িয়ে দেবে ঠিক নেই; ধারের পর ধার, কবে শোধ দেবো, ঠিক নেই। এভাবে আর চলতে পারে না।'

লিও ভোলাতে চেষ্টা করেছিলো, 'ভরসা রেখো, হুহু', তার মেজাজ ভালো করতে চেয়েছিলো লিও, 'তুমি ভুলে গেছো যে কাল সাবানের কারখানার লোকটার সঙ্গে দেখা করার কথা।'

স্যামের চিঁ-চিঁ করা গলা লিওকে তার ভাবনা থেকে ফিরিয়ে আনলো। 'লিও, আজ সকালে তোমার যে চাকরিটা পাবার কথা ছিলো, তার কী হ'লো ? তুমি তো সে-সম্বন্ধে কিছু বলো নি।'

লিও জানালো, 'ফোরম্যানের এক ভাইপো না ভাগ্নে সেটা বাগিয়ে নিয়েছে।'

স্যাম তার অদ্ভুত গোল মাথাটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নাড়তে-নাড়তে সহানুভূতির স্বরে মৃদুস্বরে বললে : 'মামার জোর চাই, বুঝলে, মামার জোর।'

একটু পরেই স্কোয়ারের মধ্যে পথচারীদের সংখ্যা কমে গেলো; তাদের শশব্যস্ত চলাফেরায় এতক্ষণ যে ধুলো উড়ছিলো, তাও এখন ক'মে এলেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো ঝরা পাতা ভেসে আসছে, আস্তে নেমে আসছে মাটিতে; ওপরে, গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় মর্মরধ্বনি জাগছে।

কয়েকটা দল ভেঙে গেলো; কিন্তু পরক্ষণেই সেই একই জায়গাগুলোয় নতুন-নতুন দল গ'ড়ে উঠলো। অন্যরা, কাঠফাটা রোদ্দুরের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কংক্রিটের ছোট্ট বাস-স্ট্যাণ্ডটায় আশ্রয় খুঁজছিলো। কিন্তু তখনও স্কোয়ারটা দিনের সব সময়কার মতোই অন্তত জনা পঞ্চাশ বেকার লোকের আড্ডা হ'য়ে আছে।

'দেখা যাক, কাল কী হয়,' বেঞ্চি থেকে উঠতে-উঠতে লিও বললে।

'ঠিক আছে,' স্যাম উত্তর দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লিও জানকান স্ট্রীটে তার বস্তির ঘরে এসে ঢুকলো : মেবেল ছোট্ট লোহার খাটটায় শুয়ে আছে, তার শস্তা ফুটিফুটি সবুজ জামাটা তোশকের নানা রঙের ছোপের সঙ্গে বেশ ছবির মতো মিশে গেছে। তার কাপড় কেচে-কেচে ক্ষ'য়ে-যাওয়া মোটা-সোটা হাতে দামী বাঁধাইয়ের একটা কালো রঙের বাইবেল।

লিও-র কাতর মুখে নিশ্চয়ই হতাশা ফুটে উঠেছিলো, কারণ তাকে দেখেই মেবেল আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'তুমি চাকরিটা পাওনি।'

'না!' লিও জানালো।

'কিন্তু এটা'···বাইবেলটা বন্ধ ক'রে তড়াক ক'রে উঠে বসলো মেবেল, রাগী সুরে ব'লে উঠলো, 'এর কী মানে, বলো ? যদি তুমি জানতেই যে কোনো কাজ জোটাতে পারবে না, তাহ'লে বিয়ে করেছিলে কেন ?'

তার আত্মসম্মানে এত বড়ো একটা ঘা খেয়ে লিও তোৎলালো, 'কিন্তু, মেবেল, আমি তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি।'

'তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করছো' মেবেল মুখ বেঁকালো। 'তাহ'লে জেন-এর বর আজ তিনদিন ধ'রে বন্দরে কাজ করছে কী ভাবে ?'

'ও তো একটা কুত্তা,' লিও যে-ছোট্ট বেঞ্চিটায় ধপ ক'রে ব'সে পড়েছিলো, তা থেকে উঠতে-উঠতে রাগে গরগর ক'রে উঠলো। ঘরের আসবাব বলতে ঐ বেঞ্চিটা, রংচটা একটা দেরাজ, আর চৌকো একটা খাবার টেবিল। 'ওভাবে আমি কোনো চাকরি চাই না। ও তো···'

'আহা, তোমার তো আবার বাছাবাছি আছে,' কোমরে হাত রেখে মেবেল খিঁচিয়ে উঠলো। 'তুমি ওদের ইউনিয়ন ওদের রাজনীতি, এই সবকে পাত্তা দিচ্ছো। বুঝলাম। তোমার দেমাকই তোমাকে খেলো।'

'মোটেই দেমাক নয়। শিক্ষা। ঐ তাদের মতো শিক্ষা, যারা···'

'শিক্ষা, না হাতি! শিক্ষা তোমাকে খাওয়াবে ?'

'তুমি বুঝছো না···'

'আমি ভালোই বুঝতে পারি। আসলে তুমি কাজই করতে চাও না। কিন্তু আমি এমন লোকের সঙ্গে ঘর করতে চাই না যে-কোনো কাজ করে না বা বউকে খাওয়াতে পরাতে চায় না। আমি এমন-কোনো মেয়ে নই যে তুমি রাস্তায় প'ড়ে পেয়েছো—আমার খাওয়া-পরার ভার তোমাকে নিতে হবে।'

তারপর নাটুকে ভঙ্গিতে শেষ কথা ব'লে দিলো মেবেল। 'তুমি যদি আমার দেখাশোনা না-করো তো আমি তাহ'লে নিজের রাস্তা নিজেই দেখবো।'

'কী হয়েছে?'

'আমি খুবই ঠাণ্ডা আছি,' মেবেলের পুঁতির মতো কালো চোখ দুটি তেরিয়া ভঙ্গিতে চকচক ক'রে উঠলো। 'তুমি যদি আমার দেখাশোনা না-করো তো অন্য লোকে করবে।'

'জাহান্নামে যাও,' ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে চীৎকার করে লিও।

বিশাল এক উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়েছে প্রিন্স স্ট্রীটে। রাস্তায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে মেয়ে-পুরুষেরা। কারু-কারু জামায় নানা রঙের ফিতে বাঁধা: কারু-কারু হাতে ছোটো-ছোটো জলভরা বালতি, কারু বা হাতে বেতের ঝুড়িতে খাবারদাবার; অন্য অনেকে জলজ্বলে লাল রঙে লেখা ছোটো-ছোটো কাডবোর্ডের প্ল্যাকার্ড নাড়াচ্ছে।

লিও-র কাছে এই সংক্রামক উল্লাস কার্নিভালের সময়কার খালাসিদের বাজনদার দলের কথা মনে করিয়ে দিলো। কত সহজে তারা সৈন্যদের মতো কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে, কেমন অদম্য উৎসাহে তারা তাদের ব্যানারগুলো দোলাচ্ছে। লিও-র অবাক লাগে।

এই জমায়েতের বেখাপ্পা ধরনটাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই যেন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শৌখিন পোশাক পরা কয়েকজন লোক—গলায় দামী টাই।

'ওরা সব বড়োবাবু,' লিও আপনমনে ভাবলে। 'ওরা তো খালাসি নয়।'

এলোমেলো ভিড়টা তারপর নড়তে শুরু করে। নিজের অজান্তেই লিও আবিষ্কার করলো যে সেও তাদের সঙ্গে চলেছে। অস্ফুট গুঞ্জনটা থেমে গিয়েছে। প্ল্যাকার্ডগুলো উঁচু ক'রে ধরা, আকাশ লক্ষ্য করে ধ্বনি উঠছে।

সামনের দিক থেকে শুরু হ'য়ে গানটা এক নিমেষে গ্রীষ্মের দিনের দাবানলের মতো পুরো জমায়েতে ছড়িয়ে পড়লো।

'গাও, কমরেড, গাও,' ধর্মঘটের শরিক এক লম্বা চওড়া লোক খালি পায়ে চলতে-চলতে লিওকে আহ্বান করে—বাজারের এক দশাসই তরকারিউলির পাশে তাকে সে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়।

রাস্তাটা তাদের পায়ের শব্দে আর গানের স্বরে গমগম ক'রে ওঠে—কড়ি আর কোমলে মেশামেশি এক হৃদয়স্পর্শী ঐকতান যেন।

আগলে রাখো দুর্গ, কারণ আমরা এসে যোগ দেবো
ইউনিয়নের মজুর, তুমি শক্ত হও

দ্রুত ছুটে-আসা কথাগুলো লিও-র বুকের গভীরে একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগিয়ে দেয়। সকলের সঙ্গে এগুতে-এগুতে গাইতে থাকে সে, আর গানটা পৌঁছে যায় এক দম-আটকানো উঁচু পর্দায়।

দম নেবার জন্য প্রিন্স স্ট্রীট আর হেনার স্ট্রীটের মোড়ে মিছিল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে লিও। ফুটপাতের উপর অনেক লোক দাঁড়িয়ে, লিও শুনতে পায় এদের মধ্যে কে যেন কাকে বলছে, 'এই একতা যদি ওরা বজায় রাখতে পারে, তাহ'লে ওরা জিতবেই।'

লিও ঘুরে দাঁড়িয়ে খেয়াল করে যে বক্তা একজন তরুণ। চ্যাঙা, পরনে শোভন বেশ, চোখে চশমা, থুৎনিটা দাড়িতে ঢাকা। নিমেষের জন্য তার পায়ের চকচকে জুতো জোড়ায় লিও-র চোখ ধাঁধিয়ে যায়; তার নিজের পায়ের নোংরা লালচে চটির সরু মুখ দিয়ে তার নোংরা আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে—সেদিকে তাকিয়ে লিও কিছুতেই তার বিদ্রূপের হাসি চাপতে পারে না।

একটা বিচ্ছিরি মানসিক দ্বন্দ্বে লিও-র মনটা যেন ফাঁদে প'ড়ে যায়। মেবেল আর তার শাসানি, এরিক আর তার টিপ্পনি, তার নিজের দাউদাউ ক্ষুধা, মিছিলের নেতারা, শিক্ষকরা, ধর্মঘট, তার এই অসহ্য উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্ব—সব, যেন কোনো অদ্ভুত উপায়ে, তার মাথায় জট পাকিয়ে যায়।

জনতা থেকে দূরে স'রে যায় সে, হেনরি স্ট্রীট ধ'রে হাঁটতে থাকে। সে স'রে যায় ঐ সংক্রামক উল্লাস থেকে, যা তাকে তার নিজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো—দূরে, দূরে স'রে যায় সে ক্রমে। অস্পষ্টভাবে, যেন কুয়াসার মধ্য দিয়ে, সে সামনে এসে-পড়া গাড়ি ঘোড়া এড়িয়ে চলে।

অবশেষে সে এসে পৌঁছোয় দক্ষিণ জেটিতে। একটা মস্ত কাঠের বাড়ির সামনে এক সার লোক দাঁড়িয়ে। এমনকি এই দৃশ্যও তার মনে কোনো আশা জাগিয়ে দিতে পারে না। বড্ড বেশি দুর্বল সে। অথচ কোনো প্রশ্ন জিগেস করার জন্য সে থামে না, বরং নিজের অজান্তেই এগিয়ে যায় সারিটার দিকে।

'লিও!' একটা চেনা ভাঙা গলার মৃদু স্বর শোনা যায়। 'এই-যে, এখানে একটা জায়গা আছে।'

ডুম ক'রে ঘুরে দাঁড়ায় লিও, তার মুখটা জ্বলছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে কী করবে। ফিরে যাবার জন্য সে পা বাড়ায়। কিন্তু নড়বার আগেই এরিকের লম্বা হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

'আরে এসো, গবেট কোথাকার, সুযোগটা ফসকাবার আগেই চ'লে এসো,' এরিক বলে।

গভীর একটি তাৎপর্যময় মুহূর্ত—লিও এরিকের টানাটানি ঠেকিয়ে রাখে। তার পরস্পরবিরোধী ভাবনাগুলো যেভাবে ক্রমশ ছোটো-হ'তে-থাকা পাগল করা আবর্তের মধ্যে পাক খেতে থাকে, তাতে সে যেন একেবারেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। তার চিন্তাগুলো যেন কোনো চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর যেই তারা সেই চরম পরিণতিতে পৌঁছলো, সে মনস্থির ক'রে ফেললো।

কোনো রকমে গুটিসুটি মেরে সে এরিকের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, এরিক ক্ষুব্ধ স্বরে যখন তাকে ফিশফিশ ক'রে বললো, 'সরকার আমাদের তিন ডলার রোজে কাজ দিচ্ছে। সত্যি, কালো লোকেরা যে কী হাঁদা!' সে-কথা যেন তার কানেই গেলো না।

'হুঁ...' এটাই ছিলো লিও-র ছোট্ট উত্তর।

অনুবাদ : শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে. ই. ইনগ্রাম

যেন-বা এক সোনার জালের ভিতর

যেন-বা এক সোনার জালের ভিতর
পাতার নিচে রবিন পাখি গায় ;
রৌদ্র আর বাতাস দিয়ে বোনা
ভুবন, তোমার বন্দীরও কী সুখ ;
ভাবে না যে জীবনসন্ধ্যা তার
দিনের মতোই অস্তে নেমে আসে,
গাছের নিচে শীতল হবে যখন
জীবনচক্র ফুরিয়ে যাবে সব,
বাতাসে তার হাড়ই হবে বাঁশি
বাজিয়ে যাবে অসম্পন্ন গান।

অনুবাদ ঃ শঙ্খ ঘোষ

মাইকেল অ্যান্টনি

সফেদা গাছ

সফেদা-গাছটা ফলে ফলে ভর্তি হয়ে আছে, ভার সইতে না পেরে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে একেবারে। কী বড় বড় খয়েরি রঙের ফল—দেখলে লোভ লাগে! একটুখানি ভাবলেই টের পাবে, কেমন স্বাদু রস জমা আছে ওর খোসাগুলোর তলায়। বাদুড়ে খুবলে খেয়েছে কিছু ফল, সে জায়গায় রসটা জমে একেবারে চিনি, আর তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো কিসমিসের মতো দেখতে কী একটা বীজ। পাকা-টুসটুস সফেদা—যেগুলো মাটিতে ঝরে পড়ছে—দেখলেই কেমন যেন করে বুকের মধ্যে!

কিন্তু কিছু করার নেই। এই সফেদা গাছটা নিয়ে মুশকিল কী—মিস্টার কারক্যানের জানলাটার ঠিক পাশেই ওটা দাঁড়িয়ে, আর যা হাড়কিপ্টে মিস্টার কারক্যানের! ওঁর মতো আর একটা লোকও দেখি নি বাবা—বিশাল একখানা 'না'!

কী জানো, যতই সাধাসাধনা করো না কেন, মিস্টার কারক্যানের কাছে, একটা সফেদা চাওয়া মানেই 'না' আর 'না', কেবলই 'না'। আর তারপরই গজগজ করবেন, আজকালকার ছোকরাগুলো কী বাউণ্ডুলে আর লোভী রে বাবা! তাঁর আমলে তো ছেলেপুলেরা কখনও সফেদা চেয়ে চেয়ে বেড়াত না। যখন খুব বেশিরকম মেজাজ গরম থাকত আর আমরা একেবারে হন্যে হয়ে উঠতাম, দরজার পাশ থেকে তিনি টেনে বার করতেন বিরাট একখানা ছড়ি, আর আমরাও অমনি রাস্তা ধরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়।

উইস্কি আর আমি একবার ঠিক করে ফেললাম, আর কক্ষনো একটাও সফেদা চাইতে যাব না মিস্টার কারক্যানের কাছে। আমি বললাম, 'থাকুক ও, ওর বাসি সফেদাগুলো নিয়ে, ওখানে পচুক বসে বসে!' উইস্কিরও তাই মত। কিন্তু একদিন দেখি কী, হাঁপাতে হাঁপাতে উইস্কি বাড়ি এসে হাজির, ওর টুপিটা ভর্তি পাকা সফেদা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেলি রে?'

'জানিস না?' দাঁত বার করে ও হাসতে থাকে।

আমি তো অবাক। 'তোকে দিল?' বলেই বুঝলাম কী বোকার মতো কথাটা বলেছি। সফেদা দেওয়ার চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে প্রাণটা দিতে পারেন মিস্টার ফারফ্যান। তবে তো এর একটাই মানে। নিশ্চয়ই খুব ভোরে উঠে পড়ে সফেদা গাছটায় উইস্কি ডাকাতি করে এসেছে।

তারপর কতকাল ধরে যে উইস্কিকে আমি রাজি করালাম—একটা দিন যেন আমাকে ও ওর ভোর-রাত্তিরের অভিযানটায় সঙ্গে নেয়। আমায় ঘুষ দিতে হলো সব রকম জিনিস। আর দিব্যি যে গালতে হলো কত কিছুর! শেষটায় পার পাওয়া গেল আমার নতুন লাটিমটার জন্য।

তবুও কিন্তু, আমায় সঙ্গে নিতে হবে বলে ও খুব অস্বস্তিতে থাকল। এই-রকম সব কাজে যেমন সঙ্গী ও চায়, আমি তো ঠিক তেমন না। উইস্কির মতো সব পরিস্থিতিতে পড়লে আমি তো বোধ হয় কিছু করতেও পারব না সত্যি। আমি একটু ভীতু আছি, চট্‌পটেও নই একদম। উইস্কি কিন্তু অন্যরকম। যতই কম সময় থাকুক না কেন, যে কোন জিনিস ও ঠিক চুরি করতে পারে। তারপর এমন শান্তশিষ্ট হয়ে থাকে যে কেউ রাগ করতেও পারে না ওর ওপর।

'ঠিক আছে', যে-লাটিমটা আমি দিয়েছিলাম, সেটা মেপে-টেপে নিয়ে মনে মনে কী সব ভেবে তারপর বলল কথাটা। 'ঠিক আছে, চল্‌। কিন্তু ভগবানের দিব্যি, ঠিকঠাক থাকবি। ধরা পড়লে কিন্তু ফারফ্যান ঠিক জেলে দিয়ে দেবে তখন।'

আমরা যখন পৌঁছেছি, সকালের আলোটা তখন ঠিক যেমনটি দরকার। খুব আঁধারও নেই, খুব আলোও হয় নি। চারদিক কী চুপচাপ—যেন কবরখানা।

উইস্কি গাছে উঠে সফেদা পাড়বে, আর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমাকে লুফতে হবে সেগুলো। লুফে ঢোকাতে হবে ঝোলার ভেতর। ব্যস্‌ এই। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল—এতে আর বীরত্বের কী আছে!

প্রথম ফলটা যে-ই নিচে ছুঁড়েছে উইস্কি, আমার হাত গলে সেটা মাটিতে পড়েই—ফটাস্‌। শুনতে পাচ্ছিলাম, ওপরে গাছের মধ্যে বসে ও ফোঁস ফোঁস করছে রাগে।

মুখ ভার করে বলি: 'একটা তো মোটে পড়ে গেল। হয়েছেটা কী তাতে?'

'বুঝবি মজা': নরম-গলায় বললে কী হবে, কথাগুলো বাঁকা বাঁকা. 'ফেল্ মাটিতে, ফারফ্যান জাগুক বুঝবি।'

এই ফাঁড়াটা অবশ্য কেটে গেল, সব কিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল তারপর। আস্তে আস্তে আরও ভালো করে আমি লুফতে পারছিলাম। এমনকি কয়েকটা তো একদম ওস্তাদের মতো—এক হাতে আমি লুফেছি। আর আমাকে ওস্তাদি করতে দেখলেই উইস্কি কট্‌মট্ করে আমার দিকে চাইছে।

কিন্তু বেশ ভালোই এগোচ্ছিল আমাদের কাজটা। সফেদা-ফলে আমাদের ঝোলাটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। বললাম উইস্কিকে। ও বলল, 'ঠিক আছে, আর শেষ কয়েকখানা ছুঁড়ছি তাড়াতাড়ি করে। ঠিকমতো ধরবি, হ্যাঁ?'

আর অমনি হঠাৎ গাছের ওপর ও থমকে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ওর মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখিস?' একবার আমার দিকে তাকিয়েই ও চোখ ফিরিয়ে নিল ঐ বাড়িটার দিকে। মুখটা ভয়ে সাদা—বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটো 'ফারফ্যান'। পড়ি-মরি আমি রাস্তা ধরে দৌড়।

দিনের আলো পরিষ্কার হলে ভাবলাম আমি আবার ওখানটায় যাই। ভয় করছিল। উইস্কির অপেক্ষায় সারাটা সকাল আমি বাড়ি বসে রইলাম। অপেক্ষা করছিলাম, পুরো ঘটনাটা শুনব বলে। আমি জানতাম, উইস্কি কিছুতেই ধরা পড়বে না। কী রকম করে ও পালাল, সেটা জানার জন্যেই আমি তখন ব্যাকুল। প্রায় রোজই তো উইস্কি একটা-না-একটা নতুন বীরত্বের কাজ করে। সব সময় কাজটা যে তত বীরত্বের, তা না-ও হতে পারে, কিন্তু যে-ভাবে ও তোমায় বলবে না গল্পটা! আমি তো সময় সময় ভাবি. বড় হয়ে একদিন উইস্কি রহস্য-উপন্যাস লিখতে পারবে। এমন ভালো করে ও ঘটনাগুলো বলে! এমনও হতে পারে যে, ঘটনাটা যখন ঘটছিল, তুমিও ওখানে ছিলে, কিন্তু তাও, উইস্কির মুখ থেকে সেগুলো শোনায় একটা নতুন আনন্দ থাকে। আমি জানতাম, এই ঘটনাটাও একটা সত্যিকারের শিল্প হয়ে উঠবে। তাই তো আমি ওর জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম এতটা আগ্রহে।

কিন্তু 'এই আসে' 'এই আসে' করে কতক্ষণ যে পেরিয়ে গেল। মিনিটের হিসেব পেরিয়ে এখন এক ঘণ্টা—দু-ঘণ্টা। ভোর থেকে সকাল গড়াল, তবু

সে আসে না। তখনই কেমন এই ব্যাপারটা মাথায় এল আমার। এখন আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। মিস্টার ফারক্যান যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন আর আমিও যেই-না চম্পট দিয়েছি, উইস্কি ঠিক গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ব্যাগটা তুলেই দৌড় লাগিয়েছে। না, বড় রাস্তা ধরে যায় নি। চোট্টা কোথাকার! ওই যেখানে ও ওর জিনিসপত্র সব লুকোয়, নির্ঘাৎ গিয়ে পড়েছে ওর সেই পেটোয়া ঝোপে, গিয়ে যতগুলো সফেদা গিলতে পারে গিলেছে, আর লুকিয়ে ফেলেছে বাকিগুলো!

উঠে পড়লাম। এবার আর চিন্তা না, রাগ হচ্ছে। রাগে ফুঁসছি আমি। যা হলো সে তো অন্তত আমার জন্য না। আমি নিশ্চয়ই মিস্টার ফারক্যানকে দরজা খুলিয়ে বাইরে আনাই নি!

রাস্তা ধরে আমি চলেছি, গা-টা রাগে জ্বলছে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্যই যাওয়া। আমার চেয়ে বড় না উইস্কি। আমার ভাগের সফেদা আমি কিছুতেই ওকে নিতে দেব না।

মিস্টার ফারক্যানের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, দরজাটা দেখি খোলা। ভয়ে ভয়ে ভেতরে তাকালাম। তারপর মাথাটা খাড়া রেখে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আর কয়েক পা যেই-না এগিয়েছি, শুনি: 'সুপ্রভাত, কেন!' চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, সফেদা গাছটার নিচে মিস্টার ফারক্যান—লাঠিটা হাতেই আছে, সামনে পড়ে আছে সফেদা-ভর্তি ঝোলাটা।

ওখান থেকে উনি আমার দিকে তাকিয়ে, মুখটা হাসি-হাসি। 'সফেদা চাই, না রে?' ঝোলার মধ্যে তিনি হাত ঢুকোলেন। আমি তো বোবা হয়ে গেছি তখন। তাঁর দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকালাম সফেদা গাছটার দিকে, তারপর গাছটার ওপর দিকে চোখ গেল। 'কী রে, চাই নাকি কয়েকটা সফেদা?' আবার তাঁর প্রশ্ন, উঠে পড়েছেন এবার।

ততক্ষণে আমি কিন্তু পগার পার। সমস্ত শক্তি জড়ো করে দৌড়লাম আর তখন আমার সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। কেন কাঁদছিলাম, কী জানি। গাছের ওপর থেকে উইস্কি কেমন করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, বোধহয় সেটাই মনে পড়ল আমার, আর তাতেই এ রকম লাগছে। আর মনে পড়ছিল মিস্টার ফারক্যানের বিশাল লাঠিটা। সেটা মনে পড়েই আরও খারাপ লাগছে। দৌড় থামিয়ে বাকি পথটা আমার হেঁটেই যাওয়া উচিত ছিল বাড়ির দিকে। কিন্তু উইস্কির চিন্তাটা যে কিছুতেই সরাতে পারছি না

মন থেকে। আমি জানতাম দেবতারও সাধ্যি নেই সফেদা গাছটা থেকে নিচে নামা, যেটার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ফ্যারফান।

বাড়িতে বসে তখনও কেঁদেই চলেছি, হঠাৎ শুনি বাইরে একটা কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের মধ্যে উঠে পড়ে দেখি, উঠোনের মধ্য দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে—উইস্কি। 'এসেছিস!' বলে চেঁচিয়ে উঠি আনন্দে। আশ্চর্য, কী করে ও পালাতে পারল!

দাঁত বার করে ও বলল: 'তুই তো কিছু সাহায্য করলি না।' আর ঠিক তখুনি আমি তাকিয়ে দেখি সফেদা-ভর্তি একটা ঝুড়ি!

ও নিয়ে অবশ্য বললাম না কিছুই। সেই মুহূর্তে সফেদা টফেদা আর আর আমার মাথায় নেই। ও পালালোটা কী করে—এইটেই এখন আমি জানতে চাই।

'ধরতে পারে নি তোকে?' জিজ্ঞেস করি।

'কেন ধরবেটা কীসের জন্য?' বলেই হো-হো করে হাসতে থাকে। বলে: 'তোকে ডাকল লোকটা, আর তুই পালালি!'

আমি তো থতমত খেয়ে তাকিয়ে।

ও হাসছেই, কেবলই হাসে। তারপর এক সময়ে আর চাপতে না পেরে বলল পুরো ঘটনাটা। আমি হতভম্ব। আমি তো এখনও পর্যন্ত ভেবে পাই না—এইভাবে সমানে উইস্কি বোকা বানিয়েছে আমায়? সম্প্রতি নাকি ও হয়ে উঠেছিল মিস্টার ফারফ্যানের একজন প্রাণের বন্ধু!

অনুবাদ: শ্রাবন্তী ঘোষ

একফালি পেয়ারা বাগান

বাগানটা ওখানে তখনও আছে। খানিকটা অবশ্য ঢাকা পড়ে গেছে বিছুটি আর আগাছার জঙ্গলে আর লম্বা, ক্ষুরের মতো ধারালো ঘাসে, কিন্তু কোন বড় গাছ ওখানে গজিয়ে ওঠে নি। এতগুলি বছর ধরে বেশ সুন্দর রাখা হয়েছে বাগানটাকে। কেবল দুই ধার বরাবর কয়েকটা বড় বড় গাছ গজিয়ে মাথার ওপর হেলে আছে, মাথার ওপর যেন একটা পুরু চাঁদোয়া বিছানো।

মিস্টার জনসন বেশ লম্বা মানুষ, মাথাটা একটু নুইয়ে তাঁকে চাঁদোয়ার তলা দিয়ে যেতে হলো। অভিভূতভাবে তিনি চলেছেন, তাঁর মুখে বিস্ময়-মেশানো একটুখানি হাসি। যখন আবার আলোয় বেরিয়ে এলেন, ওঁর সামনে পড়ে থাকা নিচু জমিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি হাসলেন। একটুখানি কেঁপে উঠলেন যেন। পেয়ারা গাছ-ভরা সেই জমিটা ওখানে এখনও আছে। সত্যি, এখনও আছে, এই এতগুলি বছর পরেও।

মুহূর্তের জন্য চারিদিকে তাকালেন তিনি। ঐ তাঁর পরিচিত নারকেল গাছগুলো, কাঠবেড়ালি লাফিয়ে যাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডাল। এ-সব কিছু, মিস্টার জনসন দেখছেন। ঐ গাছগুলোও একই রকম আছে, আর এমনকি ঐ কাঠবেড়ালিগুলোও।

এবার পথ ধরে তিনি এগোতে লাগলেন নারকেল গাছের ঝাড়টার দিকে। একটুখানি থেমে কাছেই বয়ে-চলা নদীটার জলে ডুবিয়ে নিলেন হাতদুটো। কী দ্রুত এখন বয়ে চলেছে নদীর জল! এতগুলো বছর ধরে যেন আরও বেশি উচ্ছল হয়ে উঠেছে এই নদী। সমস্ত দেখে বিস্ময়ে আবিষ্টভাবে হেঁটে চলেছেন প্রৌঢ় মানুষটি।

নারকেল-ঝাড়ে পৌঁছে খুব সহজেই তিনি খুঁজে পেলেন ঠিক যে-গাছটির কথা তিনি ভাবছিলেন। গাছের ছালে কিছু দেখবেন বলে এগিয়ে গেছেন। আর তারপর নিজের চোখকেই যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। হ্যাঁ, 'ই. সি.' লেখাটা তো এখনও ওখানে রয়েছে। যে ছোট্ট ছুরিটা দিয়ে ও-দাগটা কাটা, সেটার যে কী হলো ওঁর মনে পড়ছে না, এমি এখন কোথায় তাও তিনি জানেন না। কিন্তু ছেলেবেলায় চিরে দেওয়া সেই 'ই. সি.' দাগটা এখনও ওখানে তেমনি আছে।

তাঁর ধূসর মাথার চুলের ভেতরে হাত চালালেন মিস্টার জনসন। আলুথালু পড়ে-থাকা পেয়ারা-জমিটার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর বুকের মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছেন একটা উত্থান-পতনের আওয়াজ।

সেটা গরমকাল, তাই পেয়ারার শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে পুরু হয়ে—যেন তৈরি হয়েছে একটা ঢেউ, যেন পায়ের নিচে বিছানো খয়েরি রঙের একটা কার্পেট। শাখাগুলোর মাঝে মাঝে হলুদ-রঙা ফল, কিন্তু গাছের গোড়ায় ঝোপের চিহ্নমাত্র নেই। পুরু পাতার রাশের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো এসে পৌঁছচ্ছে না মাটিতে। সেই অনেক আগের দিনগুলোয় যেমন লাগত, ঠিক তেমনি হালকা মেজাজে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো।

পদ্মপুকুরটার কাছে আসার আগে পর্যন্ত মিস্টার জনসন ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন সামনের দিকে, তখনও তিনি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। যেমন ছিল, পুকুরটা আজও তেমনি পদ্মফুলে ভরা। কিছু ফুল শুকিয়ে গেছে, কিছু বা রোদের তাপে গুটিয়ে নিয়েছে তাদের পাপড়ি।

পুকুরপাড়ে শুকনো পাতার ওপর বসে পড়লেন প্রৌঢ়টি। শুকনো দিনে এই পুকুরেই তারা জল নিতে আসতেন—কুট্‌স, কিটসিপ, মলি, এমি আর তিনি নিজে। তিনি ভাবছেন—তাঁর সেই পূর্বভারতের প্রতিবেশীরা, তিনি যাদের সান্নিধ্য পেতেন, এখন কোথায় সেই শিশুর দল? মনে মনে হাসলেন তখন। সেই শিশুরা এখন তো আর শিশু নেই! কিন্তু গাঁ ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার খবর ছাড়া আর কোন খবরই তো তিনি পান নি।

ভেতরে ভেতরে তিনি ভীষণ কষ্ট বোধ করলেন। তাঁর কত কাছের মানুষ ছিল ওরা! শৈশবের দিনগুলো ভরে দিয়েছিল তাঁর। এখন তারা নেই। চলে গেছে অনেকদিন আগে, আর চিরদিনের মতোই চলে যাওয়া। আর এই কবরখানার পাশে যদি বা তারা থাকতও তারাও তো তখন ওঁর মতো এমন বৃদ্ধ, অথর্ব।

শেষটায়, যেন খানিকটা কষ্ট করেই, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন প্যান্টের ধুলো, তারপর ফিরে চললেন সেই দিকে, যেদিক দিয়ে তিনি এসেছিলেন। আর পেয়ারা বাগানের ভেতর দিয়ে যখন আসছেন, মুঠো-মুঠো পেয়ারা নিলেন সঙ্গে, ভর্তি করে ফেললেন তাঁর পকেট।

* * *

গ্রামটির ওপর কিন্তু সময়ের ছাপ খানিকটা পড়েইছে। মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন

বৃদ্ধের. আর সে সময়ের মধ্যবয়সীরা এখন পূরণ করেছে সেই বৃদ্ধদের স্থান। এবং সেই মধ্যবয়সীদের স্থানে এখন সেদিনের কিশোর-তরুণের দল। যুবকেরা অনেকেই চলে গেছে এখান থেকে। ধ্বসে গেছে কয়েকটা পুরনো বাড়ি, নতুন বাড়ী তৈরীও হয়েছে সামান্য কিছু। ডাকঘরটা নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে। আর একটা ভারি সুন্দর, অনেকদিনের পুরনো পামগাছ ছিল পাহাড়ের ওপর—সেটা এখন নেই। এছাড়া অবশ্য জায়গাটার খুব কিছু পরিবর্তন আর হয়নি।

ছেলেবেলার পরিচিত এই গ্রামটিতে এসে আবার বাসা বাঁধা—মিস্টার জনসনের পক্ষে এখনও সম্ভব। বস্তুত তাঁর অনেকটাই মনে হচ্ছে যেন এখান থেকে তিনি দূরে যান নি আসলে। এতদিন অন্য জায়গায় কাটিয়েছেন, তবু তাঁর মনে হয়, এটাই তাঁর আসল বাসস্থান, এখানেই তিনি ভালো থেকেছেন। পারিবারিক বাসাটার দায়িত্ব বর্তেছে তাঁরই ওপর। ফিরে আসতে প্রথম-প্রথম তাঁর খানিকটা আপত্তিই ছিল। কিন্তু কী দারুণ লাগছে এখন; তিনি ঠিক করে ফেললেন ভিটেটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে স্থায়ী আস্তানা গাড়লেন এখানে।

বাড়ির পিছনের টুকরো বাগানটা এখন কী ভালোই দেখায়! চোখে পড়ে পাকা টমেটোর টুকটুকে রং, লাউকুমড়ো আর নানারকম শস্যের লম্বা গাছ। আরও আছে প্রচুর কাসাভা, মটর, আর রাঙা আলুর গাছ। ফল ভালোবাসেন মিস্টার জনসন, তাঁর জন্যে আছে কুলগাছ, খেজুরগাছ আর পর্তুগাল-ট্রি।

গ্রামবাসীরাও দারুণ খুশি। মিস্টার জনসন তাদের এখানে এসেছেন, খুব বেশিদিন তো নয়, অথচ তারই মধ্যে কী রকম অন্য চেহারা নিয়েছে এই পরিত্যক্ত জায়গাটা। বাগান ছাড়াও, পুরনো বাড়িটা মেরামত হয়েছে, রং করা হয়েছে নতুন করে। ওরা বোঝে, এই মানুষটির প্রাণস্ফূর্তি তাদের সকলকেই উৎসাহ জোগায়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে তিনি একটি আদর্শ হয়ে উঠলেন।

মিস্টার জনসনের প্রত্যাবর্তনের পর এক বছরও তখন কাটে নি, দেখা গেল ব্রিফকেস-হাতে কয়েকজন লোক সে-পথে আনাগোনা করছে। ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। মিস্টার জনসনের অনুমতি নিয়ে তারা চলে গেল বাড়িটার ঠিক পিছনের জমিটায়।

ভাবিত নয়, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন মিস্টার জনসন। কৌতূহল বাতিকটা তাঁর খুব নেই। কেবল ভাবলেন, এ রকম ভালো পোশাক-পরা মানুষগুলির ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কী কাজ! তারপর ক্রমে আর ওদের লক্ষ্যও করেন না তিনি। কিন্তু একদিন পথ দিয়ে যেতে যেতে ব্রিফকেস-ওয়ালা একজনের সঙ্গে তাঁর দেখাই হয়ে গেল। 'এই যে।'···হাঁটা থামিয়ে লোকটি ডাকল। তারপর তাদের কাজ সম্পর্কে বিশদ বোঝাতে লাগল তাঁকে।

বলে চলে ব্রিফকেস-ওয়ালা, 'হ্যাঁ সবরকম জিনিসই এখানে আমরা তৈরী করব, জানেন মিস্টার······নামটা যেন কী?'

'জনসন।'

'সবরকম জিনিসই এখানে তৈরী হবে, মিস্টার জনসন। সবরকম—কোকো আর চকোলেটের জিনিস, নারকেল, নারকেলের শাঁস, নারকেল তেল, ওটের খোল, মাদুরের কাঠি···' বলে থামল, যেন এই বিস্তারিত পরিকল্পনায় সে নিজেই মুগ্ধ।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার জনসন। তারপর চোখ ফেরালেন পাশের জমিটায়, যেন ওখানেই তিনি খুঁজছেন তাঁর উত্তর। কথা না বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমি—মানে আমার মনে হয় এ-জায়গাটা যেমন আছে, তাতেই আমাদের ভালো লাগে। শান্তি আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থাকাটাই বোধ হয় আমাদের পছন্দ।'

'শান্তি! নৈঃশব্দ্য!' ব্যবসায়ী অবাক। হে ভগবান, বলে কী এ-লোক! 'মিস্টার জনসন, একটু ভেবে দেখুন একটা কারখানা হলে এ-অঞ্চলে কত উন্নতি হবে। একটা অনুন্নত জায়গায় এটা তৈরি হওয়ার মানেটা একটু বুঝুন। যে শত শত লোক আমাদের এখানে কাজ পাবে—তাদের কথাটা ভাবুন। প্রগতির কথা ভাবুন, মিস্টার জনসন, প্র-গতি। এর আগে এ-অঞ্চলে এমন উন্নতি তো আর কখনো হয়নি।'

'হয়নি—সে আমাদের ভাগ্য!' ভাবলেন মিস্টার জনসন। বললেন না কিছুই। সতৃষ্ণনয়নে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তাকালেন ব্যবসায়ীর দিকে। নিজেকে তাঁর দুর্বল লাগছিল। তার ভাবনাটা বিস্তারিত জানিয়ে ব্যবসায়ী তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে। গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনাটা তার কাছে স্পষ্ট। চোখ মেললেই সে দেখতে পায়, কলকারখানা যেন তার সামনে উপস্থিত। সেগুলির চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া, চাকা ঘোরার শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড়।

যেন সে শুনতে পাচ্ছে, এই স্থানের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে উঠে-আসা কারখানার গুমগুম আওয়াজ।

মিস্টার জনসনের দিকে সে ফিরে তাকায়। তার তৃপ্তি যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। বলছে, 'কী সুন্দর সমতল ঐ জায়গাটা, দেখুন। সত্যিই সুন্দর। আমাদের বাকি শুধু এখন ঐ পেয়ারা বাগানটা সরিয়ে ফেলা।'

'কিন্তু কেন?' মিস্টার জনসন বললেন, 'কিন্তু কেন? পেয়ারা বাগানটা কেন?'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যবসায়ী। ফিরে দাঁড়ায় মিস্টার জনসনের দিকে। অধৈর্যভাবে সে বলে ওঠে, 'আপনি চান ওটা এখানে থাকুক?' ফুলে উঠেছে তার গলার শির। 'ম্যালেরিয়া হোক, টাইফয়েড হোক —এই কি আপনার ইচ্ছে নাকি?' সে বলে চলে, 'শুনুন, মিঃ জনসন, ওই-রকম ভাবুক কবি-কবি হয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। এটা রক্তের, ঘামের, হাঁপ ধরানো কাজের যুগ, কাব্য করার যুগ নয় এটা।' বলে ঝড়ের বেগে সে চলে যায় ওখান থেকে।

সেখানেই দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করেন মিস্টার জনসন। তারপর চোখ সরান একফালি এই পেয়ারা-বাগানটার দিকে। কী একটা কষ্ট বুকের মধ্যে নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন, পুরনো দিনের স্মৃতি ভীড় করে আসে মনের মধ্যে। কিছুতেই আর সম্ভব না যে, চারিদিকের এই পরিস্থিতি থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন, আবার ফিরে যাবেন বালক-বয়সে, এমি, মলি, কিটসিজ, কুট্‌সের সঙ্গে সেই পেয়ারা বাগানটায়! কিছুতেই তিনি পারেন না আর শৈশবে ফিরে যেতে, দুর্দান্ত, স্বাধীন আর ঠিক ঐ পেয়ারার ডালগুলির মতো নমনীয় হয়ে উঠতে। সেইরকম দিনগুলো কেমন ছিল—ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এলেন ব্যবসায়ীর ভাবনায়, আর অমনি মনে হলো যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন তার সেই গম্ভীর স্বর: 'ম্যালেরিয়া চান? টাইফয়েড?··· এটা কাব্য করার যুগ নয়, হাঁপ ধরানো কাজের যুগ।'

চারিদিকে চাইলেন তিনি—কেউ কোথাও নেই। সশব্দে বলে উঠলেন, 'তোমরা—এই তোমরাই ধরাচ্ছো হাঁপ। কোন কিছু ধ্বংস করলে, তবেই সেখানে সৃষ্টি করার কিছু দেখো তোমরা। জায়গাটা লণ্ডভণ্ড করে দিলে।' বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলেন তিনি। তিনি জানতেন, ব্রিফকেস-হাতে ঐ লোকগুলির কাজ যখন শুরু হবে, গ্রামটা কখনোই আর এইরকম তো থাকবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কথা ওঁর মনে হলো, তাই তিনি পথ ধরে ফিরে চললেন সেই নারকেল গাছটার দিকে। আর একটু পরেই তিনি এসে পৌঁছলেন সেই ব্যবসায়ীটির কাছে।

বললেন, 'আচ্ছা মশাই, কবে নাগাদ শুরু হচ্ছে আপনাদের কাজ?'

পিছন ফিরে খানিকটা অবাকই হলো ব্যবসায়ী। সহাস্যবদনে বলল, 'এই —আমরা প্রায় প্রস্তুত হয়েই আছি, মিস্টার জনসন।—দেখি, কাটাকাটি আর মাটি সমান করার কাজটা তো মঙ্গলবার নাগাদই শুরু হওয়া উচিত। আর এই ধরুন ও মাসের শুরু নাগাদ মালমশলা সব এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কারখানা তৈরিও ঐ তখনই শুরু হয়ে যাবে।'

'ও, আচ্ছা। খুব ভালো, আচ্ছা, নমস্কার।' বলে উঠলেন মিস্টার জনসন। তারপর পিছন ফিরে তিনি এগিয়ে গেলেন পথে।

এই কারখানা-চত্বরের কারবারীদের যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার জো নেই। ঠিক মঙ্গলবার সকালেই শ্রমিকদের কাজ শুরু হয়ে গেল বাড়ির পিছনের জমিটায়। পেয়ারা-বাগানটা দিয়েই শুরু। ঝপ্! ঝপ্! ঝপ্!—কুঠার কাজ করে চলেছে। ঝপ্! ঝপ্! ঝপ্! হেলে পড়ছে পেয়ারা গাছগুলো, তারপর সটান মাটিতে।

উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে কাজকর্ম তদারক করছে ব্যবসায়ী লোকটি। হঠাৎ তার মনে পড়ল ব্রিফকেসে বয়ে আনা তাদের ছক-আঁকা কাগজটার কথা। মিস্টার জনসনকে দেখানোর জন্যই আনা। চিন্তিত ভাবে গাছের ঝাড়টার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে।

বাড়িটায় পৌঁছে মিস্টার জনসনের নাম ধরে সে ডাকল, গর্জন করে উঠল বলা যায়। শুনতে পেয়ে দৌড়ে বেরোলেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মহিলাটি। বললেন, 'মিস্টার জনসন তো এখানে নেই, আপনি বুঝি জানেন না? কী হয়েছিল কী জানি—সবাই তো অবাক। হঠাৎই ফিরে এলেন গত বছর, আমরা তো জানি, বেশ ভালোই কাটাচ্ছিলেন এখানে। হঠাৎ কালকে জিনিসপত্র বাঁধলেন-টাঁধলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রওনা।'

অনুবাদ : শ্রাবন্তী ঘোষ

ক্যালিপ সোনিয়ান

সামুয়েল সেলভন

ত্রিনিদাদে সময়টা বড্ডো খারাপ যাচ্ছে। রেজর ব্লেড কিছুতেই কিছু সুবিধে করতে পারছে না। কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই। যেখানেই যাচ্ছে কোনো কাজ মিলছে না। কাজ সোনার মতোই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ছ'মাস হতে চললো ওর কোনো কাজ নেই।

ওদিকে চিন-এর দোকানে পাঁচ ডলার ধার হয়েছে। গতবার ওখানে যখন স্যাণ্ডউইচ আর মিষ্টি মদ খেতে গিয়েছিলো, চিন ওকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে বাকি শোধ না করলে আর বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নেই। কাউণ্টারের নিচে একটা খাতায় চিন ওর নাম টুকে রেখেছে। "সবুর করো, ক্যালিপ্সোর দিন আসুক", ও চিনকে বলে "তখন আমি কী করি দেখো। মনে আছে গত বছর কতো রোজগার করেছিলাম?"

গত বছরের কথা মনে করেও চিন-এর মন গলে না। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো সেই ক্ষুধা, সেই নোংরা জামা-কাপড় আর কোথাও কিছু হবার কোনো লক্ষণ নেই। এদিকে ক্যালিপ্সো আসতে এখনো চার মাস বাকি।

এর ওপর প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। ওর পায়ের জুতোয় এতো বড়ো-বড়ো ফুটো হয়েছে, যেন ওগুলো হাসছে।

এই বৃষ্টির জন্যেই সে পার্ক স্ট্রিটের-এক জুতো তৈরির দোকান থেকে একজোড়া জুতো চুরি করলো। জীবনে এই প্রথম চুরি, তাই মনস্থির করতে অনেকটা সময় লাগলো। জুতোর দোকানের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ও ভাবছে, হা ঈশ্বর, খিদেয় পেট জলে যাচ্ছে, তখন সামনের দোকানে টেবিলের ওপর, মাটিতে, এখানে-ওখানে সব জুতো ছড়ানো। কোনোটা নতুন, কোনোটা পুরনো, কারো হাফসোল হবে, কারো বা হিল। ওখানে একজোড়া রয়েছে ঠিক ওর পায়েরটার মতো।

টেবিলটা কেটে-কেটে গেছে, যেন মুচি চোখে দেখে না, তাই চামড়া কাটতে

গিয়ে টেবিলটাই কেটে ফেলেছে। টেবিলের ওপর আধভাঙা লাউ-এর খোলার মধ্যে ফোটানো মাড়। দেখতে জাউ-এর মতো। ওর এতো খিদে পেয়েছে যে ওগুলো খেয়ে নিলে হয়। মুচি দোকানের পেছন দিকটায় রয়েছে। সামনে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছে। কাজটা এতো সহজ মনে হলো—নিজের জুতো জোড়া খুলে রেখে আরেক জোড়া তুলে নেয়া, অথচ নজরটা ঠিক পড়েছে একজোড়া 'টেকনিক'-এর ওপর, ঠিক নিজের পায়ের মাপের।

রেজর ব্লেড-এর মনে পড়ে গত বছর ওর সময়টা কতো ভালো ছিলো— পায়ে দো-রঙা 'টেকনিক', গায়ে গ্যাবার্ডিন স্যুট আর রঙীন টাই। এখন সময় খারাপ যাচ্ছে ব'লে প্রতিমুহূর্তেই সে গত বছরের সঙ্গে তুলনা করছে, মনে-মনে ভাবছে সেই সুন্দর পুরনো দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসতো!

ওর মনে হ'লো চুরি করা বেশ সহজ, কারণ অনেকেই জিনিসপত্র ফেলে রেখেই এদিক-ওদিক চলে যায়। যেমন এই মুচিটি দোকানের পেছনে চলে গেছে, আর ওকে যা করতে হলো তা হলো শুধু একজোড়া জুতো তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হেঁটে যাওয়া।

চুরি করা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়। যা দরকার তা হলো একটু মেজাজ, বেকারত্ব—ব্যস্। এদিক-ওদিক দু-তিনবার ঢুঁ মারলে ঝাঁকা থেকে একটা কমলা অথবা দোকান থেকে রুটি কিম্বা অন্য কিছু। ঠিক যেমন ক'রে জুতো জোড়া হাতানো গেলো।

যদিও ভীষণ ভয়ে-ভয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে শরীরের কোনো-কোনো অংশে কেউ সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে, রেজর ব্লেড কিন্তু বিজয়ী বীরের মতো শিস্ দিতে-দিতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলো।

শুধু ওর এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ঠিক কুইন স্ট্রীটের যেখানটায় এক রেস্তরাঁ রয়েছে সেখানটায় দাঁড়িয়ে তার মাথায় একটা ব্যাপার খেলে গেলো। আসলে ব্যাপার কিছু নয়, ও ভাবলো: শিলিং চুরি করা যা, পাউণ্ড চুরি করাও তাই, এখন সে সবকিছুই করতে পারে। শুধু শুরু করাটাই যা, শুধু একবার ক্ষেপে যাওয়া, তারপর ব্যাপারটা সহজ।

ও পরিকল্পনা ভাঁজছে বলে আপনার মনে হয়? ও ভাবছে সামনের

চীনে রেস্তরাঁয় ঢুকে প'ড়ে সোজা টেবিল দখল করে বেশ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে পড়া। কাজটা এত সহজ, অথচ একথা সে আর কখনো কেন ভাবেনি, আশ্চর্য!

ওয়েট্রেস্ পাশে এসে দাঁড়ায়, রেজর ব্লেড মেনু দেখতে থাকে। কানে পেনসিল গুঁজে মহিলা দাঁড়িয়ে। ও তার দিকে আড়চোখে এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারলো মেয়েটি এখানে ঠিকে। কারণ দেখলে মনে হয়, ওর ঘুম পেয়েছে আর শরীরটা এক টুকরো তামার তারের মতো বেঁকে গেছে। কীই-বা করার আছে? মেয়েটা ঐ চীনে লোকটির কাছ থেকে কয়েকটা ডলার মাত্র পায় যাতে ওর দিন চলে না।

হঠাৎ ও বুঝতে পারলো নিজেরই কিছু ঠিক নেই অথচ সে ঐ মহিলাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাই সে মাথা ঝাকিয়ে মেনু দেখতে লাগলো।

প্রায় সবগুলো জিনিসেরই কিছু অর্ডার দেবার জন্য ও পাগল হ'য়ে উঠলো—ফ্রায়েড রাইস, চিকেন চপ-স্যুয়ে, পর্ক রোস্ট, চিকেন চৌ-মিন, বার্ডনেস্ট স্যুপ, চিকেন ব্রথ এবং ইয়া বড়ো টোমাটো ও পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে দারুণ সালাড। আবার সে গত ক্যালিপ্সোর দিনগুলোর কথা ভাবতে বসলো। তখন কী দিন ছিলো! সেণ্ট ভিনসেণ্ট স্ট্রীটের নামকরা চীনে রেস্তরাঁয় তখন সে যেতো। ওর ভাবতে মজা লাগে মানুষ কেমন এক সময় বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, আবার অন্য সময় খাবারের জন্য মাথা খুঁড়ে মরতে হয়।

এ রকম একটা ব্যবস্থা থাকা বোধ হয় উচিত, যাতে একসঙ্গে এক হপ্তা বা এক মাসের খাবার খেয়ে নেয়া যেতে পারে। ও ভাবলে এরপর যখন ওর হাতে টাকা হবে (হা ঈশ্বর!), তার বড়ো-একটা অংশ রেস্তরাঁয় জমা দিয়ে রাখবে যাতে ওকে শুধু ওখানটায় সময়মতো ঢুকে পড়ে হাভাতের মতো গিলতে পারে।

এদিকে মহিলা অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তিনি বললেন: "মনে হচ্ছে আপনি এর আগে কোনো দিন রেস্তরাঁয় খান নি। মনস্থির করতে এতো সময় নিচ্ছেন কেন?"

আর ও ভাবতে লাগলো সেই সময়ের কথা যখন ওর টাকা ছিলো, যখন কোনো এলেবেলে মেয়েছেলে ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারতো না। ওর মনে পড়ে বেয়ারারা ওকে পরিচর্যা করার জন্য কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়তো। এবং একদিন যখন খবর রটে গেলো যে ক্যালিপ্সোনিয়ান রেজর

ব্লেড এসেছে, ওরা সব্বাই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলো একটা গানের জন্য—সেই হোম আর ব্যাচেলরকে নিয়ে যে গানটা।

"আরে মশাই চটপট মন ঠিক ক'রে ফেলুন। আমার কাজ রয়েছে।"

সুতরাং সে খালি ভাত ও চিকেন স্টু-র অর্ডার দিলো। এর আগে যে-সব দারুণ খাবারের কথা ভাবছিলো, সেটা শুধু মজা ক'রে ভাবাই। আসলে সে চাইছে রোস্ট ব্রেডফ্রুট এবং সল্টফিশ, মানে ভারী কিছু যা পেটে গেলে টের পাওয়া যায়।

তাই সে প্রথমেই অর্ডার দিলো বারবাডোজ রাম-এর জন্য, কারণ সে জানে এরা খাবার আনতে কতো দেরী করে। সেই সময়টা রাম দিয়ে ভরে দেয়া যাবে।

খাবার আসতে-আসতে ওর দারুণ খিদে পেয়ে গেলো। তাই সে ভাত ও চিকেন স্টু-র ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো যেন জীবনে সে এই প্রথম খাবার দেখছে। তিন মিনিটেই সব শেষ।

মনে হ'লো এই প্রথম পৃথিবীকে দেখছে। নিজেকে মনে হচ্ছে লক্ষপতি, লর্ড। একটা মস্তো ঢেঁকুর ওর গলায় তুলে আনলো কিছু মাংস আর ভাত। সেগুলো যখন আবার ও গিলতে গেলো কেমন যেন টক-টক স্বাদ।

ও ভাবছে কী ক'রে এক আমেরিকান ত্রিনিদাদ-এ ক্যালিপসো শুনে দেশে ফিরে গিয়ে তাতে সুর এবং রঙ লাগিয়ে এ্যাণ্ড্রুজ সিস্টারসকে দিয়ে গাওয়ায়। লোকটা যাচ্ছেতাই পয়সা ক'রে ফেললো এ থেকে। 'হিট প্যারেড'-এ ওটা বাজলো। যেখানেই যাও, ঐ গান। শুধু ঐ গান। কিন্তু বেচারা ক্যালিপসোনিয়ান, যে নিজে ঐ গান লিখেছে, সে ত্রিনিদাদ-এ পচে মরছিলো। এক চালাক চতুর উকিলবাবু ওকে কপিরাইটের কথা বুঝিয়ে দিতেই সে আমেরিকা চলে গেলো। তারপর নিউ ইয়র্কের সেই মামলার কথা নিশ্চয়ই জানেন যাতে সে প্রচুর পয়সাকড়ি পেয়েছিলো ?

রেজর ব্লেড গল্পটা ভালো করেই জানে। যখনই সে একটা ক্যালিপসো বাজায়, প্রার্থনা করে মার্কিন মুলুক থেকে একজন হোমরা-চোমরা কেউ ওটা শুনুক ও পছন্দ করুক। তারপর সব ঠিক হো যায়গা। রেজর ব্লেড মাঝে-মাঝেই ফ্রেডরিক স্ট্রীট ও মেরিন স্কোয়ারে ওয়ান-টু মিউজিক শপগুলোর কাছে যায়, চালু গানগুলোর স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে থাকে! স্বরলিপির পাশে বড়ো-বড়ো অক্ষরে গীতিকারের নাম, কখনো বা ছবি। রেজর ব্লেড

ভাবে: আমি কেন এ রকম গান লিখতে পারি না যাতে সব জায়গায় নাম ছড়িয়ে পড়ে।

সময় যখন ভালো ছিলো, সে দোকানের ভেতরে যেতো এবং কেরানীদের বলতো যে, সে ক্যালিপ্‌সো লেখে। ওর কথা শুনে ওরা হাসতো, কারণ, ওরা মনে করে ক্যালিপ্‌সো কোনো গানই নয়। মার্কিনি সুরকাররা যে-গুলো তৈরি করছে যেমন 'আই হ্যাভ গট ইউ আনডার মাই স্কিন' এবং 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি' হচ্ছে সত্যিকারের গান।

এবং রেজর ব্লেড নিজের সঙ্গে তর্ক ক'রে চলে—সবারই দিন একদিন আসে। একদিন এমন হবে সারা দুনিয়া পাগলের মতো শুধু ক্যালিপ্‌সো গাইবে।

চীনে রেস্তরাঁয় চেয়ারে হেলান দিয়ে সে এসব কথাই ভাবছে।

এখন তো পয়সা-কড়ি না দিয়ে সট্‌কে পড়তে হবে!

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় গম্ভীরমুখে বেরিয়ে যাওয়া যেন ও-ই এ রেস্তরাঁর মালিক।

সুতরাং সে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো ওয়েট্রেস্ ধারে কাছে নেই, সে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে এখন খাবার দিচ্ছে, তারপর ক্যাশিয়ারের পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। ক্যাশিয়ার খাতায় যেন কী লিখছে।

কিন্তু এ-অবস্থায় যতই গম্ভীরমুখে তুমি হেঁটে যাও না, তোমার শরীরের একটা অংশে চিম্‌টে ক্লিপ্-ক্লিপ্ ক'রে খাম্‌চে ধরবে, মনে হবে দুটো পা এক হ'য়ে গিয়ে তুমি হাঁটছো।

ওয়েট্রেস্ যখন দেখলো রেজর ব্লেড পয়সা না দিয়ে চ'লে গেছে, দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে। রান্নাঘর থেকে একজন চীনেম্যান ছুটে গেলো বাইরে যদি লোকটাকে দেখতে পায় এই আশায়। কিন্তু তখন রেজর ব্লেড ফ্রেডরিক স্ট্রিট ধরে ছুটে চলেছে।

রেস্তরাঁর মালিক মহিলাকে জানালো যে রেজর ব্লেড-এর খাবারের দাম তাকেই দিতে হবে, কারণ দোষ তারই। মহিলা আরও চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, কারণ রেজর অনেকটা খাবার খেয়েছে—তার মানে ওর মাইনে থেকে প্রায় দু-তিন ডলার কাটা যাবে।

যাক তাহ'লে এবারও, রেজর ব্লেড হেসেই অস্থির। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে সে। এখন ওকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে লাগলো। রেজর ব্লেড নতুন জুতো পায়ে রাজার মতো হেঁটে

চলেছে। এখন আর পায়ে জল লাগছে না, তাই আশ্রয়ের জন্যও মাথা ব্যথা নেই।

*　　　*　　　*

ও জানেনা কেন, কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় একটা ক্যালিপ্সোর কথা খেলে যায়। ওটা হবে একটা লোককে নিয়ে যে সবরকম চেষ্টা করেও কোনো কাজ পাচ্ছে না, এবং সত্যিকারের কষ্টের দিনগুলোকে সে কীভাবে দেখছে। বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে সে কথাগুলো তৈরি করার চেষ্টা করে এভাবে—

'এই কলোনীর সেই যে আমার দিনগুলি।

যখন আমি ছাড়া সবাইর ছিলো টাকা।

যখন মাথা কুটেও জোটেনি কোনো কাজ।

মনে হতো ভালো সময় এড়িয়ে যাচ্ছে আমায়।'

একটা পুরোনো ক্যালিপ্সোর (ম্যান সেণ্টিপেড বাড টু ব্যাড) সুরে ও গুনগুন ক'রে ছাথে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়।

ওর মনে পড়লো ওয়ান ফুট হার্পার-এর কথা। সে-ই একমাত্র লোক যে ওকে গানের সুর জোগাতে পারে।

ওয়ান ফুটকে নিয়ে এক সময়ে একটা দারুণ রগড় হয়েছিলো। একদিন উডফোর্ড স্কোয়ারে এক উইলো গাছের ছায়ায় ওয়ান ফুট যখন ঝিমোচ্ছিলো, কেউ সেই ফাঁকে ওর ক্রাচ্ চুরি করে। ফলে ওকে সারাদিন সারারাত স্কোয়ারে থাকতে হয়েছিলো। সহজেই ভাবা যায় ও কতো অভিশাপ দিচ্ছিলো নিজেকে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে হাসছে, কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। হয়তো এই মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়ান ফুটকে ঐ উইলো গাছের নিচে প'ড়ে থাকতে হতো, যদি না রেজর ব্লেড ওখানে গিয়ে পড়তো।

সেই থেকে ওরা দু-জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সুতরাং রেজর ব্লেড এগিয়ে চলে দরজির দোকানের দিকে যার এক অংশে ওয়ান ফুটকে পাওয়া যাবেই, কারণ ওর কোনো কাজ নেই। একটা সাবানের বাক্সের ওপর ব'সে সারাদিন সে ব'কে চলে।

অযথা মাথা গরম ক'রে লাভ নেই, কারণ ওয়ান ফুট মোটেই বোকা নয়; একদিন ছিলো যখন লোকে ওকে ক্যালিপ্সোর রাজা বলতো এবং সত্যিই সে দারুণ গাইতো। ওর যদি টাকা এবং ডিগ্রি থাকতো তাহ'লে নির্ঘাৎ আজ ও অনেক ওপরে উঠে যেতো। কারণ, ও-ই প্রথম লোক যার মাথায় খেলে-

ছিলো যে ক্যালিপ্‌সোনিয়ানদের আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড-এ গিয়ে গান গাওয়া উচিত। কিন্তু লোকে ওর কথা তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

রেজর ব্লেড যখন ওয়ান ফুট-এর দেখা পেলো তখন সে টাউন হলে কী ক'রে আগুন লেগেছিলো (ওয়ান ফুট বলছিলো সে জানে কে ঐ আগুন লাগিয়েছিলো) সেই আলোচনায় মশগুল। ওকে দেখে ওয়ান ফুট আলোচনা থামিয়ে বললো, "কী ব্যাপার দোস, অনেক কাল দেখা নেই।"

রেজর ব্লেড বলে, "শোনো দোস্ত, একটা ক্যালিপ্‌সোর দারুণ আইডিয়া মাথায় এসেছে। চলো, দোকানের পেছনে ব'সে ওটা চেষ্টা করা যাক।"

ওয়ান ফুট কিন্তু সাবানের বাক্সের ওপরই বেশ আরামে আছে। সে বললে, "আরাম ক'রে ব'সো, তাড়া দিও না। তা গত হপ্তায় যে এক শিলিং ধার নিয়েছিলে তার কী হ'লো?"

রেজর ব্লেড পকেটগুলোকে উল্টে দিলো। মেঝের ওপর ছিটকে পড়লো একজোড়া পাশা ও একটা পেনসিল-কাটা ছুরি।

"আমার কাছে একটা কপর্দকও নেই। কিস্‌সু নেই। আমার গায়ে যদি পিন ফোটাও এক ফোঁটা রক্তও বেরুবে না।"

"থামকা ওসব কথা বলো না। তোমাদের সবারই ওই এক কায়দা। লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করো, তারপর তার ঠিকানা ভুলে যাও।"

"তোমায় বলছি আমি," রেজর ব্লেড এমনভাবে বলে যেন খুব তাড়া রয়েছে, আসলে সে এই আলোচনা থেকে স'রে যেতে চায়, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না?"

কিন্তু ওয়ান ফুট ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমায় বলে রাখছি যদি আবার আমার কাছে ধার চাইতে আসো তবে মস্ত ভুল করবে। এক কাণাকড়িও তোমায় আমি দেব না যতক্ষণ না তুমি আমার ঐ এক শিলিঙ শোধ দিচ্ছো।" সাবানের বাক্সো ছেড়ে উঠে ক্রাচে দেহের ভার ঠিক ক'রে নেয়।

"এসো তাড়াতাড়ি এসো," রেজর ব্লেড দোকানের পেছন দিককার ঘরে যাবার ভাব করে। এই সময় ভারতীয় দরজি রহমতকে দেখতে পায়। "কেমন আছো, ভালোই চলছে মনে হয়।"

খাকি প্যাণ্ট সেলাই করা থামিয়ে রহমত রেজর ব্লেড-এর দিকে তাকায়।

"তুমি ও ওয়ান ফুট হরদম এই দোকানে ব'সে ক্যালিপ্‌সো লিখছো। আমায় কিন্তু কমিশন দিতে হবে।"

"তুমি তো জানোই ব্যাপারটা কেমন—কখনো সময় ভালো যাচ্ছে, কখনো আবার খারাপ। এই মুহূর্তে ঝুলে আছি, একেবারে দারুণভাবে ঝুলে আছি।"

"জানি, ওই বুড়ো মজার লোক। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো ভালো অবস্থায় দেখিনি।"

"আ, ক্যালিপ্‌সো শুরু হোক তখন দেখতে পাবে।"

"তখন তো তুমি এদিকে পা-ই মাড়াবে না। তখন তো তুমি মস্তো লোক, এই সামান্য রহমতকে কি মনে থাকবে।"

এরপর রহমতকে কী বলবে রেজর ব্লেড ভেবে পায় না। কারণ, দোকানের পেছনে বসে থাকা সে ও ওয়ান ফুট সম্পর্কে ভারতীয়টি যা বলেছে সবই ঠিক। ওর মনে পড়ে ইদানীং ওকে যখনই কেউ জিগেস করেছে, ও বলেছে: "ক্যালিপ্‌সোর সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো." যেন ক্যালিপ্‌সো শুরু হলেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং সবাইকে সুখী ক'রে দেবেন।

সুতরাং রেজর ব্লেড ফিক্-ফিক্ ক'রে হেসে রহমতের পিঠ চাপড়ে দেয় আস্তে-আস্তে পুরনো বন্ধুর মতো।

এ-সময়ে ওয়ান ফুট এগিয়ে আসে, এবং ওরা দু'জনে বিশ্রামের টেবিলের পাশে বসে।

রেজর ব্লেড বললো: "এই কথাগুলো শোনো, জন্ম থেকে এ রকম ক্যালিপ্‌সো কোনোদিন শোনো নি," বলেই সে কথাগুলো বলতে শুরু করে।

শুরু করতেই ওয়ান ফুট আঙুলে কান বন্ধ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো: "হা ঈশ্বর, তোমার মাথায় কি নতুন-কিছু ভাবতে পারো না। প্রতি বছরই সেই এক পুরোনো কথা।"

"তুমি কী বলছো," রেজর বলে, "এই তো আদি ক্যালিপ্‌সো। আগে সবটা শুনে নাও।" ওরা দু-জন গানটা নিয়ে কাজ শুরু করে। ওয়ান ফুট দু-লাইন ক'রে সুর বসিয়ে দিলো। রেজর ব্লেড একটা খালি বোতল ও একটা কাঠি দিয়ে এবং ওয়ান ফুট টেবিলে তাল বাজিয়ে ওদের সদ্য তৈরি ক্যালিপ্‌সো গাইতে থাকলো।

রহমত এবং ওর সাহায্যকারী অন্য ভারতীয়টি সেলাই হাতে নিয়ে শুনতে লাগলো।

"এই নতুন গানটা কেমন লাগলো তোমার?" রেজর ব্লেড রহমতকে জিগেস করে।

রহমত মাথা চুলকে বললো: "আবার শুনি সুরটা।" সুতরাং ওরা টেবিল এবং বোতল বাজিয়ে আবার শুরু করলো। আর রেজর ব্লেড-এর মনে হলো সে ক্যালিপ্সো টেন্ট-এ বেশ বড়ো শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে গাইছে। সুতরাং ও সবকিছু ঢেলে দিলো ওর গানে।

যখন শেষ হ'লো রহমতের সাহায্যকারী লোকটি ব'লে উঠলো: "এ হ'লো প্রাণের জিনিস।"

কিন্তু রহমত বলে: "মুখ বন্ধ ক'রে থাকো না বাপু। তোমরা ভারতবর্ষের লোকেরা ক্যালিপ্সোর কী বোঝ?" একথা শুনে সবাই হাসতে লাগলো। দারুণ হাসির ব্যাপার, কারণ রহমত নিজেই একজন ভারতীয়।

ওয়ান ফুট রেজর ব্লেড-এর দিকে ফিরে বললো: "শোনো দু-জন ভারতীয় কীভাবে ক্যালিপ্সো নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আমার বাপের জন্মেও এমন দেখিনি।"

রহমত বললে: "আরে বাবা, আমি হচ্ছি ত্রিনিদাদের আসল অধিবাসী, হ্যাঁ।"

রেজর ব্লেড বললো: "ঠিক আছে ভাই। তামাশা হচ্ছে তামাশা। তোমাদের এ-গান ভালো লেগেছে? সত্যি ভালো লেগেছে?"

রহমত হ্যাঁ বলতে চাইলো, কিন্তু নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে বললো: "এই, মানে মোটামুটি" এবং "না, তেমন-কিছু খারাপ নয়" এবং "আমি এর চেয়ে খারাপ গানও শুনেছি।"

কিন্তু যে-লোকটা রহমতকে সাহায্য করে সে পাগলের মতো রেজর ব্লেড ও ওয়ান ফুট-এর কাঁধ চাপড়ে বললো, সে এ রকম ক্যালিপ্সো আগে কোনোদিন শোনেনি। ওর নিশ্চিত ধারণা পরের বছর কার্নিভালে এ-গান রোড মার্চ হবেই। কথা বলতে-বলতে সে হাওয়ায় হাত ছুঁড়ে দিলো, সেই হাত গিয়ে লাগলো রহমতের হাতে আর রহমতের হাতের ছুঁচ ওর আঙুলে বিঁধে গেলো।

রহমত হাতের আঙুল মুখে দিয়ে চুষতে লাগলো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সহকর্মীকে খিস্তি করলো কেন সে চুপ ক'রে থাকে না। "ছুঁচের খোঁচায় শালা

আঙ্গুলটাই গেলো।" "তাতে হয়েছে কি? ছুঁচ ফুটতেই তুমি মরে যাচ্ছো?" লোকটি বললো।

দারুণ তর্ক শুরু হ'য়ে গেলো। ওরা রেজর ব্লেডের ক্যালিপ্‌সোর কথা ভুলে গিয়ে কী ক'রে পিন ও ছুঁচ থেকে রক্ত দূষিত হয় তাই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলো।

ভালো কথা, ক্যালিপ্‌সোর ব্যাপারে কোনো-কিছু লিখে রাখবার নেই। রেজর ব্লেড গানের কথা ও সুর মনে মনে ধ'রে রাখে—ব্যস্। এ ভাবেই একটা ক্যালিপ্‌সোরা জন্ম নেয়, ধীরে ধীরে কোনো হৈ-চৈ না করে। এভাবেই জন্ম নিয়েছে সব বিখ্যাত ক্যালিপ্‌সো—"ইয়েস, আই ক্যাচ্ হিম লাস্ট নাইট," এবং "দ্যাট ইজ্ এ থিং আই ক্যান ডু এনিটাইম এনিহোয়্যার," এবং "ওল্ড লেডি ইয়োর রুমারস্ ফলিং ডাউন" ঐ রহমতের সেলাই-র দোকানের পেছনে।

পিন ও ছুঁচ নিয়ে মস্তো তর্কের পর রহমত ও তার সহকারী ফিরে গেলো একটা স্যুটের কাজ শেষ করতে, কারণ লোকটা সন্ধ্যেবেলা আসবে ওটা নেবার জন্য।

এবার রেজর ব্লেড ভাবছে ওয়ান ফুটকে বলবে ওকে এক শিলিং ধার দেবার জন্য, কিন্তু বুঝতে পারছে না ঠিক কী ভাবে বলবে—কারণ, ওর কাছে আগে থেকেই ধার রয়েছে। সুতরাং মিষ্টি কথা দিয়ে শুরু করে ক্যালিপ্‌সোর জন্য ওয়ান ফুট যে সুর দেয় তার প্রশংসা দিয়ে। এত মধুর সুর নাকি সে এর আগে আর শোনে নি।

কিন্তু যেই সে বলতে শুরু করে, অমনি বুড়ো ওয়ান ফুট হুঁশিয়ার হ'য়ে যায় এবং বলে, "ঈশ্বরের দোহাই, আমায় বোকা বানাবার চেষ্টা করো না।"

রেজর ব্লেড তাড়াহুড়ো করে না, কারণ ওর পেট এখন ভর্তি। কিন্তু কিছু ধার পাবার জন্য ওয়ান ফুটকে বোকা বানাতে গিয়ে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়।

ও ওয়ান ফুটকে বলতে লাগলো কী ক'রে দিনটা কেটেছে। কী ক'রে পার্ক স্ট্রীটে জুতো সরিয়েছে দোকান থেকে এবং কিচ্ছু খরচা না ক'রে কী ক'রে একপেট খেয়েছে।

ওয়ান ফুট বললে: "আমি বাজি ধরছি তুমি বিপদে পড়বে। তোমরা বড্ডো বেশি ঝুঁকি নাও, হ্যাঁ।"

রেজর ব্লেড বললো : "ওটা হাতে চুমু খাবার মতোই সহজ। তুমি ও রকম বলছো কারণ তোমার একটা পা নিয়ে ছুটতে পারো না ব'লে।"

ওয়ান ফুট বলে : "আমার পা নিয়ে কোনো ঠাট্টা নয়।" রেজর ব্লেড বলে : "শোনো, তুমি একটা আস্ত গাধা! তুমি ও আমি মিলে টাকা রোজগারের ফন্দি বার করতে পারি। চেষ্টা করলে তুমিও একটা বড়ো চোর হ'তে পারো।"

"চোর তুমি, আমি নই।"

"কিন্তু ওয়ান ফুট শোনো," রেজর ব্লেড নিচু গলায় বলে, "আমি সব কিছুই করতে পারি, কিন্তু তোমাকে বলছি পাহারায় থাকতে, দেখতে কেউ আসে কিনা।"

"তোমার ফন্দিটা কি বলোতো ?"

সত্যি বলতে কি বুড়ো ব্লেড-এর মাথায় আগে থেকে ঠিক করা কোনো কিছু ছিলো না। যেটা সে ভাবছিলো তা হ'লো একটা বড়ো ধরনের চুরি যাতে পয়সা হবে। একটা ছবিতে দেখা স্পেন্সার ট্রাসির মতো ক'রে মাথা ও কান চুলকে বললো : "সেণ্ট জেমস্-এ রক্সি থিয়েটারটা কেমন ?"

কথা বলার সময় সারা শরীরে উত্তেজনা, যেন ঢেউ উঠছে। ও ওয়ান ফুটের হাত ধরে আছে।

ওয়ান ফুট বললো : "এমন দিন হোক যখন সত্যিই তোমার মেজাজ খুলে যাবে। এমন দিনের কথা কোনোদিন ভাবিনি যখন আমার বন্ধু রেজর ব্লেডকে দেখবো চুরি করতে। ওহে, একদিন তুমি ধরা পড়ে যাবে। ক্যালিপ্‌সোর সময় আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নিচ্ছোনা কেন ?"

"চেষ্টা করেছি অনেক, একটা কাজও জোটেনি।"

"তুমি যে চোর নও, একদিন নির্ঘাত ধরা প'ড়ে যাবে বলছি।"

"কিন্তু দ্যাখো আমি কীভাবে জুতো জোড়া নিয়ে এবং খাবার খেয়ে সটকে পড়েছি! আমি বলছি তোমাকে শুধু সাহস সঞ্চয় করতে হবে, আর কিছু নয়। তাহলে খুন করেও ছাড়া পেয়ে যাবে।" ওয়ান ফুট গুনগুন ক'রে একটা পুরনো ক্যালিপ্‌সো গাইতে লাগলো :

"কারো যদি থাকে অনেক টাকা
খুনী হলেও যায় না ধরে রাখা,
তার ওঠা বসা গবর্নরের সঙ্গে…"

রেজর ব্লেড বিরক্ত বোধ করতে লাগলো। "তাহলে ব্যাপার তোমার পছন্দ নয়? তুমি ভাবছো আমি বেরিয়ে যেতে পারবো না।" "তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তুমি একটা নবিশ। অপরাধ ক'রে লাভ হয় না কিছুই।"

"তুমি এক নম্বরের ভীতু!"

"আমাদের ক্যালিপ্‌সোনিয়ানদের একটা মর্যাদা আছে।"

"মরোগে যাও! তুমি আমায় সাহায্য না করলে আমি নিজেই করবো। শুধু চেয়ে দ্যাখো! আর আমি ছোটো জিনিস হাতাইনে, বড়ো দাঁওই মারি! নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গেলে, আমি জানি, অনেক টাকা করতে পারি: খুচরো ব্যাপারে আমি ··" চলতে-চলতে ভাবতে-ভাবতে সে কুইনস পার্ক সাভানায় এসে পড়লো। দেখলো এক বুড়ি কমলালেবু বেচছে। ও যেন রোদ্দুরে ঘুমোচ্ছে এমনভাবে এক হাতের ওপর থুতনি রেখে মাথা নিচু ক'রে বসে ছিলো। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাচ্ছে। রেজর ব্লেড অবস্থাটা দেখে নিলো পলকে।

ও ক্ষেপে গেলো ডালা থেকে একটা লেবু নিয়ে কেটে পড়তে, লোককে দেখাতে যে সে এটা পারে। পাশ দিয়ে চলে যাও, নিচে ডালার দিকে তাকিও না—শুধু একটা তুলে নিয়ে সোজা হেঁটে যাও পকেটে পুরে।

আহা, ওয়ান ফুট এখন থাকলে দেখতে পেতো কাজটা করা কতো সহজ!

কিন্তু লেবুটা সবে পকেটে ফেলেছে অমনি বুড়ি লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলো: "চোর, চোর! লোকটা একটা লেবু চুরি করে পালাচ্ছে! পাকড়াও ওকে! ধরে ফ্যালো!"

মনে হ'লো ঐ চিৎকার আর চেঁচামেচি ওর শরীরে সাঁড়াশী চালিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যা-কিছু ভাবছিলো সব ভুলে গিয়ে সাভানা দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। সে পেছন ফিরে দেখলো তিনজন লোক তাড়া ক'রে আসছে। মনে হলো ও কিছুই অনুভব করছে না, ও দৌড়চ্ছে না, ও যেন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শরীরের ভেতরে সাঁড়াশী চলছে ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌ ক'রে আর ও হাঁপাচ্ছে: হে ভগবান! হে ভগবান!

"নেই।"

"ঠিক আছে গুরুদেব, আমি বলছি না আপনার কোনো বিপদ হোক।"

"বুঝলে হে ওয়ান ফুট, তোমার মুশকিল হচ্ছে তোমার একটা মাত্র পা, এবং তুমি আমার মতো ভাবতে পারো না।"

ওয়ান ফুট রেগে গেলো। বললো: "শোনো, আমার পা নিয়ে কোনো

ঠাট্টা নয়, বুঝলে? ও-মশকরা আমি বরদাস্ত করবো না। আমার বাবা-মাকে তুমি শাপান্ত করতে পারো, কিন্তু পা নিয়ে একটি কথাও নয়।"

রেজর ব্লেড দমে না। "দুঃখিত ওয়ান ফুট। আমি জানি তুমি ঠাট্টা একদম সহ্য করতে পারো না।"

এ সময় রহমত ভেতর থেকে ডেকে জিগেস করলো ওরা এতো শোর জমিয়েছে কেন, নাকি ওরা মাছের বাজারে রয়েছে।

অতএব ওদের কথা শেষ হলো। রেজর ব্লেড বললো পরে এক সময় ও ওয়ান ফুট-এর সঙ্গে দেখা করবে। আর ওয়ান ফুট বললো: "ঠিক হ্যায়, ভাই, গানের কথাগুলো ভুলোনা। আর তোমায় আমি শেষ বারের মতো সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঝামেলায় পড়ো না।"

কিন্তু দোকান ছাড়ার মুহূর্তের মধ্যেই রেজর ব্লেড ভাবতে শুরু করলো এই বড়ো কাজটা করা কতো সহজ। সে একাই করবে এবং বন্দুক পিস্তল ছাড়াই।

ওয়ান ফুট বলেছে ও নবিশ—ভাবা যায় না! শুধু দরকার নির্বিকার মুখ, ভাবলেশহীন মুখ। যেন তুমি এক সাধুসন্ত পুরুষ, যেন শিশুর মতো নিষ্পাপ তোমার আকৃতি। আর কেউ যদি তোমায় কিছু জিগেস করে অমনি কপালে চোখ তুলে আকাশে হাত ছুঁড়ে বলবে: "হা ঈশ্বর, কার কথা বলছো, আমি?"

অনুবাদ: সিদ্ধান্ত দাশগুপ্ত

রংরুট

কিং ফিশ একরকম লড়াকু মাছ যার পাক খাওয়ার গতিতেই তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তোমার বাহু সমান লম্বা মাছটা বঁড়শি পর্যন্ত চ'লে যায় সড়সড়িয়ে, জলের মধ্যে ঘুষি কষায় তার ছায়াটা। মাঝে-মাঝে এই মাছটা ওয়াহু মাছের মতো ধাক্কা মারে, মাথায় একটা ঠোক্কর আর ব্যস, বঁড়শিটা ঢুকে যায় মুখের ভেতর। জোর দেবার জন্য ঝুলিয়ে দেয় সে চোয়ালদুটো আর শিরদাঁড়ার একটা ঝটকাতেই সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে সুতোটা। যখন বঁড়শি থাকে তার মুখে, সে হয়ে ওঠে এক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, সমুদ্র যাকে ক'রে তুলেছে নরম, চিক্কণ, তার আর কোনো জুড়ি নেই, আর তাই তাকে পেয়ে হারাবার মতো দুঃখ আর কিছু নেই।

জ্যামেকার মেয়ে টিনা একটা ছিপ দিয়েছে কেনেডি নামে মার্কিনটিকে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে কিছুই ঘটলো না। আর তারপর এলো একটা বড়ো মাছ, তার বঁড়শিতে ঠোক্কর খেলো আর চিংড়ির টোপটার মিষ্টি রস চাখতে-চাখতে সে সেটাকে টেনে নিয়ে গেলো বটে তিরিশ ফিট, কিন্তু সেটাকে নিয়ে আর কিছুই করলে না। মাঝে-মাঝে সে বেশ রসিক খাইয়ে হ'য়ে যায়।

কেনেডির চীৎকার শুনে টিনার নাবিক টাই ব্রুকস ছই-এর বাইরে এসে হাত দিয়ে ধ'রে দেখলো ছিপটা। অস্ফুটভাবে চেঁচিয়ে উঠলো টাই ব্রুকস, এ হেন সৌভাগ্য তার যেন বিশ্বাস হ'তেই চাইছে না।

'ব্যাপার কী টাই?' টিনা বললে। 'এ যে একেবারে দেবদূতদের ভোজ', সশব্দে ফিশফিশ ক'রে বললে টাই ব্রুকস্।

ছোট্ট মাছধরা নৌকোটার জালের কাছে বসেছিলো মেয়েটি। মার্কিন ছোকরাটি যে ছিপে একটা মাছ গাঁথতে পেরেছে তাতে সে খুশি হ'লো। মার্কিনরা এখানে বেড়াতে আসে, তারা অচেনা। কেউ-কেউ ছ-মাসও থাকতে আসে, তবু তারা অচেনাই ফিরে যায়। এরা অনেকটা সে-রকম প্রতিবেশী, যার সম্বন্ধে কচিৎ কিছু জানা যায়; কিন্তু যার সঙ্গে এক নৌকোয়

ব'সে তুমি মাছ ধরেছো সে তো আর তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

'অত তাড়া নেই, বিদেশী,' বললে টিনা।

'বড়ো বাড়ির ভোজ টেবিলেরই যোগ্য এ-মাছ। এ নিশ্চয়ই কোনো পুরুষমাছ না-হয়ে যায় না।' টাই ব্রুক্স আবারও সোৎসাহে চ্যাচালো।

টিনা ওর দিকে ফিরে খুব জোরে মাথা নাড়লো। ওর চোখে যে রূঢ় রসিকতার ঝিলিক, তা টিনার চোখ এড়ায়নি। জ্যামেকার উত্তর উপকূলের জেলেরা তার চেনা। সে নিজেও তো তাদেরই একজন। এটা তো তারই নৌকো।

টাই ব্রুক্স সামনে বাড়ানো ছিপটাকে ছুঁয়ে দেখলো। সৌভাগ্যের এমন সূত্রটাকে আঁকড়ে ধরার ইচ্ছেয় তার আঙুলগুলো হাহাকার ক'রে উঠছে। কিন্তু কোনো ছিপ কেউ ব্যবহার করছে—তাকে কিছুতেই অন্য-কেউ নিতে পারে না: এটাই অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

কেনেডি মোটেই কোনো মৎস্য-শিকারী নয়। নৌকোটায় সে আছে কারণ সে এই গাঁয়ে এসেছিলো আর মেয়েটি তাকে তাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিলো। হঠাৎ এভাবে একেবারে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে নিজেকে আবিষ্কার ক'রে তার যেন অস্বস্তি হচ্ছে; সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে দুর্বলভাবে হাসলো।

'দয়া দেখাও ওকে,' টাই ব্রুক্স উত্তেজনার ঘোরে ফিসফিস করলো। 'সময় নাও, নরম ব্যবহার করো—ভেবে নাও, ও কোনো কুমারী মেয়ে। ওকে কোনো সাজা দিয়ো না। ও একটা বন্ধু মাছ। ওর মধ্যে আমার বাবার আত্মা আছে—আর আমার বাবা ছিলেন পুরুত। ভগবান মৃতের আত্মার সদ্গতি করুন।'

'থামো তো, ভাঁড় কোথাকার!' ঝাঁঝিয়ে উঠলো কেনেডি; হঠাৎ কখন টান-টান সুতো ঢিলে হয়ে যাবে, এই ভয়ে সে ঘেমে উঠেছে। নৌকোয় তার পায়ের কাছে কুণ্ডলি পাকানো সুতোর বাণ্ডিল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, আর সে কতটা সুতো গেছে তার মাপ নিতে চাচ্ছিলো। একটু দোনোমনা ক'রে সে কয়েক ইঞ্চি টেনে গোটালো।

'ওর হাতগুলো ঠিক গোরুর মতো। মাঝি, না কাঁচকলা।' টাই ব্রুক্স

টিনার দিকে তাকিয়ে কাৎরে উঠলো। 'এই আমেরিকান সাহেব একটা অপদার্থ।'

টিনা কঠোর স্বরে বললে, 'ওটা ওরই মাছ, টাই ব্রুক্স।'

'মাছটা সবার জন্যেই। সব বারের মতো এ-বারও সবাই লাভের বখরা পাবে। এটা জেলে ডিভি—মণ্টেগো বে-র আমেরিকান হোটেলগুলোর ফুরফুরে খেলার নৌকো নয়,' টাই ব্রুক্স জানালো।

টাই ব্রুক্স কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কেন ভগবান একেবারে সমুদ্দুরের তলা থেকে একটা কিং ফিশকে তাড়িয়ে এনে এই মার্কিনটার বঁড়শিতে গেঁথে দিয়েছেন, যখন কিনা তার বঁড়শিটায় কোনো মাছই ঠোকরাচ্ছে না। সে কেনেডির আরো কাছে চলে এলো।

মাছটা—তার তো আছে দশ কিলো ওজনের গভীর জলের সপ্রতিভ হাড়, পেশী আর মুখরোচক ভরা শরীর। তার পাখনায় যে বঁড়শি গেঁথে গেছে তা টের পেলো, আর তক্ষুনি ডান দিকে পাক খেলো, তারপরেই বাঁ দিকে, আর এমনি চললো সারাক্ষণ, যতক্ষণ-না বঁড়শিটা তার এইসব মোচড়ে তার গা থেকে খুলে গেলো। কেনেডির হাতের মধ্যে ছিপের সুতো প'ড়ে রইলো নিষ্প্রাণ, আর ছোট, একটা শপথ উচ্চারণ ক'রে কেনেডি তার হতাশা ঢাকলো। রেগে, সে সুতো গোটাতে শুরু ক'রে দিলে, কিন্তু টাই ব্রুক্স যন্ত্রণায় কাৎরে উঠলো :

'না! না! মাছটা সাঁৎরে আবার আমাদের কাছেই আসছে। ও আমাদেরই মাছ, ও চায় না যে তুমি ওকে ধরতে না-পারো। খুব মধুর ভাবে সুতো গোটাও আলগোছে, সাবধানে—যেন ও কোনো কিশোরী মেয়ে।'

কেনেডি হালের কাছে ঠকঠক শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলে টিনা সেই ভারি কাঠের টুকরোটাকে টেনে নামাচ্ছে, তার ভিজে বাহু রোদে চকচক করছে। হালকা দাঁড়টাকে হাতে তুলে নিলো টিনা, গলুইয়ের ওপর দিয়ে জলে নামিয়ে নিলো। দাঁড়ের ফলকে ফিশফিশ ক'রে কী যেন বললে জল, যখন সে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে মাছের চলার পথের দিকে চালিয়ে দিলো। টিনা নৌকোর মধ্যে স্কার্টটা না পরলেই ভালো করতো, মনে-মনে ভাবলো কেনেডি।

'ওহে,' টিনার গলার স্বর ধারালো, 'মাছটার দিকে মন দাও। ও কি টোপটা গিলে ফেলেছে?'

মেয়েটির সুডৌল বাহু আর চিক্কণ কালো মুখে সমুদ্রের আভা মাখানো।

'তা, আমি কী ক'রে জানবো,' কেনেডি একটু চটেই গেলো।

'ও সুতো ধ'রে টান দিয়ে তোমায় ব'লে যাবে,' নৌকোর কিনারে কনুই ঠেকিয়ে, দু-হাতে মুখ রেখে, কষ্টের স্বরে বললে টাই ব্রুক্‌স।

'মাছটাই সুতো ধ'রে টান দেবে। চিংড়ির ল্যাজটা তার গলার পক্ষে বেশি লম্বা ঠেকলে সে খাপ্পা হয়ে যাবে,' বললে টিনা।

'আহা, কী চমৎকার তার গলা,' বললে টাই ব্রুক্‌স। সে তার নিজের বঁড়শির কথা ভুলে গিয়েছে, এখন সে কেনেডির ছিপের কথা ভেবেই দারুণ চিন্তিত। 'আমি ওর গলাটা দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে জলের তলায়। শুধু ঐ গলাটারই ওজন হবে দু-কিলোর বেশি। ও হচ্ছে সমুদ্দুরের সেরা মাছ—আর আমেরিকানটা ওকে বঁড়শিতে গেঁথেছিলোও।'

কেনেডি চেঁচিলে উঠলো, 'তুমি কি চুপ করবে?'

'কাজেই এখন ও সমুদ্রের সেরা মাছটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে ছাড়বে। বোধ হয় আমেরিকানটির কাছ থেকে মাছটাকে আমারই নিয়ে নেয়া উচিত,' বললে টাই ব্রুক্‌স।

'ওর ছিপটায় তুমি হাত দেবে না' বললে টিনা, 'এ নৌকা চলে আমারই হুকুমে, মনে রেখো।'

'নৌকো চলে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের হুকুমে,' জানালো টাই ব্রুক্‌স।

'একটা মাছ আর কী এমন? ওকে আমরা ছেড়েও দিতে পারি,' বললে টিনা।

'তাহ'লে আর কী, মুখটা থেকে বঁড়শিটা খুলে দাও,' ঘ্যানঘ্যান করলো টাই ব্রুক্‌স।

টিনা আপন মনেই বললে, 'মোদ্দা কারণটা কি, না আমেরিকানটি চেয়েছিলো সময় হবার আগেই মাছটার সঙ্গে লড়াই বাধাতে। টোপ গেলবার পর যে মাছটার পেট কামড়াবে, ততটুকুও তার তর সয়নি। সুতো যদি আমার হাতে থাকতো, তবে আমি মাছটাকে এমনভাবে খেলাতুম যে শেষটায় ও ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে মিনতি করতো ক্ষান্ত দিতে, অনুনয় করতো ওকে নৌকোয় টেনে তুলতে। আর সুতো কি না এমন শক্ত ছিলো। আমিতো ওর সঙ্গে এমন খেলতুম যে ও একেবারে জেরবার হ'য়ে যেতো, আমার পায়ের আঙুলে অব্দি যতটুকু লড়ায়ের শক্তি আছে, তাও ওর আর থাকতো না।'

কাঠের তৈরি নিচু ডিঙিটা তরতর করে ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রে। সুতো লাফিয়ে উঠলো, কেনেডির হাত থেকে সরসর করে বেরিয়ে এলো।

'টোপ গিলেছে,' বললে টিনা। সুতোয় টান দিতেই ওদিককার লড়াকু ওজনটা মালুম হ'লো কেনেডির। 'এবারে পৃথিবীতে শুধু দুজন লোক—তুমি আর ঐ মাছটা। কিন্তু তোমাদের একজন খচ্চর হ'য়ে যাবে। আর খচ্চরটা মরবে,' বললে টাই ব্রুক্‌স।

'কী ভ্যাজর-ভ্যাজর করছো?' বললে কেনেডি। তার আঙুলে যে কাঁপুনি ধরেছে, সেটা কারু চোখে পড়বে না ব'লে সে আশা করছিলো। মাছ ধরাকে লোকে কিনা খেলা বলে, মজার ব্যাপার ভাবে—অথচ এটাতো মোটেই তা নয়, এ একেবারে বুকভাঙা কাণ্ড। না, ওকে ঠাণ্ডা মাথায় লড়তে হবে। আড়চোখে তাকিয়ে সে মন্টেগো বে-র হোটেলগুলোর লাল আর গোলাপি রং দেখতে পেলে।

'তীরের এতো কাছে এ যে একটা বড়োমাছের কামড়, তাই না?' মাথাটা পুরো ঘুরিয়ে সে বললে টিনাকে।

টিনা সাবধান করে দিলে, 'মাছের ওপর থেকে চোখ সরিয়ো না।'

'উনি এক মহা তালেবর ব্যক্তি। উনি না-তাকিয়েই মাছ ধরতে পারেন, হাতে লাগাম না-ধ'রে ঘোড়া ছোটাবার মতো আর কী,' অমনি ফোড়ন কাটলো টাই ব্রুক্‌স।

কেনেডি তার দিকে ফিরে বললে, 'তা চাঁদু, খচ্চর সম্বন্ধে তখন কী ফ্যাচফ্যাচ করছিলে?'

'মাছ যদি খচ্চরের মতো হয়ে পড়ে, বঁড়শির সঙ্গে লড়তে চায়, তাহ'লে কাবু হ'য়ে গিয়ে কাবার হবে। আর তুমি যদি খচ্চর ব'নে যাও, তো জোরে সুতো ধরে টান দেবে—আর সুতো ছিঁড়ে যাবে, আর মাছটাকে তুমি খোয়াবে।'

'তো তাতে আমার ম'রে যাবার কী হ'লো? তুমি তো বললে যে খচ্চর মরবেই।'

'যখন মাছটা টের পাবে যে সুতো ছিঁড়ছে, অমনি সটান ফিরে এসে তোমায় গিলে খাবে,' বুঝিয়ে দিলো টাই ব্রুক্‌স।

কেনেডি সহজভাবে খুকখুক ক'রে হেসে উঠে তার ছিপের দিকে ফিরলো। সমুদ্রে জলজলে হলদে আর নীলের ঝিলিক। সে আশা করছিলো মাছটা ঝোঁকের বশে এমন-কিছু ক'রে বসবে না যাতে তাকে সত্যিকার মৎস্য শিকারীর মতো কেরামতি দেখাতে হয়। এতক্ষণ অব্দি ব্যাপারটা প্রায় ঘুড়ি ওড়াবার

মতোই লাগছে। অবশ্য ভেতরে-ভেতরে তার ঘেমে ওঠাটা বাদ দিলো।

'একদা আমি এক মৎস্য হারাইয়াছিলাম এবং উহা আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল,' জলের দিকে তাকিয়ে টাই ক্রুক্স বললে। 'সেই রজনীতে আমি ছিলাম হালধারী আর সে ছিল তরোয়াল মাছ। গলুইয়ের উপর তরোয়াল মাছ তাহার সুবৃহৎ তরবারিটা উঁচাইয়া বলিয়াছিল :

"নৌকা থামাও!"

'আমি বলিয়াছিলাম, "কেন থামাইব, তরোয়াল মাছবাবু?"

'সে কহিয়াছিল, "নৌকা থামাইতেই হইবে, কেননা যে-ব্যক্তি আমাকে হারাইয়াছিল, আমি তাহারই খোঁজে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

'তখন আমি বলিলাম, "তরোয়াল মাছবাবু, আপনি জানেন ইহা কাহার নৌকা?"

'অমনি সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "নৌকা কাহার, তাহাতে আমার কী আসিয়া যায়? আমি যখন বঁড়শিবিদ্ধ, তখন নৌকা চলে আমারই আদেশে। উপরন্তু আমি সমুদ্রতলে হলফ করিয়া কহিয়াছিলাম যে যদি আমি বঁড়শিটাকে কোনোক্রমে ছাড়াইতে পারি, তবে আমি যে-ব্যক্তি আমাকে ধরিতে পারে নাই তাহার উদ্দেশে ফিরিয়া আসিয়া নৌকার দখলদারি লইব।"

'তা, তখন আমি কহিলাম, "এই নৌকা এক মার্কিনের—সে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।"

'শুনিয়া তরোয়াল মাছ লম্ফ দিয়া উঠিল, কহিল, "অ্যাঁ?" আর পরক্ষণেই এমন ক্ষিপ্রগতিতে পিঠটান দিল, যেন শত-শত বাঘা হাঙর তাহাকে তাড়া করিয়াছে—কারণ তরোয়াল মাছ হাঙরকে বিষম ভয় করে। তবে ইহা কি জানেন সে ভ্রমণকারীদের ভয় পায় কেন?'

'না, জানি না,' বললে কেনেডি, 'কেন?'

'কারণ ভ্রমণকারী তাহাকে আবার বঁড়শিতে গাঁথিবে এবং আবার তাহাকে খোয়াইবে—হয়তো অনেকবার। আর প্রতিবারই বিদ্ধ হইবার পর বঁড়শি তাহাকে যাহা করে, তাহা সে কায়মনোবাক্যে অপছন্দ করে,' বললে টাই ক্রুক্স।

'ঠিক আছে, এবার ক্ষমা দাও,' বললে কেনেডি। টিনার দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপলো।

এই লোকটার মধ্যে আবার ষাঁড়ের রাগ আছে, আপন মনে বললে টিনা। কিন্তু লোকে আবার তিড়িংবিড়িং লাফায়ও। এদিকে তো মোটেই মাছশিকারী নয়, কিন্তু আশা ক'রে আছে যে এই অভিযানটাকে এক দোল-কেদারা বানিয়ে নিয়ে সে আমাদের বোকা বোঝাবে যে আসলে সে এক মহা ওস্তাদ।

মাছটা জলের ঝাপটা ছিটিয়ে লাফ দিলে, আর অমনি টাই ব্রুক্‌স শপথ ক'রে বললে যে মাছটাকে সে চিনতে পেরেছে। এটা তার চেনা এক বুড়ো কিংফিশ, দারুণ লড়াকু, এমন কি জলের ওপরেই লড়াই করতে ভালোবাসে।

'তুমি যদি ওর মাথা ধ'রে টান দাও, তো মাছটাকে বঁড়শিতে রেখেই ও চ'লে যাবে। ও দারুণ তাজা মাছ' টাই ব্রুক্‌স সাবধান করে দিলে।

'আহা! ওকেই মাছটা ধরতে দাও না,' বললে টিনা।

সুতোটা না ধরলে কী হবে, কেনেডির সঙ্গে সঙ্গে টাই ব্রুক্‌সও মাছটাকে হয়রান করে তুলছিলো। হাত দিয়ে নানারকম ইশারা করছিলো সে কী করতে হবে, মাছটা ঝাঁপ খেলেই কুঁজো হয়ে বসে পড়ছিলো নৌকার খোলে, আর মাছটা যখন হাওয়ায় দাপাচ্ছে সে তার মাথাটা এতটাই বাড়িয়ে দিচ্ছিলো যে তার গলাটাই বুঝি ছিঁড়ে যায়। মাছটা যখন জলের ওপর দাপাদাপি করছে, টাই ব্রুক্‌স তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো মার্কিনটির দ্বিধায় ভরা ভঙ্গি, আর দেখে খুকখুক করে হাসছিলো। এই বিদেশী মোটেই কোনো মাছ শিকারী নয়।

কেনেডিকে সে জিগেস করলো, 'মাছ কেন অমন করে, তা জানো?'

'তুমি ওকে তাকিয়ে দেখছো টের পেয়ে ও ওর নানারকম কারদানি দেখায়,' কেনেডি গম্ভীরমুখে রসিকতা করলো।

'ও ভাবে যে, যদি ও হাওয়া বেয়ে নিজেকে ওভাবে সাজা দেয়, তাহ'লেই ওর পেটের ঐ অদ্ভুত অসুখটা সেরে যাবে। আমরা জেলেরা বলি ও ওষুধ খাচ্ছে,' টাই ব্রুক্‌স বুঝিয়ে বললে।

'লোকটা তো ভালোই লড়ছে মাছটার সঙ্গে,' টিনা বললে।

'আঃ, আমাকে অনুমতি দাও না, আমেরিকানটকে একটু সাহায্য করি,' টাই ব্রুক্‌স বেদম বিতৃষ্ণায় ব'লে উঠলো। এই সব সাদা পেটের বিদেশীগুলো থেকে এইতো খানিকটা মজা নিঙড়ে নেবার সুযোগ। এই ভিনদেশীগুলো

যতো ভাবে রোদের মধ্যে শুয়ে থাকে—বেলাভূমিকে বানিয়ে তোলে কসাই-খানা, মাংসের আড়ত। মাছটা কখন হয়রান হ'য়ে গেছে, টিনা বুঝতে পারলে, কারণ মাছ এখন আর ততটা লাফাচ্ছে না হাওয়ায়। টাই ব্রুক্‌সের চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারলে কেনেডি; জেলেটির হাতের কোঁচটা তার নজরে পড়লো এক ঝলক। টাই ব্রুক্‌সের দিকে তাকিয়ে সে গরগর করলে—যা করতে হবে, তা সে একাই করবে, সে অন্য কারও কোনো সাহায্য চায় না।

লড়াইক্ষ্যাপা মাছটা তার যুদ্ধের পরিধি কমিয়ে এনেছে। কেমন শ্লথ ভাবে সে লড়ছে এখন: তাকে খতম করবার জন্য যে বঁড়শিটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তারই ওপর ভর দিয়ে সে মাঝে-মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে। সমুদ্রের আস্তরের তলায় কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্ছে, টিনা তার সব খুঁটিনাটিই জানে। মাছটার জন্যে তার মনে কোনো দুঃখ নেই। আসলে এই শিকারীই যেন বঁড়শিতে গেঁথে গিলেছে। তার চোখে জয়ের গর্ব। একটা ছোট্ট ঢেউ হঠাৎ টিনার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গেলো। টিনা বৈঠা চালিয়ে নৌকোটা ঘুরিয়ে আনলো; মাছটাকে টেনে তোলবার জন্যে কেনেডিকে একটা কাঠের টুকরো দিলে সে। মস্ত মাথাটা উঁচিয়ে আছে জল থেকে, অবাধ্য এক টাট্টুর মতো ছুটছে বঁড়শির সঙ্গে। প্রবল শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেলো আর সেটা আছড়ে পড়লো জলে। কেনেডির হাত হুড়মুড় ক'রে স্থতো গোটাতে শুরু করে দিলো। তার কব্জির ব্যথা এখন কেমন মধুর ঠেকছে।

'না,' টিনা বললে আস্তে।

'না', হাঁক পাড়লে টাই ব্রুক্‌স।

কেনেডির হাত কিন্তু সানন্দ তাড়ায় সাগ্রহে গুটিয়ে আনছে স্থতো। স্থতোর রান সে আঁকড়ে ধরলো, তার ঠোঁটদুটি খোলা, মাথার মধ্যে খুশির তীব্র স্বর। টাই ব্রুক্‌স তার হাত থেকে স্থতো ছিনিয়ে আনতে চাইলে, আর কেনেডি কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলে তাকে, তড়াক করে সরেও গেলো।

স্থতো ছিঁড়ে গেলো।

বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো টাই ব্রুক্‌স ছেড়ে গেলো নৌকো, তার হাত দুটো অন্ধের মতো হাৎড়ালো জল, যখন সে জল ছুঁলো। ঢেউ স্থতোটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে, আর টাই ব্রুক্‌স স্থতোটা ধরতে পারলো না।

টাই ব্রুক্‌স আবার উঠে এলো নৌকোয়, মাথা গুঁজে ব'সে রইলো।

আবার জলের ঝাপটা লাগলো টিনার মুখে-চোখে; সে বাঁশের খুঁটির ওপর গুটিয়ে রাখা পাল ক'টাকে টান-টান ক'রে মেলে দিলে। তীরে ফিরে যাবার জন্যে টিনা এবার ছোট্ট কোনো হাওয়াকে ধরবে।

'যে মাছটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, আমি তার দাম দেবো,' বললে কেনেডি।

টাই ব্রুক্‌স এগিয়ে গিয়ে পালটা তুলে ধরলো। বাঁশের মাস্তুলটা ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো মরা মাছটা ভেসে চ'লে গেলো দূরে। টিনাও দেখলো একবার, তারপরেই চোখ ফিরিয়ে নিলে। কেনেডি সেটা দেখতে পেল।

'যে-মাছটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, আমি তার দাম দেবো,' আবার বললে কেনেডি।

পালে হাওয়া লাগলো, নৌকো হুড়মুড় ন'ড়ে উঠলো। মরা মাছটার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো তারা, তারপরেই সমুদ্র ফাঁকা হয়ে গেলো।

'ওটা তো আমারই মাছ। আমারই তো ক্ষতি,' রেগে চেঁচিয়ে উঠলো কেনেডি।

'ক্ষতি হলো এই নৌকোর', টিনা বললে।

'আগে তো তোমরা সে-কথা বলোনি,' বললে কেনেডি।

যখন বঁড়শিতে গেঁথেছিলে, তখন মাছটা তোমার ছিলো। আমাদের দু-পয়সা লাভ হোক, এটা তখন তোমার ক্ষমতার মধ্যে ছিলো। এখন যখন তুমি ওটাকে খোয়ালে, এটা নৌকোরই ক্ষতি,' তরুণীটি বললে।

তারা ভেসে চললো। একটু পরেই তারা শুনতে পেলো মণ্টেগো বে-র বেলা-ভূমির হোটেলগুলোয় মার্কিন ভ্রমণকারীদের হাসির রোল।

'আমি জেলে নই,' বললে কেনেডি।

'আগে তুমি নিছক ভ্রমণকারী ছিলে, কিন্তু যেই একবার হাতে ছিপ ধরেছো, তুমি হয়ে উঠেছো জেলে,' বললে টিনা, 'এটা মাছধরার নৌকো।'

কেনেডি মেয়েটির দিকে তাকালে; তার নবোদ্ভিন্ন সৌন্দর্যের প্রায় সবটাই তার চোখে পড়ছিলো। মেয়েটি নৌকোর মধ্যে স্কার্ট না-পরলেই ভালো করতো।

'কাল আমি আবার তোমার নৌকো ভাড়া নেবো। আমি মাছধরা শিখতে চাই।'

টিনা ভাবলে সে তাকে নৌকোটা ভাড়া দেবে—এমনি রাগ ক'রে তো কোনো লাভ নেই। লোককে তো শিখতে হয় মাছ ধরা, যেমন ক'রে লোকে

শেখে কাঠচেরাই, বা জুতো বানানো, বা ইঞ্জিন সারানো, যা-কিছু। কিন্তু একটা ব্যাপারে টিনা খুশি ; কেন তারা মরা মাছটিকে জল থেকে তুলে নেয়নি, এ-কথা সে জিগেস করেনি। অন্তত এটা সে জানে যে নৌকোর মধ্যে জ্যান্ত আসতে দিতে হয় মাছকে। ও মাছ ধরতে শিখে ফেলবে একদিন।

অনুবাদ : স্বাতী ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এডগার মিটলহোলজার

তাকামা

তাকামা যেন কেমন অগোছালো আর দলছুট।

ফেব্রুয়ারির সেই দিনটিতে 'কোরিয়াল'টা যখন তীরে এসে ঠেকলো, আমি নেমে দাঁড়িয়ে চার্লসকে বললাম যে আমি একটু ভেতরে ঢুকে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে চাই।'

বললাম, 'এ-ই জায়গাটা আমার বেশ মনে ধরেছে।'

সে আমায় হাত নেড়ে বিদায় জানালে।

'আমার সঙ্গে আসছো না তাহ'লে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি বরং এখানেই শুয়ে একটু আলসেমি করবো। ছুটি তো বিশ্রামের জন্যই—এই কাঠফাটা রোদে ঘুরে-ঘুরে সান-স্ট্রোক্ বাধাবার জন্য নয়।'

আমি তাকে বললাম,. 'আমি পাঁচ মিনিটও নেবো না।'

মাছির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মাথাটা একটা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে জলের ধারে একটা জংলি কোকো গাছের তলায় টান হ'য়ে শুয়ে পড়লো চার্লস্।

'পিটার, রাস্তাটা খেয়াল রেখো।' তোয়ালেটা একটু তুলে আমায় ডেকে সে সাবধান ক'রে দিলে।

বালির মধ্য দিয়ে থপথপ ক'রে হাঁটতে শুরু করে আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, 'দিক সম্পর্কে আমার ধারণা চমৎকার', যদি ভেবে থাকো যে আমি পথ হারিয়ে ফেলবো, তবে বলি আমার সে-ভয় নেই।'

'কোরাল'-এর পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা উঠে গেছে সেটা বেশ স্পষ্ট। নেহাৎ কৌতূহল বশেই আমি সেটা ধ'রে এগিয়ে চললাম ; কিছুদূর যাবার পর আমি দেখতে পেলাম যে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে। ওই রাস্তাটা ধ'রে আমার আর যাবার ইচ্ছে ছিলো না। বরং আমায় টানছিলো জঙ্গলটা। আমি জঙ্গল ভালোবাসি।

বালির ওপর সবখানেই জীবজন্তু আর মানুষের পায়ের ছাপ; কয়েক সপ্তাহ কোনো বৃষ্টি না-হওয়ায় ওগুলো ধুয়ে যায়নি।

রাস্তার বাঁ ধারে একটা তেড়াবেঁকা গাছ আমার নজর কাড়লো। একেবারে আগায় ছাড়া গাছটার আর কোথাও কোনো পাতা নেই, যেন ধীরে ধীরে খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কচি মোরা গাছের মতো দেখতে। যেন মৃত্যুতৃষ্ণায় আমার দিকে তাকিয়ে একটা ধূসর হাসি হাসছে; গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমার মনে হ'লো যে বালির মধ্য থেকে যে-তাপ উঠে আসছে তাতে ক্রমেই সেটা নেতিয়ে যাচ্ছে।

আমি দাঁড়িয়ে প'ড়ে মিনিট খানেকের জন্য তাপটা পরীক্ষা করলাম। তরল রেশমের মতো তাপটা আমার চারদিকে পাক দিয়ে-দিয়ে উঠছে।

গাছটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তেড়াবেঁকা একটা গাছ, আগেই বলেছি। একটা গাছ—যেটা মৃত্যুর ফাঁদে প'ড়ে গেছে আমি ভাবলাম।

ভাবনাটা আমার মনকে কেমন দমিয়ে দিলো। এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে যেন সময় থমকে গেছে…কেন মরণফাঁদে জড়ালো? কি সে? ঢেউয়ের? …গাছের মাথায় হাওয়া ঢেউয়ের আছড়ানির মতোই শব্দ করে…কান পাতলেই শুনতে পাবে যে ঢেউ এগিয়ে আসছে—তুমি হয়তো বৃষ্টি ব'লে ভুল করবে…কিন্তু আসলে এ শুধু হাওয়া…।

নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোরটা থেকে জেগে উঠলাম আমি, এগিয়ে গেলাম গাছটার দিকে। আমার খালি মাথার ওপর কড়া রোদ। কোনো পেতলে তৈরি প্রেত যেন অলুক্ষুণে ভাবে জোর ক'রে আমার চুল ছেঁটে দিচ্ছে।

পিঁপড়েগুলো গাছটার সরু, শুকনো গুঁড়িটা বেয়ে-বেয়ে উঠছে, বড়ো-বড়ো কালো পিঁপড়েদের এক লম্বা বাহিনী। তাদেরই একটি থেমে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো—সাবধানী, সজাগ। যেন সংকেত দিচ্ছে। যেন একরত্তি কেউ সংকেত পাঠাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য অন্য পিঁপড়েগুলো এটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। হঠাৎ এ-পিঁপড়েটাও চলতে শুরু করলো; ওর নিশ্চয়ই মনে হয়েছে যে মনুষ্যজাতির নিছক একটা দৃষ্টান্ত যতটা মনোযোগ দাবি করে তার চেয়ে ও আমার অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলেছে।

পিঁপড়েগুলোকে তাকিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে কালো বুনো পিঁপড়ে। সমুদ্রের উপকূলে এইরকম পিঁপড়ে নেই।

পিঁপড়েদের নিয়ে ভাবছিলায় আমি। ওরা নাকি বুদ্ধিমান প্রাণী। বিজ্ঞান এও ইঙ্গিত দিয়েছে যে ওরা নাকি নিজেদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। যে এই কালো পিঁপড়েগুলো পাতার টুকরোয় লেখা তাদের জাতির ইতিহাস যে সেটা মাটির তলায় জমিয়ে রাখেনি তা কে বলতে পারে? যার খোঁজ কেবলমাত্র তারাই জানে। হ'তে কি পারে না যে এদের পূর্বপুরুষেরা ১৭৬৩-র কোনো দুর্ভাগা ওলন্দাজ আবাদকারীকে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলো। যাকে ক্রীতদাসদের একটি দল অনুসরণ করে শেষে কুপিয়ে মারে। এই সাদা বালির তলায় হারিয়ে-যাওয়া মাটির নীচের ছোটো ছোটো ভাঁড়ারে হয়তো এরা ধ'রে রেখেছিলো গরীয়ান দাসবিদ্রোহের সেইসব দলিল যা রডওয়ের ব্রিটিশ গিয়ানার ইতিহাস বইয়ের চেয়েও ঢের দামী। পিঁপড়েদের কথা কিছু বলা যায় না।

এই অদ্ভুত খেয়ালের বশেই শেষটায় আমি আবিষ্কার ক'রে ফেললাম কোত্থেকে তারা আসছে।

দেখলাম যে, তারা বালি থেকে গাছের গুঁড়িটায় উঠছে। পিঁপড়ের সারি না ভেঙে দিয়ে আমি পাশটায় সরে এসে দেখলাম যে সারিটা গেছে একটা সুইজল্-স্টিক্ গাছের ঝাড় অব্দি। আমি পাতাঝাড়টার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। খুব একটা ঘন বা নিবিড় নয় ঝাড়টা, চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা আছে। এখন আমি সত্যি-সত্যি জঙ্গলটার মাঝখানে—কিন্তু কোনো লিয়ানার লতা আমার পথে বিছানো নেই, হলিউড দৃশ্যটা যেমনভাবে দেখাতো। তার দাঁতালো চোয়াল হাঁ ক'রে জলার মধ্য থেকে কোনো কুমির লাফিয়ে বেরোয়নি কিংবা কোনো অলুক্ষুনে চিত্রল সাপও কুণ্ডলী খুলে ছোবল মারতে উদ্যত হয়নি। সত্যি বলতে, স্তব্ধতাটাই ছিলো একমাত্র ভয় জাগানো উপস্থিতি। সে যেন জ্যান্ত। সে যেন পাক খাচ্ছে, হাতড়ে ছুঁয়ে দেখছে আমাকে, যেন ইচ্ছে ক'রে আমার সব বোধের মধ্যে নানারকম ইঙ্গিত করে যাচ্ছে। রোদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছে সে, আমি না-চাওয়া সত্ত্বেও তার আদরে-আদরে আমার দম আটকে দিচ্ছে। আমার ওপর নজর রাখছে সে, আর গোপনে-গোপনে আপন মনে হাসছে।

সেই তেড়াবেঁকা গাছটা এখনও দেখা যাচ্ছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানবার জন্যে আমি ফিরে তাকালাম—ঠিক করলাম সবসময়েই গাছটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে—কোনো চিহ্ন হিসেবে—বলা যায় না, দৈবাৎ যদি কখনও গুলিয়ে যায় আমি কোথায় আছি।

কালো পিঁপড়েদের সারির পেছনে-পেছনে ঝাড়টার আরো ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি। শুকনো পাতার ওপর আমার পা প'ড়ে গেলো হঠাৎ, আর আওয়াজটা হ'লো যেন কোনো কাঁচ ভেঙে গেলো, আর স্তব্ধতাটা যেন এই অপকর্মের জন্য দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। কেমন একটা দোষী-দোষী ভাব জেগে উঠলো আমার মধ্যে। প্রায় ক্ষমাই চেয়ে নিলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাবো না ব'লে দিব্যি গাললাম আমি।

আমি এগিয়ে চললাম।

এখনও গাছপালাগুলো নীচু, আর ছাড়াছাড়াভাবে দাঁড়ানো; আমার মাথা বাঁচাতে মোটেই সাহায্য করলো না তারা। পিঁপড়েরা আমাকে বুনো পাইনের একটা দঙ্গলের কাছে নিয়ে এলো। সারটা তারপর বাঁক ঘুরে আরো-একটা সুইজল-স্টিক্ গাছের ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে, কিন্তু এখানে এসে আমি ঠিক করলাম এ খেলার কোনো মানেই নেই, শুধু তা ছেলেমানুষিতে ভরা। রোদ দারুণ চড়া; এই ফাঁদ থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে চার্লসের কাছে চলে যাওয়া উচিত আমার। মাথাটা কেমন ঘুরছে টের পেলাম—নাঃ, এটা মোটেই ভালো কথা নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

ফিরে যাবার আগেই কিন্তু বুনোপাইনের দঙ্গলটার মধ্যে কী একটা শাদা জিনিসে আমার চোখ পড়লো। বুনো পাইন তার দীর্ঘ, ছুঁচলো পাতাগুলো বাড়িয়ে দেয় আকাশে—শক্ত ধারালো সব পাতা। কোনো বুনো পাইনের ঝাড়ে ধাক্কা খেলে বা থুবড়ে পড়লে বিষম জখম হ'তে পারে—বিশ্রীভাবে কেটে যেতে পারে, ছ'ড়ে যেতে পারে। কীভাবে আমি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখি দঙ্গলটার মাঝখানে, অতএব, আমাকে সাবধান হ'তে হবে এবার।

দঙ্গলটার মাঝখানটায় যে ফাঁকা গর্ত, কচি পাতাগুলোকে জড়িয়ে সেখানে ধবধবে শাদা একটা মাকড়সার জাল নিচে নেমে গেছে। জালটায় একটা ছ্যাদা আছে—ভুতুড়ে-কালো আর রহস্যময়। কিন্তু এই ছ্যাদার মধ্যে কোনো ভূত নেই। বরং তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আছে দুটি রোমশ নীলচে কালো পা—তাদের ডগাগুলো লাল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি—কেমন বিস্মিত আর অভিভূত।

সব মাকড়সাই আমার শত্রু—আর এখানে কিনা একটা জংলি মাকড়সা। একটা বিশাল রোমশ নীলচে-কালো মাকড়সা।

আমার পিঠ বেয়ে একটা শিহরণ নিচে নেমে গেলো—এমন একটা শিহরণ, আমার মগজ যাকে তর্জমা ক'রে দিলো যেন আমার চামড়ায় এলোমেলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে নীলচে-কালো রোমশ পা। আমি নীচু গলায় হেসে উঠলাম—কেমন একটা বিকৃত হাসি।

আর একটা নতুন পরিস্থিতি আমার সামনে। এ-সম্বন্ধে আমার কিছু-একটা করা উচিত।

আমি নুয়ে একটা ভাঙা ডাল তুলে নিলাম। মৃদু হাসছি আর কাঁপছি। কিন্তু তবু হাত বাড়িয়ে ইচ্ছে করে জালটার মধ্যে ডালটা ফেলে দিলাম আমি।

ডালটা হালকা, জালের মধ্যে প'ড়ে সেটা আটকে রইলো, আর ঝুলতে লাগলো।

চারটে নীলচে-কালো রোমশ পা বীভৎসভাবে ছ্যাদাটার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো, আর দুটো অপেক্ষমান দাঁত, নিষ্ঠুর আর বর্বরভাবে আশায় ভরা।

বাঃ, চমৎকার—ভয় জাগানো, কিন্তু চমৎকার।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের মধ্যে সব্বাই একটু না একটু কষ্ট পেতে ভালোবাসে। তা, আমার কষ্ট পাওয়ার ভঙ্গিটা এইরকম চেহারা নিলো। কতক্ষণ যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিলো না—শুধু ছোটো-ছোটো ডাল ছুঁড়ে ফেলছি আর মাকড়সাটাকে তাতিয়ে দিচ্ছি। আর সেইসঙ্গে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো যে সেই তেড়াবেঁকা গাছটা চোখে পড়ে কিনা তাকিয়ে দেখা উচিত।

কী যেন মড়মড় ক'রে উঠলো আমার পেছনে।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

একটাও ডাল নড়ছে না। একটা পাতাও না। কাজেই শেষটায় ধ'রে নিতে হ'লো যে স্তব্ধতাই বুঝি আমাকে নিয়ে খিকখিক ক'রে হাসছে।

বারে-বারে ফিরে তাকালাম আমি, একবার তাকে অসাবধানে পাকড়ে ফেলার জন্য। কিন্তু দারুণ চালাক সে।

একটা নীল গিরগিটি তীরের মতো ছুটে গেলো বালির ওপর—একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে।

দূর থেকে ভেসে এলো ঢেউয়ের শব্দ—আস্তে জেগে উঠেই আওয়াজটা গেলো।

পিঁপড়েদের সারিটা খুঁজে বার করা উচিত আমি ভাবলাম। সারিটার পেছন-পেছন গেলে সহজেই ঐ অষ্টাবক্র গাছটার কাছে পৌছোনো যাবে।

তাকালাম—কিন্তু কোথায় ঐ পিঁপড়েরা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, বারবার, আর হেসে ফেললাম। চেয়েছিলাম তেমনি খুক ক'রে হাসতে, যেমন স্তব্ধতা হেসেছিলো, কিন্তু আমার ঐ হাসি শোনাতো বাজ পড়ার মতো—আর বাজের আওয়াজ শোনবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিলো না।

একটু ঘুরে দেখলাম আমি, তারপর ঐ বুনো পাইনের দঙ্গলের কাছে এসে হাজির হলাম। ডালটার দিকে ঝুঁকে দেখলাম। কিন্তু মাকড়সাটার কোনো পাত্তা নেই। নিশ্চয়ই সে ঐ গর্তের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

যে-ডালগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, তাদের ওখানে ঝোলা উচিত ছিলো। কিন্তু একটাও নেই।

আমি জানি এটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস। মাকড়সাটা নিশ্চয়ই ডালগুলোকে তার জালের ঠিক ভেতরটায় টেনে নিয়ে যায়নি, কোনো ডাল তো আর কোনো মাছি নয় যে মাকড়সা তাকে বলবে, 'এসো আমার বসবার ঘরে।'

এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো বুনো পাইনের ঝাড়। আমি নিশ্চয়ই প্রথমটার কাছ থেকে স'রে গিয়েছি। এ নিশ্চয়ই নতুন কোনো।

আমার ভেতরটায় ঝাঁকি খেতে লাগলো যেন খয়েরি একটা স্পঞ্জ। আমার মুখের ভেতরটা কেমন যেন শুকনো।

আমি দুহাত জড়ো ক'রে মাথায় রাখলাম। মাথাটা যেন একটা বিজলি তাওয়ার মতো, যার বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন এইমাত্র বোতাম টিপে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমি মাথায় হাত দেওয়ামাত্র আবিষ্কার করলাম যে আমি ঢলে প'ড়ে যেতে চাচ্ছি। মুহূর্তের জন্য টলমল করলাম, আর বুনো পাইনের পাতাগুলো আমার কাছে এসে পৌছলো। তাদের পাশ কাটাতে আমাকে ক্ষিপ্রভাবে মাথা সরাতে হ'লো। পাতাগুলো নীলচে-কালো আর রোমশ, আর তাদের ডগাগুলো লাল।

কাৎরে উঠতাম প্রায়, কিন্তু এটা জানতাম যে, শব্দে বা ভাবে ভঙ্গিতে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুললেই সব শেষ। সবসময়েই আমাকে তো স্তব্ধতার মোকাবিলা করতে হবে।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলাম আমি। আমি বসে পড়লাম, আর

অনুভব করলাম কিছু একটা কঠিন জিনিস আমাকে ছোঁবার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাকিয়ে দেখি সেটা একটা তালগাছের ডাল। কোত্থেকে যে এই তালগাছের ডাল এসে হাজির হ'লো, তা আমি মোটেই জানি না। কিন্তু এই নতুন বিষয়টা আমার মনের জোর ক্ষইয়ে দিক, তা আমি চাই না। এই তাপ আর স্তব্ধতার সঙ্গে সহ-অবস্থানই যথেষ্ট।

খুব স্থিরভাবে ব'সে আমি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম তাপ যেন আমাকে বড্ড বেশি গলন্ত রেশমে আগাগোড়া ঢেকে না ফেলে। অফুরান এই গলন্ত রেশম—আমার চারপাশে ছড়িয়ে আছে। যেন কোনো অফুরান চাদর।

নাঃ, মোটেই ভালো ভাবনা নয়। অফুরান—চাদর!

আমি কিছুই করলাম না; আমি কোনো সাড়া দেবো না। নিচে তাকালাম আমি, ভেবেছিলাম শাদা বালি দেখবো—দেখলাম সেখানে ঝরাপাতার গলিচে পাতা—নরম, ভেজা-ভেজা। সেই যখন ফান হোগেনহাইম রাজ্যপাল ছিলেন, তখন থেকে যে-সব পাতা জমে আছে। আমি খেয়াল করলাম ছায়াদের নতুন এক মূর্তি। এতক্ষণ তো ছায়া থাকার কথা ছিলো না। চার্লসের কাছ থেকে চ'লে আসার সময় ছিলো বেলা দুপুর। সে তো মাত্র কয়েক মিনিট আগে—তাহ'লে ছায়াগুলো এমন লম্বালম্বি পড়েছে কেন? দুপুরে ছায়ারা থাকে ছোটোখাটো; বামন সব ছায়া, তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকে, যাতে তুমি মাড়িয়ে যেতে পারো তাদের, বশে রাখতে পারো। শুধু যখন তারা তোমার পেছনে লম্বা হ'য়ে ওঠে বিকেলবেলায়, তখনই তারা তোমার কথা মানে না, আর বদ মতলবে ঘুরে বেড়ায় তোমার পেছন পেছন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে প্রায় ডুবতে বসেছে। আবারও আমাকে কার গলার স্বর ডাকলো—শুনতে পেলাম। গলাটা এতই চার্লসের মতো যে আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে ব'লে মনে হ'লো সেদিকে এগিয়ে চললাম।

তার দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি; আর স্বরটা আরো জোরে ডাকলো আমায়।

তারপরেই দেখতে পেলাম সেই অষ্টাবক্র গাছটা। বুনো পাইনের একটা জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে গেলাম আমি। গেলাম সুইজল-স্টিক গাছপালার একটা

ঝাড়ের পাশ দিয়ে—আর, এই তো আমি, আবার ঠিক পথটায়। আর ঐ যে চার্লস আমার নাম ধ'রে ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে আসছে।

চার্লস বললো ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে সাড়ে-তিনটেয় জেগে ওঠে, আর আমার কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। 'ভড়কে দিয়েছিলে, বাপু। কী, হারিয়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'গাধা নাকি'—আমি ওকে বললাম। 'আমি মোটেই পথ হারাইনি।'

হেসে উঠলাম আমি। 'ঐ অষ্টাবক্র গাছটা দেখতে পাচ্ছো? ওটাই ছিলো আমার দিকচিহ্ন। ওরকম একটা গাছ থাকা সত্ত্বেও আমি পথ হারাবো কী করে?'

আমি আবার হাসলাম। 'শুধু এই কড়া রোদ আমাকে একটু দেরি করিয়ে দিয়েছিলো চার্লস। আর এই স্তব্ধতা। শয়তান। চেয়েছিলো আমাকে একটা চাদরে ঢেকে ফেলতে।'

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো চার্লস, তারপর আমার হাত ধ'রে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে আমার মাথা ধোয়াতে শুরু করলো।

অনুবাদ : শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লুইস সিমসন

ব্যাঙ

ঝড় উঠল, বৃষ্টি হলো খুব
পুকুর ভরে উঠল কানায় কানায়
নালার জলে লাফিয়ে বেড়ায় ব্যাঙ

হলুদ আর সবুজ রঙা গায়ে,
থকথকানো কাদার থেকে কেবল
বাইরে জেগে থাকে ওদের চোখ।

রাত্রে যখন জোনাকিদের দল
সুগন্ধি ফুল এবং গাছের ফাঁকে
আলোকরেখা তৈরি করে দেয়

ছন্দে কথা বলে তখন ব্যাঙ
এ ওর সাথে বীভৎস এক তানে,
কিন্তু তাদের গলায় ঝরে খুশি।

শহরে মন গাঁয়ের জন্য কাঁদে
গাঁয়ে ভাবি কোথায় আলাপচারি
সেই আমাদের সুখী গ্যাঙর গ্যাঙ!

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

মেরভিন মরিস

একটি মৃত্যু

'ওঠ্! ওঠ্! ট্রেভর, ওঠ্!'

আবার ডাক শোনা গেলো। আগের মতোই চাপা, শান্ত কিন্তু তীব্রস্বর: উঠে পড়্! ট্রেভর, ওঠ্!'

ট্রেভর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু গোড়ায় কিছুই দেখতে পেলো না, একদম অন্ধকার। পরমুহূর্তেই সে তার ওপর ঝুঁকে পড়া অবয়বটা খেয়াল করলো। গলা শোনা গেলো ফের।

'উঠে পড়্, ট্রেভর, ওঠ্!'

'অ্যাঁ?' ট্রেভর বললে।

'ওঠ্, তোকে বাড়ি যেতে হবে'

'বাড়ি যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, বাড়ি। তোর বাবার খুব অসুখ।'

'অসুখ? বাবার?'

এতক্ষণে গলাটা চিনতে পারলো ট্রেভর, আর্থার কাকা। ধড়মড় ক'রে উঠে সে আলোর জন্যে হাত বাড়ালো।

ছেলেদের জামাকাপড় রাখার লকারের একটা খোলা; তার ওপর শুইয়ে রাখা একটা টর্চ। ট্রেভর তার স্কুলের খাকি পোশাক প'রে ফেললো। আর্থার কাকার পরামর্শ মতো তারই কিছু জামাকাপড়ও একটা ব্যাগে ভ'রে ফেললো।

'তোর নীল স্যুটটা নিয়ে নে,' আর্থার কাকা বললেন।

'কটা বাজে?'

আর্থার কাকা টর্চের আলোয় কব্জিটা এনে বললেন, 'মোটামুটি দুটো বেজে কুড়ি।'

ছোট্ট দলটা নিঃশব্দে রওনা দিলো, নিঃশব্দেই। কারণ ডরমিটরির দরজার ঠিক সামনে মেঝের ঢিলে তক্তাটার ওপর দিয়ে তারা তিনজনে পেরোলো। কাঠের ও পাথরের সিঁড়ি পার ক'রে পাথরের ভারি খিলানের তল অব্দি রাতের পাহারাওলা জোন্স্ তাদের আলো দেখিয়ে এগিয়ে দিলো।

বাইরে হাওয়া দিচ্ছিলো, বেশ ঠাণ্ডা। শিরশির করছে। ব্রেজারের

বোতাম লাগিয়ে নিলো ট্রেভর। হেড স্যারের ঘরে আলো জলছে দেখা যাচ্ছে। ট্রেভররা সেদিকেই এগোলো। হেড স্যারের পরনে ড্রেসিং গাউন। ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাঁকে, তবু আতিথেয়তার খাতিরে তাদের কফি খেয়ে যেতে বললেন। আর্থার কাকা নম্রভাবে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন। হেড স্যারের গাড়িবারান্দায় তারা তিনজনে গাড়িতে উঠে পড়লো। চলতে শুরু করতে গাড়ির আলোয় গীর্জের সামনেটা আর বাইরের সবেধন কবরটার ওপরের ক্রুশ দেখা গেলো।

'তুই প্রার্থনা করিস ?' কাকা জিগেস করলে।

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে কর। তোর বাবার খুব অসুখ।'

'মারা যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ।'

যখন তারা বাড়ি পৌঁছলো, তখন আকাশে আলো ফুটে উঠেছে। ট্রেভরকে শুয়ে পড়তে বলা হ'লো। আস্ত বাড়িটায় মাকে খুঁজলো ট্রেভর, কিন্তু তিনি তখন হাসপাতালে। পরের তিন দিনের ধকল কিন্তু সইতে খুব কষ্ট হ'লো না। ট্রেভরের মনে হচ্ছিলো, হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে মনে-মনে জানে, যে অনুভূতিটা তার ভেতরে তা উৎকণ্ঠাও নয়, শোকও নয়, ; কেমন এক অদ্ভুত শূন্যতা, অনুভূতি যেন থমকে আছে ; যেন তারা সবাই অপেক্ষা করে আছে কিছু-একটা ঘটবে ব'লে, যা তাদের ব্যাপারটার সত্যিকার গুরুত্ব আরো ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে দেবে।

মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে-আসতে আসতে ট্রেভরের কেমন মনে হ'লো এই নাটকে সে যেন মোটেই কোনোভাবেই নেই। এটা যে কোন নাটক তা সে জানে। তার মা কেমন বিমনা আর শোকে আতুর, আর অস্বস্তিকর-ভাবে চুপচাপ ; যে কয়েক ঘণ্টা তারা বাড়িতে কাটায় হঠাৎ-হঠাৎ মা তাকে বুকে চেপে ধরেন। বাবা যে মারা যাচ্ছেন, তা সে স্পষ্টই বোঝে। তার বাবা কাউকেই চিনতে পারছেন না। এমনকি ট্রেভরের মাকে অব্দি না। তিনি শুধু শুয়ে থাকেন চিৎ হ'য়ে, বেশির ভাগ সময়েই চোখ বোজা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেন মুখ দিয়ে সশব্দে, হাত দুটি বিবশ পড়ে থাকে বিছানায়। ট্রেভরের মা ব'সে থাকেন একটা শক্ত চেয়ারে তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে। কখনো তাঁর দৃষ্টি অপলক, কখনো কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা, যেন তিনি অন্য কিছুর কথা ভাবছেন।

অবশেষে, বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ, মনে হ'লো রুগী যেন নিশ্বাস নিতে গিয়ে খাবি খাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী চকিতে সজাগ হ'য়ে উঠে বসলেন; কি রকম আড়ষ্ট, আর টানটান।

'নার্স! নার্স!' একটু থেমে ট্রেভরকে পাঠালেন তিনি, 'যা নার্সকে ডেকে আন।'

বাবা যখন সত্যি-সত্যি শেষ নিশ্বাস ফেললেন, ট্রেভর যতটা-না উত্তেজিত হ'লো তার চেয়ে বেশি হ'লো কৌতূহলী – কেমন যেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। তার বাবার নিশ্বাস শুধু বন্ধ হয়ে গেলো একসময়। তাঁর সারা শরীর আর বিশেষ ক'রে তাঁর মুখ, যতটা-না শিথিল হ'য়ে গেলো, প্রথমে তার চেয়েও বেশী কেমন শান্তির ভাবে ভ'রে এলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে, তাঁর মুখ ভাবলেশহীন হ'য়ে গেলো। একজন নার্স তাঁর মুখে বাঁধানো দাঁতের পাটি পরিয়ে দিলো, তারপর চাদরটা টেনে দিলো মাথার ওপর।

ট্রেভরের মা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দুহাতে মুখ ঢাকলেন, তারপর কেমন টানটান দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে যখন তিনি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাঁর স্বামীর দিকে তাকাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, বিছানার চারপাশে তখন একটা পর্দা টাঙানো। ট্রেভরকে দেখতে পেলেন তিনি হঠাৎ। অমনি আবার চোখের জল ঝরতে লাগলো, এবার একেবারেই নিঃশব্দে। এই চোখের জল কেমন অবসাদে ভরা ব'লে মনে হ'লো ট্রেভরের, কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাবও আছে তাতে।

সেই সংকটের সময় কাকারা কেউ ছিলেন না ব'লে ট্রেভর আর তার মা একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেলেন। ট্যাক্সির কাছাকাছি আসতেই রেক্টর রেভারেণ্ড টমাসের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

'শুভ সন্ধ্যা মিসেস ফ্রাঙ্কলিন,' বললেন তিনি, তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে জিগেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'ভালোই, চলে যাচ্ছে,' অস্পষ্ট স্বরে ট্রেভরের মা বললেন।

'আপনার স্বামী আজ কেমন আছেন?'

আবার ট্রেভরের মা কেঁদে ফেললেন।

'রেক্টর, উনি মারা গেছেন।'

হতবাক, রেক্টর মার হাতটা চেপে ধরলেন, তারপরে ট্যাক্সিতে উঠতে সাহায্য করলেন তাঁকে, ট্যাক্সিটা ছাড়া অব্দি তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বাড়ি পৌঁছে গেলো। খবরটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, সমবেদনা জানাতে আত্মীয় পরিজনরা আসতে শুরু করেছেন। ট্রেভরের এক বৌদি গরম দুধে গোপনে একটা ঘুমের বড়ি মিশিয়ে ট্রেভরের মাকে দিলেন, তারপর তাঁকে শুইয়ে দিলেন।

একটু পরেই কাকাদের আবির্ভাব হ'লো; ট্রেভর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আর শুনলো কীভাবে তাঁরা জরুরি বন্দোবস্তগুলো করছেন। বেতারে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা, খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তিরও, কোন্ পুরুত কবর দেবেন, কোথায় কবর দেয়া হবে, অন্ত্যেষ্টির সময় কী – তারও।

হাপুশ কাঁদিয়েরা পরে এসে পৌঁছুলো, – তাকিয়ে দেখলো ট্রেভর—সেই যারা বলাবলি করলো কবে তারা তার বাবাকে শেষ দেখেছিলো, আর কেমন চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি – এইসব। ট্রেভর জানতো যে তার বয়স এতোই কম যে কাউকে বিচার করা তাকে মানায় না, কিন্তু এরা যে সবাই মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ তা সে টের পেলো। এদের শোক প্রকাশের ধরনটা যেন আগে থেকে ঠিক-ক'রে-রাখা কোনো বাঁধাধরা পথে চলেছে—যেন এরা আগে থেকেই মহড়া দিচ্ছিলো। ট্রেভর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো আর তার ইচ্ছে করলো এদের অপমান করতে।

শেষকৃত্য করা হ'লো পরদিন। কিন্তু অন্ত্যেষ্টির চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক ছিলো তার প্রস্তুতি। সারা সকাল ধরে ট্রেভরের মাসিপিসিরা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে ঠোঙায় ভ'রে রাখতে বা তেলে-কাগজে মুড়ে রাখতে ব্যস্ত রইলেন—যাতে স্যাণ্ডউইচগুলো টাটকা থাকে। বেলা দুটো নাগাদ মৃতদেহ এসে পৌঁছলো। ট্রেভরের মা কফিনের গোল ঘুলঘুলিটার ওপর থেকে কাঠের ঢাকনাটা খুলে ফেললেন, যাতে তার বাবার মুখটা দেখা যায়। মুখটা কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিলো, সত্যি বলতে যেন মেকআপ পরানো। ট্রেভরের মা একবার মৃতদেহের কাছ থেকে সরে যান, আবার পরক্ষণেই ফিরে আসেন, কেমন ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন সেই মৃত ফ্যাকাশে মুখটার দিকে। অবশেষে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর ঘরে পাঠানো হ'লো, সৎকারের জন্য পোশাক প'রে নিতে। সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত, মুখচোখে কেমন একটা সুখে দুঃখে নির্বিকার গর্বের ভাব।

এক-এক ক'রে অভ্যাগতরা কফিনের পাশ দিয়ে গেলেন, কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালেন ট্রেভরের বাবার মৃত মুখের দিকে, আর যাঁর যা উচিত মনে হ'লো সেইভাবে শোক প্রকাশ করলেন—কেউ খুব পোশাকিভাবে, কেউ-বা আন্তরিক। বোকারা বললেন, 'চিরবিশ্রাম নিতে গেছেন, আমেন!' আর ট্রেভর বহু কষ্টে তার মজা চেপে রাখলো। বাড়ির সামনেটায় সবখানে ছোটো-ছোটো দলে লোকেরা দাঁড়িয়ে—ট্রেভর আবিষ্কার করলো তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলছে—কে যে মৃতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলো, আর কে তাঁকে শেষ দেখেছে—এই নিয়ে। যারা তাকে 'ছোট্ট ছেলে' বলেছে সেইসব মধ্যবয়সী লোকদের ওপর সে কতটা রেগে গিয়েছে তা যাতে প্রকাশ না-পায়, ট্রেভর সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলো তার চোখেমুখে শোকের ছায়া এঁটে রাখতে।

চারটের ঠিক আগটায় রেক্টর এসে পৌঁছুলেন। কালো পিয়ানোটার দিকে পেছন ফিরে ছোট্ট করে তিনি প্রার্থনা সারলেন। কফিনটাকে বৈঠকখানার চেয়ারগুলো থেকে তুলে নিয়ে শবযাত্রার গাড়িতে ওঠানো হ'লো। তার মায়ের সঙ্গে ট্রেভরের কোন-এক অচেনা ধনী লোকের শোফার-চালানো গাড়িতে তুলে দেয়া হ'লো, আসলে ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরই বাবার সঙ্গে গির্জের ওয়ার্ডেন। ট্রেভর অবশ্য চটলো না; স্টুডিবেকার গাড়িটা বেশ আরামের।

গির্জেয় গিয়ে ট্রেভরের মা ছেলের হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলেন। ট্রেভর দেখলো তার মুখঢাকা কালো কাপড়ের আড়ালে তিনি কাঁদছেন—কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন না মোটেই, আর চোখও মুছলেন না।

'ঈশ্বরের গতিবিধি রহস্যময়
বিচিত্র তাঁর লীলা…'

কথাগুলো ট্রেভরকে ক্রুদ্ধ ক'রে দিলো। কে এই ঈশ্বর, সে ভাবলো আর কেনই বা কেউ তাকে বোঝে না? স্কুলের গির্জের সব সুভাষিতের কথা ভাবলে সে, ভাবলে সব জটপাকানো হেঁয়ালিগুলোর কথা, সেইসব প্রশ্নের কথা—যা তার মনে হ'তো এইসব সুসমাচারে শুনলে।

ঐ অন্য স্তোত্রগুলো, তার মনে হ'লো, বরং অনেক মানাতো এখন। 'স্বর্গের রাজা, আমার আত্মার স্তুতি করো'—এই অদ্ভুত চরণটার মানে ক-জন বুঝতে পেরেছে, এ-কথা না-ভেবে অবশ্য সে পারলে না। ক-জন লোক এ নিয়ে ভাবার কষ্ট স্বীকার করে? ক-জন জানে যে আত্মা হ'লো স্বর্গেরই রাজা? 'আমার সঙ্গে থাকো,' তার মনে পড়লো বাবা পিয়ানোয় বাজাতেন, আর মাঝে-মাঝেই

এমন স্বয়ম্বৰমা ফুটিয়ে তুলতেন, যা ছিলো উজ্জ্বল, সুনিশ্চিত আর জটিল—সবই একসঙ্গে।

'এবং যদিও কীটেরা এই শরীর ধ্বংস ক'রে দেবে, তবু আমার এই শরীরেই আমি দেখতে পাবো ঈশ্বরকে…' কী মানে এই কথার?

প্রশংসার কথাগুলো আন্তরিক ব'লেই মনে হ'লো ট্রেভরের। রেক্টর সম্ভবত সত্যি চিনতেন তার বাবাকে। ট্রেভর অবাক হ'য়ে গেলো। সে ভেবেছিলো ফাঁকা কতগুলো বুলি শুনবে, কিন্তু তা তো নয়। সেদিন এই প্রথমবার তার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে ক'রলো। রেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন পাদপীঠে, তার ঝাপসা দৃষ্টি তাঁকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো: বেদির ওপর পেতলের ক্রুশ—ঠিক তার স্কুলের কাঠের ক্রুশের মতো। এখনও তার মনে আছে এই বছরখানেক আগেও তার বাবা প্রার্থনাদলের সঙ্গে গাইতেন, প্রার্থনাদলের পুরোভাগে ক্রুশের কাছে দাঁড়াতেন তিনি।

গির্জের শেষকৃত্য শেষ হ'তেই সেই মস্ত জমায়েত সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো কারখানার উদ্দেশ্যে।

শববাহকদের পেছন-পেছন শোকযাত্রীরা সমাধিস্থলে এসে পৌঁছুলো—একটা গাছের নীচে। ছায়া দেবে কি এই গাছ—না কি ঝরা পাতা নোংরা ক'রে রাখবে এই সমাধিকে? তাতে কি সত্যি কিছু এসে যায়?

সমাধির চারপাশে কোদালের কাজ এমনই ছিমছাম যে গর্তটা যেন জায়গায়-জায়গায় ঝকমক ক'রে উঠেছে। অনেক ফুলের স্তবক প'ড়ে আছে মাটিতে।

কফিনটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর রাখা হ'লো। ট্রেভর অন্য দর্শকদের দিকে ফিরে তাকালো। সবাইকেই ঠিক একরকম বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

'নারীর গর্ভে যে-মানুষের জন্ম তার পরমায়ু অতি স্বল্প ও দুর্দশায় ভরা। তিনি আসেন, উৎপাটিত হন, যেন কোনো ফুল, তিনি মিলিয়ে যান, যেন কোনো রামধনু, এবং কখনোই চিরকাল থাকেন না।

'জীবনের মাঝখানে আমরা মৃত্যুতেই আছি…'

তার হাতের ওপর মায়ের মুঠি আরো আঁটো হ'য়ে উঠলো।

কপিকলের ক্যাঁচকেচে আওয়াজ অশ্লীল শোনালো—কফিনের ওপর প্রথম মাটি পড়ার চেয়েও অশ্লীল। তার মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

সমাধির ওপর শেষ পল্লা মাটি চাপাবার পর জমায়েতের মধ্যে হঠাৎ যে পরিবর্তন দেখা দিলো, তা লক্ষ্য ক'রে ট্রেভরের তাজ্জব লাগলো। সে তাকিয়ে

দেখলো ফুলের স্তবক হাতে সগর্ব এগিয়ে এলো লোকে, তাদের স্তবক সাজিয়ে রাখতে।

আর তারপরেই, আচমকা শুরু হ'য়ে গেলো কথার গুঞ্জন; তাদের মুখে ফুটে উঠলো হাসি, সৎকারের আবহাওয়াটা এমন হ'য়ে উঠলো যেন এটা কোনো বাগানের মধ্যে পিকনিক। এমন কি ট্রেভরের মাও—যেন এই নতুন ভাবটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, অস্ফুট একটা হাসি তাঁর মুখে—যদিও তাতে কোনো প্রাণ নেই।

'ছোট্টো মানুষ, মার দেখাশুনো কোরো।'

ট্রেভর ঘাড় নাড়ালো।

'এখন তুমিই তো বাড়ির পুরুষ।'

গম্ভীর ও দায়িত্ববান দেখাবার চেষ্টা করলো ট্রেভর। লোকে কতটুকু বোঝে তাকে? কতখানি? সে ভাবলে। শোক কাকে বলে? সমবেদনা জানানোই বা কেন?

'বুঝেছো, আমি সবসময়েই বলি, জীবনের মধ্যেও আমরা মৃত্যুর সঙ্গেই আছি। লোকটা হেসে উঠলো, 'যাক, পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে এবার একটু হাসিখুশি হও।'

স্কুলে ফিরে গিয়ে কী বলবো আমি? ট্রেভর ভাবলে। কিছুদিন আমিই থাকবো কৌতূহলের বিষয়। কেমন ভাব করতে হবে আমাকে? লোকে কী চায়? কী তারা আশা করে আমার কাছ থেকে?

'তা, ট্রেভর,' সে শুনতে পেলো তার এক কাকা বলেছেন, 'আমরা তোর জন্য গর্বিত। তোকে আমি কাঁদতে দেখিনি।'

ট্রেভরের মা শক্ত মুঠোয় তার হাতটা চেপে ধরলেন। আর ট্রেভর কেমন করুণভাবে একটু হাসলো।

অনুবাদঃ চন্দ্রচূড় সরকার

এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট

ব্ল্যাক + ব্লুজ

১ ভূমিকা

মাদল চামড়া চাবুকের
শপাং, মাধব সূর্যের
চামড়াকাটা তাপের
ধার, সবকিছুর
টানটান উপরিতল
আমি গান ক'রে উঠি
আমি চীৎকার করি
আমি কাৎরে উঠি
আমি স্বপ্ন দেখে
চলি

ধুলো কাচ বালির কণা
মরুভূমির সব নুড়ি :
বালি দুলে ওঠে, স'রে যায় :
পোড়া জগতের মধ্য দিয়ে
জল তার প্রবাহ
রুদ্ধ ক'রে দেয় ;
তপ্ত চাকার
বহরের
মড়াগুলো
প'চে যায়।
উটগুলো চুরমার
তাদের নিজেদের

জলের মধ্যে
আবার বাঁচিয়ে দেয় প্রজা-
পতিদের যারা
নেচে বেড়ায় দুপুর রৌদ্রে
আশাহীন
কোনো সকালের
আশাহীন।

শিগগিরই
পাথর
হাতির চামড়া গায়ে-
পরা খ'য়ে-যাওয়া শিলাখণ্ড
টেনে-আনা এখন
শুকনো সব নদীর
খাতে, মৃত্যুর
উপত্যকাগুলোয়।
এখানে মাটি
ঠাণ্ডা কয়লা আঁকড়ে থাকে
কাচে, সৃষ্টি করে
ঝনঝন, লাভা ঝকঝক ক'রে ওঠে,
আকাশের সব তারার শিশুরা।
এখানে ঠাণ্ডা
শিশির পড়ে
সন্ধ্যায়
শ্যামা পাখিরা মিটমিট করে
গাছের ওপর
গুঁড়িগুলো ধর্ষিত
আগুনে
তছনছ তার সব
সোনা সমেত।

এখুনি গ'ড়ে তোলো
নতুন-সব
গ্রাম, তোমাকে
ময়লার সঙ্গে মেশাতেই হবে
থুতু, গোবরের সঙ্গে
লালা আর
ঘাম : গোল
মাটির দেয়াল উঠে দাঁড়াবে
উষায়
দেয়ালঘেরা সব নগরী
উঠে দাঁড়াবে
সাভান্না আর
পাথুরে নদীর খাত থেকে :
হে কানো হে বামাকো
হে গাও

কিন্তু মাছির পাল
উঠে দাঁড়ায় গোখোঁয়াড়
শহর থেকে : রক্তশোষা
মাছি। দুধ
জ'মে যায়
বাঁটে
স্তনে
মুখে। মাছির পাল
ঠুকরোয় আর সপুঁজ ক্ষত :
আঁটো টানটান রুপোলি—
পিঠ ঝাঁক ব'য়ে নিয়ে আসে
স্তব্ধতা, প'চে যাওয়ার
দীর্ঘ সব শুঁড়।
তপ্ত

হারমাটালের মধ্যে,

লাশগুলো আস্তানা গাড়ে
আর কাঁপে
সেই চাদরের কাছে হাল ছেড়ে দেয়া
যে-চাদর ঢেকে রাখে আর গরম রাখে
সেই চরম হিমের
গরম থেকে ; যতক্ষণ-না আচমকা ফেটে পড়ে,
গুঞ্জিত সব কালো এলাকা যারা সব
স্তব্ধতা, ঘূর্ণি তুলে যায়
রৌদ্রে, যে পরিত্যক্ত পুঁজে ভরা
মাংস তারা ঢেকে রেখেছিলো
ধারাবওয়া গর্তে ভরা যেন বৃষ্টির
নিচে ধুলো, যেন বৃষ্টির নিচে
মাটি ।

কিন্তু মাংস যখন
পচে যায়,
মাছি যখন ঝাঁক বাঁধে
কোনো বর্ষণই
নামে না । কিন্তু, ঐ যে,
নদীর খাতের শুকিয়ে-যাওয়া
অন্তরের ভেতর,
ছ্যাখো !
গাছপালা
শীতল, তাদের পাতাগুলো
শ্যামল, সেখানে
জ্ব'লে উঠেছে কোনো ঝরনার
স্বপ্ন,
গন্ধের বিতান,
নরম সব গলিপথ ।

কাজেই বানাও গ'ড়ে তোলো
আবার নতুন-সব
গ্রাম : তোমাকে
মেশাতেই হবে নোংরার সঙ্গে
থুতু, গোবরের সঙ্গে
ঘাম আর লালা, পলেস্তারা বানাতে। ছাতের জন্য
পাতার ছাউনি আর লতাপাতার
ঝালর।
কিন্তু চৌকো কাঠামো
ফেটে যায়, কাঠ
পচে, মসৃণ পলেস্তারাও
প'ড়ে থাকে মরণাতুর,
তার নিজের নুনেই ফাঁদে-পড়া,
তার জলের টালমাটাল সব ভিত।
তাই, ভগবান, তুমি মঞ্জুর করো
যাতে এই বাড়ি সটান সামলাতে পারে।
চার হাওয়া
ঋতুর অদলবদল
ঘুণপোকার হাতড়ানি।
মঞ্জুর করো, ভগবান,
চোরেদের কাছে থেকে এক সুপরিস্ফুট মুক্তি,
দস্যুদের কাছ থেকে আর তাদের কাছ থেকে
যারা ষড়যন্ত্র করে বিষ দেয়
যখন তারা আমাদের থালায়
হাত বাড়ায়।
আরো মঞ্জুর করো : উষ্ণ আগুন, সুমঙ্গলা
সহধর্মিণী, কৃতজ্ঞ সব সন্তান।

কিন্তু দারুণ তপ্ত আগুন শিখা ছড়িয়ে দেয়।
শিখা জ্বলে, পোড়ায়, জ্বালায়, ফাটিয়ে দেয়,

ভগ্ন বাড়ির শুকনো পাতাগুলো
গ্রাস করে। শিখারা ঠকায় ঋতুদের,
পোকাদের, আমাদের পড়শীর বেইমানিদের,
আমাদের জানলা, আমাদের খিল-ছিটকিনি, আমাদের সব পূজা,
আমাদের কুকুর আর আমাদের ভগবানকে। শিখা,
সেই লোহিত দেবমূর্তি, আমাদেরই শক্তির
সে প্রতিষ্ঠাতা : শিখা গ'ড়ে তোলে কাঠের ছাঁচ ; বারুদ দিয়ে,
লোহা। দীর্ঘ লোহা
ছুটে যায় সব তরোয়ালে,
বল্লমে, ঝকঝকে সব ফলায়
যারা হটিয়ে দেয় বন্য জীব, চক্ষু হ্রেষাধ্বনি।

শিখা আমাদের ভগবান, আমাদের শেষ প্রতিরোধ, আমাদের সর্বনাশ।

শিখা জ্বালিয়ে দেয় গ্রাম।

নয়া দুনিয়া আ-রহা

অসহায় এই রকম
দলনায়ক-
হীন এই রকম,
বীরনায়কহীন,
আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম তোমার : প্রেমিক,
যোদ্ধা, ঘৃণাকারী,
বেরিয়ে আসছো বনের
সার থেকে
নরম পা
স্তব্ধতার
নরম মাটিতে :

আমাদের দেখা হয়েছিলো
ঝরা পাতার প'চে-যাওয়া শুঁড়িপথে।

খট তালা
তোমার বহ্নি-
জালা পুরো-
বাহু আগ্নে-
য়াস্ত্র ঝলসে দিয়েছিলো
আগুন আর আমাদের দৃঢ়তা
শিথিল, শিখা
সুতপ্ত, পতঙ্গ
কামড়ানো যোদ্ধারা সব
প'ড়ে গিয়েছিলো পর-পর।

কত দিন
হায় কতদিন
হে প্রভু
হে শয়তান
হে আগুন
হে শিখা
আমরা হেঁটেছি
আমরা পথ পেরিয়ে এসেছি
এই জায়গায়
এই দেখা হওয়ায়
এই ঝাঁকুনিতে
আর লজ্জায়
এই কলঙ্কিত
স্তব্ধতায়।

সে-যে কতকাল আমরা
নেমে আসছি নিচে

উপত্যকায় নিচে
চাল বেয়ে, জমানো লাভা
ঝকমক করে, নুড়িগুলো
জলের মতো শুকনো,
জঙ্গলের মধ্যে শেষকালে এই
শিখার ঝলসানিতে।
হায় কে তবে এখন বাঁচাবে
আমাদের, সহায়-
হীন, তুরঙ্গ-
হীন, কোনো
আশা নেই, কোনো হকিন্‌স নেই, কোনো
কোরতেজের আবির্ভাব নেই।
প্রেমপে বন্দী,
তাইয়া মৃত,
আসানতেয়া দড়ি বাঁধা
আর ফাঁসিতে ঝোলানো।
হায় কে তবে এখন বাঁচাবে
আমাদের : জেরোনিমো, টাকি
আর মোন্‌তেজুমার যে আসতে বাকি।

আর আগুন, আমাদের
আগুন, গ'ড়ে তোলে তালা,
লোহার চেয়েও কালো পাথর ;
আগুন ফাঁসিয়ে দিয়েছিলো একবার আমাদের
গ্রামে ; এখন
জঙ্গলে, আগুন ঝ'রে পড়ে
পাখির মতো, আমাদের পেটের তপ্ত
খোলস। আগুন পেড়ে ফ্যালে
সব দেয়াল, আকার দেয় এই সব বহ্নি-
তালাকে যা লোহার চেয়েও কালো,

আর আমরা সারি-সারি নেমে এসেছিলাম পথ দিয়ে
লোহার এক নতুন ঝনঝনে স্তব্ধতায়
পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা।

অনেক অনেক কাল কেটে যাবে আবার আমাদের চোখে পড়বার আগে
এই দেশ আবার, এই গাছগুলো
আবার, জোয়ারের শব্দের সঙ্গে
ভাসমান এই ভেতরদেশ, ধোঁয়া উঠছে

অনেক অনেক কাল কেটে যাবে আবার আমাদের চোখে পড়ার আগে
এইসব খামার আবার, নরম ভেজা মন্থর শ্যামল
আবার : আবুরি, আক্‌ওয়ামু,
কুয়াশা উঠছে

এখন লক্ষ ক'রে ছাখো এই কঠিন লোকগুলোকে, হিম
চোখ যেন জল চেপে এলাম তারই মতো স্বচ্ছ,
পাল আর দড়ি আর মাস্তুল বিষয়ে কী তুমুল দক্ষ

লক্ষ ক'রে ছাখো এখন এই ঠাণ্ডা লোকগুলোকে, সাহসী
সেই জলের মতো যে গলুইতে আছড়ায় অতর্কিত বন্য জোয়ার যেন-বা,
উদাসীন, মনে হয়,

জল আর হাওয়ার এই সংঘর্ষে ;
কারণ আমাদের রুধির, শিগগিরই
মিশে যাবে তাদের খেলাধুলোর উৎকাঙ্ক্ষায়,

ঔদাসীন্যে, রোষে,
গ'ড়ে তুলবে নতুন মাটি,-নতুন আত্মা, নতুন
পূর্বপুরুষ ; ব'য়ে যাবে এই জোয়ারের মতো

তারার গায়ে আটকানো যে-জোয়ারের জলে ভেসে যায় এই জাহাজ
নতুন জগতের উদ্দেশে, নতুন জলের দিকে, নতুন
বন্দরের দিকে, আমাদের পূর্বপুরুষের গরিমা

হাওয়ার জলের সঙ্গে মেশানো
মাংস আর মাছির সঙ্গে, চাবুকগুলো আর
এই শৃঙ্খলিত স্বাগত জানানো বন্দরের যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে অনড় জুড়ে-দেয়া।

অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই যে সেজেয়ার

দুটি কবিতা

শকুনদের দখলে মঞ্চ

কোথায়, কখন, কী ভাবে, কেন, হ্যাঁ, কেন, কেন,
কেন এ-সব ভয়ানক বজ্জাত শব্দ ভবিষ্যৎকে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে
এত-কম কয়েকটা আকশি আবিষ্কার করেছে

ঐ নিরীহ লোকটাকে থামাও, ও তো ঠিক অন্যদের মতোই। ঐ
লোকটা ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে যায় আমার রক্ত। তার জুতোর ভিতর
ব'য়ে নিয়ে যায় আমার রক্ত। তার নাক ফেরি ক'রে বেড়ায় আমার
রক্ত। চোরাকারবারীদের খতম করা হোক। সমস্ত সীমান্ত রুদ্ধ।
চেনাও নয় আবার অচেনাও নয়
তাদের সবাই
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার হৃদয় হারমাটানের চেয়েও শুকনো,
সমস্ত অন্ধকারই আমার শিকার
সমগ্র তামসই আমার প্রাপ্য, আর সব বোমা আমার উল্লাস

তোমরা শকুনেরা, ছিঁড়ে খাবার জন্য জঙ্গলের ওপর উদ্যত চকচক করছো
তোমরা পাক খাচ্ছো গুহার ওপর যেখানে দরজাটা এক ত্রিভুজ
যেখানে একটি কুকুর প্রহরী
যেখানে জীবন সবুজ পাপড়ির মতো উন্মীলিত
যেখানে কৌমার্য একটি মাকড়সা
যেখানে অসাধারণ নর্দমাটি একটি হ্রদ যেখান থেকে দুটো
মহাপ্রলয়ের স্বর পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
পথ খুলে দেয় ঝোড়ো জলের আত্মাদের

অন্য-সব নিধনের মধ্যে

সমস্ত শক্তি দিয়ে চাঁদ আর সূর্য পরস্পরকে জাপটায় ঝাপটায়
নক্ষত্রেরা ঝ'রে পড়ে মাছের হৃষ্টপুষ্ট ডিমের মতো

আর একঝাঁক সদ্যোজাত ধূসর ইঁদুরের মতো

ভয় পেয়ো না তৈরি ক'রে তোলো তোমার ভরা জোয়ার
যে এত নিখুঁত স্বচ্ছভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দর্পণের তটদেশে

ওরা আমার দু-চোখে কাদা লেপটে দিয়েছে
আর আমি দেখি আমি ভয়ংকরভাবে দেখতে পাই
অননুতপ্ত সমুদ্রটির থুথুর ফেনায়
সমস্ত দ্বীপ সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে
কিছুই আর অবশিষ্ট নেই
মূলসুদ্ধ উপড়ে-আসা ক্ষ'য়ে-যাওয়া কয়েকটি দাঁত ছাড়া।

অনুবাদ : মণিভূষণ ভট্টাচার্য

লিওপোল্ড সেডার সেনঘোর

নীল দিগন্তে

আমার সমস্ত হিমায়িত নদী থেকে বরফ মুছে নিয়েছে বসন্ত
নরম বাকল বরাবর প্রথম সোহাগছোঁয়া পেয়ে শিউরে উঠছে
আমার কচি চারা
অথচ দেখ, মধ্য জুলাই-তে আমি সুমেরু শীতের চেয়েও
কত অন্ধ!
আমার ডানাগুলি ঝটপট আঘাত করে, ভেঙে পড়ে
আকাশ দেয়ালে
আমার তিক্ততার বধির কুঠুরি ভেদ ক'রে
কোনো আলো ভিতরে ঢোকে না।
তবে কোন্ চিহ্ন খুঁজে পেতে হবে? কোন্ চাবিতে খুলতে হবে
রুদ্ধ দরজা?
বর্শা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কীভাবে পৌছনো যায় ঈশ্বরের কাছে?
দূর দক্ষিণের হে রাজকীয় গ্রীষ্মঋতু, অনেক দেরি ক'রে
এক ঘৃণাময় সেপ্টেম্বরে তুমি এসে পৌছবে!
কোন্ গ্রন্থে খুঁজে পাবো তোমার সেই প্রতিধ্বনির রোমাঞ্চ?
কোন্ বইয়ের পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠায়, কোন্ অসম্ভব ঠোঁটে পাবো
তোমার প্রলাপবিদ্ধ ভালোবাসার স্বাদ?

অস্থির সেই বিক্ষেপ আমাকে ছেড়ে গেছে।
পাতায় পাতায়-বাজা হে ক্লান্তিকর বৃষ্টিধ্বনি,
হে রাজন্, তোমার একাকিত্ব নিয়ে তুমি আমাকে বাজাও
যতক্ষণ না আমি কেঁদে কেঁদে নিজেকে হারিয়ে ফেলি ঘুমে।

দেখাশুনা

এক বিকেলের অন্তরঙ্গ আধো অন্ধকারে
আমি স্বপ্ন দেখি।

আমাকে দেখা দিয়ে যায়
প্রতিদিনের ক্লান্তিপুঞ্জ, প্রতি বছরের মৃতেরা, দশকের স্মৃতিচিহ্নদল
অগভীর সমুদ্রের দিগন্তছোঁয়া গ্রামে
মৃতদের মিছিলের মতো।
মায়াবী শিশিরে ভেজা সেই একই রোদ,
কিছু কিছু লুকনো হাজিরা নিয়ে বিপন্ন সেই একই আকাশ,
মৃতদের সঙ্গে হিসেবী সম্বন্ধ আছে যাদের
তাদের নিয়ে সন্ত্রস্ত
সেই একই আকাশ।
তারপর হঠাৎ আমার শব আমাকে কাছে টানতে থাকে···

সারাদিন

সারাদিন দীর্ঘ সোজা রেল লাইনের উপর
অনন্ত বালিয়াড়ির উপর এক অনমনীয় ইচ্ছার মতো
রোদঝলসানো কেয়র এবং বাওল পেরিয়ে
যেখানে বাওবাব গাছেরা যন্ত্রণায় তাদের হাত মোচড়াতে থাকে
সারাদিন লাইন বরাবর
একঘেয়ে ছোট ছোট ইস্টিশান পেরিয়ে
ইসকুলের গেটে পাখিদের-মতো-ডানা-ঝাপটানো
কালো মেয়েদের পেরিয়ে
সারাদিন
লোহার ট্রেনের আওয়াজে ধ্বস্ত বিপর্যস্ত ধুলোমাখা রুক্ষ
এই আমাকে
দেখ,
যে আমি ভুলতে চেষ্টা করছি ইয়োরোপকে
সীনের রাখালিয়া হৃদয়ের মাঝখানে থেকে।

মুখোশদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

হে কালো মুখোশ, লাল মুখোশ, শাদা-কালো মুখোশের দল,
হে আয়তাকার মুখোশের দল

জানলা—১৮

তোমরা, যাদের ভিতর দিয়ে আত্মা নিঃশ্বাস ফেলে
তোমাদের স্বাগত জানাই এই নৈঃশব্দের মধ্যে।
স্বাগত তোমাকেও, হে আমার চিতার-মাথা-ওয়ালা পূর্বপুরুষ।
তুমি পাহারা দিচ্ছো এই জায়গাটুকু
যেখানে কোনো মেয়েলি মস্করার ঠাঁই নেই
যেখানে সব নশ্বর হাসি পুরোপুরি নিষেধ।
এই জায়গায় যেখানে আমি আমার বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতিমাখা
বাতাস নিঃশ্বাস ভরে নিচ্ছি
তোমরা সেই সনাতন বাতাসকে শুদ্ধ করছো
গালের মেকি টোল এবং চামড়ার কুঞ্চনমুক্ত
হে নির্ভান মুখের মুখোশমালা,
তোমরা তৈরি করেছো এই মূর্তি, এই আমার মুখ
যা নুয়ে পড়ে শাদা কাগজের বেদির উপরে।
তোমাদের নামে শপথ নিয়ে বলছি, শোনো,
এখন পুরনো স্বৈরাচারের আফ্রিকা মরে যাচ্ছে
এ যেন এক বেচারা রাজকুমারীর দুঃখ
ঠিক ইয়োরোপের মতো, যার সঙ্গে তার নাভির যোগ,
এখন তোমার শিশুদের দিকে তোমার স্থির চক্ষু ফেরাও
সেই ডেকে-আনা শিশুদের দিকে
যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে গরিব মানুষেরা
শেষ পোশাকটুকুও দিয়ে দেবার মতো
যাতে পৃথিবীর নতুন করে জন্মানোর সময়ে
এবার আমরা চেঁচিয়ে বলতে পারি 'এখানে'
যে চিৎকার শাদা ময়দার পক্ষে জরুরি খামিরের মতো।
কারণ
যন্ত্রপাতি গোলাবারুদের চাপে মৃত এই পৃথিবীকে
কে আর ছন্দ শেখাবে ?
কে আর হঠাৎ তুলবে সেই প্রবল আনন্দধ্বনি
যা মৃত ও সবজান্তাদের জাগিয়ে তোলে এক নতুন ভোরে ?
বলো, কে আর মানুষের কাছে পুরনো জীবনের স্মৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে

একটি দীর্ঘ আশাসমেত ?
ওরা আমাদের বলে 'তুলো-ঠাসা মাথা' বলে 'কফি ও তেলের মানুষ' বলে
'যমের পেয়াদা'
অথচ আসলে আমরা সেই নাচের মানুষ
যাদের দু'পা কঠিন মাটিকে আঘাত করে করেই
শক্তি খুঁজে পায়।

মৃতেরা

তারা সব শুয়ে আছে ওইখানে
দখল-করা রাস্তার পাশে, বিধ্বস্ত সড়ক বরাবর
অপরূপ পপলারের সার বেয়ে, লম্বা ঝুলের সোনার আংরাখা-পরা
গম্ভীর দেবতাদের মূর্তির পাশে
সেনেগালী বন্দীরা ফ্রান্সের অন্ধকার মাটিতে শায়িত।
বৃথাই তারা ছেঁটে দিয়েছে তোমার মুখের হাসিকে
বৃথাই তোমার মাংসের নিচে ফুটেছে গাঢ় ফুল
নগ্ন অনুপস্থিতির মধ্যে প্রথম সৌন্দর্যে-জাগা
তুমিই সেই ফুল
বিষণ্ণ-হাসি-মাখা কালো ফুল, অনাদি কালের হীরা।
তুমিই পৃথিবীর সবুজ বসন্তের মজ্জা রক্ত-রস
প্রথম দম্পতির তুমি ত্বক উজ্জ্বল তলপেট দুধেল ভাব
তুমি উজ্জ্বল স্বর্গীয় বাগানের পবিত্র প্রসার
আগুন ও বজ্রজয়ী দুর্জয় বনানী।
তোমার রক্তের মহাসংগীত ডুবিয়ে দেবে সব যন্ত্রপাতি এবং কামানকে
তোমার বুক-তোলপাড়-করা কথা ডুবিয়ে দেবে
সব গা-বাঁচানো কাজ ও মিথ্যাকে।
ঘৃণাবিহীন কোনো ঘৃণা তোমাদের আত্মায় নেই
নেই ধূর্ততাশূন্য কোনো ধূর্ততা।
হে কালো শহীদের দল, অমর সম্প্রদায়,
আমাকে ক্ষমার কথা উচ্চারণ করতে দাও।

অনুবাদ : পিনাকেশ সরকার

বিরাগো দিওপ

সারজ্জান

কোনটা যে ধ্বংসস্তূপ আর কোনটা যে উইঢিবি তা কিছুতেই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। শুধু একটা উটপাখির ডিমের খোলা—ফাটা, আর রোদে-জলে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া—এখনও দেখিয়ে দিচ্ছিলো একটা লম্বা থামের আগায় একদিন যা ছিলো এল হজ ওমরের যোদ্ধাদের তৈরি মসজিদের মিরাব। আজ যারা এখানকার গাঁওবুড়ো, তুকুলোর বিজেতা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার চুল ছেঁটে মাথা কামিয়ে দিয়েছিলো। যারা কোরানের বিধিনিষেধ মানতে চায়নি, ধড় থেকে তাদের মুণ্ড সে উড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন আবার গাঁওবুড়োরা চুল রাখে, বিনুনি বেঁধে। গোঁড়া তালিবেরা একদিন যে-পবিত্র বনগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিলো, অনেকদিন হ'লো সে-সব আবার বড়ো হ'য়ে গিয়েছে। এখনও সেখানে র'য়ে গেছে পুজোর উপকরণগুলো—জোয়ার সেদ্ধ করতে করতে শাদা-হওয়া সব হাঁড়িকুড়ি বা বলি-দেয়া মুরগি বা কুকুরের রক্ত জ'মে জ'মে খয়েরি হ'য়ে-যাওয়া সব বাসনকোসন।

পাটাতনে ধানের আঁটি আছড়ালে যেমন ধান ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে, কিংবা রসে টইটম্বুর ফল যেমন খ'সে পড়ে গাছ থেকে, তেমনিভাবেই গোটা-গোটা পরিবার ডুগুবা ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলো নতুন-নতুন গ্রামের পত্তন করতে। —ডুগুবানিস। কোনো-কোনো ছোকরা কাজকর্মের সন্ধানে যেতো সেগু, বামাকো, কায়ে অথবা ডাকার-এ; অন্যরা কাজ করতে যেতো সেনেগালের বাদাম বনগুলোয়, ফিরে আসতো ফসল তোলা শেষ ক'রে, সব মাল জাহাজ বোঝাই ক'রে ভিনদেশে পাঠিয়ে দেবার পর। সবাই জানতো যে তাদের জীবনের শিকড় কিন্তু এখনও ডুগুবাতেই প্রোথিত, যেখান থেকে অনেক দিন আগেই ইসলাম যাযাবরদের সব চিহ্ন মুছে গিয়েছে, যেখানে আবার ফিরে এসেছে পূর্বপুরুষের রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা।

ডুগুবারই একটি ছেলে কিন্তু সাহস ক'রে চ'লে গিয়েছিলো সকলের চেয়ে দূরে, আর সেখানে থেকেও ছিলো সবচেয়ে বেশিদিন : তার নাম থিমেখো কইতা।

ডুগুবা থেকে সে গিয়েছিলো স্থানীয় রাজধানীতে, সেখান থেকে কাটি, কাটি থেকে ডাকার, ডাকার থেকে ক্যাসাব্লাঙ্কা, ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে ফ্রেজু, আর তারপর দামাস্কাস। সৈন্য হবে ব'লে সুদান ছেড়েছিলো থিমেখো কইতা, ট্রেনিং নিয়েছিলো সেনেগালে, যুদ্ধ করেছিলো মরোক্কোয়, ফ্রান্সে হয়েছিলো পাহারাদার, আর লেবাননে শান্তিরক্ষী। শেষমেশ আমার ডাক্তারি ক্যারাভানের সঙ্গে সে ফিরে এলো ডুগুবায়—একজন সার্জেন্ট হিসেবে।

আমি তখন পশুর ডাক্তার হিসেবে সুদানের দূর-দূরান্তরে রোদে বেরুচ্ছি। এই সময়ে স্থানীয় শাসনকর্তার দপ্তরে আমার সঙ্গে সার্জেন্ট কইতার দেখা হ'য়ে গেলো। সে তখন সদ্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে—ইচ্ছে যে, হয় স্থানীয় পুলিশ বাহিনীতে কাজ নেয় অথবা কোনো দোভাষীর কাজ পায়।

'না-না,' স্থানীয় শাসনকর্তা তাকে বলেছিলেন, 'গ্রামে ফিরে গেলেই তুমি বরং আমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে। তুমি এত ঘুরেছো, এত দেখেছো-শুনেছো, তুমিই তো সহজে অন্যদের শেখাতে পারবে শাদারা কেমন ক'রে থাকে। তুমি তো তাদের অন্তত একটু "সভ্য" করে তুলতে পারবে। আচ্ছা, ডাক্তার,'—আমার দিকে ফিরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যখন ওদিকটাতেই যাচ্ছেন, তো কইতাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান না কেন? তাতে ওকে অতটা রাস্তার ধকল সইতে হবে না, তাছাড়া সময়ও কিছুটা বাঁচবে। ও দেশ ছেড়েছে তা সে বছর পনেরো তো হবেই।'

অতএব আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ছোট্ট ট্রাকটার সামনের আসনে বসলাম আমি, সার্জেন্ট আর ড্রাইভার, আর পেছনে বসলো রাঁধুনিরা, আমার সহকারীরা, ড্রাইভারের শাগরেদ, আর সরকারি রক্ষীরা—সফরের রান্নাঘরের জিনিসপত্তর, ক্যাম্প খাট, আর ওষুধবিষুধ ও টিকে দেবার সিরামের বাক্সগুলোর মধ্যে গাদাগাদি ক'রে। সার্জেন্ট আমাকে তখনই তার সেনাজীবনের কথা বলেছিলো, বলেছিলো তারপর যখন সে সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী হয় তখনকার কথা। সুদানের কোনো বন্দুকবাজের পক্ষ থেকে রিফ যুদ্ধ কেমন হয়েছিলো, তার বিবরণ আমি শুনেছিলাম; সে শুনিয়েছিলো মার্সেই, তুলোঁ, ফ্রেজু, বেইরুটের কথা। আমাদের চোখের সামনের রাস্তাটা যেন তার চোখে পড়ছিলো না। ঢেউ-তোলা টিনের চালের মতো রূঢ় অসমতল এই রাস্তা—কাঠের গুঁড়ির ওপর কাদার আস্তর বুলিয়ে শান বাঁধানো, এই প্রচণ্ড গরম আর দারুণ শুকতায় সে-প্রলেপ এখন গুঁড়িয়ে ধুলো হ'য়ে গিয়েছে। কেমন একরকম তেলতেলে

ধুলো হলদে মুখোশের মতো এঁটে বসছিলো আমাদের চোখেমুখে, ধুলোয় আমাদের দাঁতগুলো কিচকিচ করছে, আর কিচিরমিচির তোলা বেবুন বা ভয়চকিত যে-সব হরিণী আমাদের পথের ওপর লাফিয়ে পড়ছিলো, ধুলোর এই পর্দা তাদেরও আমাদের চোখ থেকে ঢেকে দিচ্ছিলো। এই দমবন্ধ আব-ছায়াতেও কইতা কিন্তু, মনে হচ্ছিলো, তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ফেজ-এর মিনার, মার্সেই-এর উত্তাল জলস্রোত, ফ্রান্সের বড়ো-বড়ো সব দালানকোঠা আর নীল সমুদ্র।

দুপুরের মধ্যেই আমরা পৌঁছেছিলাম মাতুগু শহরে—এখানেই রাস্তা শেষ। রাত নামবার আগেই ডুগুবা পৌঁছবার জন্য আমরা নিয়েছিলাম ঘোড়া আর বাহক।

'এরপর যেবার আপনি এ-পথে আসবেন,' কইতা বললে, 'একেবারে ডুগুবা অব্দি পুরো রাস্তাই আপনি গাড়ীতে যেতে পারবেন। কালকেই আমি রাস্তা বানাবার কাজে লেগে যাবো।'

একটা টমটমের অস্ফুট আওয়াজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে আমরা কোনো গ্রামের কাছে এসে পড়েছি। দেখা দিলো আবছাধূসর কুঁড়েঘরের সারি, বিবর্ণতর ধূসর আকাশের পটভূমি গাঢ়তর ধূসর রঙের তিনটি তালগাছ দাঁড়িয়ে। গুমগুমে শব্দটার সঙ্গে এবার মিশেছে একটা বাঁশির সুর—তীক্ষ্ণ তিনটি স্বরগ্রাম। আমরা ডুগুবা পৌঁছে গেছি। আমিই সকলের আগে নেমে প'ড়ে গাঁয়ের মোড়লের খোঁজ করলাম।

'ডুগু-টিগুই, এই-যে তোমার সন্তান, সার্জেন্ট কইতা।' তার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেছিলো থিমেথো কইতা। যেন মাটির ওপর তার জুতোর শব্দ ছিলো কোনো সংকেত—অমনি থেমে গেলো মাদলের বোল আর বাঁশির সুর। বুড়ো মোড়ল কইতার দু-হাত ধরলো আর অন্য বুড়োরা তার বাহু, কাঁধ, তার মেডেলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো। কয়েকজন বুড়ি ছুটে এলো, আর তার হাঁটুর ওপরকার পট্টিগুলো আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। কালো মুখগুলোর মধ্যে চকচক ক'রে উঠলো চোখের জল—উপজাতির ক্ষতচিহ্নগুলো আর মুখের অসংখ্য বলিরেখার ভাঁজে-ভাঁজে তা আটকে রইলো। সকলেরই মুখে শুধু:

'কইতা! কইতা! কইতা!'

'যাঁরা,' কম্পিত স্বরে অবশেষে বুড়ো মোড়ল বললে, 'যাঁরা আমাদের গাঁয়ে আজ আবার তোমার পায়ের চিহ্ন নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সদাশয় ও ভালো মানুষ।'

সত্যি বলতে ভুগুবার অন্য দিনগুলোর চাইতে এই দিনটা ছিলো আলাদা। এটা ছিলো কোতেবা বা পরীক্ষার দিন।

আবার মাদল তার বোল শুরু ক'রে দিলো, আর তাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বেজে উঠলো বাঁশির শিস। গণ্ডির ভেতরটায় ছিলো নারী পুরুষ আর শিশুরা, আর খোলা-বুক তরুণেরা, প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে বালাজান গাছের ডাল—চাঁছা, পরিষ্কার, আর চাবুকের মতো নমনীয়, আর তারা ঘুরে-ঘুরে নাচছিলো টমটমের তালে-তালে। সেই আন্দোলিত গণ্ডির ঠিক মাঝখানে, হাঁটু মুড়ে আর মাটিতে কনুই ঠেকিয়ে গুঁড়ি মেরে ব'সে, বংশীবাদক ফুঁ দিয়ে চলেছে তিনটি স্বরে—সব সময়েই একই তিনটি স্বর। মাঝে-মাঝে কোনো তরুণ এসে দাঁড়ায় তার ওপর, পা দুটি ফাঁক করা, ক্রুশের ভঙ্গিতে হাত দুটি ছড়ানো, —আর অন্যরা তখন, তার কাছ দিয়ে যেতে-যেতে, শপাং ক'রে আছড়ায় তাদের চাবুক। চাবুকের ঘা এসে পড়ে তার বুকে, ডোরা কেটে যায় বুড়ো আঙুলের মতো চওড়া, মাঝে-মাঝে চামড়া ফাটিয়ে দেয়। বাঁশির তীক্ষ্ণ স্বর তখন চ'ড়ে যায় আরেক পর্দা, টমটমের বোল হ'য়ে আসে আরো-নরম, আর চাবুক শিস দেয়, রক্ত ঝরে পড়ে। কালো-বাদামি গায়ে আগুনের আলো চকচক ক'রে ওঠে আর অঙ্গার থেকে আলো লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে তালগাছের ডগা অব্দি —সন্ধ্যের হাওয়ায় আস্তে মর্মর তুলে। কোতেবা! সহ্যশক্তির পরীক্ষা, যন্ত্রণার বোধ অবলুপ্ত ক'রে দেবার পরীক্ষা। যে শিশু কোনো আঘাতের যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে, সে নিছকই শিশু: যে শিশু যন্ত্রণার চোটে আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে কখনো সত্যিকার পুরুষ হ'য়ে উঠবে না।

কোতেবা! তার মানেই নিজের পিঠ বাড়িয়ে দেয়া, আঘাত গ্রহণ করা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য কাউকে সেই আঘাত দেয়া। কোতেবা!

'এ-সব…এ-সব এখনও জংলিদের রীতি দেখছি যে!'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, মাদলের পাশে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সার্জেন্ট কইতা।

জংলিদের রীতি? এই পরীক্ষা, যা কিনা অন্য সব কিছু বাদ দিলেও এমন মানুষ গ'ড়ে দেয় যে শক্ত, কঠিন, সমর্থ! কী সেই বস্তু যা এইসব যুবকের

পূর্বপুরুষদের একদিন ক্ষমতা দিয়েছিলো মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিনের পর দিন না থেমে চলতে? কী সেই বস্তু, যা স্বয়ং থিমেখো কইতা এবং তারই মতো অন্য অনেক পুরুষ সৃষ্টি করেছে—যারা যুদ্ধ করেছে এমন-সব আকাশের তলায় যেখানে সূর্য নিজেই অনেক সময়ে ছিলো বিবর্ণ ও পাণ্ডুর, যারা পিঠের ওপর প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে দিনের পর দিন, সহ্য করেছে ঠাণ্ডা, পিপাসা, ক্ষুধা?

জংলিদের রীতি? হয়তো-বা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে অন্যখানে, যেমন আমি নিজে যেখান থেকে এসেছি, আমরা এইসব দীক্ষার অনুষ্ঠান পিছে ফেলে এসেছি। আমাদের কিশোরদের জন্য আর নেই সেইসব 'পুরুষ ভবন', যেখানে শরীর মন আর চরিত্র ইস্পাতের মতো পিটিয়ে গড়া হয়; যেখানে উপুড় পিঠে বা বাড়ানো আঙুলে ঘা দিয়ে শেখানো হ'তো পাসিন, হেঁয়ালি আর যত কঠিন জিজ্ঞাসা; অথবা যেখানে শেখানো হ'তো 'কাসাক', যুগযুগান্তরের পুরোনো সেই গানগুলো যা ছিলো স্মরণশক্তির ব্যায়াম, যার বাণী আর প্রজ্ঞা আমাদের ওপর বর্ষিত হ'তো অন্ধকার সব রাত্রি থেকে, আমাদের মাথায় যাকে সুনিশ্চিত স্থান দেবার জন্য জ্বলন্ত কয়লার তাপ দেয়া হ'তো, আমাদের হাতের চেটো যাতে পুড়ে যেতো। আমি ভাবছিলাম আমি অন্তত যদ্দূর বুঝতে পারি তাতে আমরা অর্জন করিনি কিছুই, যে হয়তো আমরা এইসব পুরোনো রীতিনীতি ছেড়ে এসেছি নতুন কোনো প্রথা অর্জন ক'রে নেবার আগেই।

বাঁশির সেই তীব্র চেরা শব্দকে লালন ক'রে ক'রে টমটমের মর্মর চলতে লাগলো। আগুনরা ম'রে গেলো, জন্মালো আবার। যে কুঁড়ে বাড়িটায় আমার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, আমি সেখানে চ'লে গেলাম। ভেতরে, ছেঁড়াখোঁড়া পচা খড়ের শুকনো কাদামাটির তাল মাখিয়ে কুঁড়েকে যে-বৃষ্টিনিরোধ করা হয়েছিলো সেই বান্‌কোর পুরু ভারি গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে ঝুলে ছিলো সূক্ষ্মতর আরো একটি গন্ধ, মৃতের গন্ধ, যার সংখ্যা তিন, বোঝা যাচ্ছিলো দেয়ালের গায়ে কোনো মানুষ সমান উঁচুতে তিনটি জন্তুর শিং দেখে। কারণ, ডুগুবায় এমনকি গোরস্থানও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, আর মৃতেরা জীবিতের সঙ্গেই বেঁচে আছে। তাদের কবর দেয়া হয় কুঁড়ের মধ্যেই।

যখন আমি বিদায় নিলাম রোদ তখন বেশ চ'ড়ে গিয়েছে, কিন্তু ডুগুবা তখনও ঘুমিয়ে আছে নেশাচ্ছন্ন-অবসাদ, আর কালাবাশে-কালাবাশে যে

জোয়ারের মদ হাত থেকে মুখে আর মুখ থেকে হাতে ঘুরেছে সারা রাত ধ'রে, তার ফলেই।

'বিদায়,' বলেছিলো কইতা, 'পরের বার আপনি যখন এখানে আসবেন দেখবেন যে পাকা রাস্তা হ'য়ে গেছে—কথা দিচ্ছি।'

বিভিন্ন বিভাগে এবং অন্য নানা অঞ্চলে কাজে ব্যস্ত থাকায় পরের বছরের আগে আমি আর ডুগুবা যেতেই পারিনি।

বেলা প'ড়ে এসেছে, পথের ধকলও বিস্তর ছিলো। হাওয়া কেমন যেন পুরু আর ভারি হ'য়ে ঝুলে ছিলো, গরম আর চটচটে, তার ফলে আমাদের দারুণ কষ্ট ক'রে এগুতে হয়েছিলো।

সার্জেন্ট কইতা তার কথা রেখেছে : একেবারে ডুগুবা অব্দি পুরো রাস্তা ছিলো শানবাঁধানো। সব গাঁয়েই যেমন হয়, গাড়ির শব্দ শুনেই পালে-পালে ন্যাংটো ছেলেমেয়ে এসে রাস্তার ধারে ভিড় জমালো, তাদের ছোট্ট শরীরগুলো ধুলোয় ধূসর, আর তাদের পায়ে-পায়েই এলো লালচে-খয়েরি কুকুরের পাল, কান ছাঁটা, হাড়-জিরজিরে। ছেলেমেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে-একজন বয়স্ক লোক হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে, তার ডান মণিবন্ধে বাঁধা একটা গরুর ল্যাজ নাড়াচ্ছে। গাড়ি থামতেই আমি দেখতে পেলাম এ আর কেউ নয়, স্বয়ং সার্জেন্ট, থিমেখো কইতা। তার পরনে একটা রংজ্বলা ছেঁড়াখোঁড়া কুর্তা, তার না-আছে কোনো বোতাম, না-আছে কোনো রশি। নিচে একটা 'বুবু' পরা, আর পাৎলুনটা তৈরি খাকি রঙের সুতি কাপড়ের ফালিতে, যেমন এককালে পরতো গাঁওবুড়োরা। হাঁটুর ওপরেই শেষ হয়েছে তার পাৎলুন, রশি দিয়ে বাঁধা ব'লেই খুলে প'ড়ে যাচ্ছে না। তার পট্টিগুলো শতচ্ছিন্ন। খালি পা, মাথায় 'কেপি'।

'কইতা!'

ছেলেমেয়েগুলো ছিটকে পড়লো চড়ুই পাখির ঝাঁকের মতো, আর সেই-রকমই কিচিরমিচির তুললো :

'না! না!'

থিমেখো কইতা আমার হাত ধ'রে ঝাঁকালো না। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু আমি যেন তার চোখেই পড়ছি না। তার দৃষ্টি এতই সুদূর প্রসারিত যে ফিরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম আমাকে ছাড়িয়ে

গিয়ে তার দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ। হঠাৎ তার মণিবন্ধের গরুর ল্যাজটি নেড়ে কেমন অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো :

শোনো সব বস্তুদের কান পেতে
প্রাণীদের যত শোনো
তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর
শোনো অগ্নি শোনো জল শোনো-শোনো বাতাস কিভাবে
ঝোপের ভিতরে ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের শ্বাসক্রিয়া, এটা মনে রেখো।

'ও পাগল,' বললে আমার ড্রাইভার, আর তাকে আমি ইঙ্গিতে চুপ করিয়ে দিলাম। সার্জেন্ট তখনও মন্ত্রের মতো গান গেয়ে চলেছে, কেমন অদ্ভুত, টানা-টানা গলায় :

যারা মৃত তারা কেউ কখনোই পুরোপুরি হয়নি উধাও
যে-তিমির ধীরে-ধীরে আলো হয়
তারা সব র'য়ে গেছে সেই অন্ধকারে
এবং রয়েছে তারা সেই গূঢ় তমিস্রাতে
গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'য়ে আসে ক্রমে-ক্রমে
যে-দীর্ঘ তিমির
মৃতেরা কখনো নেই মাটির ভিতরে মাটি চাপা
তারা সব র'য়ে গেছে গাছপালাপাতার শিহরে
বনের কাতর ক্ষীণ আর্তনাদে
যে-জল প্রবলবেগে দূরে ছুটে যায়
যে-জল ঘুমিয়ে থাকে নিরিবিলি একা
সেইসব জলে
তারা আছে কুটিরে, বাড়িতে, যত ভিড়ের ভিতরে।

মৃতেরা মোটেই নয় মৃত।
প্রাণীদের যত শোনো
তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর

শোনো অগ্নি শোনো জল শোনো-শোনো বাতাস কিভাবে
ঝোপের ভিতরে ধ্যালে দীর্ঘশ্বাস
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের শ্বাসক্রিয়া, এটা মনে রেখো
সে-পূর্বপুরুষ যারা কোনোদিনও হয়নি উধাও
যারা নেই মাটির ভিতরে মাটিচাপা
যারা কেউ সত্যি-সত্যি কখনো মরে না।

যারা ম'রে গেছে তারা পুরোপুরি হয়নি উধাও
তারা সব র'য়ে গেছে মাতৃস্তন্যে শিশুর ক্রন্দনে
আর যত অগ্নিময় কাঠে আর উষর শিলায়
বিলাপে আতুর যত তৃণের ভিতর
তারা আছে বনে-বনে তারা আছে সকলেরই ঘরে
মৃতেরা মোটেই নয় মৃত।

আগুন কেমন ক'রে কথা বলে কান পেতে শোনো
শোনো জল কোন্ কথা কয়
ফুলে-ফুলে কেঁদে ওঠে ঝোপ, তাকে বাতাস কী কথা বলে—
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রাচীন বন্ধন তারা প্রতিদিন আবার নতুন ক'রে বাঁধে
আদিম সে-রাখী যেটা দৃঢ় ধ'রে রাখে সকলেরে
আমাদের ভাগ্য বাঁধে তাদের বিধির দীর্ঘ ডোরে
আমাদের চেয়ে ঢের বলশালী আত্মাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে
জীবনের সাথে বাঁধে আমাদের সকলেরে সংহিতা যাদের
যাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় বেঁধে রাখে যত গূঢ় আকাঙ্ক্ষার সাথে
তারই তো আকাঙ্ক্ষা সব, মৃতের আত্মার,
যে বয় নদীর খাতে তীরের চঞ্চল কোলাহলে
পূর্বজাত পুরুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস
শিলায়-শিলায় কাঁদে ব্যাকুল কেবল কাঁদে তৃণের ভিতরে

যে-তিমির আলো হ'য়ে আসে

যে-তমিস্রা আরো গাঢ় হয়
সেইখানে মৃতের আবাস
শিহরণশীল গাছে মর্মরস্ফুরিত বনে-বনে
উচ্ছল চঞ্চল জলে সুপ্তিমগ্ন অলস সলিলে
মৃতেরা অনেক বলী আমরা ততটা বলী নই
যে-মৃতেরা বাস্তবিক কখনো মরেনি
যে-মৃতেরা পুরোপুরি হয়নি উধাও কোনোদিন
যে-মৃতেরা আর নেই পৃথিবীতে মাটির ভিতরে
সেইসব মৃতের নিশ্বাস।

শোনো সব বস্তুদের কান পেতে
প্রাণীদের যত শোনো
তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর…

ছেলেমেয়ের পাল ফিরে এলো, ঘিরে দাঁড়ালো বুড়ো মোড়ল আর অন্য-সব গাঁওবুড়োদের। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আমি জিগ্যেস করলাম সার্জেন্ট কইতার ব্যাপারটা কী।

'না! না!' বললে বুড়োরা। 'না! না!' প্রতিধ্বনি করলো বাচ্চারা।

'না, না, কইতা নয়!' বুড়ো মোড়ল বললে, 'সারজান, শুধু সারজান![১] আমরা যেন মৃতদের কিছুতেই না-রাগাই। সারজান এখন আর মোটেই কইতা নয়। মৃতেরা, আত্মারা তাকে তার অপরাধের যেন সাজা দিয়েছেন।'

শাস্তি শুরু হয়েছিলো সে সেখানে পৌঁছুবার পরদিন থেকেই, ঠিক যেদিন আমি ডুগুবা থেকে বিদায় নিই।

সার্জেন্ট কইতা নিরাপদে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে এসেছে ব'লে তার বাবা একটা শাদা মুরগি উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন পূর্বপুরুষদের—কইতা তাতে বাধা দেয়, বলে যে, সে যে বাড়ি ফিরে এসেছে, তা নেহাৎ বাধ্য হ'য়েই, তা না-ক'রে যেহেতু কোনো উপায় ছিলো না। এবং এর সঙ্গে তার পূর্বপুরুষদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

১। সারজান হ'লো সার্জেন্ট কথাটিরই সেনোগালি সংস্করণ।

'মৃতদের নিয়ে আবার টানাটানি কেন,' সে বলেছিলো, 'তারা যেমন আছে তেমনি থাক। যারা বেঁচে আছে, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল কিছুই করার কোনো ক্ষমতা তাদের আর নেই।'

বুড়ো মোড়ল সে-কথায় কোনো পাত্তা দেয়নি—মুরগিটাকে যথারীতি উৎসর্গ করাই হয়েছিলো।

যখন ক্ষেতে কাজ করতে যাবার সময় এলো, থিমেথো বলেছিলো এজন্যে কালো মুরগিগুলো জবাই ক'রে তাদের রক্ত ক্ষেতের কোণায় ফেলবার রীতিটা কেবল যে অর্থহীন তা-ই নয়, রীতিমতো বোকামি। কাজ করাই তো, সে বলেছিলো, যথেষ্ট। বৃষ্টি যদি পড়বার হয় তো এমনিতেই পড়বে। জোয়ার, ভুট্টা, চিনেবাদাম, ইয়াম, বীন—নিজে-নিজেই গজাবে, এবং খুবই ভালো ফসল হবে যদি গাঁয়ের লোকে স্থানীয় শাসনকর্তার পাঠানো জোয়াল ইত্যাদি ব্যবহার করে। দাসিরি গাছ পুণ্যতরু, গাঁয়ের আর ফসলের রক্ষাকর্তা, তার গোড়ায় কুকুর কেটে উৎসর্গ করা হয়;—কইতা সেটাকে কেটে ফেলে তার ডালপালাগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

ছোটো ছেলেমেয়েদের যেদিন সুন্নৎ করার কথা, সার্জেন্ট কইতা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গানগুরাং অর্থাৎ তাদের গুরুর ওপর—সে তখন নেচে-নেচে মন্ত্র আওড়াচ্ছিলো। গানগুরাং তার মাথায় শজারুর কাঁটার যে শিরো-ভূষণ পরেছিলো, আর শরীর ঢাকবার জন্য জাল-জাল পোশাক প'রেছিলো, তা সে টেনে খুলে দেয়। পূজ্যপাদ পিতামহ মামা দিজোম্বা গাঁয়ের তরুণীদের দীক্ষা দিতেন, কইতা তার মাথা থেকে গ্রি-গ্রি মন্ত্র আর ফিতে ঝোলানো শঙ্কুর মতো হলদে টুপিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। এ-সব নাকি, সে বলেছিলো, জংলিদের রীতি'। অথচ সে কিনা গেছে নীস্, দেখেছে মজার আর ভয়ের মুখোশ পরা কার্নিভাল। শাদারা বা তুবাবরা—এটা সত্যি যে—মুখোশ পরে মজা করবার জন্য—তাদের ছেলেমেয়েদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষা দেবার জন্য নয়।

তাদের কুঁড়েতে ঝোলানো ছোট্ট ঝোলাটা—যার মধ্যে নিয়ানকোলি থাকে, কইতাদের বাস্তুদেবতা—টেনে, খুলে, উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সার্জেন্ট কইতা, আর রোগাপটকা কুকুরগুলো আরেকটু হ'লেই বাচ্চাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতোই হয়তো যদি না সময়মতো বুড়ো মোড়ল সেখানে গিয়ে পড়তো।

একদিন সকালে সে গিয়েছিলো পুজোর বনে, গিয়ে জোয়ার সেদ্ধ আর দইয়ের

বাটিগুলো ভেঙে দিয়ে এসেছিলো। ছোটো-ছোটো মূর্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে ঢুকেছিলো সে, দু-ফলা বল্লমগুলো টেনে তুলেছিলো, ফলাগুলো সব রক্তের ডেলা আর মুরগির পালকে মাথামাখি হ'য়ে ছিলো। 'জংলিদের সব রীতি,' সে বলেছিলো এদের। সার্জেণ্ট এদিকে অথচ গির্জেয় গেছে। সেখানে সাধু সন্তদের ছোটো-ছোটো মূর্তি দেখেছে নিজের চোখে, দেখেছে দিব্য কুমারীকে, যার সামনে লোকে মোমবাতি জ্বালায়। এটা সত্যি যে এ-সব মূর্তি ঝলমলে সব রঙে রাঙানো, নীল, লাল, হলদে আর গায়ে সোনার কাজ করা। সত্যি যে পুজোয় বনের কালিসেদ্রা বা মেহগিনি কাঠে তৈরি লম্বা হাত খাটো পা-ওলা সব পিগমি মূর্তির চেয়েও সেগুলো ঢের সুন্দর।

'তুমি তো তাদের একটু "সভ্য" ক'রে তুলতে পারবে,' বলেছিলেন স্থানীয় শাসনকর্তা। সার্জেণ্ট কইতা অতএব তার দেশের লোকদের "সভ্য" ক'রে তুলবেই। অতএব, ভেঙে ফেলতে হবে ঐতিহ্য, খতম ক'রে দিতে হ'বে সেইসব বিশ্বাস যার ওপর ভর দিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের জীবন-যাত্রা, পরিবারের অস্তিত্ব, লোকজনের আচার-ব্যবহার। কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ চাই। জংলিদের যত রীতি! জংলিদের রীতিনীতি! সুন্নৎ করার সময় যে রূঢ় কঠোর আঘাত করা হয় শিশুদের তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য, তাদের চরিত্র গ'ড়ে দেবার জন্য যে, কখনও, কস্মিন কালেও, কোনোখানেই, তাদের জীবদ্দশায় তারা একা থাকবে না—একা থাকতে পারবে না। জংলিদের যত রীতি, অর্থাৎ কোতেবা, যা গ'ড়ে তোলে সত্যি-মানুষ, যার ওপর যন্ত্রণার কোনো প্রভুত্ব খাটে না। জংলীদের রীতিনীতি…এই সব বলি আর উৎসর্জন, পূর্বপুরুষ আর মাটির উদ্দেশে অঞ্জলি দেয়া এই রক্ত…যাযাবর সব আত্মা আর রক্ষাকর্তা, দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত এই জোয়ার সেদ্ধ আর দই… জংলীদের যত রীতিনীতি!

এইসবই সার্জেণ্ট কইতা পালাভার-গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো গ্রামের সমবেত ছেলেবুড়োকে বলেছিলো—দৃঢ়স্বরে।

তখন প্রায় সূর্য ডোবার সময়, যখন সার্জেণ্ট কইতা পাগল হ'য়ে গেলো। সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো পালাভার-গাছে, মুখে কথার তোড়, কথা, কথা আর কথা, ওঝার বিরুদ্ধে নালিশ, যে কিনা সেদিনই সকালে বলি দিয়েছে কতকগুলো কুকুর, বুড়োদের বিরুদ্ধে নালিশ যারা কিনা তার কথা একবর্ণও

শুনতে চায় না, ছোটোদের বিরুদ্ধে নালিশ, যারা কিনা এখনও বুড়োদের কথায় কান দেয়। তখনও তার মুখে কথার খই ফুটছে, এমন সময় হঠাৎ সে অনুভব করলে তার বাম কাঁধে কী যেন বিঁধে গেলো। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে একবার, তারপর যখন সে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকালে তখন তার চোখের দৃষ্টি আর আগের মতো নেই। তার ঠোঁটের কোণায় শাদা ফেনা। সে কথা বললে, আবারও, কিন্তু তার মুখ থেকে এবার কিন্তু একেবারে অন্য কথা বেরুলো। আত্মারা তার মনটিকে নিয়ে গিয়েছে, আর এখন সবাই আর্তনাদ ক'রে উঠলো আতঙ্কে :

কালো রাত! কালো রাত!

সে চেঁচিয়ে উঠলো রাত নামতেই, আর মেয়েরা ছোটোরা ভয়ে কাঁপলো তাদের কুঁড়ের মধ্যে :

কালো রাত! কালো রাত!

সে চেঁচিয়ে উঠলো উষার সময় :

কালো রাত! কালো রাত!

সে হাউ-হাউ ক'রে উঠলো ভর দুপুরে। রাত আর *দিন*, *দিন* আর রাত পূর্বপুরুষেরা, আত্মারা, দেবতারা তাকে দিয়ে কথা বলালো, কাঁদালো, জপালো, আর্তনাদ করালো…

তখন সকাল ফুটি-ফুটি, আমি কোনো রকমে একটুখানি ঢুলতে পারলাম সেই কুঁড়ের মধ্যে যেখানে মৃতেরা বেঁচে থাকে। সারারাত ধ'রে আমি শুনেছি সার্জেন্ট কইতার আসা-যাওয়া, তার হাউ-হাউ, তার কান্না, আর তার গান :

আঁধার জটিল বনে
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত! কালো রাত!

কালাবাশে দুধ ট'কে যায়

যত মণ্ড বোয়ামে জমাট
বিভীষিকা ওত পাতে কুঁড়ের ভিতরে,
কালো রাত! কালো রাত!

মশাল ছড়িয়ে দেয় আকাশে হাওয়ায়
অশরীরী যত অগ্নিশিখা
তারপর, ধীরে, আসে ধূম্রপুঞ্জ রক্তচক্ষুহীন,
কালো রাত! কালো রাত!

অস্থির আত্মারা সব
এলোমেলো কাৎরায় ঘোরে
অস্ফুট কেবল বলে শব্দ কোন্ হারানো ভাষার,
যে-সব হারানো শব্দ বিভীষিকা জাগায় হৃদয়ে,
কালো রাত! কালো রাত!

হিমজমা মুরগির শরীর
কিংবা উষ্ণ চলন্ত শবের
একফোঁটা রক্তও ঝরে না
নয় কোনো কালো রক্ত কিংবা নয় টকটকে লোহিত,
কালো রাত! কালো রাত!
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত! কালো রাত!

অন্তহীন, নিষ্ফল, চঞ্চল
পরিত্যক্ত পাড় থেকে পাড়ে
মানুষের জন্য কোন নিদারুণ ভয়ে
অনাথ আতুর নদী ডেকে-ডেকে ঘুরে-ঘুরে বলে,
কালো রাত! কালো রাত!

আর ঘন সাভানায় নিঃসঙ্গ একাকী
পূর্বজাত পুরুষের আত্মা যাকে ছেড়ে গেছে
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত

অভিশপ্ত ঢাকের উপর,
কালো রাত ! কালো রাত !

শঙ্কায় ব্যাকুল গাছে-গাছে
যত রস হিম জ'মে যায় ডালপালায় পাতায়
পূর্বজাত পুরুষেরা একদিন এসেছে এখানে
তাদের নিশ্চল পাদদেশে
অথচ এখন তারা বোবা সব
আর তারা জানে না প্রার্থনা,
কালো রাত ! কালো রাত !

কুটিরে-কুটিরে ভয় গুড়ি মেরে ব'সে আছে ওই
ভয় আছে ধূমার্ত মশালে
ভয় আছে অনাথ নদীতে
ভয় আছে অবসন্ন আত্মাহীন বনের ভিতরে
ভয় আছে শঙ্কাতুর রংচটা গাছে

আঁধার জটিল বনে
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত ! কালো রাত !

আর কারু সাহস হয় না তাকে তার নাম ধ'রে ডাকে, কারণ আত্মারা, দেবতারা, পূর্বপুরুষেরা তো তাকে পুরোপুরি অন্য এক নতুন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন ! থিমেথো কইতা গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে । তার বদলে র'য়ে গেছে শুধু 'সারজান,' পাগলা সারজান ।

অনুবাদ : স্বাতী ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেম্বেন উসমান

উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোল্‌তেইকরা

সন্ধ্যেবেলাগুলো আমরা যেতুম মেন্‌-এর ওখানে; সেখানে পুদিনা মেশানো চা খেতে-খেতে কত বিষয়ে কথা হ'তো আমাদের—যদিও অনেক বিষয়েই আমাদের জ্ঞান ছিলো সামান্য। কিন্তু ইদানীং আমরা বড়ো-বড়ো সমস্যা-গুলো এড়িয়ে যেতুম—যেমন বেলজিয়ান কঙ্গোর কথা, মালি যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডগোলের বিষয়, আলজেরিয়ার স্বাধীনতার লড়াই অথবা জাতিপুঞ্জের পরবর্তী অধিবেশনের কথা। তার কারণ ছিলো সেয়ার, বেশির ভাগ সময়েই যার মাথা থাকতো ঠাণ্ডা, আর যার স্বভাবটা ছিলো গম্ভীর। প্রশ্নটা সে-ই তুলেছিলো। 'আমাদের জাতের লোকের গায়ে ও-রকম জখমের দাগ থাকে কেন?'

(এখানে আমার যোগ করা উচিত যে সেয়ার ছিলো আধা-ভোল্‌তেইক, আধা-সেনেগালি; কিন্তু তার নিজের গায়ে কোনো জাতিগত ক্ষতচিহ্ন ছিলো না।)

আমাদের সকলের মুখে যদিও ও-রকম কোনো ঘায়ের দাগ ছিলো না, তবু আমি কখনো ও-রকম উত্তেজিত আলোচনা শুনিনি—শুনিনি ও-রকম অনর্গল কথা—অন্তত যদ্দিন ধ'রে আমরা মেন্‌-এর বাড়িতে আড্ডা দিতে যাচ্ছিলুম। আমাদের কথা শুনে যে-কারও মনে হ'তে পারতো যে গোটা আফ্রিকা মহাদেশের ভবিষ্যৎটাই বুঝি বিপন্ন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে রোজ সন্ধ্যেয় যত অদ্ভুত-অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হ'তো। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ তো আশপাশের গাঁগুলোয়—এমনকি আরো দূরেও—চ'লে যেতো, গাঁওবুড়ো আর পুরুতদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য—তাদেরই কিনা এ-অঞ্চলের 'জ্যান্ত বিশ্বকোষ' ব'লে ধরা হ'তো। তারা যেতো শুধু এই রহস্যটার গভীরে তলিয়ে দেখবার জন্য—কেননা এটা মনে হচ্ছিলো যে এই ক্ষতচিহ্নের ব্যাপারটা কোনো সুদূর অতীতে প্রোথিত হ'য়ে আছে।

সবগুলো ব্যাখ্যাই যে ভুল, এটা সেন্নার বুঝিয়ে দিতে পারলো।

কেউ-একজন তীব্রস্বরে বলেছিলো যে, 'এটা হ'লো বংশগরিমার চিহ্ন,' আরেকজন বলেছিলো, 'এটা দাসত্বের প্রতীক।' তৃতীয় আরেকজন ঘোষণা করেছিলো যে, 'এটা নিছকই একটা শোভার চিহ্ন—এককালে এমন-এক জাতি ছিলো যারা গায়ে-মুখে এই বিশেষ চিহ্নগুলো না-থাকলে কোনো ছেলেমেয়েকেই বিয়ে করতো না।' আরেকজন ভাঁড় গম্ভীর স্বরে বলেছিলো: 'একদা আফ্রিকার কোনো ধনী সর্দার তার ছেলেকে ইওরোপে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলো। সর্দারের ছেলে যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যায়, তখন সে ছিলো নেহাৎই ছেলেমানুষ—যখন ফিরে এলো, তখন সে প্রাপ্তবয়স্ক। তো আমরা বলতে পারি যে সে ছিলো শিক্ষিত—একজন বুদ্ধিজীবী। সে তার নিজের জাতের লোকদের আর সব প্রথা-পার্বণকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দেখতো: এতে তার বাবা খুব বিরক্ত হ'য়ে পড়েন—কী ক'রে তাকে বংশমর্যাদা বিষয়ে অবহিত ক'রে ফিরিয়ে আনা যায়, এটাই তিনি ভাবতে থাকেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন। আর শেষকালে, একদিন সকালে, গাঁয়ের বড়ো চত্বরটায় সকলের চোখের সামনে ছেলেটির মুখে ঐ কাটার দাগগুলো তৈরি ক'রে দেয়া হয়।'

কেউ তার গল্পটা বিশ্বাস করলো না ব'লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তা শেষটায় তার মতটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'লো।

আরেকজন কে বললে: 'আমি ফ্রেঞ্চ ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে বিস্তর বই ঘেঁটেছি, কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই বার করতে পারিনি। তবে, এইটুকু জেনেছি যে যারা বড়ো-বড়ো চাকরি করে তাদের বৌরা তাদের মুখ থেকে এই দাগগুলো তুলে ফেলছে; তারা ইওরোপে গিয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ নেয়। কারণ আফ্রিকার সৌন্দর্যবোধের নতুন বিধিগুলো দেশের সব পুরোনো ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করে; মেয়েরা সব মার্কিনমার্কা হ'য়ে আছে। নিউ-ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ অ্যাভিনিউয়ের কালা আদমীদের প্রভাব ছড়াচ্ছে এরা। আর এই ঝোঁকটা যত বাড়তে থাকবে, জাতির গায়ের এই ক্ষতচিহ্নগুলো ততই তাদের অর্থ আর গুরুত্ব হারিয়ে বসবে—এবং শেষে একদিন এ-সব চিহ্ন একেবারেই উধাও হ'য়ে যাবে।'

আমরা এই চিহ্নগুলোর বৈচিত্র্য নিয়েও অনেক আলোচনা করেছিলুম। এমনকি এক জাতের লোকের মধ্যেও যে কত রকম ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়।

সারা গায়ে যেমন কাটার দাগ, তেমনি আবার মুখেও। এই প্রসঙ্গে একজন জিগ্যেস করলে: 'এই দাগগুলো যদি সত্যিই বংশগরিমার চিহ্ন হয়, অথবা উঁচু বংশ নিচু বংশের তফাৎ বোঝায়, তবে আমেরিকার দেশগুলোয় কেন কোনোদিন তাদের দেখা যায় না?'

'হুম্। এতক্ষণ শেষ অব্দি আমরা কোথাও একটা পৌছুচ্ছি!' সেয়ার চেঁচিয়ে উঠলো। সেয়ার—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে—মূল প্রশ্নটার সঠিক উত্তর জানে, অন্তত তার ধারণা ছিলো যে সে জানে।

'তাহ'লে তুমিই আমাদের বলো,—' আমরা হার মানলুম, আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।

'ঠিক আছে,' সেয়ার বললে। যতক্ষণ-না কাজের লোক গ্লাস ভর্তি গরম চা এনে পরিবেষণ করলো, সেয়ার চুপচাপ ব'সে রইলো। সারা ঘর পুদিনার গন্ধে ভ'রে উঠলো।

'তাহ'লে আমরা আমেরিকায় এসে পৌছেছি,' সেয়ার শুরু করলো। 'এখন, ক্রীতদাস প্রথা ও দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে যে-সব লেখক ভালো কাজ করেছেন, আমি যদ্দূর জানি তারা কেউই কোনো দিন এই ক্ষতচিহ্ন-গুলোর কথা উল্লেখ করেননি। দক্ষিণ আমেরিকায়—যেখানে ক্রীতদাসদের ঝাড়ফুঁক তুকতাক জাদুবিদ্যা আজও বেঁচে আছে কোনোদিনই এই জাতীয় ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি। ক্যারিবিয়ানে যেসব কালো লোক আছে, তাদের মধ্যেও এটা নেই—নেই হাইতা, কিউবা বা ডমিনিকান রিপাবলিকে—অথবা অন্য কোথাও। তো, তাহ'লে আমরা ফিরে আসি দাস ব্যবসার আগেকার কালো আফ্রিকায়—সেই প্রাচীন ঘানা সাম্রাজ্য, মালি আর গাও সাম্রাজ্যর আমলে—হাউসা, বুরুনু, বেনিন, মসি ইত্যাদি নগর ও রাজত্বের সময়ে। এখন, ও-সব জায়গায় যারা ভ্রমণ করেছেন এবং ও-সব দেশ সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন, তাদের একজনও কিন্তু এই জাতীয় ক্ষতচিহ্নের প্রথার কথা উল্লেখ করেননি। তাহ'লে কোথায় এই প্রথার উদ্ভব হ'লো?'

ততক্ষণ সবাই গরম চায়ে চুমুক দেয়া বন্ধ করেছে; সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

আমরা যদি তন্ময়ভাবে দাসব্যবসার ইতিহাস পরীক্ষা করি, তাহ'লে দেখতে পাবো যে, ব্যবসায়ীরা সেই কালোদেরই সন্ধান করতো যারা শক্তসমর্থ, স্বাস্থ্যবান ও নিখুঁত গড়ন। অন্য অনেক তথ্যের মধ্যে এটাও দেখতে পাবো যে

এখানে আফ্রিকার বাজারে, এবং বিদেশের বন্দরে ক্রীতদাসদের তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখা হ'তো, জন্তুর মতো তাদের ওজন নেয়া হ'তো, দাম ঠিক করা হ'তো। কোনো খুঁত বা ত্রুটি আছে, এমন পণ্য কেনবার ইচ্ছে, কারই ছিলো না—শুধু দাস ব্যবসায়ীর নিজের বসানো মোহরটা তারা মেনে নিতো; কিন্তু এই জন্তুর দেহে অন্য কোনো চিহ্নই সহ্য করা হ'তো না। কারণ তারপর ক্রীতদাসদের নিলামের জন্য প্রস্তুত করা হ'তো; তাকে ধুয়ে মুছে পালিশ ক'রে—তারা বলতো শাদা ক'রে—বাজারে ছাড়া হ'তো, যাতে তার দাম বাড়তো। তাই যদি হয়, তবে এই দাগগুলোর উৎপত্তি হ'লো কীভাবে?'

আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পেলুম না। ওর ঐ ইতিহাসের জরিপ আমাদের কাছে রহস্যটাকে গভীরতর ক'রে তুলেছিলো।

'বলো, সেয়ার, তুমিই আমাদের বলো,' আমরা ব'লে উঠলুম, জাতীয় ক্ষতচিহ্নের উদ্ভব বিষয়ে তার কাহিনী শোনবার জন্য এখন আমরা আরো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছি।

আর, এই কথাই সে আমাদের বলেছিলো :

দাসব্যবসার জাহাজ 'আফ্রিকান' বেশ ক-দিন ধ'রেই উপসাগরে নোঙরবন্দী হ'য়ে ছিলো—দাসদের যারা কেনে, সে-সব দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেবার আগে সে চাচ্ছিলো তার পণ্যের ঠাস বোঝাই। এর মধ্যেই পঞ্চাশজন কালো লোক আর তিরিশজন নিগ্রো মেয়েকে জাহাজের খোলে পোরা হয়েছে। কাপ্তেনের দালালরা সারা দেশ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে পণ্যের সন্ধানে। সেদিন জাহাজে মাত্র কয়েকজন খালাসী হাজির ছিলো; কাপ্তেন আর জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে তারা সবাই ডাক্তারের কামরায় ব'সে। তাদের কথাবার্তার আওয়াজ এমনকি ডেক থেকেও শোনা যাচ্ছে।

আমু ঝুয়ে প'ড়ে একবার তার অনুগামীদের দিকে তাকালে। বলিষ্ঠ সে, তেজস্বী পুরুষ, তার গায়ের পেশীগুলো ঢেউয়ের মতো নেচে উঠছে। যে-কোনো রকম কায়িক শ্রমের পক্ষেই সে উপযুক্ত। একহাতে তার কুঠারটা শক্ত ক'রে ধ'রে, অন্য হাতটা তার লম্বা বাঁকানো তলোয়ারে বুলিয়ে নিয়ে, সে খুব সন্তর্পণে সামনের দিকে এগুলো। আরো কয়েকজন সশস্ত্র লোক আলতো ভাবে ডিঙিয়ে এলো রেলিঙ, একের পর এক। মোমুতু, তাদের

দলপতি, প'রে আছে এক চওড়া পাড়ওলা টুপি, লাল আঁচল লাগানো একটা নীল উর্দি, আর উঁচু কালো বুটজুতো। সে তার বন্দুক তুলে ইশারা করলো ডেকের চারপাশ ঘিরে ফেলবার জন্য। হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছিলো জাহাজের পিপেনির্মাতা, সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যে কালো লোকরা তখনও শালতিতে ব'সে অপেক্ষা করছিলো তাকে চেপে ধ'রে বর্শা দিয়ে খুন করলো।

'আফ্রিকান'-এর ওপরে তখন লড়াই বেধে গিয়েছে। খালাসীদের একজন আক্রমণকারীদের কাছে আসতে চেষ্টা করেছিলো—তাকে পেড়ে ফেলা হ'লো। কাপ্তেন আর বাকি সবাই ডাক্তারের কামরায় দরজা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে রইলো। মোমুতু আর তার দলের লোকরা—তারা বন্দুক আর তলোয়ারে সশস্ত্র—কামরাটা দখল করতে চেষ্টা করলো—মাঝে-মাঝেই তারা গুলি ছুঁড়ছে। এদিকে জাহাজে তখন লুটপাট শুরু হ'য়ে গেছে! গুলির আওয়াজ হ'তেই আক্রমণকারীদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, শালতিগুলো তীর ছেড়ে 'আফ্রিকান'-এর পাশে ভেসে এলো, আর মালবোঝাই ক'রে ফিরে গেলো।

মোমুতু তার প্রধান অনুচরদের কাছে ডাকলো: চারজন জোয়ান পুরুষ, আপাদমস্তক সশস্ত্র। 'বন্দীদের মুক্ত করে দাও—খোল থেকে বের করতে শুরু করে দাও।'

'ওর ব্যাপারে কী হবে?' তার সহকারী জিগ্যেস করলে—আমুর দিকে ইঙ্গিত ক'রে। আমু খোলের ঘুলঘুলিটার পাশে দাঁড়িয়েছিলো।

'ওর ব্যাপার পরে দেখা যাবে,' মোমুতু উত্তর দিলে। 'ও ওর মেয়েকে খুঁজছে। খোলটা খুলে দাও—আর স্থানীয় লোকদের হাতে কোনো হাতিয়ার দিয়ো না। সব্বাইকে নিয়ে যাও।'

বারুদ আর ঘামের গন্ধে বাতাস ভারি হ'য়ে আছে। আমু এর মধ্যেই ঘুলঘুলির ঢাকায় গায়ের জোরে ঘা মারতে শুরু করেছিলো- শেষটায় কুঠার আর মুগুর দিয়ে ঢাকাটা ভাঙা হ'লো।

বিকট গন্ধে-ভরা খোলের মধ্যে লোকেরা শুয়ে আছে—তাদের পায়ে বেড়ি। গুলির শব্দ শুনেই তারা চ্যাচাতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো—খানিকটা আনন্দে, খানিকটা ভয়ে। দুই ডেকের মাঝখানের চিলতে জায়গাটায় ছিলো মেয়েবন্দীরা—সেখান থেকে আসছিলো আতঙ্কের রোল। এই বিষম কোলাহলের মধ্যেও আমু তার মেয়ের গলা শুনতে পাচ্ছিলো। তার গা থেকে

দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে—তবু সে গায়ের জোরে কাঠের দেয়ালটা কুঠার দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললে।

'ও ভাই, এই-যে!' কে-একজন চেঁচিয়ে বললে। 'মেয়েকে দেখবার জন্য তোমার খুব তাড়া বুঝি?'

'হ্যাঁ,' আমু বললে—তার অধীর চোখ দুটি চকচক করছে। কয়েক ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রমের পর পুরো খোলটা খোলা গেলো। মোমুতুর লোকেরা বন্দীদের ওপরে এনে পাটাতনের ওপর সার ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলো। ডেকের ওপর তখন জাহাজের সব মাল এনে জড়ো করা হয়েছে—এ-সব মাল দিয়ে তারা বিনিময় ব্যবসা চালায়ঃ মদের পিপে, বাক্স-বাক্স ছুরি, পেটি ভর্তি কাচের জিনিস, রেশমি কাপড়, রঙ-বেরঙের শৌখিন ছাতা, আর কাপড়ের থান। আমু, ততক্ষণে তার মেয়ে ইওনেকে খুঁজে পেয়েছে—দুজনেই অন্যদের থেকে একটু সরে আলাদা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমু খুব ভালো ক'রেই জানতো যে মোমুতু এই বন্দীদের উদ্ধার করেছে শুধু তাদের আবার বিক্রি করবার জন্যে। 'আফ্রিকান'-এর কাপ্তেনকে আরো ক্রীতদাসের লোভ দেখিয়ে সে-ই এই উপসাগরে নিয়ে এসেছিলো।

'এবার আমরা তীরে যাবো', মোমুতু জানালো। 'আগেই তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি—তোমরা সবাই আমার বন্দী। যদি কেউ পালাবার বা আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে, আমি কিন্তু তার পাশের লোকটাকে কুচি-কুচি ক'রে কাটবো।'

দিগন্তের দিকে সূর্য ডুবছিলো তখন, উপসাগরটি যেন জলের একটি ঝিকিমিকি রুপোলি চাদর, তীরের ওপর গাছের সার কালো হ'য়ে দাঁড়িয়ে। মোমুতুর লোকজনেরা লুঠের মাল শালতিতে উঠিয়ে তীরে নিয়ে যেতে শুরু করলো। মোমুতু—তাদের অবিসংবাদিত নেতা—সব কাজ পরিচালনা করছে, হুকুম দিচ্ছে। তার দলের কয়েকজন তখনও ডাক্তারের সামনের কামরায় পাহারা দিচ্ছে; তারা যে দরজার বাইরেই মোতায়েন আছে, তার জানান দিতে কয়েক মিনিট পরে-পরেই তারা দরজা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ছে। জাহাজ যখন বিলকুল সাফ, মোমুতু তখন দু-পিপে বারুদের গায়ে লাগানো একটা বড়ো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলো। সব চুপচাপ হ'য়ে গেছে দেখে কাপ্তেন ওপরে উঠতে শুরু করেছিলো; যেই সে ডেকে এসে পৌঁছুলো, বন্দুকের একটা গুলি সরাসরি তার বুকে এসে লাগলো। শেষ শালতিগুলো ততক্ষণে

জাহাজের কাছ থেকে স'রে গিয়েছে, তারা যখন তীরের দিকে অর্ধেক পথ গেছে, তখনই শুরু হ'লো পর-পর বিস্ফোরণ; তার পরেই প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে 'আফ্রিকান' উড়ে গেলো—আর নিচে তলিয়ে গেলো।

সবকিছু যতক্ষণে তীরে নামানো হ'লো, ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। জানোয়ারের পালের মতো বন্দীদের এক জায়গায় জড়ো করা হ'লো, তাদের ওপর নজর রাখবার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হ'লো—যদিও বন্দীদের হাতে-পায়ে তখনও বাঁধন পরানো। সারা রাত ধ'রে তাদের কান্নাকাটি ও চুপিচুপি কথা বলার আওয়াজ শোনা গেলো—আর মাঝে-মাঝেই চাবুকের তীক্ষ্ণ শপাং। খানিকটা দূরে মোমুতু আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গ লুঠের মালের হিসেব কষছে—আর লাভের পরিমাণ দেখে ফুর্তির চোটে তারাজ্বলা আকাশের তলায় ব'সে-ব'সে অনবরত মদ খাচ্ছে।

আসরে যোগ দেবার জন্য আমুকে ডেকে পাঠালো মোমুতু।

'কী? তুমি আমাদের সঙ্গে একটু মদ খাবে, কেমন?' পিঠে তার ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে আমু যখন এলো (তাদের দেখাচ্ছিলো আবছা ছায়ার মতো), মোমুতু তাকে বললে।

'আমার এক্ষুনি যাওয়া উচিত। অনেকটা পথ, তাছাড়া উপকূল এখন আর মোটেই নিরাপদ নেই। আমি তো পাক্কা দু-মাস ধ'রে তোমার জন্য কাজ করছি,' মদের গেলাস প্রত্যাখ্যান ক'রে আমু বললে।

'এটা কি সত্যি যে দাসব্যবসাদারদের হাতে তুলে দিতে চাওনি ব'লে তুমি তোমার বৌকে খুন করেছিলে?' ভকভক ক'রে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে গা দিয়ে—মোমুতুর এক স্যাঙাত তাকে জিগেস করলে।

'হ্যাঁ।'

'আর তোমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে তুমি একাধিকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছো – এও কি সত্যি?'

'ও আমার মেয়ে। আমাদের পরিবারের সবাই একে-একে কী ক'রে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হ'লো আর অজানার দিকে চ'লে গেলো—এতকাল আমি তা শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছি। আমি বড়ো হয়েছি ভয় আর বিভীষিকার মধ্যে, জাতভাইদের সঙ্গে অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছি—শুধু ক্রীতদাস হ'তে চাইনা ব'লে। আমাদের জাতে কোনো দাস নেই, আমরা সবাই সমান।'

'তার কারণ তোমরা উপকূলে থাকো না,' কে একজন টিপ্পনী কাটলো আর তা শুনে মোমুতু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'আরে, এসো-এসো, একটু মদ খাও! তুমি দারুণ যোদ্ধা। কী ক'রে ঐ খালাসীটাকে তুমি কেটে ফেললে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুমি তো কুঠার বেশ ভালোই চালাও।'

'আমার সঙ্গে থেকে যাও। তুমি শক্ত মানুষ, তুমি জানো তুমি কী চাও,' মোমুতু তার দিকে একটা মদের বাটি বাড়িয়ে দিলো। আমু তবু সবিনয়ে মদ খেতে অস্বীকার করলে। 'এটা আমাদের কাজ,' মোমুতু ব'লে চললো, 'আমরা তৃণভূমি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি, লোকজনদের বন্দী ক'রে নিই আর শাদাদের কাছে বিক্রি ক'রে দিই। কয়েকজন কাপ্তেন আমায় ভালোই চেনে, কিন্তু অন্যদের আমি লোভ দেখিয়ে উপসাগরে নিয়ে আসি—আর আমার লোকজনেরা খালাসীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনে। তারপর আমরা জাহাজটা লুঠ করি, বন্দীদের ফিরিয়ে আনি। জাহাজে কোনো শাদা লোক থাকলে তাকে খতম করি। দারুণ সোজা কাজ, আর সব দিক থেকেই আমাদের জিত। আমি তো তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়েছি। চমৎকার মেয়ে তোমার—বেশ কয়েক তাল লোহা ওর দাম হবে।'

(সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দাসদের কেনা হ'তো কড়ির ছড়া আর শস্তা সব টুকিটাকির বিনিময়ে। পরে কড়ির জায়গায় আসে লোহার তাল। এটা সবাই জানে যে অন্য সবখানে, অন্য-সব বাজারে, লোহার তালই ছিলো সবসময় বিনিময়ের মাধ্যম।)

'এটা সত্যি যে আমি মানুষ খুন করেছি,' আমু বললে, 'কিন্তু সে লোকজনকে বন্দী ক'রে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেবার জন্যে নয়। ওটা তোমার কাজ, আমার নয়। আমি আমার গাঁয়ে ফিরে যেতে চাই।'

'লোকটা ছিটেল আছে। নিজের গ্রাম, নিজের বৌ, নিজের মেয়ে ছাড়া আর-কিছুর কথাই ও ভাবে না।'

আমু শুধু ওদের চোখের শাদাটুকু দেখতে পাচ্ছিলো। এটা সে ভালোই জানতো যে এই লোকগুলো তাকে আর তার মেয়েকে চেপে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নিকটতম দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিতে দু-বার ভাববে না। সে নিজে তাদের মতো বদমায়েস হিসেবে তৈরি হয়নি।

'আমি আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম।'

'না,' মোমুতু রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলো। এতক্ষণে মদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে গলার স্বর মোলায়েম ক'রে ফেললো। 'শিগগিরই আরেকটা লড়াইতে আমরা জড়িয়ে পড়বো। দলের কয়েকজন শাদাদের সঙ্গে বন্দী সংগ্রহ করতে গেছে। যে-ক'রেই হোক তাদের আমাদের পাকড়াতে হবে। তারপর তুমি স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পারবে।'

'আমি ওকে শোয়াতে যাচ্ছি একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য। ওর ভীষণ দুঃসময় গেছে,' আমু তার মেয়েকে নিয়ে স'রে যেতে-যেতে বললে।

ও কিছু খেয়েছে ?'

'আমরা দুজনেই ভালো খেয়েছি। আমি সকাল-সকাল উঠে পড়বো।'

দুজনে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। কিন্তু তাদের পেছন-পেছন অনুসরণ ক'রে এলো এক ছায়ামূর্তি।

'লোকটা দারুণ তাগড়া আছে। চার পিপে মদ দাম হবে।'

'তার চেয়ে বেশি, আরেকজন জুড়ে দিলে। ওর বদলে বেশ কয়েকটা লোহার তাল আর অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাবে।'

'তাড়াহুড়ো কোরো না! কালকের লড়াই শেষ হ'লেই ওকে আর ওর মেয়েকে আমরা পাকড়াবো। মেয়েটারও বেশ দর হবে। ওদের যেতে দিলে চলবে না। ওদের মতো মাল এই উপকূলে আজকাল আর সহজে মেলে না।'

সমুদ্র থেকে মোলায়েম এক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছিলো। তারায় ভরা আকাশের তলায় নিবিড়ভাবে রাত চেপে এলো। হঠাৎ-হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে ভেসে আসছে কাতর আর্তনাদ আর তারপরেই চাবুকের আওয়াজ—শপাং। আমু তার মেয়ে ইওমেকে নিয়ে অন্যদের চেয়ে একটু দূরে শুয়েছিলো। তার চোখ দুটি সজাগ, যদিও তার চেহারায় ঘুম-ঘুম ভাব। তার মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্যে যে দশ-বারোটি লড়াইতে সে অংশ নিয়েছিলো, তাতেই মোমুতু তার গুণগুলো বুঝতে পেরেছিলো: অসীম শক্তি তার, আর শরীরটা নমনীয়।

তিনগুণ তিন অমাবস্যা আগে দাসশিকারীরা আমুদের গ্রামে হামলা করেছিলো—গাঁয়ে যতজন সুস্থ সবল লোক ছিলো, সবাইকে ধ'রে নিয়ে এসেছিলো। সে যে তাদের কবলে পড়েনি তার কারণ সে সেদিন জঙ্গলে

গিয়েছিলো। তার শাশুড়ির গোদ ছিলো ব'লে দাসশিকারীরা ঘেন্না ক'রে তাকে ধরেনি—সে-ই তাকে পুরো কাহিনীটা বলেছিলো।

দাসজাহাজ থেকে মেয়েকে উদ্ধার করার পর আমু অঝোর ধারে চোখের জল ফেলেছিলো। শক্ত ক'রে মেয়ের কব্জি চেপে ধ'রে, অন্য হাতে রক্তমাখা কুঠার উঁচিয়ে, সে যখন দাঁড়িয়েছিলো, তার বুক প্রবলবেগে ধ্বকধ্বক ক'রে উঠেছিলো। ইওমে, তার বয়েস নয়-দশ হবে,—সেও কেঁদেছিলো।

আমু তার মেয়ের ভয় শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলো। 'আমরা গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। তুই কাঁদিসনে, কিন্তু আমি তোকে যা বলবো, ঠিক তা-ই করবি। বুঝতে পারছিস ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আর কাঁদিসনে। ও-সব এখন শেষ হ'য়ে গেছে! আমি তো তোর সঙ্গে আছি এখন।'

আর এখন, রাত্রির কোলে ইওমে ঘুমিয়ে আছে তার বাবার কোলে মাথা রেখে। আমু কাঁধ থেকে কুঠারটা খুলে তার পাশে রাখলো। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে আমু তার সমস্ত অভিনিবেশ সংহত ক'রে আনলো তার আশপাশের দিকে। পাতার শরশর শুনলেই সে কুঠারটা সবলভাবে চেপে ধরে। নইলে সে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছিলো।

কোনো পাণ্ডুর আলো পুবদিগন্ত আলো ক'রে দেবার আগেই মোমুতু তার লোকজনদের জাগালো। কয়েকজনের ওপর হুকুম হ'লো বন্দীদের আর লুঠের মাল নিয়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় চ'লে যেতে। আমু আর ইওমে এ-সময় একটু দূরে-দূরে স'রে রইলো। গভীর দুটি চোখ ইওমের, বয়েসের তুলনায় সে অনেকটা লম্বা। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা তার—দুটি বিনুনি ঝুলে আছে কাঁধে। বাবার পাশ আঁকড়ে ছিলো সে; দাসজাহাজে যারা তার সঙ্গে ছিলো, তাদের সে দেখতে পাচ্ছিলো; তাদের ভাগ্যে কী আছে তা যদিও তার স্পষ্ট জানা ছিলো না, কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দশা যে কী, চাবুকের অবিশ্রাম শপাং সে-সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ রাখেনি।

'ওরা আমাদের জন্য সামনে অপেক্ষা করবে,' আমুর কাছে এসে মোমুতু বললে। 'শাদাদের গুপ্তচরেরা যাতে আমাদের ওপর আচমকা হামলা করতে না-পারে, সে বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তোমার মেয়েকে তুমি

সঙ্গে-সঙ্গে রাখছো কেন? ওকে তো দলের কারোর কাছে রেখে এলেই পারতে।'

'আমি বরং ওকে নিজের কাছেই রাখবো। ও ভীষণ ভয় পেয়েছে,' বন্দীদের নিয়ে পাহারাওলাদের চ'লে-যাওয়া দেখতে-দেখতে আমু উত্তর দিলে।

'তোমার মেয়ে খুব সুন্দরী।'

'হ্যাঁ।'

'ওর মা-র মতো সুন্দর?'

'ঠিক ততটা নয়।'

মোমুতু তার দলবলের কাছে ফিরে গেলো; সংখ্যায় তারা জনা তিরিশ—তাদের সে বললে রওনা হ'য়ে পড়তে। তারা একসার বেঁধে হাঁটতে লাগলো। দাসব্যবসাদাররা মোমুতুকে ভালোই চেনে—কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। আগে সে কয়েকজন ব্যবসাদারের হ'য়ে দালালের কাজ করেছিলো, তার পরে সে হ'য়ে ওঠে 'ভাষার ওস্তাদ' অর্থাৎ দোভাষী, কেল্লা আর ছাউনি যে-সব জায়গায় বন্দী নিগ্রোদের রাখা হ'তো, দোভাষী হিসেবে সে সে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতো।

সেদিন সারা সকাল তারা কুচকাওয়াজ ক'রে এগুলো—আমু আর তার মেয়ে ছিলো সকলের পেছনে। ইওমে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, তার বাবা তাকে পিঠে তুলে নিলো। আমু ভালো ক'রেই জানতো যে তার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তার সামনের লোকগুলো ছিলো রুক্ষ, রূঢ়, আর কেমন যেন করুণ; লম্বা বন্দুকগুলো যেভাবে হিঁচড়ে-হিঁচড়ে তারা হাঁটছিলো, তাতে তাদের হাস্যকর দেখাচ্ছিলো। তৃণভূমি পেছনে ফেলে এলো তারা; শিগগিরই এসে পড়লো বনের মধ্যে—উঁচু-উঁচু গাছের ডালে শকুনের ঝাঁক ব'সে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু পাখির কিচিরমিচির কানে আসছে—আর তার মাঝে-মাঝে দূর থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে আসছে বুনো জানোয়ারের গর্জন। তারপর তারা বনের গভীরে এসে পৌঁছুলো—আদ্র´ আর বিরূপ এক বন—আর মোমুতু হেঁকে তার দলবলকে বললো থামতে, তাদের ছুটি দিয়ে সে জিরিয়ে নিতে বললো।

'কী, ভাই, ক্লান্ত?' একজন আমুকে শুধোলে। 'আর তোমার মেয়ের কী অবস্থা?'

ইওমে তার ঘন চোখের পাতা তুলে লোকটাকে একবার দেখলো, তারপর তার বাবার দিকে তাকালো।

'সেও একটু ক্লান্ত,' কোথায় ব'সে বিশ্রাম করবে, খুঁজতে-খুঁজতে আমু বললে। একটা গাছের গুঁড়ির কাছে ভাঙা একটা ডাল প'ড়ে আছে— ইওমেকে সে সেদিকে নিয়ে গেলো। একটু দূরে ব'সে লোকটা তাদের ওপর নজর রাখলো সবসময়।

মোমুতু তার দলবলের মধ্যে কয়েকটা মিষ্টি আলু ভাগ ক'রে দিলে, তারপর এই সামান্য খাবার শেষ হ'তেই সে আমুর সঙ্গে দেখা করতে এলো।

'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'ও ঘুমোচ্ছে,' আমু একটা কাঠের টুকরো কেটে-কেটে একটা পুতুল বানাচ্ছিলো।

'মেয়েটি বেশ সবল,' মোমুতু তার পাশে ব'সে প'ড়ে তার চওড়া পাড়ওলা টুপিটা মাথা থেকে খুললো। তার বিরাট কালো বুটজোড়া কাদায় মাখামাখি হ'য়ে আছে। 'আমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করবো—এখানে। এ-পথ দিয়েই ওদের আসতে হবে।'

আমু ক্রমেই খুব সাবধান হ'য়ে পড়ছে। সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কাঠের টুকরোটা ক্রমে একটা পুতুলের চেহারা নিচ্ছে—কাঠের গায়ে খোদাই করতে-করতে সে সবসময় ইওমের ওপর চোখ রাখলো।

'ব্যাপারটা চুকে গেলেই তুমি চ'লে যেতে পারো। তবে সত্যি কি তুমি তোমার গাঁয়ে ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমাদের বাড়ির আর কেউই তো ওখানে নেই,' বললে মোমুতু। আমুর উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রেই সে ব'লে চললো, 'এককালে আমারও একটা গ্রাম ছিলো—এক জঙ্গলের পাশে। আমার মা-বাবা থাকতেন সেখানে। অনেক আত্মীয়স্বজন—পুরো একটা জ্ঞাতিগুষ্ঠি! আমাদের খাবার জুটতো অনেক—মাংস, মাঝে-মাঝে মাছ। কিন্তু আস্তে-আস্তে গাঁয়ের অবস্থা প'ড়ে এলো। বিলাপের কোনো অন্ত রইলো না। আমি তো জন্মাবধি আর্তনাদ ছাড়া আর-কিছু শুনিনি—উন্মাদের মতো লোকজনদের পালাতে দেখেছি, ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে। কিন্তু তুমি জঙ্গলে গেলে—আর কোনো

অজানা লোকের শিকার হ'য়ে মরলে; খোলামেলায় থাকলে তো, তোমাকে পাকড়ে দাস হিসেবে বেচে দেয়া হ'তো। কী করতে পারতাম আমি? শেষটায় আমি আমার পথ বেছে নিলাম। আমি বরং শিকারীদের সঙ্গে থাকবো —শিকার হ'তে আমি চাই না।

আমুও জানতো যে এটাই জীবন। কক্‌খনো নিরাপদ নও তুমি, পরের দিন সূর্য ওঠা দেখতে পাবে কিনা, তা অব্দি তোমার জানা নেই। কিন্তু যেটা ও বুঝতে পারতো না তা হ'লো, এই যে নারী-পুরুষ ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের কোন্ কাজে লাগানো হয়? জনরব যে, শাদারা নাকি তাদের চামড়া দিয়ে জুতো বানায়।

অনেকক্ষণ কথা বললো তারা—আসলে মোমুতুই বললো—অবিরাম। সে তার কীর্তিকাহিনী শোনালো সাত কাহন, তার মদের আড্ডা সম্বন্ধে বারফট্টাই করলো। শুনতে-শুনতে মোমুতুর চরিত্রটা আমুর কাছে ক্রমশ একটা হেঁয়ালি হ'য়ে দাঁড়ালো। ও যেন এক ক্ষুদে যুদ্ধনেতা, শুধু গায়ের জোর আর দমননীতি দিয়ে যে তার ক্ষমতা খাটায়। অবশেষে—আমুর কাছে যখন এই কথাবার্তা বড্ড বেশি দীর্ঘ ঠেকতে শুরু করেছে—একটি লোক এসে সর্দারকে সাবধান ক'রে দিলে যে শাদারা আসছে। মোমুতু হুকুম দিলে—সব ক-টাকে সাবাড় ক'রে দাও, আর বন্দীদের ধ'রে রাখো। মুহূর্তের মধ্যে সারা বন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো; শুধু শোনা যেতে লাগলো বাতাসের নিরপেক্ষ স্বর।

কালো বন্দীদের লম্বা সারটা চোখে এলো, তাদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে চারজন ইওরোপীয়, তাদের প্রত্যেকের হাতে দুটি ক'রে পিস্তল আর একটা ক'রে ছুরি। বন্দীরা—নারীপুরুষ সবাই এক জায়গায় জড়ো করা—একটা কাঠের জোয়াল আটকানো তাদের ঘাড়ে—সামনের আর পেছনের লোকের ঘাড়ে। দলের পেছনে ছিলো আরো তিনজন ইওরোপীয়—আর চতুর্থজন, সে বোধহয় অসুস্থ, তাকে চারজন কালো লোক ডুলিতে ক'রে ব'য়ে আনছে।

গাছের ওপর থেকে আচমকা গুলির আওয়াজ হ'লো—অনেকক্ষণ দূরে-দূরান্তরে শোনা গেলো তার প্রতিধ্বনি। তার পরেই শোনা গেলো আর্তনাদ আর বিশৃঙ্খল লড়াইয়ের আওয়াজ। আমু সুযোগ বুঝে যে-লোকটা তাকে পাহারা দিচ্ছিলো তাকে পেড়ে ফেললো, তারপর তার মেয়ের হাত ধ'রে, জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

তারা পেরিয়ে গেলো ছোটো নদী আর বড়ো-বড়ো নদী, ঢুকে পড়লো অরণ্যের আরো গভীরে, সবসময়েই লক্ষ্য দক্ষিণ পূর্ব দিক। আমুর ছুরি আর কুঠার এখন যতটা কাজে লাগলো, তেমন আর কখনও হয়নি। তারা প্রধানত চলতো রাতের বেলায়—কখনো খটখটে দিনের আলোয় নয়, আর সবসময়েই মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতো।

তিন সপ্তাহ পর তারা গাঁয়ে এসে পৌঁছুলো—গ্রাম মানে গোটা তিরিশ কুঁড়েবাড়ি, একে আরেকের গায়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, ঠিক জঙ্গল আর নদীর মুখটায়। দিনের সে-সময় সব বাসিন্দাই গাঁয়ে ছিলো; তাছাড়া গ্রামের যারা সবল ও কর্মক্ষম মানুষ, তাদের বার-বার হামলা ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবার দরুন এমনিতেই গ্রামে লোকের সংখ্যা ক'মে গিয়েছিলো। আমু আর ইওমে যখন তার শাশুড়ির বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছুলো, বুড়ি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাইরে বেরিয়ে এলো, আর তার কান্নাকাটি চ্যাঁচামেচি অন্য লোকদের জড়ো ক'রে আনলো—তাদের অনেকেই রুগ্ন আর দুর্বল। গোড়ায় তারা দারুণ ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু আমু আর ইওমেকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আনন্দ আর বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো। তারা দুজনের চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো, তাদের অশ্রু আর প্রশ্ন একে আরেকের সঙ্গে মিলে গেলো। ইওমের দিদিমা তাকে কোলে তুলে নিলো, তাকে এমনভাবে কুঁড়ের ভিতরে নিয়ে গেলো যেন সে কোনো অমূল্য নিধি। আর মেয়েটি দিদিমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কথার সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে ফেললো।

গাঁওবুড়োরা আমুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য তাকে ডেকে পাঠালো: তারা তার দুঃসাহসী কীর্তির কথা শুনতে চায়।

'আমি সারা জীবন ধ'রে—এমনকি আমার বাপের জন্মেরও আগে থেকে', জমায়েতের মধ্যে যারা সবচেয়ে বুড়ো, তাদের একজন ব'লে উঠলো, 'সারা দেশ কেবলই ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে কবে তারা ধরা পড়বে আর শাদাদের কাছে বিক্রি হবে। শাদারা বর্বর।'

'এর কি কোনো শেষ নেই?' জিগেস করলে আরেকজন, 'কেবলই দেখলাম, আমার সব ছেলেপুলেকে ওরা ধ'রে নিয়ে গেলো—আর কতবার যে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। জঙ্গলের মধ্যে এর চেয়ে গভীরে আর যাওয়া যাবে না…বুনো জানোয়ার আছে, অসুখ বিসুখ আছে…'

'দাসশিকারীদের চেয়ে বরং বুনো জানোয়ারের মুখোমুখি পড়তে আমি রাজি,' বললে তৃতীয় একজন। 'পাঁচ-ছ বর্ষা আগে আমরা ভেবেছিলাম এখানে বেশ নিরাপদ আছি। কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নই। গ্রাম থেকে মাত্র সাড়ে তিনদিনের পথ দূরে একটা দাসশিবির আছে।'

সবাই চুপ ক'রে গেলো, তাদের ভাঁজপড়া, জীর্ণশীর্ণ, উদ্বিগ্ন মুখগুলোয় যুগের ছাপ পড়েছে। আবারও একবার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবার কথা তারা আলোচনা করলো। কেউ-কেউ ছিলো চ'লে যাবার পক্ষে, কিন্তু অন্যরা জঙ্গলের মাঝখানে জল ছাড়া থাকতে যাওয়ার বিপদের কথা মনে করিয়ে দিলো—তাছাড়া সবল পুরুষ নেই দলে, পারিবারিক কবরখানাও তো ছেড়ে যেতে হবে। মোড়ল—তার মাথাটা অধঃপাতে যাওয়া লোকের মতো চ্যাপটা আর গর্দানটা মাংসল—প্রস্তাব করলে যে শীতকালটা তাদের এখানেই কাটানো উচিত, তবে অন্য কোনো ভালো বাসস্থানের সন্ধানে একদল লোক পাঠানো যায়। কোনো জায়গার খোঁজ না-পেয়ে, সেখানে বসবাসের কোনো প্রস্তুতি না-ক'রে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়াটা হবে নিছকই পাগলামি। তাছাড়া প্রথা অনুযায়ী বলি-উৎসর্গের ব্যাপারটাও আছে। শেষটায়, সকলেই এই কর্মসূচিতে সম্মত হ'লো। যে অল্প কিছুদিন তারা এখানে থাকবে, তাদের চাষবাসের মাত্রা বাড়াতে হবে, সব গোরুমোষকে সকলের সাধারণ সম্পত্তি ব'লে মেনে নিতে হবে—সব জন্তুকেই রাখতে হবে একটা খোঁয়াড়ে। মোড়লের মতে গ্রামের বুড়িদের ওপর গ্রামের পাহারার ভারটা দেয়া উচিত।

আমু আর ইওমের ফিরে-আসা তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিলো। তারা একজোট হ'য়ে কাজ করতে শুরু করলো,—জমি সাফাই, আগাছা কাটা, বেড়া মেরামত—সব কাজেই সবাই সমানভাবে লেগে পড়লো। পুরুষরা একসঙ্গে কাজে বেরোয়, একসঙ্গে কাজ থেকে ফিরে আসে। মেয়েরাও কাজে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে পড়লো; কেউ-কেউ রান্না করে, অন্যরা নজর রাখে আচমকা কোনোখান থেকে 'আড়কাঠিরা' এসে হাজির হয় কিনা। ('আড়কাঠিরা' হ'লো দেশেরই লোক, দালাল, তাদের চেনা যায় তাদের গায়ের উর্দির রং দেখে, বোঝা যায় তারা কোন্ দেশের হ'য়ে কাজ করছে, তাদের সাধারণ নাম ছিল 'দাসশিকারী') কোনো আশঙ্কার ভাব ছাড়া কেউই সমুদ্রের দিকে তাকাতে পারতো না।

বর্ষা এলো; উর্বরা, সুফলা জমি বীজগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুললো। যদিও গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যে উদ্বেগ বা শঙ্কা না-দেখিয়েই কাজে যেতো, সব সময়েই কিন্তু তারা হামলার জন্য সজাগ থাকতো: এটা তারা ভালোই জানতো যে একদিন না-একদিন অতর্কিতে ঐ আক্রমণ আসবেই।

ইওমের সঙ্গে একই কুঁড়েঘরে থাকতো আমু, ঘুমোবার সময় হাতের কাছে সে কোনো অস্ত্র রাখতো। এমনকি বাতাসের একটা নিরীহ ঝাপটাও বাচ্চা মেয়েটিকে আতঙ্কিত ক'রে তুলতো। আমু তার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলো; ইওমের যে বিশ্রাম করা উচিত, এ-বিষয়ে সকলেরই ছিলো একমত, ক্রমে সে নিদারুণ অভিজ্ঞতার প্রভাবটা কাটিয়ে উঠলো। আবার তার কালো গাল চকচক ক'রে উঠলো, তার গলার চারপাশে ছোটো-ছোটো ভাঁজ পড়লো, তার ছোট্ট সমতল বুক দুটি ভরতে শুরু ক'রে দিলো।

শান্তিতেই কাটলো দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে প্রকৃতির কবল থেকে তারা যে সরু-সরু জমিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এসে চাষ করেছিলো, এবার তারা সুফলা ফসলের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলো। ক্যাসাভায় মুকুল ধরেছে; লোকে তালের তেল, মাখন, সীম, মধু ভাঁড়ারে জমাতে শুরু করেছে—যা-যা তাদের নতুন গ্রামে লাগতে পারে সব। নতুন বসতির খোঁজে যে-দলটা বেরিয়েছিলো তারা ফিরে এলো: তারা পাহাড়তলিতে একটা চমৎকার আস্তানার সন্ধান পেয়েছে, তৃণভূমির বেশ খানিকটা ওপরে—অথচ একটা ঝরণার কাছেই। জমিও ভালো, গোরুমোষের চরবার জায়গা অঢেল, আর ছেলেপুলেরাও 'আড়কাঠিদের' হাত থেকে নিরাপদ।

সবাই ভবিষ্যতের এই প্রত্যাশিত স্বপ্নে ভারি খুশি। কবে যাত্রা করা হবে, মোড়ল দিনটা ঠিক ক'রে দিলো; অদূর ভবিষ্যতেই সবাই নিরাপদে থাকতে পারবে, এই বোধটায় সব সতর্কতায় একটু ঢিলে পড়লো। আগে রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বালানো ছিলো নিষেধ, কারণ তাহ'লে গ্রামের কথা দূর থেকেই লোকে জেনে যাবে, কিন্তু এখন রাতের বেলায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো আগুন; হাসির লহরী ঝমঝম ক'রে উঠলো, ছোটোরা বাবা-মার চোখের আড়ালে দূরে চ'লে যাবার সাহস পেলো—কারণ বড়োরা এখন শুধু যাবার ভাবনাতেই মগ্ন। এখন তারা হাতে দিনগুলো গুনতে পারে। পরামর্শ সভায় আলোচনা হ'লো রওনা হবার শুভ লক্ষণ কী। প্রত্যেকেই গৃহদেবতা, টোটেম চিহ্ন আর পারিবারিক কবরখানার উপাসনায় মন দিলো।

অথচ তবু সেটা কোনো শুভদিন ছিলো না, ছিলো অন্য যে-কোনো দিনের মতোই একটি দিন। সূর্য ঝলসাচ্ছে দীপ্ত করোজ্জ্বল, গাছের নরম কচিপাতা হাওয়ায় শরশর ক'রে উঠছে, মেঘেরা খেলা ক'রে যাচ্ছে আকাশে, গান-গাওয়া পাখিরা খুশিভাবে খাবার খুঁটছে, আর বানরগুলো গাছে-গাছে নাচানাচি লাফালাফি করছে। সারা গ্রামটা এই ঝলমলে দিনটাকে উপভোগ করছে; এটা এমনই এক দিন যেদিন যাত্রীরা আরো একটুক্ষণ থেকে যেতে প্রলুব্ধ হয়, বেশ কিছুক্ষণ।

আর সেই বিশেষ দিনেই ঘটলো ঘটনাটা। সেদিনই আচমকা এসে হাজির হ'লো 'আড়কাঠিরা'। ভয়-পাওয়া পশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে গেলো; বন্দুকের শব্দ শুনে নারী পুরুষ ছেলেমেয়েরা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, সাতঙ্কে ছড়িয়ে পড়লো এদিক-ওদিক, মাথায় শুধু একটাই ভাবনা—পালাবার যে একটা রাস্তা তাদের সামনে খোলা আছে—অর্থাৎ জঙ্গল—সেখানে উধাও হ'য়ে যাওয়া।

আমু তার কুঠারটা হাতে চেপে ধ'রে ইওমে আর তার দিদিমাকে সামনে ঠেলে দিলো। কিন্তু সেই পঙ্গু বুড়ি কিছুতেই দ্রুত যেতে পারছিলো না। তারা কুঁড়েঘরগুলোর মধ্য দিয়ে পালিয়েছে, পেরিয়ে এসেছে খোঁয়াড়, এসে পৌঁছেছে গ্রামের কিনারে, আর ঠিক তক্ষুনি আমু মোমুতুর এক শাগরেদের মুখোমুখি পড়লো। দুজনের মধ্যে আমুর ক্ষিপ্রতা ছিলো বেশি, সে তাকে পেড়ে ফেললো মাটিতে। কিন্তু ততক্ষণে তার পেছনে ধাওয়া করেছে একটা পুরো দল।

জঙ্গলের আরো-গভীরে ঢুকে পড়লো আমু, যেখানে ঘন ঝোপঝাড় আর ঝোলা নিচু ডালপালা তাদের অগ্রগতিকে আরো মন্থর ক'রে দিলো। তবু, আমু যদি কেবল একা হ'তো, সে পালাতে পারতো। কিন্তু সে তো তার মেয়েকে ছেড়ে যেতে পারে না। স্ত্রীর কথা মনে প'ড়ে গেলো তার। যাতে তার স্ত্রীকে এই দাসশিকারীরা ধ'রে নিয়ে যেতে না-পারে সেজন্যে সে নিজের হাতে তার স্ত্রীকে খুন করেছিলো। তার শাশুড়ি তাকে তার স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিলো। এই বুড়িকে ফেলে যাওয়া হবে তার স্ত্রীকেই ফেলে যাওয়া। বুড়ি বারে-বারে থামছে হাঁফ নিতে; তার গোদা পা দুটো ক্রমে এত ভারি হ'য়ে উঠছে যে আর যেন নাড়ানো যায় না। যতটা পারে আমু তাকে সাহায্য করলে। আর ইওমে—সে লেপটে রইলো তার পাশে, তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

হঠাৎ আমুর মাথায় একটা মতলব খেলে গেলো। সে থেমে পড়লো, আস্তে আলতোভাবে সে ইওমের চিবুকটা ধরলো, অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইলো তার মুখে—অনেকক্ষণ, যেন অনন্তকাল। তার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠলো।

'মা,' সে বললে, 'আর আমাদের এগুবার উপায় নেই, সামনে আছে মরণ—আমাদের তিনজনের জন্যই। পেছনে আছে গোলামি—ইওমে আর আমার জন্য।'

'আমার আর এক পাও যাবার ক্ষমতা নেই,' নাতনির হাতটা ধ'রে বুড়ি বললে। করুণ, শঙ্কাতুর মুখটা তুলে আমুর দিকে তাকালো বুড়ি।

'মা, ইওমে কিন্তু ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তোমরা দুজনেই পারো। তোমার চামড়া আর ওদের কাজে লাগবে না—শাদারা তা দিয়ে আর জুতো বানাতে পারবে না।'

'কিন্তু ইওমে যদি একা প'ড়ে থাকে, তা হ'লে ও তো মারা পড়বে। আর তোমারই বা কী হবে?'

'তোমরা স্বাধীনভাবে চ'লে যাও, আমার কী হবে, সেটা আমি বুঝবো।'

'তুমি আমাদের মেরে ফেলবে না তো?' বুড়ি ব'লে উঠলো।

'না, মা, আমি তোমাদের মারবো না। তবে তোমরা যাতে বন্দী না হও, তার জন্য কী করা উচিত, তা আমি জানি। আমাকে চট ক'রে কাজটা করতে হবে। ওরা এসে পড়লো ব'লে—আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি।'

আমুর মাথার মধ্যে যেন একটা বাজ ফেটে পড়েছে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। কোনো রকমে নিজেকে সে সামলে নিলো, ছুরিটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সে একটা বিশেষ ঝোপের কাছে গেলো (য়োলোফরা তাকে বলে 'বান্টামারা'; তার পাতা ছেঁচে ঘা শুকোবার ওষুধ পাওয়া যায়), একগোছা বড়ো-বড়ো পাতা সে ছিঁড়ে নিলো একটানে, তারপর অন্য দুজনের কাছে ফিরে এলো—তারা অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়েছিলো।

মেয়ের দিকে যখন সে তাকালো, তার চোখ দুটি চোখের জলে ঝাপসা হ'য়ে গেছে। 'ইওমে, তুই ভয় পাসনি।'

তার শাশুড়ি আবার ব'লে উঠলো, 'তুমি ওকে ওর মায়ের মতো মেরে ফেলবে না তো?'

'না। ইওমে, এতে তোর খুব ব্যথা লাগবে, কিন্তু তুই কখনো ক্রীতদাসী হবি না। বুঝলি?'

বাচ্চা মেয়েটির একটিই উত্তর ছিলো—ছুরির ঐ ধারালো ফলাটার দিকে চেয়ে থাকা। দাসজাহাজ আর রক্তমাখা কুঠারটির কথা তার মনে প'ড়ে গেছে।

আমু চট ক'রে মেয়েটিকে তার দুই সবল পায়ের মধ্যে চেপে ধরলো, আর তারপর সারা গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে দিতে লাগলো। সারা বনের মধ্যে বাচ্চাটির আর্তনাদ ঝমঝম ক'রে উঠলো; তার চীৎকার শুধু তখনই থামলো যখন তার গলায় আর কোনো স্বর নেই। দাসশিকারীরা তাকে পাকড়ে ফেলার আগে কোনোমতে কাজটা শেষ করতে পেরেছিলো আমু। বান্টামাগ্নার পাতা দিয়ে সে তার মেয়ের সারা শরীর মুড়ে দিয়েছে। অন্যান্য বন্দী গ্রামবাসীর সঙ্গে আমুকেও উপকূলে নিয়ে যাওয়া হ'লো। ইওমে তার দিদিমার সঙ্গে গ্রামে ফিরে এলো, আর বুড়িতো অনেক রকম লতাপাতা চেনে, তারই সৌজন্যে ইওমের শরীর কিছুদিন পরে সেরে গেলো—কিন্তু কাটা দাগগুলোর চিহ্ন কিন্তু তার শরীর থেকে মেলালো না।

অনেক মাস পরে দাসশিকারীরা আবার গ্রামে ফিরে এলো; তারা ইওমেকেও ধরেছিলো, কিন্তু আবার তাকে তারা ছেড়ে দেয়। তার আর এক কানাকড়িও দাম নেই—তার গায়ে ঐ ক্ষতচিহ্নগুলো আছে ব'লে।

খবরটা ক্রোশের পর ক্রোশ ছড়িয়ে গেলো। দূর-দূর গ্রাম থেকে লোক এলো দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। আর বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহে নানা রকম ক্ষতচিহ্ন দেখা দিতে লাগলো।

আর এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর ক্ষত ক'রে দাগী ক'রে দেয়া হ'লো। তারা কিছুতেই গোলাম হ'তে চায়নি।

অনুবাদঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দাভিদ দিওপ

আফ্রিকা

আমার মাকে

আফ্রিকা আফ্রিকা আমার
পূর্বপুরুষের সাভানার সেই অহংকারী যোদ্ধাদের আফ্রিকা আমার
যার কথা আমার দিদিমা গান করেন
তাঁর সুদূর নদীর ধারে অফুরান
আফ্রিকা আমি তোমাকে জানিনি কোনোদিন
কিন্তু আমার চোখ তোমার রক্তে ভ'রে যায়
তোমার সেই কী-সুন্দর ক্ষেতে-মাঠে ঝরে-পড়া কালো রক্তে
তোমার স্বেদের রক্তে
তোমার পরিশ্রমের স্বেদে
তোমার দাসত্বের পরিশ্রমে
তোমার সন্তানদের দাসত্বে
আফ্রিকা বলো তুমি বলো আমাকে আফ্রিকা
এই-যে পিঠ যা বেঁকে নুয়ে গেলো
এই-যে পিঠ যা থুবড়ে পড়লো দীনতার ভারে
এই-যে কম্পমান লাল-লাল ডোরাকাটা পিঠ
সে কি তোমার
যে-পিঠ চাবুকের কাছে জো-হুজুর বলে মধ্যদিনের সব রাস্তায়
আর তখন এক কণ্ঠস্বর আমাকে উত্তর দেয় সুগম্ভীর
অবুঝ বালক ঐ যে ঐখানে
তুমি দেখতে পাচ্ছো এক কিশোর ও উদ্দীপ্ত গাছ
শাদা রংজ্বলা সব ফুলের মধ্যে চমৎকার নিঃসঙ্গ
সে-ই আসলে আফ্রিকা তোমারই আফ্রিকা পুনর্জায়মান
আবার সে জন্ম নিচ্ছে অসীম ধৈর্যে জেদী একগুঁয়ে
সেইসব ফলে-ফলে যারা ধীরে ধীরে শুষে নেয়
স্বাধীনতার তিক্ত আস্বাদ।

অনুবাদঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির কারিগর

সিপ্রিয়ান একোয়েন্‌সি

সেদিন আমার একটি ছোট ছেলের সঙ্গে পরিচয় হলো সে নিজের ইচ্ছেমত বৃষ্টি আনতে পারে। সে তার এই শক্তি সত্যিকারের প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করতে চায় না। কিন্তু এইবার এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে সে তার এই শক্তি ব্যবহার করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

আমি ডেলের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দিনটা ছিল ভীষণ গরম এক ডিসেম্বরের দিন। ডিসেম্বর মাসে হারমাটান সবচাইতে তীব্র হয়ে ওঠে। সমস্ত জায়গায় শুকনো পাতা আর শুকনো ঘাস তার শক্তির কথাই বলছিলো। আমরা বারান্দায় বসে বসে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে কাঁপছিলাম আর যখন কথা বলছিলাম আমাদের দাঁত ঠকঠক করে কেঁপে উঠছিলো।

হঠাৎ আমরা আমাদের ছাদের ওপর থেকে মেশিনগানের আওয়াজের মতো একটা শব্দ শুনলাম। ডেল যে বইটা পড়বার চেষ্টা করছিলো সেটা থামিয়ে আমার দিকে চক্‌চকে চোখে তাকাল।

সে কিছুক্ষণ শুনবার পর জিগ্যেস করলো, 'বৃষ্টি ? অসম্ভব !'

দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে মেঝেটা পেরিয়ে জানলার কাছে গেলাম। মাথার ওপরে আকাশটা কালো হয়ে আছে। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে শব্দ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাখীগুলো ভয় পেয়ে চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের বাড়িগুলোর চালের আলগা খড় উড়ে উড়ে যাচ্ছে, সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এক্ষুনি তা হয়ে উঠবে প্রচণ্ড ঝড়।

'কী অদ্ভুত, না ?' আমি বললাম, 'এখন তো মাত্র ডিসেম্বর, এবং হারমাটানও বইছে।' ডেল ভুরু কোঁচকালো। বিদ্যুতের আলো কালো আকাশটাকে যেন চিরে ফেলছিলো। বাজের ভীষণ কর্কশ আওয়াজে আমরা ভয় পেয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, তারপর দৌড়ে ঘরে চলে এলাম।

আমরা জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে চুপ করে বসে রইলাম। ডেল বারবার বলতে লাগল 'কী অদ্ভুত, কিছুই বুঝতে পারছি না···ভারী অদ্ভুত।'

'কেন অদ্ভুত কেন ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'অদ্ভুত নয় ?' সে বলল 'এনাবায় কখনো ডিসেম্বরে বৃষ্টি হয় না। আমি এখানে পনেরো বছর আছি, একবারও ডিসেম্বরে বৃষ্টি হয়নি। এটা শুকনো ঋতু।'

আমি বললাম 'হ্যাঁ, কিন্তু এখন বৃষ্টি হচ্ছে।'

'এখন বৃষ্টি হচ্ছে', সে পুনরাবৃত্তি করলো। 'আর এখন এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির পর যদি সেই লোকটি মারা যায় আমি একটুও আশ্চর্য হবো না।'

'কোন লোকটি ?'

সে বলল 'কেন বালে, গ্রামের মোড়ল।'

'সে কেন মারা যাবে ?'

ডেল আমার দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালো, 'তুমি বুঝি সেই গল্পটা শোননি ? শোন তাহলে—বৃদ্ধটি বৃষ্টির উপাসকদের একজন।'

'কুসংস্কারে বিশ্বাস কোরো না।'

ডেল হাসিমুখে বলল, 'আমি কি তোমায় বলেছি যে এর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি ? আমি স্বাভাবিক ভাবেই একজন খোলা মনের মানুষ। যাই হোক, এ কথাই সবাই বলে যে সে একজন বৃষ্টির উপাসক। সে যখন খুশি বৃষ্টি আনতে পারে। তার ওপর সে গ্রামের চাষীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে তার মৃত্যুদিনে সে তাদের ক্ষেত ভাসিয়ে দেবে।

'যতো সব কুসংস্কার', আমি অবজ্ঞাভাবে বললাম, 'তুমি নিশ্চয় এর একটা কথাও বিশ্বাস করো না।'

'দেখো,' ডেল বলল 'বিশ্বাস করি, একথা বলতে পারি না, কিন্তু অপেক্ষা করেই দেখা যাক না কি হয়। বালের বয়স সত্তরের বেশী, সে যে কোনো সময়েই মারা যেতে পারে।'

বৃষ্টি খুব জোরেই পড়ছিল। জানলার ফুটো দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘরে ঢুকতে লাগল, অচিরেই আমরা ঘরের মধ্যে এক ইঞ্চি জলের ওপর বসে রইলাম। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ডেল বাধ্য হলো তার অবশিষ্ট বিছানাটা আমাকে দিতে।

পরদিন সকালে আমরা জানলা খুলে রাস্তা দেখছিলাম। এখন সমস্ত কিছুই শান্ত এবং নিস্তব্ধ। পাতার ওপরে বিন্দু বিন্দু জলকণা লেগে রয়েছে। প'ড়ে যাওয়া গাছগুলো বনের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাঁক সৃষ্টি করেছে।

বাতাসে একটা মিষ্টি সতেজ গন্ধ। ডেল গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

সে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা ধোঁয়া ওঠা মাটি আর খড়ের ধ্বংসস্তূপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে ঐ বাড়িটায় বজ্রপাত হয়েছে।'

ডেল ঠিকই বলেছিলো, আমরা পরে জানতে পারলাম যে বাড়িটার মালিক একজন চাষী মারা গিয়েছে। সে বাড়ির মধ্যে তার বারো বছরের ছেলের সঙ্গে আটকে পড়েছিল, ছেলেটা কিন্তু কোনোক্রমে পালাতে পেরেছিলো।

যাই হোক, বালে কিন্তু সেই বৃষ্টির পর মারা যায় নি। সে সেই ছেলেটির ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনে তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলো।

বৃষ্টি সেই অন্য ঋতুতে একবার দেখা দেবার পর আবার সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেল। হারমাটান আবার সব জায়গায় বইতে লাগল। আমাদের ঠোঁট ফেটে গেল। বাতাসে ভারী কুয়াশা ঝুলে রইল। আমাদের চামড়ায় যেন আঁশ উঠতে লাগল এবং গরম অসহ্য হয়ে উঠল। অনেক চাষীরা এই বৃষ্টির সুযোগে ইয়াম এবং ভুট্টা পুঁতেছিলো; তারা এখন দেখলো যে তারা ভুল করেছে। ডিসেম্বরের পর এল জানুয়ারী, জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ, এরকম করে জুন মাস চলে এল, কিন্তু বৃষ্টি এল না। দিনের পর দিন গরম আরো বেড়েই যেতে লাগল। পুকুর-গুলো শুকিয়ে গেল। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত সবুজ থেকে বাদামী হয়ে গেল। স্ত্রী-পুরুষেরা লাল উত্তপ্ত চোখে এই প্রচণ্ড গরমে যেন ঝলসে যেতে লাগল।

'ওনাবায় কোনো খাবার নেই,' ডেল আমাকে বলল যখন জুলাই মাসে আমি ওখানে গেলাম! 'এই ইয়ামগুলোকে দেখ', সে একটা গোটা বারো ইয়ামের ছোট্ট স্তূপে লাথি মারল, যার একটাও আমার তর্জনীর থেকে বড়ো নয়। 'আমার চাকর এগুলো কিনে এনেছে দশ শিলিং দিয়ে।'

তুমি তো ভাগ্যবান যে কেনবার মতো কিছু পেয়েছ।' আমি বললাম, 'কোথায় পেলে?'

সে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকালো, তারপর ফিশফিশ করে বলল, 'তোমাকে বলতে বাধা নেই, এক বুড়ী এগুলো মাটির তলার কোনো ভাঁড়ার থেকে খুঁড়ে বার করেছে···আমি ঠিক পুরো ব্যাপারটা জানি না।'

তারপর এরকমই চলতে লাগল। গরীব লোকেরাই অবশ্য সব চাইতে বেশী কষ্ট পেল। কোথাও কোনো খাবার নেই। এমন কি অতি সাধারণ গারি, যা কিনা সমস্ত গ্রামবাসীই কিনতে পারে তাও হয়ে উঠল বিলাস।

কোকোর ব্যবসা ছাড়া, যার জন্য আমাকে ঐ সময়ে ঐ জায়গায় থাকতে হয়েছিল, আমার ঐ ভীষণ জায়গা ছেড়ে আসবার কোনো বাধাই ছিলো না। কিন্তু একজন কোম্পানীর এজেন্টকে তো খাবার না থাকলেও তারই মধ্যে কাজ করে যেতে হবে।

এক সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় আমি যখন ডেলের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম একদল লোক খুব গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন মুখে তালগাছের তলায় বসে আছে। যেহেতু আমি ওদের সমাজের কেউ নই, সেইজন্য আমি ওদের মধ্যে গিয়ে জিগ্যেস করতে পারি না যে কিসের জন্য তাদের এই জমায়েত। কিন্তু একটা জিনিস যখন চরমে পৌছয় তখন তা জানবার জন্য ডিটেকটিভের প্রয়োজন হয় না।

আমি ডেলের জানলা দিয়ে ওদের লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম, ঘণ্টা দুয়েক উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের পর তাদের মিছিল খুব ধীরে ধীরে নড়ে উঠল, বুড়োদের সবার মুখ খুব গম্ভীর, এমন কি যুবকেরাও চেষ্টা করছিলো তাদের মুখ গম্ভীর করে রাখতে এবং ইচ্ছে করেই খুবই আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছিলো।

'মনে হচ্ছে ওরা বালের বাড়ির দিকে যাচ্ছে,' ডেল বলল।

'হবে হয়তো', আমি সেই মিছিলের দিকে চোখ রেখে বললাম। মিছিলটা বুবা, সাধারণ সুতীর টুপি এবং খালি টাক মাথার এক অদ্ভুত মিশেল যার সমস্তই লাল রঙে ছুপিয়ে গেছে অস্তমিত সূর্যের আলোতে।

ডেল হঠাৎ বলল, 'চল, ওদের অনুসরণ করি।'

'কি?' আমি প্রতিবাদ করলাম। 'তুমি কি পাগল হলে? তুমি জানো তুমি কি বলছ?'

কিন্তু ডেল আমার কথা শুনলো না। সে তার চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে তার পোশাক কোনোরকমে গলিয়ে নিল। আমার বন্ধু ডেলের ব্যাপারটা এই রকমই। সে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে, ফলের কথা চিন্তাই করে না। তখন আর প্রতিবাদ করবার

সময় ছিলো না। এক মিনিটের মধ্যে আমরা দুজনেই রাস্তায় নেমে সেই মিছিলের পেছন পেছন চলতে আরম্ভ করলাম।

দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগছিলো। বাতাস যখন আমাদের মুখে এসে লাগছিলো তখন স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম তাতে জলকণার অস্তিত্ব। আকাশে মেঘ জমেছিলো, প্রতিমুহূর্তেই তা আরো বেশী কালো হয়ে উঠছিলো। কোথাও কি বৃষ্টির কোনো আভাস ছিলো? বছরের প্রথম বৃষ্টি সেপ্টেম্বর মাসে—আর ঠিক সেই সময়েই যখন গ্রামের বৃদ্ধরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সেই পাখীরা আবার উড়ছে কালো আকাশের গায়ে।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম, বৃদ্ধরা বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। একজন বৃদ্ধ, মনে হল তিনি দলের নেতা, বললেন—

'আমরা কি মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

যে মহিলাটি দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিছু গণ্ডগোল হয়েছে কি?'

'আমরা মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বৃদ্ধটি আবার বললেন এবং এবার তার সমর্থনে কিছু রাগী গলার গুঞ্জন শুনতে পাওয়া গেল।

'তিনি ঐ মন্দিরে', বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন।

মন্দিরের কথা শুনে সবাই যেন একটু বিচলিত হয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশে এখন আরো অনেক বেশি পাখী এবং তারা যেন বেশ রাগতস্বরে ডাকছে। বাতাস আরো জোরে বইছে, আমাদের পোশাক যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। আশেপাশে কোনো আচ্ছাদন নেই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। হঠাৎ আমি গালের ওপর একটা জলকণার স্পর্শ অনুভব করলাম। আকাশটা চিরে যেন বিজলী চমকালো। কিছু বুঝবার আগেই আমরা সবাই সেই নিষিদ্ধ মন্দিরের দিকে দৌড়লাম।

মন্দিরের বাড়িটা বেশ নিচু। তালপাতা দিয়ে ছাওয়া চাল। ভেতরে যতক্ষণ না চোখ স্তিমিত আলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে মনে হয় যেন রাত্রের মতো কালো অন্ধকার। আমি, প্রথমেই যারা দৌড়ে ঢুকেছিলো তাদের মধ্যেই ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল এখানে যেন বলি দেওয়া হয়। ঘরের ছাদ থেকে একটি কালো কাঠে কোঁদা মাথা ঝুলছিলো। ঘরের মধ্যে খুব অদ্ভুতভাবেই তাজা রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ডেলের কাছে গেলাম। সে মন্দিরের তিরিশ গজের মধ্যে যেতেই ভয় পাচ্ছিলো। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আমি দেখলাম কয়েকজন লোক মন্দির থেকে ফিরে আসছে। তারা আমার মতো তাড়াহুড়ো করছে না, বরং বিষণ্ণ ভাবে আস্তে-আস্তে হাঁটছে।

আরো ভালোভাবে দেখতে গিয়ে, আমি দেখলাম তারা একটা স্ট্রেচারের মতো জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্ট্রেচারের ওপর সাদা কাপড় পরানো একটি মানুষের দেহ।

ডেল আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'মোড়ল'।

'মৃত?' আমার গলার স্বর আর স্বাভাবিক থাকছিলো না।

ডেল মাথা ঝাঁকালো।

এবার হঠাৎ আমার চোখে পড়লো যে আকাশ হঠাৎ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বৃষ্টির মেঘ সব উড়ে গেছে। পাখীরাও আর ডাকছে না। বাতাস আবার আগের মতোই শুকনো। কিছু বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে কথা না বলাই ভালো, তাই আমি এ বিষয়ে কোনো কথাই বললাম না। কিন্তু ডেল আমাকে বলল যে সেও এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছে।

'মোড়ল তার কথামতো গ্রামকে ভাসিয়ে দেয়নি।' ডেল বলল, 'সে কি বলত না, যে সে বৃষ্টি তৈরী করতে পারে?'

'চুপ করো,' আমি বললাম।

ঘটনাটা এইরকমই হয়েছিলো।

ডাক্তাররা পরে বলেছিলো যে মোড়ল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলো বা ঐরকমই কিছু একটা, আমার ঠিক মনে নেই।

যখন আমরা মোড়লের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি তখন দেখলাম সদর দরজার কাছে একজন লম্বা, কোমল চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে চিনতে পারলাম, এ সেই প্রথম বৃষ্টিতে মারা যাওয়া চাষীটির ছেলে। ভারী দুঃখের ব্যাপার যে সে তার সৎ বাবাকেও হারালো।

সে জলভরা চোখে বললো, 'এখন আমার আর কোনো আশ্রয় রইল না। মোড়ল, আমার দ্বিতীয় বাবাও মারা গেল।' সে ঠিক একটা বাচ্চার মতো কাঁদছিলো।

'আমার সঙ্গে এসো।' আমি পরামর্শ দিলাম। 'আমি তোমাকে সুখী করবার চেষ্টা করবো।'

সে চোখের জল মুছে আমাদের সঙ্গে এলো। আহা বেচারা অনাথ! আমরা যখন ডেলের ঘরে ঢুকছিলাম, আমি তখন তার দিকে তাকাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে আমি কেমন সৎবাবা হবো। সে ডেলকে ঘরের একদিকে ডেকে নিয়ে তার কানে কানে কিছু বলল। মনে হলো তাদের দুজনের মধ্যে একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ডেলের মুখে প্রথমে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের রেখা, তারপর অবিশ্বাসের আর আশ্চর্যের। সে হাঁ হয়ে রইল।

'অসম্ভব!' সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি তা করতেই পারবে না।'

ছেলেটি শুধুই হাসলো।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কি করবে?'

সে আমাদের আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিয়ে গেল সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে যা একসময় ছিল তার বাবার বাড়ি। ভাঙা বেড়ার কাছে সে আমাদের রেখে চলে গেল।

আমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে ডেল বলল যে, সে তার বাবার মন্দিরে গেছে।

মিনিট পনেরো বাদে ছেলেটি ফিরে এল। তার সমস্ত শরীরে ঘাম। তাকে এখন বড়োদের মত দেখতে লাগছে, তার মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব। আবার তাকে ডেলের বাড়িতে নিয়ে এলাম। সে কিছুতেই বসতে চাইল না, খেতেও না, এমন কি একটু—আরাম করতেও নয়। সে কেবল পায়চারি করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে জানলার কাছে আসছিলো আর বিড়বিড় করছিলো, 'আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলো, সেও ঠিক এমনই করতো…মৃত মোড়লকেও সে এমনই শিখিয়েছিলো…যদি আমি কিছু বাদ না দিয়ে থাকি …আবার সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল ঘর জুড়ে।

তোমাদের যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে একে কাকতালীয় ব্যাপার বলতে পারো, আমি কিছুই মনে করবো না। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। এসমস্ত ব্যাপারে আমি খোলা মন রাখতেই ভালবাসি।

আমরা দশমিনিটও বসে থাকিনি, এমন সময়ে শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে সেটা একেবারেই একপশলা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। তারপর আরম্ভ হলো জোর বৃষ্টি এবং সেই জোর বৃষ্টি একইভাবে চলল চারদিন ধরে। বৃষ্টি ঠিক একই রকম ভাবে হয়ে যাচ্ছিলো। এই ছোট্ট বৃষ্টির কারিগরের তৈরী বৃষ্টিতে কোনো

উদ্দাম উত্তাল ব্যাপার ছিলো না। এমনকি মোড়লের শেষকৃত্য পর্যন্ত সেই বৃষ্টি বন্ধ হওয়া অবধি স্থগিত ছিলো।

সবাই বলতে লাগলো, 'মোড়ল তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। ক্ষেত, রাস্তা সমস্তই জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি সে কথা দিয়েছিলো।'

এবং এই সমস্ত সময় ডেলের ঘরে সেই ছোট্ট ছেলেটি কেবলই পায়চারি করেছে, আর বলেছে, 'আমার বাবা ঠিক এমনই করতো আর ঠিক এমনই আমাকে শিখিয়েছিল, মারা যাবার আগে।'

অনুবাদঃ শান্তা রায়

প্রতিরোধ ! প্রতিবাদ !

আমেরিকার কালোমানুষদের কবিতা

১. **লে রয় জোন্‌স (ইমাম আমিরি বারাকা)**

কালো কবিতা

কালো লোকদের একটি কবিতা
আমরা চাই
আর চাই কালো লোকদের জন্য একটি জগৎ
আর বরং
পৃথিবীটাই হ'য়ে উঠুক
একটি কালো কবিতা ।

২. **ল্যারি টমসন**

কালোই সবার সেরা

কালো যে সবার সেরা
আমার মা আমাকে বলতে ভুলে গেলো
উলটে আমিই তাঁকে বললাম :
কালোই হ'লো সেরা ।
মা ব'লে উঠলো : বাছা, চুপ ক'রে থাক,
অমন কথা বলিস্‌নি ।
আবার আমি বললাম :
মাগো, কালোই সবার ভালো ।
শুনে মা আমায় চাপড় লাগালো ।
তবু কিন্তু আমি বার-বার বলি :
কালোই সবার ভালো
জগৎ সে করে আলো ।

৩. **নিকি জোভানি**

ডাক

ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে—
এসো, আমরা মেতে উঠি তাণ্ডবে,
যা-কিছু আছে সব ধ্বংস করি ।

এসো, আমরা গ'ড়ে তুলি,
গ'ড়ে তুলি তা-ই
আমরা যার শুধু স্বপ্ন দেখি।

৪. নিকি জোভানি

মার্টিন লুথার কিং-এর কবর

কবরের মাথায় লেখা :
'মুক্ত, সে আজ মুক্ত'
হায়, এ-মৃত্যু তো শুধু একজন ক্রীতদাসের মুক্তি
আমরা চাই সমস্ত মানুষের মুক্তি
চাই গড়তে সেই পৃথিবী
যেখানে মার্টিন লুথার কিং
নির্ভয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন
আর গাইতে পারতেন
প্রেম আর অহিংসার গান।

৫. হেনরি ডুমাস

ওদের ছোঁড়া তীর

আঘাত পাবার ভয় করি না
কারণ এখন বুঝি
ওদের ছোঁড়া তীরগুলো সব
শুধুই বুমেরাং।

৬. কার্টি এম. কুম্বো

কবি

দীর্ঘ
কাব্যময়
উচ্চরব
ক্রুদ্ধ
কৃষ্ণকায়
সগৌরব

৭. **উইলিয়াম জে হ্যারিস**

সত্য—সে বড়োই অগোছালো

মহাশয়া
ফিটফাট ছিমছাম তুমি
সত্য—তার সঙ্গে সে যে বড়ো বেমানান
সত্য— সে বড়োই অগোছালো
এলোমেলো বড়ো—
যেমন তছনছ ক'রে ঐ ঘর
ব'য়ে গেলো ঝড়।

৮. **ল্যাংস্টন হিউজ**

রং

সগৌরবে
ধ্বজার মতো উচ্চে তুলে ধরো
এ তো লজ্জা করার নয়।
উচ্চরবে
গানের মতো গলায় ধ'রে রাখো
এ তো ছিঁচকাঁদুনি
কান্না কাঁদার নয়।

৯. **ডন এল লী**

সচেতনা

নিগ্রো মানুষ চিন্তা করে
নিগ্রো মানুষ নিগ্রো
চিন্তা করে মানুষ করে সমস্তক্ষণ চিন্তা
নিগ্রো মানুষ চিন্তা করে
নিগ্রোদেরই চিন্তা।

অনুবাদ: মোহিতরঞ্জন লাহিড়ী

জুলিয়াস লেস্টার

কালো মানুষদের লোককথা

১• মানুষ কাজ করে কেন

আকাশ এককালে ছিলো মাটির খুব কাছে। সত্যি বলতে, মাথার ওপর হাত তুললে হাতটা যতটা উঁচুতে ওঠে, আকাশটা কিন্তু তার চাইতে বেশি উঁচুতে ছিলো না। যখনই কারোর খিদে পেতো, তাকে শুধু হাতটা ওপরে তুলে আকাশের একটা টুকরো ভেঙে খেয়ে ফেললেই হ'তো। সেইজন্যেই কাউকে কক্‌খনো কোনো কাজকর্ম করতে হ'তো না।

তা কিছুকাল তো দিব্যি খাসা চললো এই ব্যবস্থায়, কিন্তু সময়-সময় লোকে এমন এককেটা বড়ো টুকরো ভেঙে নিতো যা তাদের পেটেই আঁটে না—ফলে যা তারা খেয়ে শেষ করতে পারতো না, মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। আকাশ কিনা এতই বড়ো যে চিরকালই লোকের খাবার মতো অনেকটা আকাশ থেকেই যাবে। কীই বা এসে যায়, যতটা তাদের দরকার তার চাইতে বড়ো কোনো টুকরো ভেঙে নিলে?

তা তাদের না-হয় এই ব্যাপারে কিছুই এসে যায় না, তবে আকাশের অনেক কিছু এসে যায়। সত্যি বলতে, নিজেকে আধখাওয়া অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে আকাশ রেগেই যেতো। তাই একদিন আকাশ একেবারে হাউমাউ ক'রে উঠলো, বললো, 'বলি, হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ? নাঃ, এ আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না! উঁহু, মোটেই না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করলেই তোমরা এসে যে যেমন-খুশি আমার গা থেকে এককেটা টুকরো ছিঁড়ে নেবে, তারপর এক কামড় খেয়েই বাকিটুকু ফেলে দেবে, এ আর চলবে না। যদি এই বদভ্যেস তোমরা না ছাড়ো, তবে আমি কিন্তু এতই দূরে চ'লে যাবো যে কেউ আর কোনোদিন আমার নাগাল পাবে না। কী, কথাটা মাথায় ঢুকলো?'

তা মর্মার্থটা লোকে বুঝতে পারলে ঠিকই! সত্যি বলতে, তারা ভালো-

একটা ঝাঁকুনিই খেলো, আর কিছুকাল বেশ খেয়াল রাখলো, যাতে যতটা পেটে ধরে তার চেয়ে বড়ো কোনো টুকরো কেউ আকাশ থেকে ভেঙে না-নেয়। কিন্তু দিনে-দিনে শাসানিটা তারা ভুলতে বসলো। একদিন একটা লোক চল্লিশজন লোকের মাসভর খাবার মতো মস্ত একটা টুকরো ভেঙে নিলো। মাত্র অল্প কয়েকটা ছোট্ট কামড় দিয়ে, ধারগুলো জিভ দিয়ে চেটে-চেটে, বাকিটুকু সে কাঁধের ওপর দিয়ে কোন দূরে ছুঁড়ে ফেলে রাস্তা দিয়ে এমন ভাবভঙ্গি ক'রে হাঁটান দিলে যে অমন পরিতুষ্ট আর আকাট লোক তোমরা কেউ কোনোদিন চোখেও গ্যাখোনি। হুম! আকাশ কথাটিও কইলে না, শুধু প্রচণ্ড এক হাঁক ছেড়ে সে যতটা উঁচুতে উঠতে পারে ততটা উঁচুতে উঠে গেলো, আর তা উঁচুই, বেশ উঁচু।

লোকের যখন মালুম হ'লো কী কাণ্ড ঘ'টে গেলো, তখন তারা হাউ-হাউ ক'রে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। আর ফিরে আসার জন্য আকাশের কাছে তাদের সে কী কাকুতিমিনতি! তারা শপথ ক'রে বললো যে আর-কখনও তারা এমন কর্ম করবে না, কিন্তু আকাশ এমন একটা ভাব করতে লাগলো যেন একটা কথাও তার কানে যায়নি।

পরদিন তো কারোরই আর একফোঁটা খাবার নেই—কাজেই পেট ভরাবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে তাদের কাজে যেতে হ'লো—আর এই জন্যেই সেদিন থেকে লোকে কাজ করে।

২. সাপ কী ক'রে পেলো তার ঝমঝম

ভগবান যখন সাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মাথায় যত সুন্দর-সুন্দর রঙের কথা খেলে গিয়েছিলো, সব তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন—সব লাল, বাদামি আর কমলার ছোপ—আর তারপর তিনি সাপকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এখানে যাতে সে সব জমি আর ঝোপঝাড়ের শোভা বাড়িয়ে দেয়, সবকিছুতেই যাতে একটু রং লাগিয়ে দেয়।

তা, পৃথিবীকে এভাবে সাজাতে সাপ মোটেই কোনো আপত্তি করলে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে সে ভাবতো ভগবান কি জানেন তার জীবনটা কেমন কষ্টের। আর কষ্ট ব'লে কষ্ট! তাতে সন্দেহের কোনো লেশ নেই। পাখিদের মতো তার ডানা নেই—তাই সে উড়তে পারে না। মাছেদের মতো তার কানকো আর পাখনা নেই—তাই নদীতে সাঁতার কাটতে যেতে

পারে না। তার পা নেই—কাজেই সে জোরে ছুটতে পারে না। তাকে খালি-খালি ধুলোবালিতে বুকে হেঁটে বেড়াতে হয়। এতোতেও সে কিছু মনে করতো না, কিন্তু এটা সে বুঝতে পারতো না যে কেন ভগবান তাকে এত কম চোখের তেজ দিয়ে পাঠিয়েছেন। সত্যি, সাপ ছিলো এমনই ডাহা অন্ধ যে তুমি যদি তার চোখের ওপর টর্চের আলো ফ্যালো তবে তাও সে দেখতে পাবে না। সে ছিলো এমনই ডাহা অন্ধ যে নিজের হাত দুটো চোখের কাছে এনে ধরলেও সে দেখতে পেতো না—অবশ্য যদি তার কোনো হাত থাকতো। তার চোখের দৃষ্টি এতই খারাপ ছিলো যে তাকে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সবকিছু করতে হ'তো। আর, সত্যি কথা বলবো? তার গন্ধ শোঁকার ক্ষমতাও তেমন কিছু আহা-মরি ছিলো না।

এখন নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পারছো যে সাপকে যদি মুদিখানায় বা কাপড় কাচার দোকানে যেতে হ'তো তো তার দশাটা কেমন হ'তো। একে অমনভাবে ঘুরে বেড়াতে হয় বুকে হেঁটে ধুলোবালিতে, তায় আবার আধা অন্ধ—সব সময়েই এ ও তাকে মাড়িয়ে যায়। কেউ আসছে কি না, সে তা দেখতেই পায় না, এদিকে সে তো প'ড়ে আছে মাটিতে, তাই অন্যরাও তাকে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। অন্য জীবজন্তু যে ইচ্ছে ক'রে তাকে মাড়িয়ে যায় তা নয়, কিন্তু বোঝোই তো, সময়-সময় কেমন-সব ব্যাপার হয়। হয়তো কোথাও যাবার জন্য তোমার দারুণ তাড়া, কোথায় কোনখানে কোন সাপ প'ড়ে আছে ডাহা অন্ধ আর এক্কেবারে অকর্মা এক নাক নিয়ে—তা খেয়াল ক'রে দেখার তোমার সময় কোথায়? কোনো-কোনো দিন, কোথাও যাবার কথা ভাবতেই সাপের এমন ক্লান্ত লাগতো যে সে এমনকি উঠে বসারও কোনো চেষ্টা করতো না।

সাপগিন্নিও এই অবস্থায় খুব-একটা সুখী ছিলো না। ছানা সাপেদের নিয়ে একটু যে খেলার মাঠে যাবে, তাও আর তার ইচ্ছে করে না। অন্য ছেলেপুলেরা ভাবে যে এরা হচ্ছে লাফিয়ে ডিঙোবার চমৎকার সব রংচঙে দড়ি! তাই সব ছানাপোনাদের নিয়ে সাপগিন্নিকে সারাদিন বাড়িতে বন্দী হ'য়ে থাকতে হয়, আর বাড়ির মধ্যে তারা যে হুলুস্থুল কাণ্ড করে তাতে সে বুঝি পুরোপুরি পাগল হ'য়েই যাবে একদিন। 'আচ্ছা, তুমি কী বলো তো? এ বিষয়ে তুমি কিছু করতেও পারো না,' একদিন সাপগিন্নি তার স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তুললো। 'এই তো, আজ সকালে

কাপড় কেচে বাইরে টাঙাতে গিয়েছিলুম কাপড় শুকোবো ব'লে—আর আমাকে একটু হ'লেই দুটো তাগড়াই মোষ, তিনটে মস্ত হরিণ, আর এমনকি একটা ছোট্ট খরগোশ কিনা একবারে চ্যাপ্টা ক'রে ফেলতো! আমি একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি! তুমি যদি আদ্ধেকও সাপ হও তো এ-বিষয়ে তোমার একটা-কিছু করা উচিত।'

কর্তা-সাপ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ-সব কথা কি আজই প্রথম কানে এলো! এর আগে তো কতবারই…'তা, তুমি আমার কাছে কী আশা করো, শুনি? দুটো হাত গজাবো? ভগবান আমাদের এই ভাবেই তৈরি করেছেন—এ-ব্যাপারে আমি আর কী করবো, বলো!'

'কে বলেছে? আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি ভালোই জানো যে ভগবান আদ্ধেক সময়ই খেয়াল ক'রে ছাখেন না তিনি কী করছেন। উনি তো ওখানে ব'সে থাকেন দিব্যি খোশ মেজাজে, আর এটা-ওটা নিয়ে দিব্যি এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যান। আমরাও তাঁর ও-রকম একটা এক্সপেরিমেণ্ট, যার গোড়াতেই গলদ ছিলো! এ-সম্বন্ধে তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে, না'হলে আমি জানতে চাই তোমার টুঁ শব্দ না-করার কারণটা কী। তুমি একটা কী—কিস্সু না, কুঁড়ের হদ্দ, তুমি তো কোনো ধর্তব্যেই আসো না। মা আমাকে ঠিকই বলেছিলেন তোমাকে বিয়ে না করতে! আমার উচিত ছিলো তখনই তার কথা শোনা।' সাপগিন্নি তারপর থেকে তাকে এক-নাগাড়ে গালাগাল ক'রেই চললো। সারা বাড়িতে তারপর সে দাপাদাপি করতে লাগলো—তাকে থামায় সাধ্য কার! এমনকি এটা অব্দি সে বললে যে সাপকর্তার মা নাকি ছিলো এক গিরগিটি আর বাবা এক কেঁচো।

তা, সাপকর্তা সেদিন কোন নম্বরে খেলবেন তা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু তাতে যে একটু মন বসাবেন তার জো কী—গিন্নি এমন চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন! শেষটায় সে ঠিক করলে বুকে হেঁটেই চ'লে যাবে স্বর্গে, গিয়ে ভগবানের সঙ্গে কথা ব'লে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা ক'রে আসবে। ভগবান যে কিছু করতে পারবেন, সে-বিশ্বাস তার ছিলো না—তবে তাতে গিন্নির মুখটা অন্তত একটু বন্ধ হ'বে—যদি ভগবান সরাসরি তাকে ডেকে দু-কথা বলেন।

তখন বেলা দুটো, সাপ গিয়ে স্বর্গে পৌঁছুলো। ভগবান তাঁর মস্ত দোল-

কেদারায় ব'সে টি. ভি. তে কী দেখানো হবে তার কাগজ পড়ছিলেন। 'তা, সাপমশাই, কী খবর?'

'নাঃ, খবর আর কী! পুরোনো কাসুন্দি। আপনি তো জানেনই।'

'হুম, বুঝলাম তুমি কী বলতে চাইছো। নাও, একটা চেয়ার টেনে বোসো। আমি ব'সে-ব'সে দেখছিলাম ১৯৭০ সালে টেলিভিশনে কী দেখানো হবে। অবশ্য, ১৯৭০ আসতে অনেক দেরি, তবে আমি ভাবছিলাম এখন থেকেই ঠিক ক'রে রাখি কী-কী দেখানো হবে—যদি তখন ভুলে ছুটিতে বেড়াতে যাই।'

সাপ একটা চেয়ারে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসলো।

'চুরুট চলবে না কি, সাপমশাই?'

'ধন্যবাদ প্রভু, তবে চুরুট খাই না।'

'আমিও ধূমপান কমিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। আমার গিন্নি বলেন আমি নাকি বড্ড বেশি চুরুট খাই। তিনি বলেন তাতে আমার মুখে নাকি গন্ধ হয়।'

'তাই বুঝি?'

তিনি অন্তত তা-ই বলেন, সাপমশাই, যদিও আমি কথাটা মোটেই বুঝতে পারি না। প্রতিবার খাবার পরেই তো আমি দাঁত মাজি। তা, এ-সব থাক। আপনি এখানে কী মনে ক'রে? আপনাকে তো তোফা দেখাচ্ছে—বেশ ভালো।'

'না প্রভু, আমি ভালো নেই।

'ও-কথা বলবেন না!'

'সত্যি বলছি, প্রভু। এখানে এসে আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করতে আমার খুবই খারাপ লাগে—জানি তো, আপনি কেমন ব্যস্ত থাকেন সবসময়। কিন্তু আমার স্ত্রী—তিনি একদণ্ডও আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না যদি না আমি একটা হেস্তনেস্ত করি।'

'তা, আপনি বরং পুরো ব্যাপারটা খুলেই বলুন।'

'প্রভু, ব্যাপারটা এইরকম: আপনি তো জানেনই আমার চোখ তেমন সুবিধের নয়। আমাদের বংশেরই বোধ হয় এই ধারা—মা-বাবা দুই তরফেই। আর সব সময়েই তো মাটিতে প'ড়ে থাকতে হয় আমাকে—আমি বুঝতেই পারি না কখন অন্য-কেউ রাস্তা দিয়ে আসছে। তার ফলে আমি আর

আমাদের বাড়ির সব্বাই সবসময় অন্য প্রাণীদের পায়ের তলায় চাপা প'ড়ে যাচ্ছি। আর প্রভু, আমার সারা গায়ে সে কী ব্যথা—আর আপনি তো জানেনই আমার পেশী নেহাৎ অল্প নেই—কাজেই ব্যথার পরিমাণটা কত! এই দশায় আমার স্নায়ু এমনি হ'য়ে আছে যে গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়লেও আমি আঁৎকে উঠি।'

'হুম, আপনার দশা তো বেশ খারাপ, সাপমশাই।'

'আমি মাথাধরার ওষুধ খেয়েছি, স্নায়ু ঠাণ্ডা করার ওষুধ খেয়েছি—একগাদা ওষুধ, নার্ভের রোগে যা-যা দেয়, কিন্তু প্রভু, কিছুই কোনো কাজে আসেনি। মাঝে-মাঝে যেই মনে ভাবি যে বাইরে গেলেই লোকে আমাকে মাড়িয়ে যাবে, অমনি আমার আর বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না।'

ভগবান তাঁর একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট ধ'রে নাক মুখ দিয়ে ভকভক ক'রে ধোঁয়ার আংটা ছাড়লেন। 'তোমার দশা যে এমন হবে, তা আমি মোটেই চাইনি।' হাত ঢুকিয়ে তিনি পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল বার ক'রে আনলেন। 'এই যে, এ হ'লো বিষ। এটা আপনি আপনার মুখে রাখুন আর বাকিটা আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দিন। আত্মরক্ষার জন্য এটা আপনি ব্যবহার করবেন। কেউ যেই আপনাকে মাড়াবে, অমনি দেবেন তাকে ছুবলে, আর একটু বিষ ঢেলে দেবেন—ব্যস, তাতেই কাজ হবে।'

'ধন্যবাদ প্রভু, আন্তরিক ধন্যবাদ।'

'না-না, এ আর কী। আপনাদের সাহায্য করতে পারলেই আমার ভালো লাগে। যদি আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় তো আমাকে শুধু একবার খবর দেবেন।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি ফিরতে একফোঁটা সময় নষ্ট করলো না সাপ। যখন বৌকে গিয়ে সে বিষের কথা বললে বৌ তো তাকে আদরটাদর ক'রে একশা। সাপ অবশ্য বৌকে বললে যে চেপে যেতে, বরং গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুক।

তা, কয়েকদিন পরে, খরগোশ সারা বনের ভেতর খবর পাঠালে যে সব জীবজন্তুই যেন তাদের ইউনিয়নের প্রতিনিধি পাঠায় সভায়। সব জীবজন্তু—তবে, সাপ বাদ।

'এখন সভার কাজ আরম্ভ হচ্ছে!' খরগোশ ঘোষণা করলে। 'ঐ যে, ওহে, হস্তীপ্রবর! আপনি কি কোথাও একটু বসতে পারেন না—আপনি তো সূর্যের আলো আটকে দিচ্ছেন। এটা কক্খনো আমার মাথায় ঢোকেনা কেন যে ভগবান জঙ্গলের সেরা বুদ্ধুটাকে সবচেয়ে বৃহদাকার ক'রে সৃষ্টি করেছেন!'

হাতি ব'সে পড়লো।

'আপনি এখনো কিন্তু রোদের আলো আড়াল ক'রে রেখেছেন, হস্তীপ্রবর!'

'আমি দুঃখিত, খরগোশ মশাই।'

'যাক-গে, ব্যাপারটা আসলে আপনার দোষ নয়। তবে আপনার মাথাটা একপাশে একটু হেলিয়ে রাখতে পারবেন তো, যাতে খানিকটা আলো আসতে পারে?—আচ্ছা, এভাবেই হবে! এখন, সব্বাই তো আপনারা জানেন কেন আজ আমি এই সভা ডেকেছি। কারণটা হ'লো ঐ সাপ! এ-বিষয়ে কিছু-একটা আমাদের করা উচিত, এবং এক্ষুনি, আমাদের সব্বাইকে ও খতম ক'রে দেবার আগেই কিছু একটা করা চাই। এ-হপ্তায় আমাকে সবসুদ্ধ তেরো-তেরোটা অন্ত্যেষ্টিতে যেতে হয়েছে—আর আজ কি না মাত্র মঙ্গলবার!'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, তা আমি জানি,' ব্যাঙ ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ ক'রে উঠলো। 'ঐ সাপ আমার তিন খুড়োকে কেটেছে আজ অব্দি, মাস-তুতোভাই, দুই মাসি আর আমার জামাইবাবুও বিলকুল খতম। তবে, এটা অবশ্য বলবো যে ঐ জামাইবাবুর অন্তর্ধানটা একদিক থেকে আশীর্বাদের মতোই।'

'হুম, আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ, কিছু এসে যায় না। ভগবান যেদিন ওকে বিষ দিয়েছেন, সেদিন থেকেই ঐ সাপটা এ-তল্লাটের বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঝোপে-ঝাড়ে যে-ই নড়াচড়া ক'রে, তাকেই সে ছোবলাচ্ছে। সে যে চোখে দ্যাখে না, তা ঠিক, কিন্তু কানে শুনতে তো তার আটকায় না। আরো, ছোট্ট একটা সরসর শুনলেই সে গিয়ে অমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

ঘোড়া বললে, 'আর কী তার তাগ—একেবারে সবার সেরা—আমি কখনো অমন তাগ দেখিনি—কখনো ফসকায় না।'

'কাকে শেখাচ্ছেন?' খরগোশ ব'লে উঠলো, 'সেদিন দেখলুম ঝোপের একটা পাতা একটু কেঁপে উঠলো—আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সে-পাতাটা এখন একটা মরা পাতা, ঝরা পাতা। সাপ যে কত রকম বিষ ঐটুকুনি পাতায় ঢেলে দিয়েছিলো—

'তা, এ-বিষয়ে আমরা এখন কী করবো, তবে?' খ্যাঁকশেয়াল জানতে চাইলো।

'ওকে কেটে পড়তে বলো, নইলে আমরাই ওকে সাবাড় ক'রে দেবো,' বললে চিতাবাঘ। 'ওকে বলো যে আর যদি কখনো ওর ঐ দু-ফলা জিভ দিয়ে কাউকে ছোঁয় তো ওকে আমরা তক্ষুনি খতম ক'রে ফেলবো।'

'ধরা যাক, ওর ঐ দু-ফলা জিভ দিয়ে কাউকে ও ছুঁয়েই দিলো আর আপনি ওকে সাবাড় করতে পারলেন না,' খরগোশ জিগ্যেস করলে।

'ঠিক কথা,' প্যাঁচা সায় দিলে। 'গুণ্ডার সর্দারকে মোকাবিলা করবে কে বটে?'

হাতি বললে, 'আমরা তো ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে পারি, বলতে পারি যে আমরা ওর কোনো ক্ষতি করতে চাই না, শুধু আমরা আমাদের বাঁচবার অধিকার চাই। এ কথাটা তার অন্তত বোঝা উচিত।'

'সেই কথাটাই তো আমি আগে জিগ্যেস করেছি—ভগবান কেমন ক'রে কাউকে এমন মস্ত ক'রে তৈরি করলেন যে তাকে মগজ দিলেন মাত্র এইটুকুনি! যদি আপনার মগজটাকে একশোগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায়, তবে একটা পোকার নাভির মধ্যে সেটাকে আঁটানো যাবে—কর্নফ্লেক্সের কৌটোয় বি-বির মতো সেটাকে তখন ঝমঝম ক'রে বাজানো যাবে। কী, কিছু ঢুকলো মগজে? সে যা বুঝতে চাইবে না তা বুঝতে যাবার জন্য তার দায় কী—অন্তত যতদিন তার ও-রকম দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে।'

আলোচনা চললো তো চললো তো চললোই—এতক্ষণ ধ'রে যে শেষটায় খরগোশের একেবারে এমন ঘেন্না ধ'রে গেলো যে সে নিজেই, একাই, ছুটলো স্বর্গে। ওরা তো অনন্তকাল আলোচনা চালাবে, তারপর ঠিক করবে যে কাকে স্বর্গে ভগবানের কাছে কথা বলতে পাঠানো উচিত। খরগোশ শুধু একবার মনে-মনে ভাবলে সব প্রাণীদের মধ্যে শুধু কি তার মাথাতেই খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান আছে?

খরগোশ গিয়ে যখন দাওয়ায় পৌঁছুলো, ভগবান তখন ব'সে ব'সে খবর-কাগজ পড়ছিলেন। 'হ্যাঁ, খরগোশ মশাই—শুধু আপনাকেই ব'লে রাখি। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর আপনি যদি আমার পরামর্শ শোনেন তো আপনারও কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দেয়া উচিত। ঐ দশ বছর সত্যি দারুণ খারাপ যাবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ দশ বছরে আমি কারোর কাকুতিমিনতিই শুনবো না।'

'প্রভু! আপনি বলছেন কী?'

'আপনি শুধু মনে রাখবেন আমি কী বললাম, ব্যস।' ভগবান খবর-কাগজটা ভাঁজ ক'রে তাঁর চেয়ারের পাশে রাখলেন। 'তা, এবার ব'লেই ফেলুন আপনার মনের মধ্যে কী আছে।'

'ওটা ঐ সাপ।'

'ও তো কয়েকদিন আগেই এখানে এসেছিলো।'

'তা কি আর আমরা টের পাইনি ব'লে আপনি ভেবেছেন। আপনি তাকে কী সব বিষ দিয়েছেন, আর সে এরই মধ্যে এত জীবজন্তুকে ছুবলেছে যে, অন্য অনেকে ভাবছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দূরে উত্তরে চ'লে যাবে কিনা। সব্বাই এত ভয় পেয়েছে যে রাত-বিরেতে বৌ মেয়েকে বাইরে বেরুতেও দিতে চায় না। হ্যাঁ, আমি একেবারে নির্জলা সত্যি কথা বলছি। ভগবান, ঐ সাপ সবসুদ্ধ তিনশো সাঁইত্রিশ জনকে ছুবলেছে, এ ছাড়া পাঁচটা ওকগাছ, সতেরোটা তালগাছ আর একটা কাঁটাঝোপও হিসেবে ধরবেন। হা! হা! হা! কাঁটা ঝোপটাকে ছোবলাবার সময় ওকে আপনার স্বচক্ষে দেখা উচিত ছিলো। হা! হা! হা! তারপর দু-ঘণ্টা ধ'রে ওর বৌ ওর মুখ থেকে কাঁটা আর শুঁয়োগুলো টেনে-টেনে খুলছিলো! ঠিকই সাজা হয়েছিলো, ব্যাটা অধম—'

'হুঁ-হুঁ, ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি। আপনি ফিরে গিয়ে সাপকে বলুন যে, ও যেন এখানে চট ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

'আজ্ঞে, তার কাছে গিয়ে পড়া একটু বিপজ্জনক হবে, প্রভু।'

'তা আপনি হাতিকে গিয়ে বলুন সে যেন চেঁচিয়ে সবদিকে খবরটা জানান দেয়। সাপ মশাইয়ের কানে তো আর কোনো দোষ নেই।'

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেলো সাপকর্তা ভগবানের পাশে একটা চেয়ারে কুণ্ডলি পাকিয়ে ব'সে আছে।

'প্রভু, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ—কয়েকদিন আগে যে মোক্ষম দাওয়াই আমাকে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তারপর থেকে কোনো প্রাণীই আমাকে আর মাড়িয়ে যেতে পারেনি।'

'ঠিক ঐ বিষয়েই আলোচনা করবার জন্য আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি আপনাকে বিষ দিয়েছিলাম আত্মরক্ষা করার জন্য ব্যবহার

করতে—কিন্তু এখন এ-সব কী শুনছি—আপনাকে তো আমি আক্রমণ করতে বলিনি।'

'আজ্ঞে, প্রভু, আপনি তো জানেনই আমার চোখ তেমন ভালো নয়—ফলে কে যে বন্ধু আর কে যে শত্রু তা আমি দেখতেই পাই না। কাজেই যার সঙ্গেই মোলাকাৎ হয় তাকেই আমি ছুবলে দিই—তাতে ক'রে সবসময়েই আমি দিব্যি নিরাপদে থাকতে পারি। আমাকে এতবার এতজনে মাড়িয়ে গেছে যে আর আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'তা আমি বুঝতে পারি, সাপমশাই। কিন্তু এখন তো আপনি দেখছি সবাইকেই বিভীষিকা দেখাচ্ছেন।'

'আমি তা করতে চাইনি, প্রভু। সত্যি বলছি. আমি তা মোটেই করতে চাইনি।'

ভগবান তাঁর পকেটে হাত ঢোকালেন। 'এই যে। আপনি এই ঝুমঝুমিগুলো নিন, নিয়ে ল্যাজে আটকে দিন। যখনই আপনি কোনোকিছুর সাড়া পাবেন, অমনি ল্যাজ আছড়াবেন, সেটা যথেষ্ট সাবধানবাণী হবে। যদি সে আপনার বন্ধু হয় তো সে থেমে যাবে, আপনার সঙ্গে সারাদিন চুটিয়ে আড্ডা দেবে। আর যদি কোনো শত্রু হয়, আর ঝমঝম শোনবার পরও এগিয়ে আসে, তাহ'লে তারপর আপনি যা ভালো বোঝেন—সে আপনাদের দু'জনকার ব্যাপার। বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, প্রভু বুঝেছি। আবারও আপনাকে ধন্যবাদ। যা-ই কাছে আসে, তাকেই ছোবলাতে হবে—ব্যাপারটা বড্ড ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠছিলো। সত্যিই ক্লান্তিকর।'

আর এইভাবেই সাপ পেয়ে গেলো তার ঝমঝম। ততদিনে অবিশ্যি ভয়ে সব্বাই এমনি আধমরা হ'য়ে গিয়েছিলো যে কেউই পারতপক্ষে তার ধারে-কাছে ঘেঁষেনি। তবে, যখন কেউ এসে পড়তো হঠাৎ, সাপ এমন জোরে-জোরে তার ল্যাজ ঝমঝম করতো যে সমস্ত বন জুড়ে সে-আওয়াজ শোনা যেতো, সবাই জানতে পারতো যে : এখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত সর্পমহারাজ আছেন—আর কেউ আমাকে মশাই মাড়িয়ে যেতে পারবেন না।

অনুবাদ : শান্তা সরকার

হাভিয়ের এরাউদ

এক গেরিলা যোদ্ধার বিবৃতি

যেহেতু আমার স্বদেশ
কোনো খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো সুন্দর
আর আরো-গরীয়ান, এখন, এমনকি
সুন্দরতর, আমি
তারই কথা বলি সবসময় আর প্রাণ দিয়ে
তাকে রক্ষা করি।
দেশদ্রোহী? ওরা কী বলে
তার কী তোয়াক্কা করি আমি?
গিরিসংকট বন্ধ ক'রে দিয়েছি
ইস্পাতের
বিশাল অশ্রুতে।
আকাশ আমাদের।
আমাদেরই দৈনন্দিন রুটি, আমরাই
বীজ বুনেছি আর ফলিয়েছি
ফসল আর মাটি,
এ-সব আমাদের, আর আমাদেরই, এখন,
চিরতরে
সমুদ্র,
পাহাড়
আর পাখিরা।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এদুয়ার্দো গালেয়ানো

সোনার লোভ রূপোর লোভ

১. তলোয়ারের বাঁটে ক্রুশ

ক্রিস্টোফার কলম্বাস যেদিন, খ্রীস্টীয় জগৎ-এর পশ্চিমে, বিশাল শূন্যতায় পাড়ি দেন, সেদিনই কিংবদন্তীর আহ্বান তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর ঝড় তাঁর জাহাজগুলোকে নিয়ে খেলা করবে, যেন তারা বাদামের খোলা. আর ছুঁড়ে দেবে রাক্ষসদের চোয়ালে ; নরমাংসলোলুপ সিন্ধুনাগ, ওত পেতে থাকবে কালো অতলে। পনেরো শতকের মানুষদের মতে তখন, শেষ বিচারের শুদ্ধকর আগুনে পৃথিবী ধ্বংস হ'তে মাত্র হাজার বছর বাকি ; আর পৃথিবী বলতে তখন বোঝাতো, ভূমধ্যসাগর আর তার অনিশ্চিত দিগন্ত : ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া। পর্তুগালের নাবিকেরা কিছু অদ্ভুত মরদেহ আর আশ্চর্য সব খোদাই-করা কাঠের ফলক পশ্চিম বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসার কথা বলাবলি করেছিল, কিন্তু কেউ সন্দেহও করেনি যে পৃথিবীটাকে চমকপ্রদভাবে বিস্ফারিত করে দিতে চলেছে একান্ত এক নতুন দেশ।

আমেরিকা তখন শুধু নামহীনই নয়। নরওয়ের লোকেরা বুঝতেই পারেনি যে কতকাল আগেই তাকে তারা আবিষ্কার করেছে, আর স্বয়ং কলম্বাস এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে মারা যান যে, তিনি পশ্চিমপথে এশিয়ায় পৌছেছিলেন। ১৪৯২-এ স্পেনের নৌকো যখন বাহামার পাড় ঘেঁষে যাচ্ছে, তখন ঐ দ্বীপগুলিকে নৌ-সেনাপতি মনে করেছিলেন কিংবদন্তীর দ্বীপ জিপাংগো বা জাপানের ফাঁড়ি। কলম্বাসের সঙ্গে ছিল মার্কো পোলোর বই, আর তার পাতার মার্জিনগুলো তিনি ভর্তি করেছিলেন নানা মন্তব্যে আর টীকায়। মার্কো পোলো বলেছিলেন, "জিপাংগোর অধিবাসীদের, প্রভূত পরিমাণে সোনা আছে। উৎস অফুরন্ত।... এই দ্বীপে প্রচুর সংখ্যক মুক্তো আছে যার রঙ লাল, গড়ন গোল, আকার বৃহৎ ডিমের তুল্য বা তারও বেশী।" (১) জিপাংগোর ঐশ্বর্য সম্পর্কে মহামান্য কুবলা খান-ও শুনেছিলেন, ফলে তাকে হাতিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে তাঁর

চাগিয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হ'ন। মার্কো পোলোর উজ্জ্বল পাতাগুলো থেকে জগৎ-এর সব কাম্য জিনিসগুলো লাফিয়ে বেরিয়ে আসে: ইন্‌ডিয়ান সাগরগুলোতে প্রায় তেরো হাজার দ্বীপে মজুত সোনা ও মুক্তোর পাহাড় আর অঢেল সাদা ও কালো মরিচ ছাড়া আরো বারো রকমের প্রচুর মশলা।

মাংস যাতে পচতে না পারে বা শীতকালে তার গন্ধ নষ্ট না হয়, তার জন্যে লবণের মত মরিচ, আদা, লবঙ্গ, জায়ফল আর দারুচিনিরও সমান কদর ছিল। রহস্যে ঘেরা প্রাচী-র মশলা, গাছগাছড়া, মসলিন আর তলোয়ারের লেনদেনের কারবার একচেটে ছিল দালাল আর ফাটকাবাজদের; তাদের গুরুভার থেকে মুক্তি পেতে আর উৎস-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরী করতে স্পেনের ক্যাথলিক শাসকেরা ঐ অভিযানকে মূলধন যোগানো মনস্থ করেন। বাণিজ্যিক লেনদেন যে দামী ধাতুগুলির মারফৎ চলত, তাদের পাবার লোভও সাঙ্ঘাতিক সব সাগর পাড়ি দিতে মানুষকে উত্তেজিত করে। তখন গোটা ইউরোপের রুপোর দরকার; বোহেমিয়া, স্যাক্সনি আর টাইরোল-এর স্তরগুলি, শেষপ্রায়।

স্পেনের তখন পুনর্দখলের যুগ: ১৪৯২ শুধু নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের সন নয়, গ্রানাদা ফিরে পাওয়ারও সন; এই নতুন পৃথিবীর জন্ম একটি ভুলের থেকে, যদিও তার ফল হল ব্যাপক। আরাগন-এর ফার্দিনান্দ আর কাস্তিয়ের ইসাবেলার বিবাহের ফলে তাঁদের রাজ্যগুলো এক হয়; আর ঐ বছরের গোড়ায় তাঁরা স্পেনের মাটিতে গেড়ে থাকা শেষ আরব ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড হামলা চালান। সাত বছরে যা হারিয়েছিল তা ফিরে পেতে প্রায় আট শতক সময় লাগে, কিন্তু এই পুনর্দখলের যুদ্ধ রাজকোষ শূন্য করে দেয়। তবু এই যুদ্ধ ছিল পবিত্র যুদ্ধ, ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীস্টীয় যুদ্ধ আর ঐ একই সন ১৪৯২-এ ১৫০,০০০ ইহুদিকে যে দেশছাড়া করা হয়েছিল, তা মোটেই কাকতালীয় ছিল না। স্পেন রাষ্ট্র হিসেবে এক এবং তা সম্ভব হতে পেরেছিল, বাঁটে ক্রুশ লাগানো তলোয়ার হাতে নিয়ে। রাণী ইসাবেলা এই পবিত্র ইনকুইশিজান-এর পৃষ্ঠপোষক। কাস্তিয়ের মধ্যযুগে জেহাদের যে রেওয়াজ চলেছিল, কেবল তার নিরিখেই আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব বোঝা যেতে পারে; সাগর পাড়ি দিয়ে অচেনা অজানা দেশ জয়ের অভিযানকে পারমার্থিক অনুমোদন দিতে চার্চকে আভাস দেবারও দরকার হয়নি। পোপ আলেকজাণ্ডার VI, যিনি আবার স্পেনীয় ছিলেন, রাণী ইসাবেলাকে নতুন পৃথিবীর স্বত্বাধিকারিণী ও সম্রাজ্ঞী নিয়োগ

করেন। কাস্তিয়ের সাম্রাজ্যবিস্তার পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দেয়।

কলম্বাস হাইতির নাম রেখেছিলেন এস্‌পেনোলা ; আর স্বয়ং তিনি আবিষ্কারের তিন বছর পরেই হাইতির বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালান। জনাকয়েক ঘোড়সওয়ার, দুশো পাইক ও কিছু বিশেষ তালিম দেওয়া কুকুর দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশী ইন্‌ডিয়ানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পাঁচশোরও বেশী, জাহাজে করে স্পেনে পাঠিয়ে সেভিয়ে-তে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা হয় ; সেখানে তাদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কিছু ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিবাদ করেন, আর ষোলো শতকের গোড়ার দিকে ইন্‌ডিয়ানদের ক্রীতদাস করা আইন করে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আদতে তাকে নিষিদ্ধ নয়, আশীর্বাদ করা হয়েছিল : প্রতিটি সামরিক অভিযানের আগে, তার সেনাপতিকে, দোভাষী ছাড়া কিন্তু এক রাজকর্মচারীকে সামনে রেখে, ইন্‌ডিয়ানদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্যে আবেদন করে এক লম্বা অলঙ্কৃত ভাষণ Requerimients পড়তে হ'ত :

তোমরা যদি দীক্ষাগ্রহণ না কর, বা গ্রহণে বিদ্বেষবশতঃ বিলম্ব কর, তবে আমি নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করিতেছি যে, ঈশ্বরের সহায়তায় আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইব ও যে-কোনো স্থানে ও যে-কোনো প্রকারে সম্ভব যুদ্ধ করিব। চার্চ ও তার কৃপাধন্যদের বশ্যতা ও আনুগত্য মানিয়া লইতে তোমাদের বাধ্য করিব। তোমাদের স্ত্রী ও শিশুদের দাস রূপে গণ্য করিয়া মহিমাময়দের আজ্ঞানুসারে তাহাদের বিক্রয় ও হস্তান্তর করিব ও তৎসহ তোমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তোমাদের ক্ষতি ও অনিষ্টসাধনে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইব। (২) আমেরিকা খোদ শয়তানের রাজ্য, তার ত্রাণ অসম্ভব, অন্তত সংশয়জনক ; কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের ধর্মের বিরুদ্ধে গোঁড়া অন্ধ প্রচারের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল নতুন পৃথিবীর ঐশ্বর্যের প্রতি সদ্য আগত বিজেতাদের লোভ। মেক্সিকো দখলের অভিযানে হের্নান কোর্তেস-এর অনুগত সঙ্গী বের্নাল দিয়াদ দেল্‌ কাস্তিও লিখেছিলেন যে, তাঁরা আমেরিকা এসেছেন, "ঈশ্বর ও মহিমাময় সম্রাটের সেবার্থে ও সেই সঙ্গে ধনসম্পদ পেতে।"

উপহ্রদওয়ালা গোল প্রবালদ্বীপ স্যান সালভাডোর-এ প্রথম পা রেখে,

ক্যারিবিয়ার স্বচ্ছ রং, সবুজ শোভা, মৃদু পরিষ্কার বাতাস, চমৎকার সব পাখী আর "দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ ও সুন্দর মুখসম্পন্ন", স্থানীয় যুবক যুবতীদের দেখে কলম্বাসের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের দেন, "কিছু লাল টুপি, পুঁতির মালা আর অল্পদামের কিছু টুকিটাকি," যা ওদের খুব খুশী করে। এইসব পেয়ে ওরা খুব খুশী হয়, আর এর ফলে আমাদের এত বন্ধু হয়ে পড়ে, যে তা বেশ আশ্চর্যের ছিল।" তলোয়ারের কিছুই ওরা জানতো না; দেখালে ওরা ধারালো দিকটা ধরতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে। এর ফাঁকে, নৌসেনাপতি তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, "আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের দেখছিলাম, ওদের কাছে সোনা আছে কিনা জানবার চেষ্টা করছিলাম। কারো কারো নাকে সোনার টুকরো দেখে, ইঙ্গিতে জেনে নিলাম যে দক্ষিণমুখো গেলে বা দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করলে এক রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যার কাছে বিরাট সব পাত্র ভর্তি সোনা আছে। আর তা-ও অঢেল।" (৩) "সব ঐশ্বর্যের মূলে সোনা, আর তাকে পুঁজি করে তার মালিক দুনিয়াতে নিজের মর্জিমত চলে, এমন-কি তা আত্মাদের স্বর্গে-ও পাঠাতে পারে।"

তিনের দফায় সাগর পাড়ি দেবার বেলায়-ও কলম্বাস ভেনেজুয়েলার তটের কাছে এসে মনে করেছিলেন তিনি চীনসাগরে আছেন। অবশ্য তা তাঁকে সামনের অন্তহীন স্থল যে ভূস্বর্গের মত, এ-কথা বলা থেকে বিরত করেনি। পরে, ষোলো শতকের গোড়ার দিকে ব্রেজিলের তটভূমির এক অভিযাত্রী আমেরিকো ভেসপুচ্চি, লরেন্জ দ মেদিচিকে বিবরণ দিয়েছিলেন: "বৃক্ষদের এমনই শোভা ও মিষ্টতা যে আমাদের মনে হয়েছিল আমরা ভূস্বর্গে বিচরণ করছি। (৪)* ১৫০৩ সালে কলম্বাস জামাইকা থেকে তাঁর অধিপতিদের লেখেন: "আমি যখন ইন্ডিস আবিষ্কার করি, তখনই

---

* ইডেন-এর কানন যে আমেরিকায়, তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আইনব্যবসায়ী এন্টোনিও ডি লিওন পিনেলো দু-খণ্ডের এক গ্রন্থ লেখেন। তিনি El Paraiso en el Nuevo Mundo (১৬৫৬)-এ দক্ষিণ আমেরিকার একটি মানচিত্র দিয়ে দেখিয়েছিলেন, আমাজন, ডিলা প্লাটা, ওরিনোকো ও ম্যাগ্‌ডেলানা নদীর ধারে মহাদেশের ঠিক মাঝখানে ছিল ইডেন কানন। নিষিদ্ধ ফলটি ছিল, কলা। মানচিত্রে, মহাপ্লাবনের সময়ে নোআ'র জাহাজ ঠিক যে জায়গা থেকে পাড়ি দেয়, দেখানো ছিল।

বলেছিলাম ঐগুলি বিশ্বের সব থেকে ধনী অঞ্চল। ওখানে আছে সোনা, মুক্তো, দামী পাথর, মশলা…"

মধ্যযুগে এক থলি মরিচ একটি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশী দামী ছিল। কিন্তু নবজাগরণ, সোনা আর রুপোর চাবিকাঠি দিয়েই আকাশে খুলেছিল স্বর্গের দরজা আর পৃথিবীতে পুঁজিবাদী বাণিজ্যের। আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের কাহিনীতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি এসে মিলেছে স্থানীয় সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া আর লুটপাটের ঘটনা। ইউরোপীয় শক্তি ছড়িয়ে প'ড়ে কোলাকুলি করতে চাইলে সারা বিশ্বকে। জঙ্গল আর বিপদে ভরা অনাবাদী দেশ, কাপ্তেনদের, ঘোড়সওয়ার অভিজাতদের আর লুঠকরা সব মালের অদ্ভুত লোভ গরীব সৈনিকদের ধনলিপ্সাকে তাতিয়ে তোলে : তাদের আস্থা ছিল গৌরবে, "মৃতদের স্বর্গে", আর তা জিতে নেবার চাবিকাঠিতে, কোর্তেস-এর সংজ্ঞায় যা : "অদৃষ্ট অনুগ্রহ করে নির্ভীককে" মেক্সিকো অভিযান-এর সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে কোর্তেস নিজে তাঁর সব সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন। কলম্বাস, পেদ্রারিয়াস দাভেলা আর মাগেলন এই ক-জন বাদে, কন্‌কিসতাদোর-দের' 'স্পেনীয় বিজেতারা') টাকার যোগাড় সরকারি সাহায্য ছাড়াই, নিজেদের ভরসায় বা যারা ঝুঁকি নিয়ে টাকা ঢালতে রাজী হ'ত, এমন ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করেই করতে হয়েছে।

এল-দোরাদোর কিংবদন্তীর, সোনার রাজার জন্ম হ'ল : তাঁর রাজ্যের শহরগুলির বাড়ি সোনার, রাজপথ সোনার। কলম্বাসের এক শতক পরে, স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে ওরিনোকো পর্যন্ত পাড়ি দিলেও তার জলপ্রপাতগুলি তাঁকে হার মানায়। "যে-পাহাড় থেকে নির্গত হয় অনর্গল রৌপ্য-প্রবাহ," সেই রূপকথার গপ্‌পোও ১৫৪৫ সালে পেতোসি আবিষ্কারের সঙ্গে সত্যি হ'ল, কিন্তু তার আগে কত দুঃসাহসী, ঐ রুপোর পাহাড়ের বিফল খোঁজে পারানা নদী পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে, হয় রসদের অভাবে নয় রোগে নয় স্থানীয় বাসিন্দাদের তীরে বিঁধে মারা গেছে।

কিন্তু সত্যিই মেক্সিকোর অধিত্যকা আর এন্‌ডিয়ান আনটিপ্লানোতে অঢেল সোনা-রুপো মজুত ছিল। ১৫১৯-এ কোর্তেস স্পেনকে জানিয়েছিলেন যে, মন্টেজুমার আস্‌টেক ভাণ্ডারের বিশালতা রূপকথার সামিল, আর তার পনেরো বছর পরে সেভিয়েতে এসে পৌঁছয় এক ঘর ভর্তি সোনা আর দু-ঘর ভর্তি রুপো, ফ্রান্সিস্‌কো পিজারো যা, দমবন্ধ করে মেরে ফেলার আগে, ইন্‌কা

আতাউ-আল্পার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন মুক্তিপণ হিসেবে। বেশ কিছু বছর আগে, কলম্বাসের প্রথম নৌযাত্রার নাবিকদের এল্‌াইস্‌স থেকে নিয়ে আসা সোনা দিয়ে মাইনে মিটিয়েছিলেন রাজা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের লোকেরা শেষ-বেশ ভেট পাঠানো বন্ধ করলে, কেননা ততদিনে তারা অদৃশ্য। হয় তারা সোনার খনিতে সমূলে উৎখাত হয়ে, জলে আধডোবা অবস্থায় চালুনি দিয়ে সোনার ধুলো ঝাড়ার মত মারাত্মক কাজ করছে, নয়-তো চূড়ান্ত ক্লান্তি সত্ত্বেও মাটি কুপিয়েই চলেছে; স্পেন থেকে আমদানি করা ভারী ভারী কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে শরীর গেছে বেঁকে, দু-ভাঁজ হয়ে। সাদা চামড়ার শোষকেরা তাদের জন্যে কী চরম পরিণতি ধার্য করে রেখেছে, হাইতির বহু বাসিন্দা তা টের পেয়েছিল: তারা তাদের সন্তানদের মেরে ফেলে, দল বেঁধে আত্মহত্যা করে। মধ্য ষোলো শতকের ঐতিহাসিক ফের্নানদেজ দে ওভিয়েদো এই এটিফিয়ার ধ্বংসকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছিলেন: "ওদের অনেকেই, ভিন্ন কিছু করার তাগিদে, কাজ না করে বরং বিষ খায়, আর অন্যেরা নিজেদের হাতে নিজেদের ফাঁসি দেয়।" (৫)*

২। দেবতারা ফিরে এলেন, সঙ্গে গোপন অস্ত্র

সাগর পাড়ি দেবার প্রথম দফায় টেনেরাইফ-এর পাশ দিয়ে যেতে কলম্বাস একটি আগ্নেয়গিরির দুর্দান্ত বিস্ফোরণ চাক্ষুষ দেখেন। সামনের প্রকাণ্ড ঐ নতুন দেশে, যা সব ঘটতে চলেছে, তখন তাকে তাঁর অশুভ লক্ষণ বলে ঠেকেছিল; ঐ নতুন দেশ আবার আশ্চর্য ভাবে এশিয়া যাওয়ার পশ্চিমপথের আড়ে দাঁড়িয়ে। সামনে আমেরিকা—প্রথমে অন্তহীন তটরেখা থেকে অনুমানের বিষয়, পরে একের পর এক ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়া। ক্রমে নৌসেনাপতিদের জায়গা নিয়ে নেয় শাসকেরা, জাহাজের নাবিকের দল চেহারা পালটে হয় জঙ্গী ফৌজ। পোপের হুকুমনামা বলে আফ্রিকা হস্তগত

হয় পর্তুগালের রাজার, আর যে-সব অজানা এলাকা, "আপনার দূতেরা আবিষ্কার করেছে বা ভবিষ্যতে করবে,"—কাস্তিয়ের রাণীর। আমেরিকা দেওয়া হয়েছিল রাণী ইসাবেলাকে ১৫০৮ সালে।

পোপের আর একটি হুকুমনামা বলে, আমেরিকা থেকে জোগাড় করা সম্পদের দশভাগের এক ভাগ-এর মালিকানা, চিরকালের মত স্পেনের রাণীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়। নিউ ওয়ার্লড চার্চ-এর প্রার্থিত পোষকতার দরুন, যাজকদের সব রকম সুযোগ সুবিধার চেয়ে রাজার অধিকার-এর গুরুত্ব বেশী ছিল।

১৪৯৪ সালে টর্ডেসিলাস-এর চুক্তির ফলে, পোপ-এর নির্দেশিত সীমারেখা অনুযায়ী লাতিন আমেরিকার নীচের এলাকাগুলো পর্তুগালের হাতে আসে, আর ১৫৩০ সালে হানাদার ফরাসীদের হটিয়ে মার্তিস অফেন্সো দে সুজা ব্রাজিলে পর্তুগালের প্রথম ঘাঁটিগুলোর পত্তন করেন। ততদিনে স্প্যানিয়ার্ডরা, অগুনতি নরকসমান জঙ্গল আর বাধা-বিঘ্নে ভরা মরুভূমি পেরিয়ে, অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৫১৩ সালে ভাস্কো মুনিয়েজ দে বালবোআ'র চোখের সামনে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ঝলমল করে ওঠে। ১৫২২ সালে ফার্দিন্যান্দ মাগেলান-এর অভিযানের আঠারো জন জীবিত সদস্য স্পেনে ফিরে আসে: তারাই এই প্রথম দুই মহাসাগরকে এক করে, আর পৃথিবী আবর্তন করে প্রমাণ করে দেয় যে, পৃথিবী গোল। এর তিনবছর আগে হের্নান কোর্তেস-এর দশখানা জাহাজ কিউবা থেকে মেক্সিকোর দিকে রওনা দিয়েছিল, আর ১৫২৩ সালে পেদ্রো দে আলভারাডো মধ্য-আমেরিকা অভিযান শুরু করেন। ১৫৩৩ সালে, ফ্রান্সিস্কো পিজারো, এক নিরক্ষর শূকর-পালক, সাফল্যের সঙ্গে কুজকো ঢুকে ইন্কা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রটি দখল করে নেন। ১৫৪০ সালে পেদ্দারা দে ভ্যালডিভিয়া আতাকামা মরুভূমি পার হয়ে স্যান্টিয়াগো-ডি-চিলি স্থাপন করেন। কন্কিস্তাদোরেরা চাকাও-এ ঢুকে পড়ে আর তার ফলে পেরু থেকে গ্রহের প্রবলতম নদীর মোহানা পর্যন্ত প্রকাণ্ড নতুন পৃথিবীটি খুলে যায়।

লাতিন আমেরিকার বাসিন্দাদের মধ্যে তখন সবকিছুরই কিছু-না-কিছু চিহ্ন ছিল: জ্যোতির্বিদ ও নরখাদক, যন্ত্রবিদ ও পাথরযুগের বর্বর। কিন্তু স্থানীয় একটি সম্প্রদায়ও পরিচিত ছিল না লোহা বা লাঙল, কাঁচ বা বারুদের সঙ্গে, জানতো না পুজো-পার্বণে ব্যবহৃত গাড়িতে ছাড়া চাকার ব্যবহার। যে সভ্যতা মহাসাগর পার হয়ে এই সব এলাকায় জুড়ে বসে, তা তখন চলেছে নব নব

উন্মেষশালিনী নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে : প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর আধুনিক যুগের জন্মমুহূর্তে বারুদ, ছাপাখানা, কাগজ আর কম্পাস-এর মত লাতিন আমেরিকাও হয়েছিল আত্মস্থ হ'বার অপেক্ষায় আর একটি আবিষ্কার মাত্র। দুই পৃথিবীর অসমান বিকাশ থেকে বোঝা যায়, কেন অত সহজে স্থানীয় সভ্যতাগুলি বশ মেনে নিয়েছিল। কোর্তেস ভেরাক্রুজে-এ পা রাখেন মাত্র ১০৪ জন নাবিক ও ৫০৮ জন সৈনিক নিয়ে ; সঙ্গে ছিল ১৬টি ঘোড়া, ৩২টি আড়ধনুক, ১০টি ব্রোন্‌জের কামান আর কিছু হার্কিউবিস, গাদা বন্দুক ও পিস্তল। পিজারো কাহামার্কা ঢোকেন ১৮০ জন সৈনিক ও ৩৭টি ঘোড়া নিয়ে। তাই যথেষ্ট ছিল। অথচ তখন আস্‌টেক-এর রাজধানী, তেনোচ্‌-তিৎলান মাদ্রিদের পাঁচগুণ বড় ও লোক-সংখ্যায় স্পেনের সব থেকে বড় শহর সেভিয়ের দু-গুন আর পেরু পিজারোতে জমায়েত হয়েছিল ১০০,০০০ জনের মত সৈন্য।

সন্ত্রাস-ও ইন্‌ডিয়ানদের হারিয়েছিল। সম্রাট মণ্টেজুমা রাজপ্রাসাদে প্রথম খবর পেলেন : একটি বিরাট পাহাড় সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে। আরো দূত আসে : "যে-সব খবর শোনেন তাতে তিনি আরো ঘাবড়ে যান। কামান কি-ভাবে বিস্ফোরণ করে, কি-ভাবে তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, কি-ভাবে তা লোকদের ভীত-চকিত করে কান ফাটিয়ে দেয়। আর বিস্ফোরণ-এর পরে তার ভেতর থেকে পাথরের গোলার মত কিছু বেরিয়ে আসে আর অগ্নি-বর্ষণ করতে থাকে। "বিদেশীরা" ছাতসমান উঁচু হরিণদের ওপর বসে। ওদের পুরো দেহ ঢাকা, কেবল মুখগুলো দেখা যায়। ওরা সাদা, যেন চুন দিয়ে তৈরী। ওদের চুলের রং হলুদ, যদি-ও কারো কারো কালো! লম্বা দাড়ি।" মণ্টেজুমা ভেবেছিলেন যে দেবতা কেৎজালকোআৎল ফিরে আসছেন : এ-সম্পর্কে আটটি ভবিষ্যদ্‌বাণী কিছুদিন আগেও হয়েছিল। শিকারীরা তাঁকে একটি পাখী এনে দিয়েছিল যার মাথার ঝুঁটি গোল আয়নার মত, যাতে সূর্য-ডোবা দেখা যায় ; সেই আয়নায় মণ্টেজুমা দেখেন মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসছে ফৌজের বিভিন্ন ভাগ।

কেৎজালকোআৎল পুবদিক থেকে এসেছিলেন আর পুবদিকে গিয়েছিলেন : তাঁর দেহের রং ছিল সাদা, দাড়ি ছিল। ভিরাকোচা, ইন্‌কাদের দ্বিলিঙ্গ

দেবতার রংও ছিল সাদা; ছিল দাড়ি। আর প্রাচী—মায়াদের বীর পূর্ব-পুরুষদের জন্মভূমিও বটে।*

প্রতিহিংসাপর দেবতারা সাঁজোয়া পরে, ঘোড়াদের উজ্জ্বল কাপড়ে ঢেকে প্রজাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ চোকাতে আসছেন; তাঁদের অস্ত্র থেকে মারাত্মক রশ্মি বের হয় আর দমবন্ধকর ধোঁয়ায় বাতাস অন্ধকার হয়ে যায়। আর তা-ছাড়া কন্‌কিস্‌তাদোরেরা তো ফান্দ আঁটা আর বেইমানিতে দারুণ দড়। তারা বুদ্ধি খাটিয়ে মণ্টেজুমার বিরুদ্ধে তল্‌কাস্কালার লোকেদের সঙ্গে হাত মেলায় আর দুই ভাই হুআস্‌কর আর আতাউআল্‌পা'র মধ্যে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের দু-ভাগকে সার্থকভাবে কাজে লাগায়। তারা জানতো, শাসকশ্রেণীর মধ্যবর্তী-স্তরের লোক, যাজক, আমলা, পরাজিত সৈনিক আর ইন্‌ডিয়ান প্রধানদের ভেতর থেকে কিভাবে নিজেদের দুষ্কৃতির সহচর খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এছাড়াও তাদের অন্য হাতিয়ার ছিল,—কিম্বা ঘুরিয়ে বললে, অন্য বস্তুগত কারণ আক্রমণকারীদের জয়ের পেছনে কাজ করেছে। যেমন: ঘোড়া, রোগজীবাণু।

উটের মত ঘোড়াও একসময়ে লাতিন আমেরিকায় ছিল, কিন্তু লোপ পেয়ে যায়। আরব ঘোড়সওয়ারেরা ইউরোপে ঘোড়া নিয়ে আসে; সেখানে, যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মূল্য যে অসামান্য তা বোঝা গিয়েছিল। দখল-এর সময়ে লাতিন আমেরিকায় তাদের আবির্ভাব স্থানীয় বাসিন্দাদের তাজ্জব করে দেয়, ঘোড়াগুলো যেন হানাদারদের যাদুকরী শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। আতাউআল্‌পা দেখেন, প্রথম স্পেনীয় যোদ্ধারা পালকগুচ্ছ আর ছোটো ঘণ্টায় সাজানো তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে; ঘোড়াদের খুরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে আর ধুলোর মেঘ উড়ে আসছে। আতঙ্কগ্রস্ত ইন্‌কা পড়ে যান। ঘোড়াগুলো কন্‌কিস্‌তাদোরদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই ভেবে পের্দো দে আল্‌ভারাদোর-এর ঘোড়াটির মাথা কেটে ফেলেন মায়া-বংশধরদের প্রধান টেকাস্: আল্‌ভারাদোর দাঁড়িয়ে উঠে তাকে মেরে ফেলেন। মধ্যযুগের যুদ্ধসাজে কিছু ঘোড়া ইন্‌ডিয়ান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, সন্ত্রাস ও মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। উপনিবেশ স্থাপন যখন চলছে, সেই সময়ে যাজক আর ধর্মপ্রচারকেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইন্‌ডিয়ানদের জন্যে গল্প ছড়িয়েছিল যে, অশ্ব প্রাণীটির জন্ম পবিত্র উৎস থেকে, কেননা, যে

* এই অদ্ভুত সমাপতনগুলির ফলে একটি মত দানা বেঁধে উঠেছে যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের ধর্মে বর্ণিত দেবতারা আদতে ইউরোপীয়, কলম্বাসের বহু আগেই তারা আমেরিকার তটে এসে পৌছেছিল। (৭)

শ্বেত অশ্বটি দৈবকৃপায় মূর আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে বীরযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল, তা চড়তেন স্পেনের রক্ষক সন্ত স্যান্‌তিইআগো।

রোগ জীবাণু আর বীজাণু সবথেকে কার্যকর জোট ছিল। বাইবেলের প্রেগের মত ইউরোপীয়রা সঙ্গে করে এনেছিল বসন্ত ও ধনুষ্টঙ্কার, বিভিন্ন ফুসফুস ও অন্ত্র সংক্রান্ত অসুখ, যৌনরোগ, চোখের সংক্রামক ব্যাধি, টাইফাস, কুষ্ঠ, হলুদজ্বর আর দন্তক্ষয়ের রোগ। প্রথমে ঘটলো বসন্ত-এর প্রাদুর্ভাব। কিন্তু এই-যে অভূতপূর্ব আর ভয়ঙ্কর মহামারী, যার ফলে উত্তপ্ত জ্বর হয় আর মাংসে পচন ধরে, তা কি প্রজাদের শোধরাবার জন্যে দেবতাদের শাস্তিবিধান নয়? এক প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দার বিবৃতি থেকে জানা যায়: হানাদারেরা "তল্‌ক্সাকালায় ঢোকার পর, মহামারী ছড়িয়ে পড়ে: কাশি, উত্তপ্ত ফুসকুড়ি।" আর একজনের বিবৃতি: "সংক্রামক, পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাকর ফুসকুড়ি অসুখ অনেকের মৃত্যু ঘটায়।" (৮) ইন্‌ডিয়ানরা পোকার মত মরে; এইসব রোগের বিরুদ্ধে তাদের শারীরিক গঠনের কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। আর যারা টিকে থাকে তারা দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায়। ব্রেজিলের নৃতত্ত্ববিদ্ দারসি রিবেইর আন্দাজ করেন যে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ওসেনিয়ার বাসিন্দাদের অর্ধেকেরও বেশী সাদা চামড়ার মানুষদের প্রথম সংসর্গের ফলে দূষিত হয়ে মারা যায়।

৩ 'খিদেয় হন্যে শুওরের মতো ওরা সোনা চায়'

বন্দুক ছুঁড়ে, তলোয়ার দিয়ে কচুকাটা করে, আর নিশ্বাসে মহামারী ছড়িয়ে, বেপরোয়া কন্‌কিস্‌তাদোর-দের ছোটো দলটি আমেরিকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিজিতদের কাছ থেকে আমরা তার বিবরণ পাই। চলুলার নির্বিচার হত্যাকাণ্ড-এর পর মন্টেজুমা নতুন দূত পাঠান কোর্তেস-এর কাছে, কোর্তেস তখন এগোচ্ছেন মেক্সিকো উপত্যকার দিকে। তারা সঙ্গে করে উপহার এনেছিল সোনার গলবন্ধনী আর কুয়েতজাল পাখীর পালকে তৈরি কিছু নিশান। ফ্লোরেন্টিন কোডেক্স-এ রক্ষিত নাহুআত্ল-পাঠ থেকে জানা যায় যে, স্প্যানিয়ার্ডরা "তখন সপ্তম স্বর্গে"। "ওরা সোনার জিনিসগুলো উঁচু করে তুলে ধরলে: ঠিক যেন বাঁদর, চোখে-মুখে আনন্দের ছটা, ওদের মধ্যে যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে, মনে খুশীর বান ডেকেছে। যেন সত্যিই সোনার প্রতি ওদের লোভটা প্রচণ্ড। ওদের শরীর ওতে পুরু হয়,

তা-ও আশ মেটে না। খিদেয় হন্যে শুওরের মত ওরা সোনা চায়।" পরে কোর্তেস যখন ৩,০০,০০০ লোকের জাঁকজমকে ভরা আস্‌টেক রাজধানী তেনোচ্‌তিৎলান পৌছন, স্প্যানিয়ার্ডরা ভাণ্ডার ঘরে ঢোকে, "আর তারপর তারা সোনার একটা বিরাট তাল তৈরী করে, আগুন জ্বালায়। আর তাতে যা-যত দামীই হোক্ সব ফেলে দেয়; সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর সোনা, স্প্যানিয়ার্ডরা বারের আকারে ছোটো করে নেয়।"

যুদ্ধ শুরু হয়। তেনোচ্‌তিৎলান আগে হারানোর পর, অবশেষে ১৫২১ সালে, কোর্তেস তা ফের দখল করে নেন: "আর ততদিনে আমাদের কোনো ঢাল বাকি নেই, নেই কোনো মুগুর, খাওয়ার কিছু নেই, কিছু খাচ্ছিলামই না আর।" মন্টেজুমার বিরুদ্ধে বেইমানির অভিযোগ আনে কিছু যাজক; হয়রান হয়ে তিনি আত্মহত্যা করে বসেন। বিধ্বস্ত হয়ে, পুড়ে, মৃতদেহের জঞ্জালে ভরে গিয়ে শহরটার পতন হয়: "ঢালই ছিল তার প্রতিরোধের হাতিয়ার, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না...শিশুদের অন্ত্রাদি যারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করত, সেই ভেরাক্রুজ-ইন্‌ডিয়ানদের বলি প্রথা সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ছিল কোর্তেস-এর, কিন্তু পুনর্দখল-করা শহরের ওপর তাঁর নৃশংসতার কোনো মাপজোক ছিল না: "আর সারা রাত ধরে আমাদের ওপর তা বর্ষিত হয়।" ফাঁসিকাঠ বা পীড়নই যথেষ্ট ছিল না অবশ্য: দখল-করা ধন-ভাণ্ডার স্প্যানিয়ার্ডদের চাহিদার ধারে কাছে-ও কোনোদিন পৌছতে পারে নি; তাই ইন্‌ডিয়ানরা নিশ্চয় সোনা আর মূল্যবান সব জিনিসপত্র হ্রদের তলায় লুকিয়ে রেখেছে, এই অনুমানের ভিত্তিতে ওরা হ্রদটি বহু বছর ধরে খুঁড়ে চলে।

পের্দো দে আল্‌ভারাদো আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো গুয়াতেমালার ওপর হামলা চালান আর, "এত ইন্‌ডিয়ান হত্যা করেন যে তা একটা রক্তের নদী তৈরি করে, যার নাম দেওয়া হয় ওলিম্‌টেপেকিউ"; "সেদিন এত রক্ত বয়েছিল, যে দিনটাই লাল হয়ে যায়।" চূড়ান্ত লড়াই-এর আগে, "ইন্‌ডিয়ানরা নিজেদের নৃশংস ভাবে নির্যাতিত হ'তে দেখে স্প্যানিয়ার্ডদের অনুরোধ করে যেন তারা আর নির্যাতন না করে; বলে, ওদের অধিপতিদ্বয় নেহাইব আর ইক্সকুইন-এর কাছে—নেহাইব ঈগল ও সিংহের ছদ্মবেশে—প্রচুর সোনা, রুপো, হীরে ও পান্না আছে। তারপরে তারা ঐসব স্প্যানিয়ার্ডদের দিয়ে দিলে স্প্যানিয়ার্ডরা তা রেখে দেয়।" (৯)

আতাউআল্‌পাকে দমবন্ধ করে শিরশ্ছেদ করার আগে পিজারো মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলেন, "ওজনে ২০,০০০ মার্কেরও বেশী রুপো ও ১৩,২৬,০০০ এস্‌কুডো খাঁটি সোনা।" তারপরে পিজারো কুজকোর দিকে এগিয়ে যান। সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী এতই ঝলমলে ছিল যে, পিজারোর সেনারা ভেবেছিল তারা সিজারদের শহরে ঢুকেছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও তারা সূর্যমন্দির ধ্বংস আর লুটপাট শুরু করতে, এক তিল দেরী করে না। "লুঠের বেশীর ভাগটাই হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হাতাহাতি করতে করতে, প্রত্যেক উর্দি-পরা সৈনিক রত্ন ও প্রতিমাগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায়; বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে বলে, সোনার বাসন হাতুড়ি দিয়ে পিটতে থাকে...বারের আকারে ছোটো করার জন্যে মন্দিরের সমস্ত সোনা ওরা এক দ্রাবণ-পাত্রে ফেলে দেয়: দেয়ালের ওপর-স্তরে গাছ, পাখী আর অন্যান্য বস্তুর অদ্ভুত যে-সব প্রতিমূর্তি বাগানে ছিল, সব।" (১০)

মেক্সিকো শহরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড খোলা চকে তেনোচ্‌তিৎলান-এর সব থেকে বড় মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ-এর ওপর আজ ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল দাঁড়িয়ে, কোর্তেস যাকে শহীদত্ব দিয়েছিলেন সেই আস্‌টেক-প্রধান কুআউহটেমোক্‌-এর আবাসভূমি জুড়ে সরকারি ভবন। তেনোচ্‌তিৎলান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পেরুতে, কুজকোর-ও সমান দুর্গতি হয়, যদিও বিজয়ীরা তার বৃহদায়তন সব দেয়াল পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারে না, ইন্‌কাদের মহৎ স্থাপত্য-শিল্পের, প্রামাণিক নমুনা হিসেবে আজও তাদের দেখতে পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক নির্মাণের ভিতগুলিতে।

তুপাক আমারুর ভগ্ন স্মৃতি

স্প্যানিয়ার্ডরা যখন লাতিন আমেরিকায় হানা দেয়, তখন দিব্যতান্ত্রিক ইন্‌কারা উৎকর্ষ-এর চরমে পৌঁছেছে। তাদের সাম্রাজ্য, আজকের পেরু, বোলিভিয়া আর ইকুআদর, কলম্বিয়া আর চিলির অংশ, পশ্চিম আর্জেন্টিনা আর ব্রেজিলের জঙ্গল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকো উপত্যকার আস্‌টেক রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষ ভাবে দক্ষ হয়ে উঠেছে, আর ইউকাতান ও মধ্য আমেরিকায়, শ্রম ও যুদ্ধে সংগঠিত, অসাধারণ মায়া-সভ্যতা, তাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে তখনও বহমান।

বহুযুগ ধরে লুটতরাজ চলা সত্ত্বেও এইসব সমাজ তাদের কীর্তির অনেক

চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছে : ইজিপ্টের পিরামিডের চেয়েও বেশী দক্ষতার সঙ্গে তৈরী ধর্মীয় সৌধ, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই-এর জন্যে বিজ্ঞানসম্মত যোগ্য ব্যবস্থা, কিছু শিল্পকাজ—এ-সব তাদের অদম্য প্রতিভার নমুনা হয়ে রয়েছে। লিমার যাদুঘরে এমন মাথার খুলি শ'য়ে শ'য়ে রাখা আছে, যেগুলোতে ইন্‌কা শল্যবিদেরা ছেনি দিয়ে ছেঁদা করে সোনা বা রুপোর ফলক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ারা অসাধারণ জ্যোতির্বিদ ছিল, স্থানকাল গণনায় একচুল নড়চড় হ'ত না, আর ইতিহাসে ওরাই প্রথম শূন্য সংখ্যাটির গুরুত্ব বুঝতে পারে। আস্‌টেকদের সেচ-ব্যবস্থা আর নকল দ্বীপ দেখে কোর্তেস-এর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল,—যদিও সে-সব সোনার তৈরী ছিল না।

এইসব সভ্যতার বুনিয়াদ ভেঙে চুরমার করে দেয় দখলের লড়াই। খনিভিত্তিক অর্থনীতি চালু হলে, তার ফলাফল, আগুন আর তলোয়ারের চেয়েও শোচনীয় হয়। খনির স্বার্থে বহু লোককে জমি ছেড়ে দিতে হয়, কৃষক গোষ্ঠিগুলিতে ভাঙন ধরে ; ওরা শুধু জবরদস্তি খাটিয়েই অগুনতি মানুষ মেরে ফেলেনি, পরোক্ষভাবে চাষ-আবাদের সমবায় ব্যবস্থাও ভেঙে তছনছ করে দেয়। ইন্‌ডিয়ানদের খনিতে চালান দিয়ে, এন্‌কমেন্‌দোরাদের কাজে ধরে বেঁধে লাগিয়ে দেওয়া হয়—আর তার ফলে যে-সব জমি তারা ছেড়ে আসে বা যত্ন করতে পারে না, বিনা খেসারতেই সে-সবের মালিকানা ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভুট্টা, ইউকা, কিডনি ও সাদা বিন, চিনেবাদাম আর আলুর বিশাল সব খেত, হয় স্প্যানিয়ার্ডরা ধ্বংস করে, নয় নষ্ট হয়ে যেতে দেয় ; ইন্‌কা সেচ-ব্যবস্থার ফলে যে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচুর্য ছিল, তা দ্রুত গ্রাস করে নিতে থাকে মরুভূমি। এককালে যেখানে সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ-এর জন্যে রাস্তা ছিল, আজ সেখানে দখলের সাড়ে চার শতক পরে শুধু পাথর আর কাঁটা ঝোপঝাড়। যদিও ইন্‌কাদের অসাধারণ পূর্তকাজ-গুলোর বেশীর ভাগ হয় সময়ের প্রভাবে নয় দখলিকারদের হাতে ধ্বংস হয়েছে, তবু এন্‌ডিয়ান কর্ডিলেরায় বিশাল সব চত্বরের চিহ্ন আজও দেখা যায় ; এদের সাহায্যে পাহাড়ের উতরাইগুলোতে একসময়ে চাষ হ'ত, আজ-ও হয়। এক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ ১৯৩৬ সালে আন্দাজ করেছিলেন যে, ইন্‌কা চত্বরগুলি আধুনিক প্রণালীতে ১৯৩৬ সালের মজুরির হারে তৈরী হলে, তার খরচ পড়ত প্রতি একরে ৩০,০০০ ডলার। চাকা, ঘোড়া বা লোহা চিনতো না যে সাম্রাজ্য, সে সাম্রাজ্যে চত্বর আর নর্দমা তৈরী সম্ভব হয়েছিল অসাধারণ

সংগঠন ও কারিগরি নিপুণতার দরুন। আর তাছাড়া মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্কে যে পবিত্র ও জীবন্ত ধর্মীয় প্রভাব ছিল, তার জন্যে কারিগরি নিপুণতা সম্ভব হয়েছিল বিবেচনাপ্রসূত শ্রমবিভাগের দরুন।

আস্টেকরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিত। যে শুকিয়ে-যাওয়া হ্রদে, স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ-এর ওপর মেক্সিকো শহর দাঁড়িয়ে, সেই হ্রদের টিকে থাকা কিছু দ্বীপ, পর্যটকদের কাছে আজ "ভাসমান বাগান" নামে পরিচিত। আস্টেকরা এগুলো তৈরী করেছিল, কেননা তেনোচ্তিৎলান গড়ে তোলার জন্যে যে জায়গা বাছা হয়, সেখানে জমির ঘাটতি ছিল। তারা পাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে কাদা নিয়ে আসে আর যতদিন গাছের শিকড়েরা দৃঢ়তা দিতে না পারে, খাগড়ার সরু দেয়ালের মধ্যে নতুন কাদা-দ্বীপগুলোকে ঠেকনা দিয়ে রাখে। এই সব অসাধারণ উর্বর দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে বইত খাল, আর তাদের ওপর গড়ে ওঠেছিল আস্টেক রাজধানী: চওড়া রাজপথ, সাদাসিধে কিন্তু সুন্দর প্রাসাদ, খাড়া পিরামিড: হ্রদ থেকে যাদুকরী ভাবে বেরিয়ে আসা এই শহরের কিন্তু, বিদেশীদের হাতে ধ্বংস হওয়া ধার্য ছিল। সে-যুগের লোকসংখ্যায় ফিরে যেতে মেক্সিকোর চার শতক লেগেছিল।

দার্সি রিবেইর বলেছেন, ইন্ডিয়ানরা ছিল ঔপনিবেশিক প্রসারণ ব্যবস্থার জ্বালানি-শক্তি। সের্গিয়ো বাস্ত লিখেছেন, "এ-কথা প্রায় নিশ্চিত যে, বহু ইন্ডিয়ান ভাস্কর, স্থপতি, যন্ত্রবিদ্ ও জ্যোতির্বিদকে দাসেদের সঙ্গে খনি থেকে আকরিক পদার্থ বের করে আনার প্রাণান্তকর কাজে লাগানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাছে এঁদের কারিগরি দক্ষতার কোনো মূল্য ছিল না। তাঁদের কিছু দক্ষ মজুর হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিল।" তা সত্ত্বেও ঐ সব ধ্বস্ত সভ্যতার চিহ্ন পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি: হারানো মর্যাদা ফিরে পাবার আশা, সে-সব, কত ইন্ডিয়ান বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছে।

১৭৮১ খ্রী: তুপাক আমারু কুজকো অবরোধ করেন। ইন্কা সম্রাটদের বংশধর, এই মেস্তিজো প্রধান, এক বিরাট বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। যে তিন্তা প্রদেশে, বাসিন্দাদের প্রায় পুরোপুরি উচ্ছেদ করে সেরো রিকো খনিতে চালান দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, তুপাক আমারু তুংগাসুকার চকে এসে দাঁড়ান আর ড্রাম ও পুতুতুর-এর শব্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি মাননীয়

করেগিদোর আন্তেনিও হুয়ান দে আরিআগার ফাঁসি দিয়েছেন ও পোতেনি মিতার অবসান ঘটিয়েছেন। কিছুদিন পরে, তুপাক দাসেদের মুক্তি দিয়ে এক হুকুম জারি করেন। তিনি সব রকমের কর ও বাধ্যতামূলক শ্রম রদ করেন। "গরীব, হতভাগ্য ও অসহায়দের পিতা", তুপাকের ফৌজের পাশে ইন্‌ডিয়ানরা হাজারে হাজারে জড়ো হয়। গেরিলাদের নেতৃত্ব দিয়ে আগে আগে চললেন তিনি, কুজকোর দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যুদ্ধে তাঁর হুকুম তামিল করতে গিয়ে যারা মারা যাবে, তারা, দখলিকারেরা যে সুখ ও সমৃদ্ধি তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সে-সব ভোগ করতে, প্রাণ পেয়ে ফের ফিরে আসতে পারবে। হার-জিত চলল ; অবশেষে, তাঁর নিজেরই এক প্রধান তাঁকে বেইমানি করে বন্দী করে ; তুপাককে শেকলে বেঁধে, রাজার অনুগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তকর্তা আরেচ, তাঁর কুঠুরিতে এসে কিছু প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদ্রোহী সহযোগীদের নাম জানতে চান। অবজ্ঞার সঙ্গে তুপাক আমারু উত্তর দেন : "এখানে আপনি বা আমি ছাড়া অন্য কোনো সহযোগী নেই। আপনি উৎপীড়ক, আমি মুক্তিদাতা, আমাদের দুজনেরই মৃত্যু হওয়া কাম্য।"

স্ত্রী, সন্তান ও প্রধান সহযোগীদের সঙ্গে তুপাককে কুজকোর প্লাজা দেল্ ওয়াকাইপাতায় নির্যাতন করা হয়। তাঁর জিভ কেটে নেওয়া হয় ; দেহটা চারটুকরো করার জন্যে তাঁর হাত-পা চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ; কিন্তু সে অভিপ্রায় সফল হয় না। অবশেষে ফাঁসি-কাঠের তলায় তাঁর মাথা কেটে নেওয়া হয়। তাঁর মাথা পাঠানো হয় তিন্‌তায়, একটি বাহু তুন্‌গাসুকায়, অন্যটি কারাবাইআয়, একটি পা সান্‌তা বোসায় আর অন্যটি লিভিতাকায়। ধড়টাকে পুড়িয়ে ওয়াতানাই নদীতে তার ছাই ফেলে দেওয়া হয়। প্রস্তাবনা করা হয়, তাঁর বংশের অধস্তন চার পুরুষ পর্যন্ত সবাইকে মেরে ফেলা হোক্।

ইন্‌কাদের আর এক বংশধর, আস্‌তোর্‌পিল্‌কো নামে এক প্রধানের সঙ্গে ১৮০২ খ্রীঃ কাহামার্‌কায় হামবোল্ট সাক্ষাৎ করতে আসেন, ঠিক যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষ আতাউআল্‌পা, কন্‌কিস্‌তাদোর পিজারোকে প্রথম দেখেছিলেন। প্রধানের ছেলে জার্মানির পণ্ডিতকে শহরের ধ্বংসাবশেষ আর পুরোনো ইন্‌কা প্রাসাদের পাথরকুচি ঘুরিয়ে দেখায় ; হাঁটতে-হাঁটতে ধুলো আর ছাই-এর তলায় লুকোনো বিরাট ভাণ্ডারের কথা বলে। "নিজেদের দরকারের জন্যেও কি

তোমরা ঐ সম্পদ খুঁড়ে বার করবার কথা ভাবো না?" হামবোল্ট তাকে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে যুবকটি বলে, "না, কখনো না। আমার বাবা বলেন যে তাতে পাপ হ'তে পারে। আমরা সোনার ডালপালা আর ফল খুঁজে পেলে, সাদা চামড়ার লোকেরা আমাদের ঘৃণা করবে, আমাদের ক্ষতি করবে।" প্রধান নিজে একটা ছোটো মাঠে গম ফলাতেন, কিন্তু তা সাদা চামড়াদের লোভের হাত থেকে রক্ষা পাবার মত যথেষ্ট ছিল না। দখলিকারেরা সোনা-রুপো আর খনি চালাবার জন্যে দাসের খোঁজে সর্বদা হন্যে হয়ে থাকত; শস্য থেকে মুনাফার সুযোগ আছে বুঝলেই তারা সেই জমি ছিনিয়ে নিতে পিছপাও হত না।

বছরের পর বছর লুঠ হয়ে চলেছে; ১৯৬৯ সালে পেরুতে জমিসংক্রান্ত নীতির সংস্কার ঘোষণার পরেও, শোনা গেছে, পাহাড়ে এলাকার ইন্‌ডিয়ানরা, তাদের বা তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের কাছ থেকে হাতিয়ে-নেওয়া জমি পুনর্দখল করার জন্যে পতাকা হাতে নেমে এসেছে; সামরিক বাহিনী তাদের বুলেট দিয়ে হটিয়ে দিয়েছে। তুপাক আমারুর মৃত্যুর পর দু-শতক পার হ'তে হ'ল, যার পর জাতীয়তাবাদী জেনেরাল জুআন ভেলাস্‌কো আল্‌ভারাদো তুপাকের অবিস্মরণীয় কথাগুলির প্রতিধ্বনি করলেন: "ক্যাস্‌পিসেনো! তোমাদের দরিদ্র প্রভুদের আর অন্ন যোগাবে না।"

অন্য যে বীরদের পরাজয়, পট পরিবর্তনের সঙ্গে উল্টে গেছে, তাঁরা হ'লেন মেক্সিকোর দু-জন: মিগুয়েল ইদাল্‌গো আর হোসে মারিয়া মোরেলস। ইদাল্‌গো, পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন শান্তশিষ্ট গ্রাম্য যাজক; একদিন ভেনোরেস গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে ইন্‌ডিয়ানদের জড়ো করে তাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে বলেন:

"তিনশো বছর আগে, তোমাদের বাপ-ঠাকুদাদের জমি যারা ডাকাতি করে কেড়ে নিয়েছিল, ঐ ঘৃণ্য স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে সে-সব কি ফের দখল করে নেবার জন্যে তোমরা সচেষ্ট হ'বে না?" উনি পবিত্র ইন্‌ডিয়ান গুআদালুপের পতাকা তুলে ধরেন, আর ছ-হপ্তা যেতে না যেতেই ম্যাচেট, বর্শা, গুলতি আর তীর-ধনুক নিয়ে আশি হাজার লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। বিপ্লবী যাজক ভেট পাঠানো বন্ধ করেন আর গুআদালাজারার জমি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন; ক্রীতদাসদের মুক্তির হুকুম জারি করেন, তারপর তাঁর বাহিনী নিয়ে মেক্সিকো শহরের দিকে ধেয়ে আসেন। অবশেষে যুদ্ধে হেরে যাবার পর, তাঁর ফাঁসি হয়ে

যায়, আর বলা হয়ে থাকে যে তিনি একটি তীব্র অনুতাপের দলিল রেখে গেছেন। বিপ্লব তাড়াতাড়ি অবশ্য আর একজন নেতা খুঁজে পায়, যাজক হোসে মারিয়া মোরেলস : "ধনী, অভিজাত আর আমলাদের নিজেদের শত্রু বলে চিনে রাখবে···" তাঁর আন্দোলন, ইন্‌ডিয়ান অভ্যুত্থান আর সামাজিক বিপ্লব একসঙ্গে মেলাতে পেরেছিল ; পরাজিত হয়ে গুলিবিদ্ধ হ'বার আগে তিনি মেক্সিকোর বিরাট অংশ নিজের দখলে আনতে পেরেছিলেন। এক মার্কিন সেনেটার লিখেছেন, দু-বছর পরে, মেক্সিকোর স্বাধীনতা, "ঠিক হিস্‌পানি পরিবারে যেমন, ইউরোপ আর আমেরিকার বংশজাত সদস্যদের মধ্যেকার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল···শাসকশ্রেণীদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক লড়াই।" শুধু এন্‌কোমিয়েন্‌দা ভূমিদাস হল পিওন আর এন্‌কোমেন্‌দেরো হ'ল বসতবাড়ি-সহ বিরাট জমির মালিক।

পবিত্র হপ্তার শেষে, ইন্‌ডিয়ানদের জন্যে পুনরুত্থান নেই। এই শতকের গোড়ার দিকেও, ইন্‌ডিয়ান পঙ্‌গো বা বাড়ির চাকরদের ভাড়া খাটাতে চেয়ে, তাদের মালিকেরা লা পাজ কাগজে বিজ্ঞাপন দিত। যতদিন না ১৯৬২ সালের বিপ্লব বোলিভিয়ার ইন্‌ডিয়ানদের ভুলে যাওয়া অধিকারের মর্যাদা ফিরিয়ে না দিল, পঙ্‌গোরা শুয়েছে কুকুরের পাশে, মালিকের খানার ছিটেফোঁটা কুড়িয়ে খেয়েছে আর সাদা-চামড়া কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই হাঁটু গেড়ে বসেছে। কন্‌কিসতাদোর-দের সময়ে চারপেয়ে ভারবাহী জন্তুর অভাব ছিল, তাই তাদের মালপত্তর বইবার জন্যে ইন্‌ডিয়ানদের পিঠ ব্যবহার করা হত ; আর আজও ইন্‌ডিয়ান আলটিপ্লানোতে, আইমারা ও কেচুআ কুলিদের এক-টুকরো রুটির জন্যে মাল বইতে দেখা যায়। লাতিন আমেরিকার প্রথম পেশাঘটিত রোগ ছিল নিউমোকোনিওসিস্ ; আর আজকের বোলিভিয়ার খনি-মজুরদের ফুসফুস পঁয়ত্রিশ বছরের পর কাজ করে না। সিলিকা-ধুলো আটকানো যায় না, চামড়ায় ঢুকে পড়ে, হাতে মুখে চিড় ধরিয়ে, গন্ধ আর স্বাদের বোধ নষ্ট করে, ফুসফুস শক্ত করে নষ্ট করে দেয়।

পর্যটকেরা আল্‌টিপ্লানোর বাসিন্দাদের স্থানীয় পোশাকে ছবি তুলতে ভালোবাসে। অবশ্য এ-কথা না জেনে যে, এই পোশাকগুলো আঠারো শতকের শেষ দিকে চার্লস III এদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্‌ডিয়ান

মেয়েদের যে-সব পোশাক পরতে বাধ্য করে, সেগুলো ছিল এস্ত্রেমাদুর, আন্দালুসিআ আর বাস্ক রমণীদের পরিচ্ছদের নকল, আর মাথার মাঝখানে চুল বাঁধার ধরনটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভাইসরয় তলেদো। অবশ্য কোকা প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য নয়, ইন্‌কাদের সময়েও তার চল ছিল। কিন্তু তখন ভাগের মাত্রাটা ছিল পরিমিত; তার ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল ইন্‌কা সরকারের এবং শুধু আচার-অনুষ্ঠানের সময়ে খনির মজুরদের ব্যবহারের অনুমতি মিলত। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্‌ডিয়ানদের বেশ উৎসাহের সঙ্গে কোকা চিবোনেতে প্ররোচিত করতে লাগল। এটি খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল। ষোলো শতকে পতোসিতে শোষকেরা ইউরোপীয় পোশাক পরিচ্ছদের জন্য যত খরচ করেছিল, ততখানিই করেছিল শোষিতরা কোকার ওপর। কুজকোতে চারশো স্প্যানিয়ার্ড কোকা ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল; প্রতি বছর এক লক্ষ ঝুড়ি ভরাত দশ লক্ষ কিলো ওজনের কোকা-পাতা পতোসির রুপোর খনিতে ঢুকতো। চার্চ নেশাদ্রব্যটির ওপর কর বসায়। ইন্‌কা ঐতিহাসিক গার্সিলাসো দে লা ভেগা তাঁর কমেন্‌তারিওস রিয়ালেস কুএ দেল ওরিজেন দে লা ইন্‌কাস-এ লিখেছেন যে, বিশপ, যাজক আর অন্যান্য কুজকো চার্চ-অধিকারীদের আয়ের বেশীর ভাগ অংশই আসত কোকার ওপর চাপানো কর থেকে, আর জিনিসটির সরবরাহ আর বিক্রী করে বহু স্প্যানিয়ার্ড বড়লোক হয়।

কাজ করে যে-কটা পয়সা পেত ইন্‌ডিয়ানরা তা দিয়ে খাবারের বদলে কোকা-পাতা কিনতো; ওগুলো চিবিয়ে আয়ু কমাবার বিনিময়ে, তারা ঐ মারাত্মক কাজের চাপ আরো ভালো করে সইতে পারত। কোকার সঙ্গে ইন্‌ডিয়ানরা আগুআরদিয়েন্‌তে পান করত,—আর তার ফলে "ক্ষতিকর বদভ্যাসের" চল হচ্ছে বলে তাদের মালিকেরা অনুযোগ করে। বিশ শতকে পতোসিতে ইন্‌ডিয়ানরা আজ-ও ক্ষুধা আর নিজেদের মারবার জন্যে কোকা-পাতা চিবোয়, বিশুদ্ধ কোহল দিয়ে নিজেদের মাড়ি পোড়ায়—শোষিতদের নিষ্ফলা প্রতিবাদ। পুরোনো দিনের মত বোলিভিয়ার খনি-মজুরেরা আজ-ও তাদের মজুরিকে মিতা বলে।

নিজদেশে পরদেশী, নিরন্তর দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য, লাতিন আমেরিকা বাসিন্দাদের, ক্ষমতাশালী সভ্যতা যত সীমানা বাড়ায়, ততই ঠেলে দেয় দরিদ্রতম এলাকায়—অনুর্বর পাহাড়ে, মরুভূমির মাঝখানে। নিজেদের ঐশ্বর্যের অভিশাপের

শাস্তি ভুগতে হয়েছে ইন্ডিয়ানদের, আজ-ও হচ্ছে : লাতিন আমেরিকার প্রহসন এইটাই। প্লেসার সোনা নিকারাগুআ'র রিও ব্লু ফিল্ডে আবিষ্কার হ'লে, কারুকা ইন্ডিয়ানদের তৎক্ষণাৎ নদীর তীরবর্তী জমি থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়; গ্রান্দে নদীর দক্ষিণে প্রতিটি আবাদা উপত্যকা আর জমিতে ইন্ডিয়ানদের ভাগ্যে বরাদ্দ থাকে ঐ একই ব্যবস্থা। কলম্বাস-এর সময় থেকে ইন্ডিয়ানদের হত্যালীলার যে শুরু তা কোনোদিন-ও থামে নি। যাতে গবাদি-পশু লাতিফুলদিআ'র সারি বেঁধে এগোনোতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই গত শতকে, উরুগোএ আর আর্জেনটিন পাতাগোনিআ-য় সেনাবাহিনী, ইন্ডিয়ানদের তাড়া করে, জঙ্গল বা মরুভূমিতে ঠেলে দিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।*

---

* যারা উত্তর উরুগোএতে ষাঁড় চরিয়ে খেয়ে পরে বাঁচতো, সেই শেষ চারুগাদের প্রতি রাষ্ট্রপ্রধান জোস ফ্রুকটোওসো রিভেরা ১৮৩২ সালে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন। বন্ধুত্বের ভুয়ো প্রতিশ্রুতিতে ভুলে ওরা ঝোপের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, ঘোড়া-অস্ত্র রেখে বেরিয়ে আসে, কিন্তু বোকা দেল টাইগ্রে নামে এক জায়গায় ওদের ওপর আক্রমণ করা হয়। এদুআর্দো আসেভেদো দিয়াজ, লা এপোকা-তে (আগস্ট ১৯, ১৮৯০) লেখেন, "বিউগল বাজিয়ে আক্রমণ শুরু হয়। তাদের দল মরিয়ার মত ঘুরপাক খেতে থাকে, তারপর একের পর এক যুবক তীরবেঁধা ষাঁড়ের মত মাটিতে পড়তে থাকে।" বহু প্রধান মারা যায়। অল্প যে-ক'জন ইন্ডিয়ান আগুনের কুণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল, তারা তার খানিক পরেই প্রতিশোধ নেয়। রিভেরার ভাই তাদের পেছনে ধেয়ে আসছিল; তাকে এবং তার দলবলকে তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে আর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। সেপে'র "বর্শার ফলা মৃতদেহগুলোর পেশীবন্ধনী দিয়ে সজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।" আর্জেন্টিনায় পাতাগোনিয়া সৈনিকরা প্রতি শুক্রাশয়ের জোড়া যা ওরা যোগাড় করে আনতে পারত, তার ওপর টাকা পেত। দাভিদ ভিনাস্-এর উপন্যাস Los dueiros de la tiena (১৯৫৯) একটি ইনডিয়ান-শিকার দিয়ে শুরু : "খতম করাটা ছিল কাউকে বলাৎকার করার মত। বেশ ভালো। আর তা পুরুষকে দিত সুখ : তুমি জলদি হ'তে, তুমি হল্লা করতে, তুমি ঘামতে আর পরে বেশ ক্ষুধিত হ'তে ......গুলি ছোঁড়ার মধ্যে বিরতি বাড়তে লাগল। নিঃসন্দেহে, ঐ পরিখায় লুকোনো কোনো একটা পথে, একটা দেহ পা-ফাঁক করে পড়ে আছে—একটা ইন্ডিয়ান দেহ, চিৎ হয়ে শুয়ে, উরুর মাঝখানে কালো মতন দাগ।"

মেক্সিকোর সেনোরা রাজ্যের ইআকুই ইন্‌ডিয়ানদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়, (যাতে তাদের সারযুক্ত সুফলা জমিগুলো মাকিন ধনিকদের বিনা ঝঞ্চাটে বিক্রী করা যায়)। যারা টিকে থাকে, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউকাতান উপনিবেশে, আর ইউকাতান উপদ্বীপ, শুধু পূর্বতন মালিক মায়াদেরই নয়, দূরাগত ইআকুইদেরও কবরখানা হয়ে ওঠে: এই শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চাশ জন হেনেকুইন-রাজার খেতে কাজ করত এক লক্ষেরও বেশী ইন্‌ডিয়ান দাস। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ইআকুইদের খাটবার অসম্ভব ক্ষমতা সত্ত্বেও গোলামির প্রথম বছরে তাদের তিন-এর দু-ভাগ লোক মারা যায়। শ্রমিকদের জীবন যাপনের মান অসম্ভব নীচু বলেই, হেনেকুইন আজ-ও কৃত্রিম ফাইবারের বিকল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। অবস্থা নিশ্চয়ই বদলেছে, তবে যথেষ্ট নয়—অন্তত ইউকাতান-এর বাসিন্দাদের জন্যে—যেমন অনেকে বলেন। এক সমকালীন বিশেষজ্ঞের মতে: "এই সব শ্রমিকদের হাল ক্রীতদাসদের মত।" বগোতার কাছে, এন্‌ডিয়ান ঢলে চাঁদের আলোয় নিজের জমি চাষ করার জন্যে, হাসেন্‌দাদো'র অনুমতি পেতে ইন্‌ডিয়ান পিওনকে আজ-ও বিনা মজুরিতে কাজ করে দিতে হয়।" রেনে দুমো বলেছেন, "ইন্‌ডিয়ানদের পূর্বপুরুষেরা, আগে বিনা জবাবদিহিতে মালিকবিহীন খেতে চাষ-আবাদ করত। আর আজ কিনা, শুধু পাহাড়ের অনুর্বর ঢলগুলোতে চাষ করার অনুমতিটুকু পেতে বিনা মজুরিতে খেটে দিতে হয়।"

জঙ্গলের গভীরে গিয়েও ইন্‌ডিয়ানদের আজ ছাড় নেই। এই শতকের গোড়ায় ব্রাজিলে ২৩০টি উপজাতি ছিল; তারপর থেকে নব্বইটি উবে গেছে—বন্দুক আর জীবাণুর প্রকোপে মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। হিংস্রতা আর রোগ, সভ্যতার প্রথম সারির পদাতিকবাহিনী: আজ-ও ইন্‌ডিয়ানদের পক্ষে সাদা চামড়ার লোকেদের সংসর্গে আসার অর্থ মৃত্যুর সংসর্গে আসা। ১৫৩৭ সাল থেকে ব্রাজিলে, ইন্‌ডিয়াননের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে-ক'টা আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রতিটা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়ে এসেছে। ব্রাজিলের প্রতিটি সংবিধান অনুযায়ী, তারা নিজেদের জমির "প্রাথমিক ও জন্মগত অধিকারে" মালিক, কিন্তু জমি উর্বরা হ'লেই, তাদের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলতে থাকে। প্রকৃতির বদান্যতাই তাদের লুটপাট আর উৎপাত-এর নিশানা করে। ইন্‌ডিয়ান-শিকার এ-যুগে ভয়ানক আকার নিয়েছে; পৃথিবীর সব থেকে বড় জঙ্গল, এক নতুন "আমেরিকার স্বপ্ন"-এর ইন্ধন যোগাচ্ছে।

কন্‌কিস্‌তাদোর-দের নতুন দল, মার্কিন মুলুকের মানুষ, তাদের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা নিয়ে আমাজনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে। এই মার্কিনি হামলা ব্রাজিলের ফাটকাবাজদের লোভ যে-ভাবে তাতিয়ে তুলেছে, এর আগে কখনো তা হয়নি। ইন্‌ডিয়ানরা কোনো চিহ্ন না রেখেই মুছে যায়, আর তাদের জমি ডলারের বিনিময়ে নতুন ক্রেতাদের হাতে চলে যায়। যাদের বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে ইন্‌ডিয়ানরা সচেতন-ও নয়, সেই সোনা, খনিজ পদার্থ, টিম্‌বার, রাবার-এর উল্লেখ, অল্প যে-কয়েকটা তদন্ত হয়েছে তাতে বারবার ফিরে আসে। জানা গেছে যে, হেলিকপটার আর হাল্কা এয়ারপ্লেন থেকে ইন্‌ডিয়ানদের মেসিন-গান দিয়ে গুলি করা হয়েছে, টিকে দেওয়া হয়েছে বসন্তরোগের বীজাণু দিয়ে, গ্রামে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ডিনামাইট, আর চিনিতে স্ট্রিকনিন্‌ ও নুনে সেঁকোবিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে উপহার। কাস্তেলো ব্রাঙ্‌কো—একনায়কতন্ত্র যাঁর ওপর প্রশাসন ঢেলে সাজানোর ভার দিয়েছিল, সেই ইন্‌ডিয়ান প্রোটেক্‌শান সারভিস-এর পরিচালকের বিরুদ্ধে ইন্‌ডিয়ানদের ওপর বিয়াল্লিশ রকমের অপরাধ-এর অভিযোগ প্রমাণ সহ দাখিল করা হয়। ১৯৬৮ সালে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়।

এ-যুগে ইন্‌ডিয়ান সমাজ, লাতিন আমেরিকার অর্থ-কাঠামোর বাইরে শূন্যে ঝুলে থাকে না। যদি-ও, এটা সত্যি যে ব্রাজিলের কিছু উপজাতি জঙ্গলে বন্ধ হয়ে রয়েছে, কিছু আলটিপ্লানো সম্প্রদায় বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিযুক্ত, ভেনেজুয়েলার সামান্তে কিছু বর্বর উপজাতির ঘাঁটি আছে, কিন্তু মোটামুটি ইন্‌ডিয়ানরা, সরাসরি না হ'লেও, উৎপাদন আর খাদক-ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গেছে। তারা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অংশ নেয়, তা তাদের গণ্য করে বলি-হিসেবে,—শোষিতদের মধ্যেও সবথেকে শোষিত তারা। তারা যে অল্প জিনিস ব্যবহার করে বা বানায়, তা অতিলোভী দালালদের পাল্লায় প'ড়ে বেশী দামে কিনতে বাধ্য হয়, অথচ যৎসামান্য মূল্যে পরে বিক্রী করতে বাধ্য হয়; সব থেকে কম শ্রম-হারে তারা খেতে দিনমজুরি করে বা পাহাড়ে প্রহরা দেয়; হয় তারা তাদের দিনগুলো বিশ্বের বাজারের জন্যে খেটে মরে, নয় দখলিকার-দের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেয়। গুয়েতামালার মত দেশে, তারা দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যমণি: প্রতি বছর অবিচ্ছিন্ন ধারায় তারা তাদের "পবিত্র·জমি" (যে জমিতে একটি ছোটো খামার মরদেহের সমান,) ছেড়ে ওরা কফি, তুলো আর চিনির ফলনে তাদের দু-লক্ষ জোড়া হাত

লাগাতে চলে যায়। গবাদি পশুর মত ওদের ট্রাকে চালান দেওয়া হয়; অনেক সময়ে রুটির প্রয়োজনের চেয়ে মদই ওদের টেনে নিয়ে যায়। ঠিকাদারেরা মারিম্বা আর প্রচুর পরিমাণে আন্তআর্দিয়েন্তের যোগান দেয় আর ইন্ডিয়ানরা নেশা ছুটলে দেখে ততদিনে তারা দেনায় ডুবে গেছে। এই দেনা শোধ করতে সে গরম এক অচেনা দেশে খেটে মরে, আর হয়তো, পকেটে কটা সেন্টাভো কিংবা ক্ষয়রোগ বা ম্যালেরিয়া নিয়ে, ক'মাস পরে সে দেশে ফিরে যায়। কাজে লাগতে গররাজীদের বোঝাতে সেনাবাহিনী দক্ষতার সঙ্গে সহযোগিতা করে। ইন্ডিয়ানদের জমি দখল করে আর শ্রমে ভাগ বসিয়ে, তাদের সর্বস্বান্ত করার ব্যাপারে হাত মিলিয়ে কাজ করছে জাতি-বৈষম্যের মনোভাব; এদের আবার মদত দিয়ে চলেছে দখলের লড়াই-এ ভেঙ্গে চুরমার সভ্যতার গৌরব হ্রাসের প্রচার। দখল আর তারপর দীর্ঘকাল ধ'রে অপমানের ফলে ইন্ডিয়ানদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনায় ভাঙন ধরে। অথচ গুয়েতামালাতে এই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সচেতনতাই যা টিকে আছে।* পবিত্র সপ্তাহে, মায়াদের বংশধরদের মিছিল দলবদ্ধ ভাবে মর্মক্ষমতার বীভৎস নমুনা দেখায়। তারা বিরাট ক্রুশ টেনে নিয়ে যায় আর গোলগোথা পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে যীশুকে বেতমারার প্রতিটি পর্বে অংশ নেয়; যন্ত্রণার, চিৎকারের ভেতর দিয়ে তাঁর মৃত্যু তাঁর কবরস্থ হওয়ার কাহিনীকে নিজেদের মৃত্যু—নিজেদের কবরস্থ হওয়ার কাহিনীতে রূপ দেয় যে-কাহিনী কত কালের আগের সুন্দর জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী। কেবল পবিত্র হপ্তার শেষে পুনরুত্থানটাই কেবল ঘটে না।

---

* মায়া-কুইচেরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত; উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, মিতাচার, পাপ-স্বীকার এর প্রথা ছিল; বিশ্বাস করত যে পৃথিবী ধ্বংস হবার সময়ে মহাপ্লাবন হবে। খ্রীস্টীয় ধর্ম ওদের জন্যে অল্প কিছুই নতুন আনতে পেরেছিলো। উপনিবেশ ভাঙনের সঙ্গে ধর্মীয় ভাঙন শুরু হয়। কন্‌কিস্‌তাদোর-দের ভাবধারণার সঙ্গে ইন্‌ডিয়ানদের বিশ্বাস খাপ খাওয়াবার জন্যে, ক্যাথলিক ধর্ম, মায়াদের ধর্মের কিছু অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়। গোড়াকার সংস্কৃতি ভেঙে চুরমার করার ধারাতেই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়।

অন্তোনিয়োর্ক সিস্‌মেরোস

কবিতা চার

মৃত বিজেতারা

১

তারা জলপথে এসেছিলো
এই নীল চামড়ার লোকগুলো
যারা দাড়ি রাখতো
আর কখনো ঘুমোতো না
একে অন্যের সবকিছু হাতিয়ে মেরে দেবার লোভে।
তাদের ব্যবসা ছিলো
ক্রুশ আর ব্রাণ্ডির, যারা
তাদের জনপদ প্রতিষ্ঠা করতো
একটা গির্জে বানিয়ে।

২

সেবারকার গ্রীষ্মে ১৫২৬ সালে
বর্ষা নেমেছিলো মুষলধারে
তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আর মাথার ওপর,
আর কেউই মেরামত করেনি
জং-ধরা পুরোনো বর্মগুলো।
সংরক্ষিত আসন আর বেদিগুলোর মধ্যে
গজিয়েছিলো কালো ডুমুরগাছ,
আর ছাতের টালিগুলোর ওপর
চড়ুইরা তাদের ঠোঁট থেঁৎলে ফেলেছিলো
ঘণ্টাগুলোকে স্তব্ধ করতে গিয়ে।
পরে পেরুতে

কেউ, যদিও নিজের বাড়িতে
সে প্রভু, এক পা-ও
নড়াচড়া করতে পারতো না মড়াগুলো না-মাড়িয়ে
কিংবা ঘুমোতেও পারতো না শাদা চেয়ারের পাশে
অথবা জলাগুলোয়
কোনো বিছের মতো আত্মীয়দের সঙ্গে
বিছানা ভাগ না-ক'রে।
বিছে আর মাকড়সার মল গায়ে
অল্প ক-জনাই শুধু তাদের ঘোড়াগুলোর চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পেরেছিলো।

তুপাক আমারু অবনমিত

লম্বা-লম্বা জুলফিওলা
কত-কত মুক্তিদাতা ছিলো
যারা দেখেছিলো মৃতদের, আর আহত তাদের
ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো
যুদ্ধের পর। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের লাশগুলো
ইতিহাস হ'য়ে গেলো আর জুলফিগুলো
তাদের পুরোনো উর্দির গায়ে গজিয়ে
তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলো।
যাদের অত ভাগ্য নেই, তারা
তাদের চারটে ঘোড়া আর মৃত্যু নিয়ে
সবসুদ্ধ মোটে দু-পাতা জুড়েছে।

প্রাচীন পেরু

হুয়ারাঙ্গোর ডাল দিয়ে
তারা মাছি তাড়ায়
যারা ভনভন করে
মৃতের বুকের ওপর।
মন্দিরের পাথরের ওপর, চাতালে,
সন্তপতিহারাদের সঙ্গে বুড়ো সর্দারদের

কী-গভীর ভালোবাসা! আর এক রক্তচোখ সূর্য
ঝলসে দেয়
তাদের ছেলেমেয়েদের হাড়।

তারমা

দেয়ালে-দেয়ালে রোদ, ছাতগুলো
ডালপালার মধ্যে দুলছে,
আমার জামায় জড়িয়ে-যাওয়া হলুদ লতা,
জুতোর মধ্যে শ্যামাপাখি,
পাহাড়ের দিকে ওঠা
ইউক্যালিপ্‌টাসের শানবাঁধানো রাস্তা—
অথচ তবু
মাছিগুলো আর মৃতেরা
কিছুই চায় না—
না ডুমুরগাছ, না হলুদ লতা, না ঝাঁকবাঁধা
উইলোর ছায়া।

অনুবাদঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এর্‌নেস্তো কার্‌দেনাল

কবিতা তিন

১

কামানের গর্জনে জেগে-ওঠা
সকালবেলায় আকাশ-ছাওয়া উড়োজাহাজে
মনে হ'তে পারে বুঝি বিপ্লব
কিন্তু আসলে এটা স্বৈরাচারীর জন্মদিন।

২

আদোল্‌ফ বেয়াজ বোনে-র সমাধিফলকের জন্য

তোমাকে ওরা খুন করেছে আর আমাদের জানায়নি কোনখানে গোর দিয়েছে
তোমার শরীর
কিন্তু সেদিন থেকে আমাদের এই সারা দেশ তোমার সমাধি,
কিংবা বরং বলি : তুমি ফিরে এসেছো জীবনের মাঝখানে
প্রতিটি ইঙ্গিতে, যেখানে তোমার শরীর নেই সেখানেও।
ওরা ভেবেছিলো 'গুলি চালাও' এই হুকুম দিয়েই ওরা তোমাকে খতম ক'রে দিয়েছে
ভেবেছিলো তোমাকে ওরা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে
আর আসলে যা করেছিলো তা এই : ওরা মাটিতে পুঁতেছিলো একটা বীজ।

৩

নিকারাগুয়ার গন্ধ গায়ে এসে হাজির বসন্ত :
নতুন বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ, আর উষ্ণ আবহাওয়ার,
ফুলের, অঙ্কুর বেরিয়ে এলো মাটি ফুঁড়ে, ভেজা পাতা,
(আর আমি শুনতে পেলাম এক জন্তু কোথাও ডুকরে উঠলো),
নাকি এটা ভালোবাসার গন্ধ ? কিন্তু এ তো তোমার ভালোবাসা নয়, কার্‌দেনাল,
দেশপ্রেম ছিলো শুধু একনায়কের : থলথলে পৃথুল
একনায়ক, তার সব খোলতাই জামা আর দশ-গ্যালন সমব্রেরা,
তোমার স্বপ্নের ভূমিচিত্র পেরিয়ে যাচ্ছে তার জমকালো ইয়াটে ;
সেই তো দেশকে ভালোবেসেছে, চুরি করেছে দখল ক'রে নিয়েছে।
আর এখন এই মলম মাখানো একনায়ক শুয়ে আছে মাটিতে যাকে সে ভালোবাসতো।
কিন্তু দেশপ্রেম তোমাকে, কার্‌দেনাল, নিয়ে চ'লে গিয়েছে নির্বাসনে।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেস

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জলে-ডোবা মানুষ

বাচ্চাদের মধ্যে যারা প্রথমে সাগরের ওপর দিয়ে কালো ফুলেওঠা জিনিসটাকে ধীরে-ধীরে ভেসে আসতে দেখেছিলো, ভেবেছিলো বুঝি শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ। পরে তারা দেখতে পেলো ওর কোনো নিশান বা মাস্তুল নেই, তখন তারা ভাবলো ওটা তিমিমাছ। কিন্তু জিনিসটা যখন ঢেউয়ের দোলায় কূলে এসে পড়লো, তারা সামুদ্রিক আগাছার ঝাড়, জেলিফিশের, মাছের আর সমুদ্রে ভেসেবেড়ানো জিনিসের টুকিটাকি তার গা থেকে সরিয়ে ফেললো, আর তখনই কেবল তারা দেখতে পেলো, ওটা একজন ডুবে-যাওয়া মানুষ।

সারাটা বিকেল তারা তার সঙ্গে খেলা করলো, বালির নিচে তাকে কবর দিলো, কবর খুঁড়ে আবার তাকে তুললো, সেইসময় কেউ একজন হঠাৎ তাদের দেখে ফেললো আর খবরটা গাঁয়ে রটিয়ে দিলো। যারা তাকে সবচেয়ে কাছের বাড়িটায় ব'য়ে নিয়ে এলো, লক্ষ করলো, তাদের জানা যে-কোনো মৃত মানুষের চেয়ে এই দেহটা বেশি ভারি, প্রায় একটা ঘোড়ার সমান। আর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, হয়তো অনেকক্ষণ ধ'রে জলের ওপর ভেসে ছিলো আর তাই জল একেবারে হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে তারা বললো, অন্য সব মানুষের চেয়ে সে লম্বা। কারণ বাড়িটায় তার জন্য আর খুব অল্পই জায়গা অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা ভাবলো মৃত্যুর পরেও বেড়ে চলার ক্ষমতা হয়তো কোনো-কোনো জলে-ডোবা মানুষের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। তার সারা গায়ে সমুদ্রের গন্ধ আর আকৃতি থেকেই কেবল বোঝা যাচ্ছিলো যে এটা মানুষের শব, কারণ কাদা আর আঁশের আবরণে তার চামড়া ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলো।

মৃত মানুষটি যে অপরিচিত তা জানতে তার মুখটাও তাদের সাফ করার দরকার হলো না। সারা গাঁয়ে মোটে গোটা-কুড়ি কাঠের বাড়ি, যার পাথুরে উঠোনে কোনো ফুল ফোটে না আর গ্রামটি একটি

মরুভূমির মতো অন্তরীপের একেবারে শেষ পর্যন্ত ছড়ানো। জমি এতই কম ছিলো যে মায়েদের মনে সবসময়েই ভয়, বুঝি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের বাচ্চাদের আর তাদের মধ্যে বুড়ো হ'য়ে যে ক-কজন মারা গেছে, তাদের পর্বতের খাড়াই থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছে। কিন্তু সাগর শান্ত আর দরাজ, আর সাতটি নৌকোতেই সব লোক ধ'রে যেতো। কাজেই তারা যখন জলে-ডোবা মানুষটিকে দেখলো, শুধু নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে দেখে নিলো যে তারা সবাই সেখানে রয়েছে।

সে-রাতে তারা সাগরে গেলো না কাজে। যখন পুরুষরা দেখতে বেরুলো আশেপাশের গাঁয়ের কেউ নিখোঁজ হয়েছে কি-না, মেয়েরা থেকে গেলো জলে-ডোবা মানুষটির যত্ন-আত্তি করবার জন্য। তারা ঘাসের তৈরি ঝাড়ন দিয়ে মাটি ঝেড়ে ফেললো, জলের নিচের যে-সব নুড়ি তার চুলে জড়িয়ে গিয়েছিলো সেগুলো সরিয়ে দিলো আর মাছের আঁশ ছাড়াবার ঝিনুক দিয়ে তার গা থেকে শ্যাওলা চেঁছে ফেললো। কাজ করতে করতে তাদের নজরে পড়লো, তার গায়ে যে-সব গাছপালা সেগুলো বহুদূর সমুদ্রের আর গভীর জলের, আর তার পোশাক শতচ্ছিন্ন, যেন প্রবালের গোলক-ধাঁধার পথ উজিয়ে এসেছে। তারা এ-ও দেখলো, মৃত্যুকে সে বহন করেছে খুবই মর্যাদার সঙ্গে, কারণ সাগর থেকে ফেরা অন্য ডুবন্ত মানুষদের মতো তার দৃষ্টি নির্জন নয়, বা নদীতে যারা ডুবে যায় তাদের মতো বন্য, নিঃস্বও নয়। কিন্তু তাকে সাফ করার কাজ শেষ করার পরেই তারা বুঝতে পারলো মানুষটি কেমন ছিলো, আর বুঝতে পারামাত্রই তাদের দম আটকে এলো। সে কেবল সবচেয়ে দীর্ঘকায়, সবচেয়ে শক্তিশালী, অত্যন্ত পৌরুষপূর্ণ এবং তাদের দেখা সবচেয়ে সুপুরুষই নয়, যদিও তারা তাকেই দেখছিলো, তবু তাদের কল্পনাতেও এমন মানুষের স্থান ছিলো না।

তাকে শোয়ানোর মতো বড়ো বিছানা তারা সারা গাঁয়ে খুঁজে পেলো না, পেলো না এমন কোনো পোক্ত টেবিল যা তার উপাসনার জন্য ব্যবহার করা চলে। সবচেয়ে লম্বা মানুষদের হলিডে প্যান্ট তার মাপমতো হবে না, সবচেয়ে মোটা মানুষদের সান্‌ডে শার্টও তার গায়ে লাগবে না, সবচেয়ে বড়ো মাপের পায়ের জুতোও তার পায়ে হবে না। তার বিশাল আকৃতি আর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে মেয়েরা ঠিক করলো পালের বড়ো টুকরো দিয়ে তার জন্য ক'টা প্যান্ট আর লিনেন দিয়ে একটা জামা বানিয়ে দেবে যাতে মৃত্যুর

মধ্যেও তার মর্যাদা অটুট থাকে। গোল হ'য়ে ব'সে যখন তারা সেলাই করছিলো, ফোঁড় দেবার ফাঁকে-ফাঁকে শবটির দিকে তাকাচ্ছিলো, তাদের মনে হচ্ছিলো, সে-রাতের মতো বাতাস এর আগে আর কখনো এমন দামাল হয়নি, সাগর হয়নি এমন অশান্ত; আর তারা ভাবলো মৃত মানুষটির সঙ্গে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের হয়তো কোনো যোগ আছে। তারা ভাবছিলো, এই অসামান্য মানুষটি যদি (তাদের) গ্রামে বাস করতো, তাহলে তারই বাড়িতে থাকতো সবচেয়ে চওড়া দরজা আর সবচেয়ে উঁচু সিলিং আর সবচেয়ে মজবুত মেঝে; তার পালঙ্ক তৈরি হ'তো জাহাজের মাঝখানের কাঠামোয় লোহার বল্টু লাগিয়ে, আর তার স্ত্রী হ'তো সবচেয়ে সুখী রমণী। তারা ভাবছিলো, তার এতই দাপট থাকতো যে শুধুমাত্র নাম ধ'রে ডেকেই সে সাগরের মাছদের কাছে টেনে আনতে পারতো, আর সে তার জমিতে এত বেশি মেহনত করত যে পাথরের বুক চিরে ঝরনা বেরিয়ে আসতো যাতে সে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ফুলগাছ লাগাতে পারে। তারা গোপনে যে যার স্বামীর সঙ্গে তার তুলনা করলো, ভাবলো সারা জীবন ধ'রে তাদের স্বামীরা যা করতে অক্ষম এ তা করতে পারে একরাত্রেই। আর পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে নীচমনা এবং সবচেয়ে অপদার্থ জীব হিসেবে তাদের বাতিল ক'রে হৃদয়ের গভীরে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবনায় ইতি টানলো। কল্পনার গোলকধাঁধায় যখন তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সবচেয়ে প্রধানা স্ত্রীলোকটি, প্রধানা ব'লেই যিনি আসক্তির চেয়ে বেশি করুণা নিয়ে ডুবন্ত মানুষটিকে দেখছিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন: 'ওর মুখখানা কোনো এক এস্তেবানের মতো।'

সত্যি! তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ে তার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই বুঝলো যে, অন্য-কোনো নামে তাকে মানায় না। মেয়েদের মধ্যে যারা একটু বেশি একগুঁয়ে, বয়স যাদের সবচেয়ে কম, আরো কিছুক্ষণ এই মোহে আচ্ছন্ন থাকলো যে যখন তারা তাকে পোশাক পরাচ্ছিলো এবং সে চক্চকে চামড়ার জুতো পায়ে ফুলের মধ্যে শুয়েছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো তার নাম লুতারো-ও হ'তে পারে। কিন্তু বৃথা এই মোহ। ক্যাম্বিসের কাপড় যতটা দরকার তা ছিলো না, খুবই অপটুভাবে ছাঁটা আর সেলাই করা প্যাণ্ট অত্যন্ত আঁটো-সাঁটো এবং তার হৃৎপিণ্ডের লুকোনো শক্তিতে তার জামার বোতাম সশব্দে খুলে যাচ্ছে। মাঝরাতের পর বাতাসের শনশনানি থেমে গেলো,

আর সাগর তার ওয়েন্‌জড়ে তন্দ্রালুতায় ঢ'লে পড়লো। নৈঃশব্দ্য সবশেষে সন্দেহেরও নিরসন ঘটালো : সে এস্‌তেবান। মেয়েরা যারা তাকে পোশাক পরিয়েছে, তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে, নখ কেটে দিয়েছে আর দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে, তারা যখন দেখলো বাধ্য হ'য়ে তাকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তখন তাদের দরদ উঠলে উথলো। তখনই তারা বুঝতে পারলো এত বড়ো দেহটা নিয়ে সে কত অসুখী ছিলো, কারণ মৃত্যুর পরেও এ-নিয়ে তাকে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে। তারা দেখতে পেলো সে কারকম ভাবে বেঁচে ছিলো, বাধ্য হ'য়ে আড়াআড়িভাবে দরজা দিয়ে যেতে গিয়ে চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাচ্ছে, বেড়াতে গেলেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা, নরম গোলাপী সিন্ধুঘোটক মাছের মতো হাত দুটি নিয়ে কী করবে জানে না, এদিকে গৃহকর্ত্রী তাঁর সবচেয়ে পোক্ত চেয়ারটি খুঁজছেন আর মিনতি করছেন মৃত্যুভয়ে—'এস্‌তেবান, অনুগ্রহ ক'রে এখানে বোসো' আর সে দেয়ালে হেলান দিয়ে, হাসিমুখে, 'বিব্রত হবেন না ঠাকরুন, যেখানে আছি বেশ আছি আমি।' যখনই কারো বাড়ি যায়, একই কাজ বারবার ক'রে ক'রে গোড়ালি শক্ত আর পিঠ ছড়ে গেছে, 'বিব্রত হবেন না, ঠাকরুন' চেয়ারটি পাছে ভেঙে ফ্যালে সেই লজ্জা এড়াতে, 'আমি যেখানে আছি বেশ আছি' (বলা) এবং বোধ হয় কখনো জানতেও পারেনি যে যারা বলেছিলো, যেয়োনা এস্‌তেবান, অন্তত কফি বানানো পর্যন্ত সবুর করো, তারাই পরে কানাকানি করতো, গণ্ডমূর্খটা শেষ পর্যন্ত চ'লে গেছে, যাক্‌ বাঁচা গেছে, রূপবান গাধাটা চ'লে গেছে। ভোর হবার একটু আগে পর্যন্ত দেহটির পাশে ব'সে মেয়েরা এই সবই ভাবছিলো। পরে, যখন তারা একটা রুমালে তার মুখ ঢেকে দিলো যাতে আলোয় তার অসুবিধে না হয়, তাকে এমন চিরতরে মৃত, এত অসহায়, এত আপনজনের মতো লাগছিলো যে তাদের হৃদয়ে প্রথম অশ্রুর উৎসার অবারিত হ'লো। তরুণীদের মধ্যে একজন প্রথম কান্না শুরু করলো। অন্যেরাও, তাতে যোগ দিয়ে, প্রথমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো পরে বিলাপ করতে শুরু করলো, আর যত তারা ফোঁপাচ্ছিলো ততই তাদের কান্না পাচ্ছিলো। কারণ ডুবন্ত মানুষটি তাদের কাছে এস্‌তেবানই হ'য়ে উঠেছিলো আর তাই তারা হাপুস নয়নে কাঁদলো, কারণ সে ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব সবচেয়ে প্রশান্ত এবং সবচেয়ে সদাশয় হতভাগ্য এস্‌তেবান। কাজেই পুরুষরা যখন এই খবর নিয়ে ফিরে এলো যে ডুবে-যাওয়া মানুষটি পাশের কোনো গ্রামেরও নয়, তখন মেয়েরা তাদের কান্নার মধ্যেও উল্লাস অনুভব করলো।

তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ঈশ্বরের গুণগান করো, ও আমাদের।'

পুরুষরা ভাবছিলো, এই বাড়াবাড়ি মেয়েলি আদিখ্যেতা ছাড়া আর কিছু নয়। সারারাত হন্যে হ'য়ে খোঁজাখুঁজির ধকলে ক্লান্ত তারা চাইছিলো শুকনো, বায়ুহীন দিনটিতে রোদের তেজ বেড়ে ওঠার আগেই আগন্তুকের ঝামেলা থেকে চিরতরে রেহাই পেতে। জাহাজের সামনের মাস্তুল আর মাছধরার কোঁচের টুকরোটাকরা দিয়ে তারা একটা শয্যা তৈরি করলো, একত্রে দড়ি দিয়ে বাঁধলো যাতে পাহাড়ের খাড়াইতে পৌছনো পর্যন্ত সেটা দেহের ভার সইতে পারে। তাদের ইচ্ছে ছিলো মালবাহী জাহাজের একটা নোঙ্গর তার শরীরের সঙ্গে বেঁধে দেয়, যাতে অতল ঢেউয়ের নিচে সে সহজেই তলিয়ে যায়, যেখানে মাছ অন্ধ আর যেখানে ডুব দিলে ডুবুরিরা বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়, এবং যেখান থেকে স্রোত আবার তাকে কূলে ফিরিয়ে আনবে না, যেমন নাকি অন্য মৃতদেহের বেলায় ঘটেছিলো। কিন্তু তারা যতই তাড়াহুড়ো করছিলো, মেয়েরা ততই নানা অছিলায় সময় নষ্ট করার কথা চিন্তা করছিলো। ত্রস্ত মুরগির মতো তারা চলাফেরা করছিলো।

কেউ একপাশে ডুবন্ত মানুষটির গায়ে সু-পবনের অংসফলক লাগাতে ব্যস্ত, অন্য কেউ আর একপাশে তার কব্জিতে কম্‌পাস বেঁধে দিচ্ছে, তারপর অনেকবার, 'ওখান থেকে স'রে যাও, এই মেয়ে, পথ ছাড়ো ছ্যাখো, তুমি তো মরা মানুষটার গায়ের ওপরেই আমায় ফেলে দিলে,' (বলার পর) পুরুষরা তাদের একঘেয়ে জীবনধারায় অনাস্থা বোধ করতে শুরু করলো এবং এই ব'লে গাঁইগুঁই করতে আরম্ভ করলো যে, একজন আগন্তুকের জন্য এত সমারোহের ঘটা কেন। কারণ যতই পেরেক ঠোকা হোক আর যত পবিত্র জলই তার মাথায় ঢালা হোক-না-কেন, হাঙর তাকে চিবিয়ে খাবেই। কিন্তু মেয়েরা ভাঙা-নৌকোর টুকরো টাকরা চাপিয়েই চলেছে, দৌড়ে আসছে, যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, চোখের জলে যা বলতে পারছে না দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রকাশ করছে। কাজেই পুরুষরা শেষ পর্যন্ত এই ব'লে ফেটে পড়ল, 'ভেসে-আসা মড়া, এক অচেনা ডুবে-যাওয়া মানুষ, একখণ্ড শীতল ওয়েন্‌জডে মীট নিয়ে এমন আদিখ্যেতা আর কবে হয়েছে।' মেয়েদের মধ্যে একজন এই তাচ্ছিল্যে আহত হ'য়ে, অতঃপর, মৃত মানুষটির মুখের ওপর থেকে রুমালটি সরিয়ে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদেরও দমবন্ধ হ'য়ে এলো।

সে এস্‌তেবান। তাকে চেনবার জন্য এ-নামটা আবার বলবার দরকার ছিলো না। গ্রিংগো অ্যাক্‌সেন্ট, কাঁধের ম্যাকাও, নরখাদক-মারা বন্দুকে চিনতে

পারলেও সার ওয়াল্টার র‍্যালের নামটা হয়তো তাদের ব'লে দিতে হয়। কিন্তু এস্তেবান পৃথিবীতে একজনই আর এ-ই তো সে, স্পার্ম-তিমির মতো শয়ান, পাদুকাহীন, ছোটো শিশুর প্যান্ট পরনে এবং পাথুরে নখ, সেগুলো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়। তার মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে ফেলতে হ'লো শুধু এটা দেখার জন্য যে, সে লজ্জিত। সে-যে এত বড়ো অথবা এত ভারী অথবা তার যে এমন অনিন্দ্যকান্তি, সে-দোষ তার নয়, এবং সে যদি জানতো এমনটা ঘটতে চলেছে, তাহ'লে সে ডুবে যাবার জন্য অন্য কোনো অনুকূল জায়গা খুঁজে নিতো; বাস্তবিক, আমি গ্যালিয়ন থেকে খুলে একটা নোঙরও গলায় বেঁধে নিতে পারতাম এবং পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তাম এমন একজন মানুষের মতো যে অন্যদের সুস্থির জীবন বিঘ্নিত হোক তা চায় না, এখন যেমন ওয়েন্‌জডে শব নিয়ে হয়েছে। এই যে তোমরা বলছো, এই নোংরা ঠাণ্ডা মাংসের টুকরো নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই—এ নিয়ে আমার তো কিছু করবার নেই আর হাবভাবে এত বেশি সততা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে পুরুষদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সন্দিগ্ধ, তারা, যারা সমুদ্রভ্রমণে অন্তহীন রাতের পর রাত কাটিয়ে এই ভেবে তিতবিরক্ত যে, ঘরে তাদের বৌ-রা তাদের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং মরা মানুষটার স্বপ্ন দেখবে, তারাও এবং অন্য যারা আরো বেশি বেশি কট্টর, হাড়ে মজ্জায় কেঁপে উঠছিলো এস্তেবানের আন্তরিকতায়।

একজন পরিত্যক্ত মৃত মানুষের জন্য যতখানি জাঁকালো শবযাত্রার কথা তারা ভাবতে পেরেছিলো, সেইভাবেই তারা আয়োজন করলো। মেয়েদের মধ্যে যারা আশেপাশের গ্রামগুলোতে ফুল আনতে গিয়েছিলো, ফিরে এলো অন্য মেয়েদের সঙ্গে ক'রে যারা শোনা কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি, এবং ঐ মেয়েরা মৃত মানুষটিকে দেখার পর আরো ফুল আনতে ফিরে গেলো এবং তারা কেবলই ফুল আনতে আনতে এত রাশিরাশি ফুল আর এত বেশি লোক জড়ো হ'লো যে হাঁটাচলাই মুশকিল হ'য়ে উঠলো। যখন শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, তাকে অনাথের মতো জলে ফিরিয়ে দিতে তারা ব্যথাতুর হ'য়ে উঠলো এবং সবচেয়ে ভালো লোকদের মধ্যে থেকে একজন বাবা আর একজন মা এবং খুড়িমাসিপিসি, খুড়োমেসোপিসে, ভাইবোনভাগনে বেছে নিল, যাতে তার মধ্য দিয়ে গ্রামের অধিবাসীরা একে অপরের আত্মীয় হ'য়ে ওঠে। দূর থেকে যে-নাবিকরা কান্নার শব্দ শুনেছিলো তারা পথ বদলে ফেললো এবং গ্রামবাসীরা

একজনের কথা জানতো যে সাইরেন সম্পর্কে পুরোনো কিংবদন্তী স্মরণ ক'রে নিজেকে প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলো। পাহাড়ের বন্ধুর, খাড়াই দিয়ে কারা তাকে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাবে এই নিয়ে তারা যখন হুড়োহুড়ি করছিলো, ডুবে-যাওয়া মানুষটির বৈভব এবং সৌন্দর্যের মুখোমুখি হ'য়ে পুরুষ এবং মেয়েরা তখনই প্রথম টের পেলো, তাদের রাস্তাগুলো কত নির্জন, উঠোনগুলো কত উষর, তাদের সব স্বপ্নই কত সংকীর্ণ। কোনো নোঙর ছাড়াই তারা তাকে যেতে দিলো যাতে ইচ্ছে করলে সে ফিরে আসতে পারে এবং অতল গহবরে দেহটা পড়তে যতটুকু সময় লেগেছিলো, বুঝি বহু শতাব্দীর ভগ্নাংশ, তারা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রেখেছিলো। এটা বুঝতে তাদের আর, পরস্পরের দিকে তাকাবার দরকার হ'লো না যে তারা সকলে আর উপস্থিত নেই, আর কখনও তারা একত্র হবেও না। কিন্তু তারা এ-ও বুঝলো যে এখন থেকে সবকিছুই বদ্‌লে যাবে, তাদের বাড়িগুলোর আরো বড়ো-বড়ো দরজা থাকবে, আরো উঁচু সিলিং, আরো শক্ত মেঝে, যাতে কড়ি বরগায় ধাক্কা না খেয়ে এস্‌তেবানের স্মৃতি সবজায়গায় চলতে-ফিরতে পারে এবং যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ-কথা বলতে সাহস না পায় যে শেষ পর্যন্ত দশাসই হাবাগোবা লোকটা মরেছে, কী বিশ্রী, রূপবান বোকাটা মরেছে শেষ পর্যন্ত। কারণ এস্‌তেবানের স্মৃতিকে শাশ্বত করতে এবার তারা তাদের বাড়ির সামনেটা নানা সুন্দর রঙে চিত্রিত করবে আর পাথরের মধ্যে থেকে ঝরনা খুঁড়ে বের করতে তারা তাদের শিরদাঁড়া প্রায় ভেঙে ফেলবে এবং খাড়া পাহাড়ের গায়ে তারা ফুলগাছ লাগাবে, যাতে ভবিষ্যতে সকালবেলা জাহাজের যাত্রীদের মাঝদরিয়ায় শ্বাসরোধকারী ফুলের গন্ধে জেগে উঠতে হয় এবং ক্যাপ্তেনকে নেমে আসতে হয় নিজের ক্যাবিন থেকে। পরনে ইউনিফর্ম, সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র পোলস্টার, যুদ্ধের জন্য পাওয়া পদকের সারি এবং দিগন্তে সমুদ্রের বুকে জেগে-ওঠা গোলাপে ছাওয়া শৈলান্তরীপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হয়ত চৌদ্দটি ভাষায় বলবেন, ঐ দিকে দ্যাখো, যেখানে বাতাস এখন এত শান্ত যে মনে হয় বিছানায় ঘুমোতে গেছে, ঐ ওখানে যেখানে সূর্য এত প্রখর যে সূর্যমুখী দিশে পায় না কোন্‌দিকে ফিরবে, হ্যাঁ, ওখানে, ঐটাই এস্‌তেবানের গাঁ।

অনুবাদ ঃ অজয় গুপ্ত

রোকে দাল্‌তোন

আবার কারাগার

আবার কারাগার, কালো জল।
রাস্তায়, কিংবা মানুষের ঘরে, এই মুহূর্তে কেউ গুঞ্জন ক'রে উঠবে
ভালোবাসায়, গান গাইবে, কিংবা এশিয়ার রাতের তলায় সেই-যে
যুদ্ধ হচ্ছে, তার খবর পড়বে। নদীতে, মহাসমুদ্রের কথা বিশ্বাস
করতে-না-পারার গান গাইবে মাছ, অসম্ভব স্বপ্ন এই মহাসমুদ্র,
এত গরীয়ান যে কিছুতেই সত্যি হ'তে পারে না। (সেইসব মাছের কথা
বলছি আমি, আসলে যারা নীল কিন্তু নাম যাদের লিরিয়ো-নেগ্রো,
যাদের শিরদাঁড়া নিংড়ে ক্ষিপ্র হিংস্র মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধি আতর
বার ক'রে নিয়ে আসে।)

১

আর, কোথাও-না-কোথাও আমার চেয়েও কম-বন্দী হ'য়ে উঠবে শুকনো
কোঁচকানো পেরেক-আঁটা কোনো জিনিস।
(সত্যি, আমার এই-যে কাগজ-পেনসিল আছে—আর কবিতা—তা-ই
প্রমাণ ক'রে দেয় যে একেকটা ফাঁপিয়ে-তোলা বিশ্বজনীন ধারণা
আছে যা বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা হবার যোগ্য—সত্য, ঈশ্বর,
অজ্ঞাত শক্তি—এক সুখী দিনে আমার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিলো
তারা, আর আমি থুবড়ে পড়িনি—ধপ ক'রে প'ড়ে যাইনি এই
অন্ধকূপে—বরং পড়েছি সুযোগেরই হাতে, যাতে মানুষের কাছে
সে-সম্বন্ধে পরে প্রকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে পারি।
তবু, গ্রামের রাস্তায় হাঁটতেই আমার বেশি ভালো লাগতো।
এমনকি, কোনো কুকুর ছাড়াই।)

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিকোলাস গিয়েন

দোনা মারিয়া

আহা রে! বেচারি দোনা মারিয়া,
কিছু জানেন না সেই বেচারি!
কালোকোলো ঐ ছেলেটি তাঁরই
কিনা টাকা পায় চরের কাজে!
এ যে নিদারুণ, অভাবনীয়!

কালকে ধূর্ত বিষম চালাক
সে গেছে আমার বাসার পাশে।
দেখেই আমি তো রুদ্ধশ্বাসে
বলেছি কেবল: ভাগ! পালা! ভাগ!
(শাদা পোশাকের পুলিস সে যে!)

হায় রে! বেচারি দোনা মারিয়া
এত কিনা যিনি সম্মানিতা
ছেলের যে সব পুলিশ মিতা
তাও জানেন না ঘুণাক্ষরে!
পুরো ব্যাপারটা অভাবনীয়!

অনুবাদঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লেওপোল্‌দো লুগোনেস্‌

ইজুর

আমি বাঁদরটাকে কিনেছিলাম নীলামে—দেউলে-হ'য়ে-যাওয়া এক সার্কাস থেকে।

এখানে যে-পরীক্ষানিরীক্ষার কথা বর্ণনা করেছি তার কথা প্রথম আমার মাথায় জেগেছিলো একদিন বিকেলে। কোন-একটা প্রবন্ধে আমি পড়েছিলাম যে, জাভার আদিবাসীদের ধারণা বাঁদরের মুখে কথা ফোটে না, তার কারণ এটা নয় যে তারা কথা বলতে পারে না, বরং তার কারণ এটাই—তারা কথা বলতে চায় না। 'তারা কথা বলে না,' প্রবন্ধটি বলেছিলো, 'যাতে মানুষ তাদের জোর ক'রে কাজে না লাগায়।'

গোড়ায় এই কথাটাকে আমি তেমন আমল দিইনি, কিন্তু ক্রমেই ভাবনাটা আমাকে এমনভাবে দখল ক'রে নিলে যে তা থেকে বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটা দানা বেঁধে উঠলো : বাঁদরেরা হলো এমন মানুষ যারা কোনো কারণে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। ফলে মস্তিষ্কের যে-অংশ বাক্‌ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তার সঙ্গে স্বরযন্ত্রের সম্পর্ক ক্রমেই এত ক্ষীণ হয়ে আসে যে শেষ অব্দি তা একেবার বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। বাঁদরদের ভাষা শেষে একেবারে কতকগুলো অস্পষ্ট চীৎকারে পরিণত হয়, আর আদিম মানুষ একেবারে জন্তুর পর্যায়ে নেমে আসে।

এটা তো স্পষ্ট যে, তত্ত্বটাকে যদি হাতেকলমে প্রমাণ করা যায়, তাহ'লে যে সব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বাঁদরদের এ-রকম অসাধারণ জীবে পরিণত করেছে, তাদের সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। কিন্তু এর তো একটাই সম্ভাব্য প্রমাণ : কোনো বাঁদরকে আবার কথা বলাতে বাধ্য করা।

ইতিমধ্যে আমি আমার এই বাঁদরটাকে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরেছি, আর এই ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে তাকে আমার খুব কাছে টেনে এনেছি। ইওরোপে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, আর আমি যদি চাইতাম তবে ওকে আমি কনস্যুলের মতো বিখ্যাত ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার এ-ধরনের মূর্খতা আমার ব্যবসায়িক সততার সঙ্গে মানাতো না।

বাঁদরদের কথা বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে এমনই তাতিয়ে দিয়েছিলো যে, এ-বিষয়ে যাবতীয় বইপত্র আমি ঘেঁটে দেখেছিলাম, কিন্তু তেমন লাভ হ'লো না! একমাত্র যে-বিষয়টা আমি তর্কাতীতভাবে জানতে পেলাম তা হলো এই যে, বাঁদর কেন কথা বলে না এই রহস্যের পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। আর এতেই কেটে গেলো পাঁচ বছর—অধ্যয়নে আর চিন্তায়।

ইজুর—কোত্থেকে যে এই নামটা ও জুটিয়েছিলো তা আমি কোনোদিন জানতে পারিনি, যেহেতু ওর পুরোনো মালিকও তা জানতো না! তবে ইজুর নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য জীব। সার্কাসে ও যে খেলা শিখেছিলো, যদিও তা কেবল প্রধানত নকল ক'রে দেখানোতেই সীমাবদ্ধ ছিলো, তা ওর চিন্তা-শক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটিয়েছিলো, আর এটাই আরো খোঁচাতে লাগলো আমার এই তথাকথিত আজগুবি তত্ত্বটা ওর ওপর খাটিয়ে দেখবার জন্য। তাছাড়া, এ তো জানা কথাই যে শিম্পাঞ্জিরা (ইজুর তো আসলে তাই) বাঁদরদের ভেতর সবচেয়ে বাধ্য জাত, আর মানসিক দিক থেকেও সবচেয়ে উন্নত, যেটা আমার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো। যখনই ওকে দেখতাম দু-পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, টলোমলো, হাত দুটো পেছনে, অনেকটা যেন কোনো মাতাল খালাসি, তখনই আমার মধ্যে এ-ধারণা আরো জোরালো হ'য়ে উঠতো যে, ও আদতে এক প্রতিবন্ধী মানুষ।

সত্যি-বলতে, কোনো বাঁদর যে কেন নিখুঁতভাবে কথা সাজাতে পারবে না, তার কোনো কারণ নেই। তার স্বাভাবিক কথা—অর্থাৎ যে-সব আওয়াজ সাজিয়ে অন্যান্য বাঁদরদের ওর মনের ভাব জানায়—বেশ বিচিত্র, ওর স্বরযন্ত্র যদিও মানুষের চেয়ে ভিন্ন, তবু তা তোতাপাখির স্বরযন্ত্র যতটা ভিন্ন ততটা নয়—অথচ তোতা কিন্তু কথা বলতে পারে। আর তার মগজ—তোতার সঙ্গে তার তুলনা করলেই তো সব সন্দেহের নিরসন হয়—এটাও মনে করা উচিত যে জড়বুদ্ধি মানুষের মগজও তো অনুন্নত থাকে, অথচ তা সত্ত্বেও কোনো জড়বুদ্ধি তো কিছু-কিছু কথা বলতে পারে। আর ব্রোকা-র মস্তিষ্কের খাঁজ-বিষয়ক তত্ত্বের কথা যদি ধরা যায়, সেটা তো বলাই বাহুল্য নির্ভর করে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশের ওপর। তাছাড়া, বাক্‌ক্ষমতা যে এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার কোনো নিঃসন্দেহ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও শারীর সংস্থানের

দিক থেকে এই-ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, তবে তার বিরুদ্ধে অকাট্য কিছু যুক্তিও তো আছে।

তবে সুখের কথা, অনেক বদভ্যাস থাকলেও বাঁদরদের একটা বৈশিষ্ট্য তাদের শেখার আগ্রহ, যা তার নকল করে দেখাবার বাহাদুরিতেই বোঝা যায়। তার উৎকৃষ্ট স্মরণশক্তি, চিন্তার ক্ষমতা—সেটা আবার এমন স্তরে উন্নীত যে বেশ সুষ্ঠুভাবে সে ভান করতে পারে, আর মনোযোগ সেটা তো যে-কোনো মানবশিশুর চেয়েই তুলনায় অনেক বিকশিত। বাঁদর, অতএব, শিল্পবিজ্ঞানের দারুণ সব সম্ভাবনায় ভরা বিষয়।

তার ওপর আমার বাঁদরটা ছিলো কমবয়েসী। আর কে না জানে এই সময়েই বাঁদরদের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী থাকে। একমাত্র মুশকিল যেটা সেটা এই: ওকে যে কথা বলতে শেখাবো সেটা কোন্ পদ্ধতিতে? তাছাড়া আমার পূর্বসূরিদের সমস্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথাও আমার জানা ছিলো। আর এটা না বললেও চলে যে তাঁদের যোগ্যতা এবং তাঁদের সব চেষ্টার পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার প্রতিজ্ঞা একাধিকার হোঁচট খেয়েছিলো। কিন্তু এই বিষয়ে আমার সব ভাবনাচিন্তাই আমাকে এই সিদ্ধান্তে টেনে আনলো যে, এ-ব্যাপারে আমার প্রথম কাজ হওয়া উচিত বাঁদরের শব্দ উৎপাদক যন্ত্রের বিকাশ ঘটানো। বস্তুত এইভাবেই কেউ বোবা-কালাদের কথা বলতে শেখায়। এ-বিষয়ে ভাবতে শুরু করামাত্র বোবা-কালাদের সঙ্গে বাঁদরের যে কত মিল আছে তা আমার মনে জেগে উঠলো। প্রথমেই আছে তাদের ঐ অসাধারণ অনুকরণ করার ক্ষমতা—যেটা উচ্চারণ ক'রে বলা কথার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেয় আর এটাই বোঝায় যে, কথা বলতে না-পারার মানে মোটেই চিন্তাশক্তি-হীনতা নয়। যদিও কথনশক্তির পক্ষাঘাত চিন্তার ক্ষমতাকে খানিকটা কমিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া আরো কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে—যেগুলো তুলনায় সুনির্দিষ্ট ব'লেই আরো অদ্ভুত: কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আর সাহস—যা দুটি বিশেষ কারণে এতই বেড়ে ওঠে যে নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ—ব্যালান্সের খেলায় স্বাভাবিক নৈপুণ্যে আর ঘূর্ণিরোগের প্রতিরোধ ক্ষমতায়।

আমি তাই ঠিক করলাম, আমার বাঁদরকে ব্যবহারিক ভাবে জিভ আর ঠোঁটের ব্যায়াম শিখিয়ে কাজ শুরু করবো: অর্থাৎ ওকে বোবা-কালা হিসেবেই গণ্য করলাম। তারপরে তার শ্রবণশক্তি নিশ্চয়ই আমাকে ওর সঙ্গে সরাসরি কথ্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে—তার স্পর্শশক্তিকে ব্যবহার না করেও।

পাঠক নিশ্চয়ই দেখবেন যে, এক্ষেত্রে আমি বড্ড বেশি আশার সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলাম।

সৌভাগ্যবশত, সব বড়ো-বড়ো বাঁদরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জির জিভই সবচেয়ে নড়াচড়া করে—আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইজুর—সে তখন গলা-ব্যথায় ভুগছিলো, জানতো কী ক'রে বড়ো ক'রে হাঁ করতে হয়, যাতে তারা ওর গলা পরীক্ষা করতে পারে। প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ দৃঢ় হ'লো—অবিশ্যি অংশতঃ—ওর জিহ্বা প'ড়ে আছে গলার তলায়—নির্জীব পদার্থের মতো—কেবল কোনোকিছু গেলবার সময় ছাড়া যা অনড় প'ড়ে থাকে। অচিরেই ব্যায়ামের ফল দেখা গেলো; দু-মাস পরেই ও শিখে ফেললো কী ক'রে জিভ বার ক'রে আমাকে দেখাতে হয়। কোনো ভাবনার সঙ্গে জিভ নাড়াবার প্রথম যোগসূত্র ছিলো এটাই—এমন এক যোগসূত্র যেটা ঠিক ওর ধাতের সঙ্গে মেলে।

ঠোঁট নিয়ে বরং অনেক ঝামেলা বাধলো: এমনকি চিমটে দিয়ে তাদের টেনে দিতে হ'লো মাঝে-মাঝে। কিন্তু বোধহয় আমার মুখের ভাব দেখেই ও এই অদ্ভুত কসরতের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলো—তাই চেষ্টা করেই কাজটা করতে শুরু করেছিলো ও। তার সামনে রুটিন ধরে আমি ঠোঁট নাড়তাম—যাতে ও সহজে নকল করতে পারে। ও চুপ করে বসে বসে হাত দুটি পিছনে নিয়ে পাছা চুলকাতো আর মনোযোগ দেবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসুভাবে চোখ পিটপিট করতো। কিংবা তার লোমশ গালে এমন ভাবে টোকা দিতে থাকতো, যেন কোনো মানুষ তার ভাবনা-চিন্তাকে তাল দিয়ে দিয়ে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। অবশেষে কী ক'রে ঠোঁট নাড়াতে হয় তা ও শিখে ফেললো।

ভাষার দক্ষতা অর্জন কিন্তু সহজ কাজ নয়, যে-কারণে পুরোপুরি কথা বলতে শেখবার আগে অনেকদিন ধরে মানবশিশুরা আধোআধো আবোলতাবোল বকে, আর শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাষার দক্ষতা বেড়ে ওঠে। এটা স্পষ্ট দেখানো গেছে যে, গলার স্বর-উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে মস্তিষ্কের বাক্-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সম্পর্ক এমন যে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক আনুপূর্বিক সহায়তায়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোবা-কালাদের কথাশিক্ষা-বিজ্ঞানের জনক এই তত্ত্বের পূর্বদ্রষ্টা। তিনি একে বলতেন "চিন্তার গতিশীল শৃঙ্খলা।" এই কথাটি এমনই স্ফটিকস্বচ্ছ যে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের অনেকেরই গৌরব বাড়াতো এটা।

ভাষার শিল্পের ব্যাপারে ইজুরের অবস্থা তখন ছিলো এমন এক শিশুর মতো, যে পুরোপুরি কথা বলতে পারার আগেই অনেক শব্দ বুঝতে পারে, তবে বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম সিদ্ধান্ত নেবার দিকেই ওর প্রবণতা ছিলো বেশী। আসলে এ তো শুধু জীবন বিষয়ে ওর বেশি অভিজ্ঞতারই ফল। এ-সব সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কেবল কতকগুলো ঝাপসা ধারণার ফল নয়, বরং বুদ্ধি-প্রসূত কৌতূহল ও নিরীক্ষার ফল—অন্তত তাদের বিচিত্র ধরন দেখে তাই মনে হয়। এতে যেহেতু ধ'রে নেয়া হচ্ছে ওর মধ্যে বিমূর্ত কিছু যুক্তি দিয়ে ভাবার ক্ষমতা আছে, তাতে বোঝা যায় ওর মধ্যে উচ্চস্তরের বুদ্ধি আছে —আমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তা যে খুবই অনুকূল তা তো বলাই বাহুল্য।

যদি আমার তত্ত্বগুলো বড্ড বেশি দুঃসাহসী ব'লে মনে হয়, তবে এটা মনে রাখতে হবে যে ন্যায়বাদ—যা কি না যুক্তি সাজিয়ে চিন্তা করার গোড়ার কথা—অনেক জীবজন্তুরই মানসিক ক্ষমতার বাইরে নয়। এটা যে সত্য তার কারণ ন্যায়বাদ মূলত দুই ভিন্ন অনুভূতির প্রতিতুলনা: তা যদি না হবে, তবে যে-সব জন্তু মানুষ দেখেছে তারা মানুষ দেখলেই পালিয়ে যায় কেন—আদৌ যারা কখনও গ্যাখেনি তারা তো যায় না!

এবার অতএব আমি ইজুরের ধ্বনিশিক্ষা নিয়ে পড়লাম, গোড়ায় শারীরিক বাকৃপ্রক্রিয়া শেখানো, তারপরে ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের দিকে নিয়ে যাওয়া। বোবা-কালাদের চেয়ে বাঁদরদের সুবিধে এইটুকু যে বাঁদর স্বর তৈরী করতে পারে। প্রথমে ওকে স্বরনিয়ন্ত্রণে শিক্ষা দেওয়া হলো যা স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল আর ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে গতিশীল।

বাঁদররা যে খেতে ভালোবাসে এ-কথা মনে রেখে—এবং বোবা-কালাদের শেখাতে গিয়ে হাইনিকে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার সূত্র ধরে—আমি ঠিক করলাম মুখরোচক একেকটা খাবারের সঙ্গে একটা ক'রে স্বরবর্ণের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তুলবো—যেমন 'আ' উচ্চারণের সঙ্গে আলু, 'ও' বলতে ওল, 'এ' বলতে খেজুর, এইসব। এমনভাবে ব্যাপারটাকে সাজালাম যে টুকিটাকি খাবারের নামের মধ্যে স্বরবর্ণটাকে পাওয়া যায়—কখনও একবার, কখনও বা দু-বার পর-পর, যেমন 'ও' স্বরবর্ণের পুনরাবৃত্তি আছে কোকো-তে। কিংবা কোনো শব্দ উচ্চারণের সময় কোথায়-কোথায় ঝোঁক পড়ে, সেদিকেও নজর রইলো। স্বরবর্ণ শেখাবার পালা তো ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেলো, অর্থাৎ মুখ খুলে যে-আওয়াজগুলো করা যায়। ইজুর তা দু-হপ্তাতেই শিখে

গেলো। ওর পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছিলো 'উ' উচ্চারণ করার সময়।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আমাকে একেবারে রাক্ষসের মতো খাটিয়ে নিলো। চট ক'রেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলুম, ও কখনও সে-সব ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে না, যাদের বেলায় জিভ আর মাড়ি দুয়েরই ব্যবহার করতে হয়। ওর লম্বা শ্ব-দন্ত তাতে বিষম বাদ সাধলো। ওর শব্দসংখ্যা কাজে-কাজেই সীমিত হ'য়ে গেলো—শুধু স্বরবর্ণ কয়েকটা, আর ব, ক, ম, গ, ফ, চ আর স—অর্থাৎ যে-সব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় জিভ আর তালুর সহযোগে। এমনকি এ-সব ক্ষেত্রেও উচ্চারণ পদ্ধতিই যথেষ্ট হ'লো না—বোবা-কালাদের বেলায় যেমন করা হয়, ওর বেলাতেও আমাকে তেমনি স্পর্শবোধের সাহায্য নিতে হ'লো—প্রথমে আমার বুকে ওর হাত পেতে রেখে—পরে ওর নিজের বুকেই, যাতে ও শব্দের স্পন্দন বুঝতে পারে।

এইভাবেই তিনবছর কেটে গেলো—একটা শব্দও ও পুরোপুরি উচ্চারণ করতে শিখলো না। ও জিনিসপত্রের নাম করতে শিখলো শুধু প্রধান বর্ণটির অনুসরণে—মাত্র এইটুকুই ওকে শেখানো গেলো।

সার্কাসে ইজুর কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করতে শিখেছিলো, কারণ একটা কুকুর ছিলো ওর খেলার সাথী। যখনই ও দেখতো যে, ওর মুখ থেকে কথা বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে-ক'রে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, ও জোরে-জোরে ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠতো, যেন আমাকে দেখাতে চাইতো ও কতটা জানে। স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আলাদা-আলাদা ক'রে এক-এক ক'রে উচ্চারণ করতো, কিন্তু তাদের জুড়ে কিছু তৈরী করতে পারতো না। খুব বেশি হ'লে এমনভাবে হুড়মুড় করে প আর ম পর-পর উচ্চারণ করতো যে, মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হ'তো।

এই মন্থর প্রগতি সত্ত্বেও ইজুরের চরিত্রে কিন্তু মস্ত একটা বদল দেখা গেলো। ও তার শরীর কম নাড়ে এখন, মুখের ভাব আরো চালাকচতুর হয়ে উঠেছে আর মাঝে-মাঝেই চিন্তার ভঙ্গি করে। যেমন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস হ'য়ে গেলো ওর। ওর স্পর্শাতুরভাবও অনেক বেড়ে গেছে; এখন একটুতেই ও কেঁদে ওঠে।

উচ্চারণ-চর্চা চলতেই থাকলো, নাছোড় প্রতিজ্ঞায়—যদিও তেমন একটা সাফল্য দেখা গেলো না। পুরো ব্যাপারটাই একটা বেদনাদায়ক প্রবল আবেশে ভ'রে গেলো—শেষটায় ক্রমেই আমি মারধোর করতে শুরু ক'রে দিলাম। ব্যর্থতার

সঙ্গে-সঙ্গে ধরনটাও ক্রমে তিক্ত হ'য়ে উঠছিলো—এতটাই যে শেষকালে ওকে দেখলেই আমার মধ্যে একটা অচেতন বিরূপভাব জেগে উঠতো।

ইজুরও ক্রমেই ওর গভীর, একরোখা নিঃশব্দতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকলো, মেজাজ দেখাতো, আর সেটাই আমার মধ্যে এ-বিশ্বাস জন্মাচ্ছিলো যে ওকে আমি কিছুতেই এই দশা থেকে বার ক'রে আনতে পারবো না। আর তখনই আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে ও-যে কথা বলে না, তার কারণ ও কথা বলতে চায় না।

এক সন্ধ্যায় আমার রাঁধুনি এসে দারুণ আঁৎকে উঠে আমাকে জানালো যে, বাঁদরটাকে নাকি সে সত্যি-সত্যিই কথা বলতে শুনেছে। তার কথা অনুযায়ী বাগানের ডুমুরগাছ-তলায় ও বসে আছে, সত্যি কী কথা বলেছিলো তা অবিশ্যি সে ভয়ে বলতে পারলো না, তবে বাঁদরটা যে কথা বলেছিলো এ ব্যাপারে তার কোনোই সন্দেহ নেই। দুটো মাত্র শব্দ সে মনে করতে পারলো—'বিছানা' আর 'পাইপ'। তার মূর্খতা দেখে আমি শুধু লাথি মারতে বাকি রাখলাম। আর তিন বছর ধ'রে আমি যা করিনি—যে ভুলটা পুরো নিরীক্ষাটাই বানচাল ক'রে দিলো—সেই ভুলটা আমি করলাম—সারা রাত জেগে উত্যক্ত ছিলাম ব'লে, আর অতিরিক্ত কৌতূহলের বশে।

বলাই বাহুল্য, তীব্র নিদ্রাহীন উত্তেজনায় আমার সে-রাতটা কেটেছিলো। কোথায় বাঁদরটাকে নিজে এসে কথা বলতে দেবো, তার বদলে উল্টে আমি ওকে জোরজুলুম ও কথা বলানোর জন্য জবরদস্তি করতে লাগলাম। যা পেলাম তা সেই 'প' আর 'ম'—যে-আওয়াজ দুটোয় আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। আর শুধু মাঝে-মাঝে তার ভণ্ড চোখ টেপা,—আর ভগবান রক্ষে করুন আমাকে—আর তার অস্থির নড়াচড়ার মধ্যে একটা উদ্ধত টিটকিরির ইঙ্গিত। আমি এত রেগে গেলাম যে এই প্রথম ওকে ক'ষে চাবকালাম, যার ফল হিসেবে ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর চোখের জল আর ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। গোঙানির কোনো আওয়াজ অব্দি করলো না।

ইজুর তিনদিন পরে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো—মনখারাপ, আর তার সঙ্গে দেখা দিলো মেনিনজাইটিসের লক্ষণ। জোঁক বসানো, ঠাণ্ডা জলে স্নান, জোলাপ, ঘুমের ওষুধ—এই ভীষণ অসুখ সারাবার জন্য সব ব্যবস্থাই করা হ'লো। দারুণ হতাশার সঙ্গে জেদ মিশে গেলো, আর তাই আমি যুঝে চললাম, অনুতপ্ত আর ভয়তাড়িত—অনুতাপ এই জন্য যে, আমার বিশ্বাস ছিলো জীবটি আমারই

নিষ্ঠুরতার বলি হ'লো, আর ভয় এইজন্য যে, হয়তো যে-রহস্য ও বহন করছে তা ভেদ করার আগেই ও কবরে চ'লে যাবে।

ওর কৃতজ্ঞ দুটো চোখ কখনোই আমার থেকে দূরে থাকতো না, ওর দৃষ্টি সবসময়ে আমাকে অনুসরণ করতো, পেছনে চলে গেলে ওর হাতদুটো আমাকে জাপ্‌টে ধরতো, আমার এই নিঃসঙ্গ দুঃখময় দিনে ও যেন সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠছিলো!

অনেক চেষ্টায় ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি চোখে পড়লো, কিন্তু এত দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো না। আসন্ন মৃত্যু ওর মধ্যে মহিমা আর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলেছিলো, পরীক্ষা চালাবার ভূত—সে তো আসলে এক ধরনের মনের রোগ ছাড়া কিছুই না—তবু আবার আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসলো। বাঁদরটা যে সত্যি-সত্যি কথা বলেছে—আমি তো আর ওকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না!

খুব ধীরে-ধীরে শুরু করলাম, যে-সব বর্ণ ও উচ্চারণ করতে পারে সেগুলো দিয়েই শুরু করলাম। কোনো আওয়াজ নেই। ওকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা রেখে দিলাম—আর দেয়ালের ফুটো দিয়ে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম—ওর বিশ্বস্ততা, ওর খাদ্যপ্রিয়তা, এগুলোকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করলাম। টুঁ শব্দ নেই! আমার বাক্যগুলো যখন দুঃখী-দুঃখী শোনাতো, ওর চোখ জলে ভ'রে যেতো। যখন আমি কোনো চেনা অভিব্যক্তি ব্যবহার করতাম, যেমন যে কথাটা দিয়ে আমি রোজ পড়ানো শুরু করতাম, 'আমি তোমার প্রভু', অথবা এই কথাটার জের টেনে যে-কথা বলতাম, 'তুমি আমার বাঁদর,'—যা দিয়ে আমি ওর মধ্যে এক শাশ্বত সত্যের অনড় অবস্থা বোঝাতে চাইতাম, ও তার চোখ বুজে সে-সব কথায় সায় দিতো, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতো না, এমনকি ঠোঁট অব্দি নাড়তো না।

আমার সঙ্গে ভাববিনিময়ের একমাত্র উপায় হিসেবে আবার ও ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করতে শুরু করেছিলো। এই ঘটনা, আর বোবা-কালাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য—এই দু'য়ের ফলে আমি আরো সাবধান হলাম, কারণ বোবা-কালাদের যে সহজেই মনের রোগ দেখা দেয়, তা তো সবাই জানে। কখনো-কখনো আমি চাইতাম ও সত্যি-সত্যি পাগল হ'য়ে যাক—যদি তবু প্রলাপ ওর স্তব্ধতা ভাঙতে সাহায্য করে।

ওর শরীর কিন্তু সারছিলো না! সেই একই শুষ্ক-বিশুষ্ক চেহারা, সেই একই বিষণ্ণতা, বোঝাই যাচ্ছিলো যে ওকে মনের রোগে ধরেছে: ওর পুরো শরীরটাই মস্তিষ্কের কাজ ঠিকভাবে না-চলায় ভেঙে পড়েছে—আর শিগ্‌গিরই ওর অবস্থা পুরোপুরি আশাহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এই রোগের ফলে ওর বাধ্যতা বেড়ে গেলেও ওর স্তব্ধতা—আমার মরীয়া চাবকানির ফলে যে মাথা খারাপকরা স্তব্ধতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছিলো তা একবারও ভাঙলো না। ঐতিহ্যের কোনো আবছা পশ্চাৎপট থেকে—যা ক্রমেই ধূসরতর হয়ে আসছে—বাঁদরজাতটাই ওর ওপর শত-শত বছরের স্তব্ধতা চাপিয়ে দিচ্ছিলো—ওর অন্তর্লীন সত্তায় ক্রমে জোরালো হ'য়ে উঠছিলো পূর্বসূরিদের উৎকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা যেন কোনো অজ্ঞাত ও বর্বর অবিচারের ফলে জঙ্গলের আদিম মানুষ অনিচ্ছুক স্তব্ধতায় ফিরে গিয়েছে, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির আত্মহত্যা ঘটিয়েছে,—ইজুরের এই অবস্থা তারই নামান্তর। ইতিহাসের ঊষা থেকে আরণ্য রহস্যগুলো এখনও সময়ের বিশাল উপসাগর পেরিয়ে ওর অচেতন সিদ্ধান্তের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে।

চারপেয়ে মানুষদের বিশাল পরিবার দুর্ভাগ্যবশত বিবর্তনের সময় পিছু হ'টে গিয়েছিলো—এবং মানুষ সে অবস্থা স্পষ্টতই পেরিয়ে গিয়েছিলো, পাশবিক বর্বরতায় তাদের দমিয়ে রেখেছিলো, আর নিঃসন্দেহে বাঁদরবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়ে তাদের আদিম নন্দনকাননের পত্রালির মধ্যে রাজত্ব হারিয়ে বসেছিলো। তাদের বংশধর কমে এসেছে সংখ্যায়, তাদের স্ত্রীজাতিকে ধরে বন্দী করা হয়েছে, যাতে সুসংগঠিত দাসত্ব মাতৃজঠরেই শুরু হ'য়ে যায়। তাদের সেই পরাভূত অবস্থায় তারা বাধ্য হয়েছিলো তাদের আত্মমর্যাদা প্রমাণ করতে অসুখী সেই উচ্চতর যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলে—যে যোগসূত্র কথিত ভাষা—যা কিনা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় আর এক চরম রক্ষাকবচ হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলো প্রাণিজগতের অস্পষ্ট আবছায়ায়।

আর কী নিদারুণ অত্যাচার, কী দানবিক নিষ্ঠুরতাই না বিজয়ীরা এই অর্ধপশুদের ওপর চালিয়েছিলো সেই বিবর্তনের মুহূর্তে—যার ফলে শাস্ত্রের সেই নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ পাবার পর, বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদ পাবার পরও—তাদের বাধ্য হ'য়ে মেনে নিতে হয়েছিলো অন্যান্য হীনতর জন্তুর সঙ্গে একত্রবাস! কোনো স্বয়ংচল সার্কাস খেলোয়াড়ের অঙ্গভঙ্গির স্তরেই তারা রয়ে গেল, যেন এক পশ্চাৎগতি তাদের পেছনে টেনে রেখেছিলো। জীবনের সেই দারুণ ভয় যা কিনা পরিণামে তাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দিলো দাসত্বে—যা তাদের জান্তব অবস্থার প্রতীক—

তাদের গায়ে মোহর বসিয়ে দিলো এক সুকরুণ বিমূঢ়ভাবের—যা তাদের ট্র্যাজি-কমিক স্বভাবের ভিত্তি হ'য়ে দাঁড়ালো।

সাফল্যের ঠিক পূর্বমুহূর্তে এটাই আমার মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছিলো। হয়তো আমার মধ্যেই কোনো আদিম অন্ধকারে তার বাস ছিলো, হাজার-হাজার বছর ধরে বাক্‌শক্তির জাদু বাঁদরদের আত্মায় সাড়া জাগিয়েছে, প্রাণীদের সহজাত অন্ধ আবছায়া ভেদ করে যা স্ফুরিত হ'তে উদ্যত হয়েছিলো, সেই পূর্বসূরিদের স্মৃতিবিস্মৃতি যা তার চেতনে-অবচেতনে মাখামাখি হয়েছিলো—সেই যুগযুগের পুরোনো বেড়াকেই আবার মনে পড়িয়ে দিলো আমার রাগ।

চেতনা না হারিয়েই ইজুর মরতে বসেছে। খুব শান্ত এক মৃত্যুর ছবি: দু-চোখ বোজা, মৃদু নিঃশ্বাস, ক্ষীণ নাড়ির শব্দ, আর পরিপূর্ণ শান্তি। শুধু মাঝে-মাঝে তারই মধ্যে ফুটে ওঠে অন্য ছবি—যখন সে তার করুণ, বৃদ্ধ মুলাটো মুখ ফেরায়—তার মধ্যে দেখি বুকভাঙা অভিব্যক্তির চিহ্ন। শেষ বিকেলবেলাটায়, ওর মৃত্যুর অপরাহ্ণে, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিলো, যার জন্য আজ আমি এই গল্প লিখতে বসেছি।

আসন্ন সন্ধ্যার উষ্ণতা ও স্তব্ধতায় ঝিম্ ধরে আসছিলো আমার। ইজুরের বিছানার পাশে আমি ঢুলছিলাম, এমন সময় হঠাৎ অনুভব করলাম কে আমার কব্জি চেপে ধরেছে। আঁৎকে, আমার চট্‌কা ভেঙে গেলো। বাঁদরটা—তার চোখ দুটি বিস্ফারিত, মরতে চলেছে, আর তার মুখের ভাব এমনই মানুষের মতো দেখালো যে আমি বিভীষিকা দেখলাম। কিন্তু ওর হাত, ওর চোখ দুটি, এমন মুখরভাবে তার দিকে টেনে নিলো যে, আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। আর তখন, ওর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে, সেই অন্তিম নিঃশ্বাস যা যুগপৎ আমার সব আশা ভেঙে দিলো আবার জয়ের আহ্লাদ এনে দিলো—ও উচ্চারণ করলো—আমার কোনোই সন্দেহ নেই—ও অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো (কেমন ক'রে আমি জানবো সে স্বর কী-রকম, যে হাজার-হাজার বছর আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি)—এই কথাগুলো, যার গভীর মানবিকতা আমাদের দুই প্রাণীর মধ্যকার অতল ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা ক'রে দিলো!—

'প্রভু, প্রভু আমার, জল দাও! জল······'